আহকামুল হাদীস
(সিহাই সিন্ধ আলোকে মাযহাববিত্তিক শরীয়তের বিধান পর্যালোচনা)

লেখক
মাওলানা মোঃ কামরূল হাসান
পি.এইচ.ডি. (গবেষক)
বি.এ. অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ. (ইসলামিক স্টাডিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাকমীল ১ম শ্রেণীতে ১ম
ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা
আহকামুল হাদিস

প্রকাশনায়:
রিয়াদ প্রকাশনী
৩৪ নর্থ ব্রুকহ্যাল রোড,
বাংলাদেশ, ঢাকা
ফোনঃ ০১৯১৪৫৮১০৩, ০১৯১৬৭৪৭৮৯৮,
০১৯১৪১৬১৫২৬

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী, ২০০৬
তৃতীয় সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

কম্পোজঃ
মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ (রিয়াদ)

প্রচ্ছদঃ
মো. সারোয়ার জাহান

মুদ্রণঃ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেজ্জ দাস রোড, ঢাকা

বাঁধাইঃ
কোয়ালিটি বাইডিং হাউস
৩১/২ শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্যঃ ৩৫০.০০ টাকা

(সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)


US$ 15.00
বাংলা ভাষাভাষী
হাদীম ও ফিরুজ অধ্যাপনকারীদের জন্য
নিবেদিত
মুখবন্ধ

সকল প্রশ্নে মহান আল্লাহ তাআলার। যিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আসমানী কিতাব প্রদি কৃষ্ণন নামিল করেছেন। দরদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ (সা

ে) এর উপর, যিনি ছিলেন এই পরিবর্ত কৃষ্ণনের উত্তম ব্যাখ্যাদাতায়। দুআ ও মাফকেরত কামনা করি। ঐ সকল অভিজ্ঞ মহামতী মুজতাহিদগণের উপর, যাঁরা অন্তর্ভুক্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে কৃষ্ণন-হাদীসের উপর গবেষণা করে শরীয়তের বিভিন্ন ব্যুৎপন্ন আহকাম ও মাসআলা-মাসবুল রচনা করে আমাদেরকে ইসলামী শরীয়তের উপর চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন।

হাদীস ইসলামী শরীয়তের বিদিয়ী উৎস। কৃষ্ণনের পরেই এর প্রয়োজন। একজন মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই আল-কৃষ্ণনের পাশাপাশি হাদীস চর্চায় মনোযোগ হয়ে থাকেন। আর এই অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে যদি হয় মাত্রাভাষ্য, তাহলে তা খুব সহজেই হস্তাক্ষর করা যায়। তাই আরবী, উর্দু, ফার্সি, ইংরেজী, ফরাসী সহ বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভাষা নেই, যে ভাষায় কৃষ্ণন-হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ প্রকাশিত হয়।

কিছুকাল পূর্বে বাংলা ভাষায় মুসলামের কৃষ্ণন চর্চার প্রধান মাধ্যম ছিল আরবী, উর্দু ও ফার্সি ভাষা। এর অন্যতম কারণ হল ভৌগোলিক অবস্থান। কেননা এতদূর্দুর্বল ইসলামী আন-বিজ্ঞানের প্রাচীন প্রাচীরে অনেক সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আফ্গানিস্তান, পাকিস্তান ও তাদের ভাষায় মহামতীদের মাধ্যমে আর তাদের কাছে না কাছে মাত্রাভাষ্য ছিল আরবী, ফার্সি অথবা উর্দু এবং তাদের রচিত সকল কিতাব ছিল মাত্রাভাষ্য আরবী, উর্দু অথবা ফার্সি ভাষায়।

আলহামদুল্লাহ, ইস্মাইল ইসলামিক ফোরেন্স ও বিভিন্ন উদ্যোগের কর্তৃক পবিত্র কৃষ্ণনের তাজমাহল বিভিন্ন তাজমাহল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, অনুবাদ হয়েছে। সিহার সিহার বা হাদীসের বিহৃত হয় কিভাবে হাদীস অনেক হাদীস গ্রহণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও শত্রু যে, এতদূর্বল আজ বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রহণ নেই বললেই চলে। আর যে আছে তাও যদিও মান্য। অনেক কৃষ্ণন-হাদীসের শব্দার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মজবাদ, মাসআলা উত্তর প্রদানকারী সাহাবাবের কিতাবের কৃষ্ণন-হাদীস স্বত্নতার জন্য তারতমোর কারণে ও মাসআলা রচনায় নীতিগত পার্থক্য বিভিন্ন কারণে হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক এখতিয়ালা রয়েছে, এর সঠিক ব্যাখ্যা না জেনে সরাসরি হাদীস অধ্যয়ন করলে সাধারণ শিক্ষিত এবং অন্যতম আলিমের বিভিন্ন বিভক্তি নিরপেক্ষ হবেন। গুরু হাদীসের তরজমা পড়ে অনেকে তো রীতিমত গবেষণ মুখাদিস হয়ে গেছেন, মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন, জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, আবার অনেকেরই হিতে বিপীলত হতেও দেখা গেছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিপক্ষ হাদীস বিশ্লেষণ কর্তৃক বাংলা ভাষায় হাদীসের ব্যাপক খেদমত। আর এই খেদমতের জন্য কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে।
দ্বিতীয়তে, আজকাল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কারণে আর্বী ও উর্দু ক্ষেত্রে পারদর্শী ও পূর্ণ মনোযোগী না হওয়ার কারণে হাসপাতালের কিতাবসমূহের সাথে মাঝামাঝি উদ্ধার করতে অক্ষম। কেননা, হাসপাতালের অধিকাংশ অমূল্য ব্যাখ্যাহীয় আর্বী ও উর্দুতে রচিত। তাই পরিস্কার সময় বাজার থেকে সাল ভিত্তিক কিছু গাইড কিনে দায়সারাতভাবে পরিক্ষা দিয়ে কোন মত পাশ করার চিহ্নিত মূল্য থাকে। এতে পরিক্ষায় ফলাফলের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হলেও এর ব্যাখ্যাতালের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে তখনই তেবেছিলাম, সহজ-সরল বাংলায় সিহাব সিস্টার্স আলোকে রচিত মাহাবিদিতিক কোন গ্রুহ থাকলে ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ জনগণের জন্য খুবই উপকার হত।

আর এ ধরনের গ্রুহ বাজারে আছে কিনা, তা দীর্ঘদিন কিছু না পেয়ে আশাহত হয়েছি। তখনই বাবলাম, এ ধরনের একটি গ্রুহ রচনায় হত দিলে কেমন হয়। কিন্তু পরিক্ষায় মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে, আমি কে? আমার ইলেমের সৌধ বা বন্ধ দূর? এ ধরনের কিতাব রচনার স্বপ্ন তো তাঁরাই দেখতে পারেন, যারা ইলেমি ও আমলী মোদ্দাতায় শীর্ষে বিচ্ছিন্ন করছেন।

আমি আগেই বলেছি, কোন কাজ শুরু করার জন্য কাউকে না কাউকে তা এখানে আসতেই হবে। তাই নিজের শত অযোগ্যতা জানা সম্ভব ও ভিত্তিতেই জন্য এই প্রায়ই বানিকটা ফলদায়ক হতে পারে না একই অর্থ গ্রুহ রচনায় হত দেই আজ থেকে কাছ পাঁচ বছর পূর্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাইল বিভাগে অনার্সে অধ্যয়নের অবসায় বৃত্তি ও পরীক্ষা ছাড়া বাকি সবটুকু সময় নিজেকে এই খেদতে ভাসত রাখার চেষ্টা করছি।

সিহাব সিস্টার্স উপর মাহাবিদিতিক ব্যাখ্যাগ্রুহ রচনা করা সহজ হয় না। এটি যেমন অন্যের বড় হওয়ার কথা, তেমনি তথ্যচুক্তি হওয়াও উচিত। কিন্তু বিভিন্ন দিক চিন করে এবং কিতাবটি কলেবর সীমিত রাখতে গিয়ে আপাতত আলোচিত অধোয়সমূহে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অনুভূমিক শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা করা সত্ত্ব হয়নি। ইন্দ্রায়ন পরবর্তী সংকলনে সমাধান পাঠকের চাহিদা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সংযোগের সম্ভাবনা রইল।

আর কিতাবটিতে পরিবাতা, নামায, যাকাত, হজ, বিবাহ, তালক ও রোয়া মোট সাতটি অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সুনাম হিসেবে আরু দাউদ প্রথম খুব গুরুত্ব দিয়ে যেটি বিবেচনা করে গ্রুহে বিবাহ বিবেচনা হয়েছে। আর প্রতিটি অনুভূমিক শুরুতে আরু দাউদের মূল কিতাব অনুসারে পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পাঠকদের, বিশেষত গবেষকদের
সাত

সুবিধার্থে প্রতিটি হাদিসের শেষে সাধারণীয় সিহায় সিহায় গ্রহণের (ভারতীয় সংস্করণ অনুযায়ী) অনুচ্ছেদ, খন্ড ও পৃষ্ঠার বরাতও দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট হাদিসটি উল্লিখিত প্রদৰ্শকে হৃদয়ে অথবা শাস্কি বা রাস্তার পার্থক্য সহকারে, সংক্ষেপে, দীর্ঘ-আকারে অথবা আংশিকভাবে সংকল্পিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত হাদিসের আলকে প্রাপ্ত মাসআলার ব্যাপারে বিভিন্ন মায়াহাবের মতান্ত সত্য ও দলিল সহকারে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর অধিকাংশ হাদিসের বঙ্গনুবাদের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবুবকর সিরিক কর্তৃক অনুৌদিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আরু দাউদ হাদিস গ্রহণের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সারোকে চেয়ারম্যান, আরবী-বাংলা অভিধান রচনার জগতের সমুদ্র নকশা, বঙ্গনুবাদের প্রণেতা, আরবী ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ও সিরাত বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য আলাহ শরীফের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান তাঁর গৌরবপূর্ণ অধ্যাপনা ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠান সময় ব্যয় করে পৃথ্বি কিতাবটির সম্পাদনা করে প্রথম পর্যায়ের প্রথমোক্তাত্যাত বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। ইসলামের আরো অধিক খেদমতের জন্য আলাহ তাজালা তাঁকে বরকতের মর্যাদা দান করেন। তাঁরই ছোট ছেলে কম্পিউটার ইজিনিয়ার ও প্রোগ্রামার রেজিয়াওয়া তাঁর কম্পিউটারের উপযোগী করে আরবী ও বাংলা সফটওয়্যার চমৎকারভাবে পুনর্নির্দেশ করে দিয়েছেন এবং বড় ছেলে রিয়াদ তাঁর নির্দেশ পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ কিতাবটি কম্পিউট করে প্রথম পর্যায়ে সূর্যের মুখ দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। মূলত তাঁর অকৃত্রিম প্রতিক্ষণ সহায়তা ছাড়া কিতাবটিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হতে না। আমি তাঁদের কাছে চিরখুশী। এছাড়া আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জামিয়া ইসলামীয়া লালমাটিয়া মাত্রাসার শিক্ষক প্রথিতবাদী মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম (সোহাইল) সহ অন্য ছাত্র তাকে ও গুপ্তদৃষ্টি এই কিতাবটি প্রণয়নে বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। আলাহ তাতালা সবাইকে উত্তম বিশিষ্টিত দান করন।

সহস্র পাঠকের কাছে আমার বিনিয়োগ আবেদন, মুদ্রণ প্রমাদসহ এই কিতাবের কোন ভুলক্ষেত্র ধরা পড়ে না ও আমার ইলমী অনুপ্রাণির কারণে কোথাও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে মেহেরবানী করে কেউ তা আমাকে জানাতে তাঁর কাছে আমি অশোক কৃতজ্জ্ব থাকবে এবং পরবর্তী সংক্রান্ত সংগ্রহে সব ভুল-ক্রীতি ও অসংগতি দূর করার চেষ্টা করব।

বিশ্বের বাংলা ভাষাভাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের হাদিস চার্চার ক্ষেত্রে এই কিতাবটি সামান্যতম উপকারে এসেই দীর্ঘদিনের এই পরিশ্রম সার্থক হবে।

মাওলানা মোঃ কামরুল হাসান
01/01/2006 ইং
সূচীপত্র

অধ্যায়

পবিত্রতা অধ্যায়

কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ
পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া
অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির
পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন

dাঙ্গিতে পেশাব করা

টয়লেট হতে বের হওয়ার দৌয়া

যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইতিক্ষ করা নিষেধ

dাঙ্গি হতে ইতিক্ষ করা

মিসওয়াক করা

অমু ফরয় হওয়া

যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়

কুকুরের লেহনকৃত পাত্র যৌতু করা

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

সাগাের পানি দ্বারা অমু করা

অমুর পরিপূর্ণতা

অমুর পূর্বে বিস্মিল্লাহ পাঠ করা

নবী করিম (সা.ব)-এর অমুর বর্ণনা

পাগড়ির উপর মাসেহ করা

মোজার উপর মাসেহ করা

মোজার উপর মাসেহ করার সময়লাম

মাসেহ করার পদ্ধতি

(ক্রীতে) চুম্বনের পর অমু করা

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে অমু

আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অমু না করা

রক্ত বের হলে অমু করা

মহী (বীর্যবর) সম্পর্কে

ঝুঁতুবী ক্রীতে সাথে মেডিনেশা ও খাওয়া-দাওয়া

ক্রীতে সাহাসী বীর্যপাত না হলে

অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ

ইতেহায়গুপ্ত (রক্তশৃঙ্খল) মহিলাদের প্রত্যেক নামায়ের সময়

গোলাম করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসসমূহ

দুই তুহের মধ্যবর্তী সময় গোলাম

তায়ামুম

তায়ামুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে

পৃষ্ঠা

17-123
17
22
23
24
26
29
30
32
35
38
40
45
49
51
58
62
64
68
70
72
75
77
79
82
84
88
91
95
97
100
103
109
114
জুমার দিনে গোসল করা 116
কাপড় বীর্ধ লাগলে 119
শিক্ষার পেশার কাপড় লাগলে 123

নামায় অধ্যায় 126-321
নামায়ের ওয়াজাসূহ 126
যুহরের নামায়ের ওয়াজ 132
আসরের নামায়ের ওয়াজ 135
যে ব্যক্তি এক রাকত নামায় পেল, তার পুরো নামায় পেল 139
মাগরিবের নামায়ের ওয়াজ 140
এশার নামায়ের শেষ ওয়াজ 142
ফজরের নামায়ের ওয়াজ 145
আযানের সূচনা 149
আযানের নিয়ম 152
যে আযান দিয়েছে, সেই ইকামত দিবে 158
আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ 160
ওয়াজ শুরু হওয়ার পূর্বে আরাম দেওয়া 163
জামাআত পরিযোজনাগুলোর কঠোর পরিণতি 165
মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত 169
একই নামায় দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা 172
ইমামদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি কে? 175
কোন ব্যক্তির একবার নামায় আদায়ের পর ঐ নামায়ে পুনরায় ইমামতি করা 179
নামায়ের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জিনিসের বর্ণনা 182
যে যেকারণে নামায় নষ্ট হয় 186
রাফিউল ইয়াদীর বা নামায়ে হত্যার উদ্ভিদন 190
উচ্চবর্ণে বিস্মিল্লাহ না বলা 196
কোন ব্যক্তি নামায়ে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিসাআত পাঠ ভাবে করলে 201
প্রথম ও তৃতীয় রাকতের পর নয়ানোর নিয়ম 214
দুই সিজদার মধ্যবর্তী উপেক্ষা পদ্ধতি 215
নামায়র অবস্থায় হাঁচির জন্য দেয়া (নামায়ে কথা বলার হুকুম) 217
ইমামের পিছনে আমীন বলা 227
বসন নামায় আদায় করা 232
তাশাহাদের বর্ণনা 234
তাশাহাদের মধ্য (অাগাল দ্বারা) ইশারা করা 237
সালাম সম্পর্কে 241
যে ব্যক্তি নামায়ের মধ্যে সদিতে হয়েছে 243
গ্রামাঙ্কে জুমার নামায়ের বিধান 246
জুমআর নামায়ের সময় 255
ইমামের খুতবা দেয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করলে 257
যে ব্যক্তি জুমআর নামায়ে এক রাকাত পায় 262
দুই ঈদের নামায় 264
ঈদের নামায়ের তাকবির সংখ্যা 266
ঈদের নামায়ের পর অন্য নামায় 270
মুসাফির কখন নামায় করে পড়বে 272
দুই ওয়াকের নামায় একটি করা 274
সফরে সুন্নত ও নফল নামায় 279
মুসাফির কখন পূরা নামায় আদায় করবে? 280
ফজরের সুন্নত পড়ার পূর্বেই ইমাম জামাজাতে দাঁড়িয়ে গেলে 288
যদি কারো ফজরের সুন্নত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে? 291
রমজান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত 293
কুরআন মজীদে সিজুদায়ে তিলাওয়াত করাটি? 301
বিতর্কের নামায় সুমৃত 308
বিতর্কের নামায়ের রাকাত সংখ্যা কত 312
বিতর্কের নামায়ে দু’আ করুন 318
যাকাত অধ্যায় 322-373
যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয় 322
বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত 329
গুছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত 331
কৃষিজ ফসলের যাকাত 334
মধুর যাকাত 339
সদকাতুল ফিতর (ফিতরা) 342
সদকাতুল ফিতর প্রদানের সময় 342
কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে 343
অগ্রিম যাকাত প্রদান করা 358
এক এলাকায় যাকাত অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া 360
যাকাত কারো দিতে হবে এবং কারো ধনী বলা যায় 363
এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে 369
অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা 371
হজ্জ অধ্যায়  ৩৭৪-৪৩৯
হজ্জ ফরয় হওয়ার বর্ণনা  ৩৭৪
মাহরাম ব্যক্তির মহিলাদের হজ্জে গমন  ৩৮০
আরেকটি অনুচ্ছেদ (অবিলম্বে হজ্জ সম্পন্ন করা)  ৩৮২
অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ  ৩৮৪
মীকাত সমূহের বর্ণনা  ৩৮৮
হজ্জ ইফরাদ  ৩৯২
যে ব্যক্তি অনেক পক্ষ (বড়লী) হজ্জ করে  ৩৯৯
মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা  ৪০৪
হজ্জ বা উমরা করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে  ৪১০
আসরের পরে তাওয়াফ করা  ৪১২
হজ্জ কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ  ৪১৪
মাথার কেশ মুড়ন ও কর্ডন করা  ৪১৭
উমরা  ৪২০
ঋতুবাতি মহিলা যদি তাওয়াফ বিদায়ের পূর্বে তাওয়াফে ইফরাদ সম্পন্ন করে  ৪২৪
হজ্জের সময় যদি কেউ আগের কাজ পরে বা পরের কাজে আগে করে  ৪২৭
কাবা ঘরের মধ্যে নামায  ৪২৯
মনীনায় অগমন  ৪৩৪
কবর মিয়ারত  ৪৩৪

বিবাহ অধ্যায়  ৪৪০-৫১০
বিবাহে দূষ্টা প্রদান  ৪৪০
বয়ফু ব্যক্তির দৃষ্টান্ত  ৪৪৯
পার্চারিক কম দৃষ্টান্তে হরমাত (হারাম) প্রতিষ্ঠিত হবে কি?  ৪৫৩
মুতা বা তোগ বিবাহ  ৪৫৯
তাহলিল বা হালাল করা  ৪৬৭
বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা  ৪৭০
গুলী বা অভিভাবক  ৪৭২
সমন্ত পরিমাণ মহর  ৪৮০
সুমারী স্ত্রীর সাথে অবস্থানকাল  ৪৯২
সহবাস সম্পর্কিত অন্যান্য হাদিস  ৪৯৪
আয়াল সম্পর্কে (পরিবার পরিকল্পনা)  ৪৯৯

তালাক অধ্যায়  ৫১১-৫৮০
সূচনা তরীকায়তালাক  ৫১১
বিবাহের পূর্বে তালাক  ৫১৮
রাগানিতী অবস্থায় তালাক দেয়া  ৫২১
তিন তালাক প্রদানের পর, পুনঃগ্রহণ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদিস  ৫২৪
খিলালা তালাক

ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারে অধিক দ্রী থাকে

লিঙ্ক

নিদর্শন অনুসরণবিদ্যা

সম্প্রদায়ের অধিক হুকুমকে?

তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দ

তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরোপোক

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দে তত্ত্বাবধায় আলোচনা বিষয়ে বেলায় বাইরে যাওয়া

যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

তালাকে বায়েন (তিন তালাক) প্রাপ্তা রমণী তত্ত্ব তার স্বামীর নিকট

ফিরে যেতে পারবে না; যত্ত্ব না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে

রোয়া অধ্যায়

“যারা রোয়ার সাম্বঢ্যক রাখে অক্ষ রোয়ার রাখে না তারা ফিদোয়া দিবে”

আল্লাহ তাআলার এ বাণী মানসূখ (রহিত) হওয়া

যদি রমণীর উন্নতি রোকতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে

তবে তোমরা বিশ্ব রোয়া পূর্ণ করবে

যদি কোন অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়

সম্প্রদায়ের দিবসে রোয়া রাখা মাকরহ

শাখালনের চাঁদ দর্শনে দু’বাণীর সাক্ষ্যদান

(সাহরিয়া) খাবার গ্রহণের অবস্থায় আচ্ছাদন হতে পেলে

সাহেন বিসাল

রোয়াদার ব্যক্তির মিষ্টান্ন করা

রোয়াদার ব্যক্তির শিংগা লাগানো

রোয়াদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

রোয়াদার ব্যক্তির চুষ্টন করা

রমণী মাসে নাপাক অবস্থায় ভোয় হলে

যে ব্যক্তি রমণীর দিন রোয়ার সাথে সহস্ত্ব করে তার কাফকারা

যে ব্যক্তি রোয়ার কাপ বাক্স থাকার হ্রস্বতায় মৃত্যুবরণ করে

সফরে রোয়া রাখা

রোয়ার নিয়ত

ইতিকাফ

ইতিকাফ কোথায় করতে হয়?

প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ

ইতিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলার খোরোপোক

বায়েন তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ইদ্দতকলীন সময়ে দিনর বেলায় বাইরে যাওয়া

যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ঘর হতে বের হওয়া

তালাকে বায়েন (তিন তালাক) প্রাপ্তা রমণী তত্ত্ব তার স্বামীর নিকট

ফিরে যেতে পারবে না; যত্ত্ব না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে
সাহাবীরা যিনি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাদুত) এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপর ইতিকাল করেছেন, তাকে রাসূলুল্লাহ (সাদুত) এর সাহাবী বলা হয়।

তাবেক্স। যিনি রাসূলুল্লাহ (সাদুত)-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং মুসলমান হিসাবে ওফার লাভ করেছেন, তাকে তাবেক্স বলা হয়।

মুহাসিব। যিনি হাদিস সর্ব করা এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সনদ এবং মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাকে মুহাসিব বলে।

শায়খাইন সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রাহ।) কে একত্রে 'শায়খাইন' বলা হয়; কিন্তু হাদিস শাখে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ।) কে এবং ফিকহের পরিভাষায় ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ।) কে একত্রে 'শায়খাইন' বলা হয়।

রাবিক। হাদিস বর্ণনাকারীকে রাবিব বলে।

রেওয়ানের হাদিস কর্ম করাকে রাবিব বলে। কখনো কখনো মূল হাদিসের কোন রেওয়ানের বলা হয়।

সনদ। হাদিসের মূল কথা কথুকুর যে সূত্র পরিপূর্ণ গ্রহ সংকলনকারী পর্যন্ত পূর্নে বলেছে তাকে সনদ বলে। এতে হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সুসজ্জিত থাকে।

মতন। হাদিসের মূল কথা ও তার বিশদসম্বন্ধে মতন বলে।

মারফুজ। যে হাদিসের সনদ (বর্ণনা পরশরী) রাসূলুল্লাহ (সাদুত) পর্যন্ত পূর্নে বলেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সাদুত) থেকে হাদিস গ্রহ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবির নাম বাদ পড়েনি, তাকে মারফুজ হাদিস বলে।

মাওক্ফুজ। যে হাদিসের বর্ণনা-সূত্র উদ্ধৃত করার সাহাবীর পর্যন্ত পূর্নে বলেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওক্ফুজ হাদিস বলে।

মাক্কুক। যে হাদিসের সনদ তাবেক্স পর্যন্ত পূর্নে বলেছে, তাকে মাক্কুক হাদিস বলে।

মুদাল্লাস। যে হাদিসের রাবির নিজের প্রকৃত ওজনের নাম উদ্ধৃত না করে তার উপরহৃ শাযখের নামে এভাবে হাদিস বিনা করেছেন যাতে মন হয়, তিনি নিজেই উপরকৃত শাযখের নিকট তা গোপন অথচ তিনি তার নিকট সে হাদিস জন্মেনি, এমন হাদিসকে মুদাল্লাস বলে। এরপর করাকে তাদিস বলে। আর যিনি এরপর করেন তাকে মুদাল্লাস বলে। এক কথায় বলা যায়, যে হাদিসের সনদ দোষ লুকানো হয়েছে কিন্তু বাহিক দিক সুন্দর করে তোলা হয়েছে, তাকে মুদাল্লাস বলে।

মুহাতাবির। যে হাদিসের রাবির হাদিসের মতন বা সনদের বিভিন্ন প্রকারে পরিমিত করে বর্ণনা করেছেন সে হাদিসকে হাদিসের মুহাতাবির বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনোরও সময় সাধন সম্পর্কে হয় বা প্রাপ্তি নেয়া না যায়, সে পর্যন্ত এই হাদিসের ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। এ ধরনের রেওয়ানের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

মুহাসিব। যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণের পর্যন্ত রক্ষিত আছে, কোন তোরই কোন রাবির নাম বাদ পড়েনি তাকে মুহাসিব হাদিস বলে।

মুনকাতি। যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক জনের কোন রাবির নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদিস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকাত।
ছৌদ্দ

মুসালাহঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা বা বিচিত্রতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর
নাম বাদ পড়েছে এবং তাকেই সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা
করেছেন তাকে মুসালাহ হাদীস বলে।

মরফুজ ও মুনকারঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত
হাদীসের বিপরীত হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মরফুজ বলে এবং অপর
রাবীর হাদীসটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

বাহ্যিঃ যে মুতাভিন্ন হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত
(স্থৃতিশাক্তি) ওং সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষালোক মুক্ত, তাকে সবীহ হাদীস বলে।

হাসানাঃ যে হাদীসের কোন রাবীর স্থৃতিশাক্তি ওং পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান
হাদীস বলে। ফিকুহবিদগণ সাধারণত সবীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন
করেন।

যইফাঃ যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যইফ হাদীস
বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল (যইফ) বলা হয়, অন্যথায় মহানবী
(সাঃ)-এর কোন বাকীই যইফ নয়।

মাসুমুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা
কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসটিকে মাওয়ু হাদীস বলে। এরপ
ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতর্কঃ যে হাদীসের রাবীর হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকাজেই মিথ্যার আশ্রয়
গ্রহণ করে বলে যায় তার বর্ণিত হাদীসকে মাতর্ক হাদীস বলে। এরপ ব্যক্তির বর্ণিত
হাদীসগুলো পরিচালে।

মূহামদঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমমরুপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষালোক
বিচার করা যেতে পারে, এরপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মূহামদ হাদীস বলে। এই ব্যক্তি
সাহাবী না হলে তার হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাভাকিরঃ যে সবীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যাকে লোক রেওয়ায়েত
করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অত্যন্ত, তাকে মুতাভাকির
হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জান লাগ হয়।

খবরে ওয়াহিদঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিন জন রাবীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে
ওয়াহিদ বা আখবারবল আহাদ বলে। এই হাদীস তিন প্রকারঃ-মাঝুরঃ যে সবীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততঃপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে
মাঝুরুর হাদীস বলে।

আবীরঃ যে সবীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আবীর বলে।

গাবীবঃ যে সবীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গাবীব হাদীস বলে।

হাদীসে কুফসীবঃ যে হাদীসের মূলচথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর
সাথে সশস্ত্রকর্তন করে। যেমন আল্লাহ নবী করিম (সাঃ)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নোগ্যে অথবা
জিবাঙ্গল (আঃ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, আর নবী করিম (সাঃ) তা নিজ ভাষায়
বর্ণনা করেছেন, তাকে হাদীসে কুফসীবা হাদীসে ইলাহীবা হাদীসে রবানী বলা হয়।
পনের
আহকামুল হাদিস প্রণয়নে সহায়ক প্রচ্ছালনা

1. বুখারী
2. মুঘলিম
3. তিরমিশি
4. আবু দাউদ
5. নাসারী
6. ইবন মজহার
7. দরসে তিরমিশি (উর্দু)
8. দরসে ভিজকাত
9. তামতীমুল আশতাত
10. আল বাহরুর রায়ক
11. ফাতেওয়ায়ে রহিমিয়াহ
12. ফাতেওয়ায়ে বারী
13. বজাতুল মজহুদ
14. আল উরফুল গায়ত্রী
15. মুহতাদরকে হাফিম
16. আহারুস সুনান
17. মাজহাউদ মাওয়ায়াল
18. ফাতেওয়ায়ে মুহরিম
19. লামআতুত চানকীহ
20. উমদাতুল কারী
21. মাজহাউদ পুনান
22. নাসরুল রায়ে
23. দায়া ফুতে
24. মুসলমানে আবুর রাজ্যাক
25. শরহে মাজহাউদ আহার/তাহারী
26. বায়াহারী
27. মুসাফ ইমাম মুহাম্মদ
28. ইলাউদ সুনান
29. তাহলুকস সাবিহ
30. আহকামুল কুরআন
31. মুসলমানে ইবন আবী শায়বা
32. শরহে মুসলিম
33. ফাতেওয়ায়ে কানীর
34. আশ শরহুল মুযাহাব
35. আল ইনাইয়াহ
36. উক্ত ডুল জাওয়াহির
37. আল মুগান
38. তালব্রীমুল হাবার
39. সহিহ ইবন খুয়ায়মা
40. ফাতেওয়ায়ে রাজ
41. মাজহাউদ কুরআন
42. হেদায়া
43. বাদায়হাউস মানাই
44. ফাতেওয়ায়ে রাহমানিয়া
45. মুসাফ ইমাম মালিক
46. কিতাবুল কেরাউতি
47. রকুল মাজহারী
48. কানুনুল উদাল
49. আল কাওকাবুদ দুরয়ি
50. আল মুতালিবুল আলিয়াহ
51. বিদায়েহামুল মুতাহাদ
52. রকাআতুত তারিভে
53. মুসাফ লিল খাদে
54. নুরুল আনওয়ার
55. তাফসিরে কুরতুবে
56. তাফসিরে মাহাবী
57. শরহে বেকায়াহ
58. কানুনুল দাকায়েক
59. মুসাফ আহমদ
60. মাবসুত
61. লিসানুল আরব
62. সীরাতে ইবন হিবাম
63. তাবকাতে ইবন সাদ
64. আহ অহাকীহ কাবিরুল রাজ
65. মীযাসুল ইতিদাল
66. তাহলুকস কামাল
67. আল বিদায়হাম ওয়ান নিহায়া
68. নায়লুল আওতার
69. ফাতেওয়ায়ে শামি
70. আল জামিউস সাইর
৭১। আল ফিক্রাল ইসলামী ওয়া আদিলাজুল্লাহ
৭২। ফাতাওয়ায়ে আলমগীর ইসলামী
৭৩। ফাতাওয়ায়ে রশিদীয়াহ
৭৪। তাহ্নুল উরূস
৭৫। ফিক্রাল সুনঁয়াহ
৭৬। আল মুহাম্মদ
৭৭। তাহ্নুল মাদারিক
৭৮। ফাতাওয়ায়ে আহ্মদিয়াহ
৭৯। আহমিয়াল উসুল
৮০। মিরকাত
৮১। ফিক্রাল ফিক্রাল
৮২। আল মুহাম্মদ ওয়ালাদীত
৮৩। শরহুন শিকায়াহ
৮৪। কিতাবুল হুজাতি আলা আহল লিল মদিনাতে
৮৫। আওয়াল মানুস
৮৬। আহসানুল ফাতাওয়া
৮৭। ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা
৮৮। মাযরিয়াল ইসলাম
৮৯। মাযরিয়াল মাতান
৯০। আল মুহাম্মদ ওয়ালাদী
৯১। আল কামাতুল ওয়ালাদী
৯২। আল মুহাম্মদ আল আবাবাদী
৯৩। আল মুহাম্মদ আল মাযাহিদিল আরবাআহ
৯৪। কামাতুল কুরান
৯৫। আল লুবাব
৯৬। রুহিয়াতুল হিলাল
৯৭। আল আহারুল বাকিয়াহ
৯৮। কিতাবুল উদ্দী
৯৯। আত আবিয়ানুল হাকায়েক
১০০। আহকামে ইতিকাফ
১০১। আওয়াজায়ুল মাস্লিক
১০২। দুররুল মুখতার
পবিত্রতা অধ্যায়

৫ কিবরা দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা মাকরহ

বিশেষণঃ কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পিছনে ফেলে মল-মৃত্র ত্যাগ করা জায়ে কিনা, এ ব্যাপারে ফক্রীগণের মাঝে মতানোক্তি (ইখিলাফ) রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে সাতটি মত বর্ণনা করা হলঃ

১. দাউদ খানের মতে, মযরদানে হোক কিংবা আবাদি জমিতে হোক সর্বাধিক কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে ইস্কিজালা (মল-মৃত্র ত্যাগ) করা জায়ে।

দলীলঃ

... আল্লাহ তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে তাঁর নামে যাদের বলে 

অর্থাং, ... জাহার ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। অর্থ রাসূল সাহেব (সা)-এর ইস্কিজালার এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি।

অতএব, উক্ত হাদেসে যেখানে কিবলার দিকেই মুখ করে পেশাব করার প্রমাণ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ইস্কিজালার করার অবকাশ তো অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

২. ইমাম মালিক, শাফেই, ইসহাক ইবন রাহওয়াই (রা)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ (রা)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী- ইস্কিজালার সময় কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ ফিরানো উভয়ই লোককলে জায়ে, আর মযরদানে নাজায়ে।
দলীলঃ একদা ইবন উমর (র) কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন—

যাবা আব্দুর রহমন আল্লাহ কি যাতে হারান তা থেকে আল্লাহ দেখতে না চায়।

আর্থাং, ... হে আবু আব্দুর রহমান! কিবরাকে দিকে মুখ করে পেছাব করাতে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ, তবে এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। যদি তোমার এবং কিবরাকে মধ্যে এমন কোন বস্তু থাকে যা তোমাকে আড়াল করে রাখে, তাহলে কোন অন্যায় হবে না।

৩. ইমাম আহমদ (র) এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইসলাম সময় কিবরাকে দিকে মুখ করা সর্ববিধায় নাজায়েন। আর পিঠ ফিরানো সর্ববিধায় জায়েন। কোন কোন আহলে যাহের এবং আবু হানিফা (র) এর একটি আংমিতও অনুরূপ।

(পেল মিহুদুজ চ ১ সু)

দলীলঃ আল্লাহ নিঃসৃতি উমর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি গ্রুপের ছাড়ে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুটি কাঁচা ইতের উপর বসে বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

উল্লেখ যে, মদীনায় বসে বায়তুল মুকাদাসের দিকে মুখ করে বায়তুল্লাহ বাহাবিকভাবে শিষ্যে পড়বে।

৪. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে, কিবরাকে দিকে মুখ করা সর্ববিধায় নাজায়েন। আর কিবরাকে দেওয়া পিঠ ফিরানো লোকালয়ে জায়েন কিন্তু খোলা ময়দানে নাজায়েন।

দলীলঃ উপরোক্ত ইবন উমর (র) এর হাদিস। তিনি ইতিহাস (গবেষণা) করে বলেন যে, উক্ত হাদিসে কিবরাকে দিকে যে পিঠ ফিরানোর কথা এসেছে, তা ছিল লোকালয়ে। সুতরাং ময়দানে তা জায়েন নয়।

৫. মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) এর মতে, কিবরাকে দিকে মুখ দেয়া বা পিঠ ফিরানো সর্ববিধায় হারাম, এমনকি বায়তুল মুকাদাসের দিকেও।
দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লিখিত হাদিসের শেষাংশঃ

এই সম্প্রদায় সাধারণভাবে সবার জন্য নয়। শুধুই মদীনাবাসীদের জন্য। কেননা, মদীনাবাসীদের কিবল ছিল দক্ষিণ দিকে। সেজন্য পেশাব-পায়খানার সময় তাদের পূর্ব-পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে।

৫. ইমাম আবু হানিফা, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাথত, সুফিয়া সাওরী ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, মল-মূত্র ত্যাগকালে কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ ফিরানো উভয়টি সাধারণভাবে নাজারে। খোলা ময়দানে হোক কিংবা লোকালয়ে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও একটি অভিমত অনুরূপ। আর হামাদীদের ফাতওয়া ইহাদ উপরই।

দলীলঃ (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে কিবলাকে সামনে রেখে যখন মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ প্রতীয়মান হল, তাহলে কিবলাকে পিছনে রাখা তো সামনে রাখার চেয়ে আরো অধিক গরিব কাজ।

দলীলঃ (২) উনি আল্লাহর নামে তুলে ধরেন হাদিস।

৬. হাফিজ আবু আওয়ানা (রহ.)-এর মতে, কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ ফিরানো উভয়টির নিষিদ্ধতা কেবল মদীনারাজির জন্য খাস (বিশেষতি)। অন্যদের জন্য নয়।

অর্থাৎ, ... মাকাল ইবন আবী মাকাল আল-আসাদী (রাজ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করিম (সাহ) উভয় কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

উল্লিখিত হাদিসের শেষে হাফিজের উক্তি করেছেন, তাই উভয় ক্ষেত্রেই হারাম।
জবাবঃ আহমদের পক্ষ থেকে অন্যান্য মায়ের দলীলের জবাবঃ  
দাউদ যাহের দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদিসের সন্দেহ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নামক একজন রাবীর রয়েছেন, যিনি সমালোচনার উপর নন। আর হাদিসের পক্ষ প্রদত্ত আরু আইতাব আনাসারীর হাদিসটি এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কেউ কেউ মুহাম্মদ ইবন ইসহাককে মিথ্যাক এবং দাজ্জাল বলতেও কার্যকর করেননি। অতএব, যার সমক্ষে এমন মন্ত্র করা হয়েছে, তা মারফু হাদিসের মুকাবালিয় প্রহ্রাণোগ্য নয়। 
তাছাড়া, ইবন হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, এটা হয়ত ঘটনাচক্রে কোন এক সময় সংঘটিত হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু এটা নবী করিম (সাঃ)-এর সাধারণ আমল ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারা অকাছা বিধান (حكم قطع) মানসূখ হতে পারে না। তাই তা প্রহ্রাণোগ্য নয়।

ইমাম মালিক ও শাফেকের দলীলের জবাবঃ হয়ত ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদিস সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা ছিল তাঁর নিজের ইজতিহাদভিত্তিক আমল। যা মারফু হাদিসের মুকাবালিয় প্রহ্রাণোগ্য নয়।

তাছাড়া ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর ইজতিহাদ প্রাধান্য লাভের উপযোগী বলে মনে হয় না। কারণ, মল-মুত্র তাগকারী ও কিবলার মাঝখানে আড়ালবর্ধন কিছু থাকা, কেবল কবন সম্ভব, যখন হামের শরীফে বলে সরাসরি কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ইসলাম করা হয়। (নাউয়বিলাহ) তাছাড়া অন্য কোথাও বলে এরূপ করা সম্ভব নয়। কেননা, কোন না কোন ঘরবাড়ি বা সাহা দু' মাঝখানে প্রতিবন্ধক হবে। এমতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোন প্রয়োজনই হতে না। সুতরাং লোকালে জায়েহ আর ময়দানে জায়েহ নয়, এমনটি বলা ঠিক নয়।

ইমাম আহমদের দলীলের জবাবঃ (১) ইবন উমর (রাঃ) ছাদ থেকে নবীজি (সাঃ)-কে দেখা, এটা একটি বিভিন্ন ঘটনা। এটা কোন দলীল হতে পারে না। কারণ এটি নবী করিম (সাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, নবী করিম (সাঃ)-এর মল-মুত্র ছিল পবিত্র। অতএব, নবী করিম (সাঃ) এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রমবুদ্ধি হওয়াও বিচিত্র নয়। (২) তাছাড়া ইবন উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিপটে ঘটনাচক্রে হয়েছিল এবং তাত্ত্বিক তিনি দৃঢ় ফিরিয়ে নেন। বিশেষ করে নবী করিম (সাঃ)-এর প্রতি এমন অনাকাংক্ষী দৃঢ় দরূণ তাঁর প্রকৃত অবস্থা জাত হওয়া ছিল তাঁর পক্ষে দুঃখ।
(৩) অথবা, নবী করীম (সাঃ)-এর চেহারা মুবারক ঠিকই কিবলার দিকে ছিল, কিন্তু লজ্জাহীন ছিল অন্য দিকে ফিরানো। যা অল্পক্ষণের মধ্যে ইবন উমর (রাঃ) আদাজ করতে পারেননি। আর ফকিরগুলি বর্ণনা করেন যে, মল-মৃত ত্যাগের ক্ষেত্রে কাবার দিকে মুখ বা পিঠ না ফিরানোর সম্পর্ক হল লজ্জাহীনের সাথে, চেহারার সাথে নয়।

আবু ইউসুফ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের বিপক্ষে প্রদত্ত জবাবই যথেষ্ট।

মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ

(১) মাকাল ইবন মাকালের হাদিসে আবু যায়েদ নামক একজন রাবী রয়েছেন, যার ব্যাপারে হাফিজ বলেন, তিনি অজাত (মজহুল)।

(২) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে মল-মৃত ত্যাগ করার হুকুম মানাকর তানিমহী, বায়তুলাহর মত হারাম নয়।

(৩) এ হুকুম তখন দেয়া হয়েছিল, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কিবলা ছিল। অতঃপর কিবলার হুকুম মান্সুর (রহিত) হয়ে গেলে নিষেধের হুকুমও রহিত (মান্সুর) হয়ে যায়।

(৪) তাছাড়া, বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে এবং কাবা শরিফ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অতএব, যদি মদিনা শরিফেও বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানোর অনুমতি দেয়া হত, তাহলে কাবা শরিফের দিকে মুখ করা বা পিঠ ফিরানো আবশ্যক হত। আর আসাদ উদ্দেশ্য এটাই।

আবু আওয়ানার দলীলের জবাবঃ যেহেতু উক্ত সুযোগের সরাসরি মদিনাবাসীদেরকে করেছিলেন, তাই তিনি ঐতিহ্য বলে অর্থাৎ, বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমের হয়ে পেশাবর্সের কাজ, নতুনা শরীয়তের হুকুম তো বিশ্বাসীর জন্যে। কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বাসী, সমস্ত উম্মতের নবি।

তাছাড়া এর উদ্দেশ্য যেহেতু কাবা শরিফকে সম্মান দেখানো। সুতরাং ইহা মদিনাবাসীসহ বিশ্বের প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যে নৈতিক দায়িত্ব। চাই সে চার দেয়ালের ভিতরে হোক বা খোলা ময়দানে হোক, চাই সে এশিয়া মহাদেশে থাকুক অথবা আফ্রিকায় থাকুক। (১০০-১৪৯ মস্কো ১)

হানাফীদের অভিভাষ্য প্রাধান্যের আরো কতিপয় কারণঃ

(ক) আবু আইবার আনসারী (রাঃ)-এর হাদিসটি একজনে সমস্ত মুহাম্মদীনের সর্বসম্মতিক্রমে সনদগত দিক থেকে বিশ্বাসভুক্ত। তাই ইমাম তীর্মিশী (রহ.) শাফেই
হাদিস

(খ) হযরত আবু আইব র(রা)।-এর রেওয়ায়েতটি একটি মৌলিক আইনের মর্যাদা রাখে। এর মুকাবলায় অন্যসব রেওয়ায়েত শাখাগত ঘটনা মাত্র।

(গ) আবু আইব র(রা)।-এর হাদিসটি বাচনিক (ফুলাই) আর বিরোধী রেওয়ায়েত কর্মগত। নিয়ম হল, বিরোধের সময় সর্বসম্প্রতিক্ষে বাচনিক (কাওলী) হাদিসই প্রাধান্য পাবে।

(ঘ) আবু আইব র(রা)।-এর রেওয়ায়েতটি নিয়েছেন (মুহাম্মদ) মসীহ(স)। আর বিরোধী রেওয়ায়েতগুলো বৈধতাসূচক (মসীহ)। এটিও একটি মূলনীতি যে, পরস্পর বিরোধের সময় বৈধতাসূচক হাদিসের উপর নিয়েছেন মসীহ হাদিস প্রাধান্য পায়।

(ঙ) আবু আইব আনসরী (রা)।-এর হাদিসটি কুরআনের সাথেও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে:- ওমন বুদ্ধির অর্থাতঃ যে আল্লাহর নিদর্শনবানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা তার আন্তরিকতার পরিচালক। (হজঃ ৩২) আর কাবা শরীফ নিঃসরণের আল্লাহ তাআলার একটি অন্যতম নিদর্শন।

(নক্ষত্র অন্তর্ক্ষেত্র ১ স, ১৩৮-১৪১, ডস তমুদী জ ১ স, ১৯৫-১৯৬)

পেশাবর্ত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া

বাবে তুমি রজলে যাবু সালাম ওহর পুজো হয়।

পেশাবর্ত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া

... আল মুহাজির ইবন কুনফুজ (রা)। হতে বর্ধিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করির পাঁচ মনস্তা এর অভিযানে এবং অবস্থায় পৌছলেন, যখন তিনি (সা) পেশাবর্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী করির (সা) অব না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট

সলাত ঘোর মতন, সমায়ি জ ১, রদ সলাম বদল বাদ, বিয়ে মাজে স (২৩)

সলাত ঘোর মতন, সমায়ি জ ১, রদ সলাম বদল বাদ, বিয়ে মাজে স (২৩)

সলাত ঘোর মতন, সমায়ি জ ১, রদ সলাম বদল বাদ, বিয়ে মাজে স (২৩)
ওয়ার পেশ করে বলেন, আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম সুর্য করা অপছন্দ করি।

बाब । फिर रज़िल याज़िकर आल्ला ताआलार यिकिर

अपवित्र अब्वश्य आल्लाह ताआलार यिकिर

... उन्हें आज़िकर काल कां रसूलुल्लाह चली आल्ला उल्लाह याज़िकर आल्ला याज़िकर इस्लाम याज़िकर दोहर सुर्य करे।

अनुवादः ... आज़िशा (रा०) हेतु बर्नात। तिनি बलेन भी, रासूलुल्लाह (सा०) सर्वव्याय आल्लाह ताआलार यिकिरे मशगुल थाकते।

बिश्लेषणः उপरोक्लिक आदीसद्धूरे असामज्ञा (नुपात) (परिलक्षित हय)। केनना, प्रथम आदीस द्वारा बुझा यात ये, नवी करीम (सा०) अपवित्रव्याय यिकिर करे अपछन्द करते। (उल्लेख ये, सलाम देया-नेया एकप्रकार यिकिर) आर आज़िशा आदीस सर्वव्याय यिकिरे कथा उल्लेख रङहे। ताइ मुहाद्दीसीने किराम उभय आदीसे सामज्ञा स्थापन करे बलेन -

(क) ये आदीसे अपछन्दे कथा बला हेरेये एर द्वारा उद्देश्य हल, अनुदूम बर्ना कर। आर आज़िशा (रा०) -एर आदीस द्वारा उद्देश्य हल जारेय पस्तित बर्ना कर।

(ख) आज़िशा (रा०) -एर आदीस द्वारा उद्देश्य हल, अन्तरे यिकिर। आर आल-मुहाजिर (रा०) -एर आदीस द्वारा उद्देश्य हल मौजिक यिकिर।

(ग) आज़िशा (रा०) -एर आदीसे बर्नित हैल तीन सर्बव्याय हल, पवित्र थाका अब्वश्य तिनि सर्बक्षण यिकिर करते। सुटराम अपवित्र अब्वश्य यिकिर करते।

(घ) ईड़िया (फ़िन) शदे बयबहट ५ सर्बनाम (मिम) द्वारा नवी करीम (सा०) -के बुझाना हयन।; बरंग यिकिर करा बुझाना हेरेये। तथन बाक्यांशे हर हवे, तिनि सबसमय घन-काल-पात्र भेदे प्रत्येक यिकिर आदाय करते। येरेन, टायलेट याओयार समय ये यिकिर (दोया) ती तिनि सर्वव्याय आदाय करते, आवार बाजारे याओयार समय ये यिकिर रङहे, तिनि (सा०) ता आदाय करते।

(द्रेस मशक़ा ज़ १५२, तनमुहऱ्ते ज़ १ १७१)
পরিভাষা অধ্যায়

৪ পেশাব হতে পরিভাষা অর্জন

০ন্ত ইবনে আব্বাস রাও হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে নবী করিম (সা) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বললেনঃ এই দুই ব্যক্তিকে শান্তি দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু এদের এই শান্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য নয়। অতঃপর তিনি (সা) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেন, এই ব্যক্তিকে পেশাব হতে সৃষ্টিভাবে পরিভাষা অর্জন না করার কারণে এবং দ্বিতীয় কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন। এই ব্যক্তিকে পরিনিদ্রা করে বেড়ানো হেতু আবার দেয়া হচ্ছে।

অতঃপর তিনি একটি কাঁচ খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর স্থাপন করে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের আর কাম হবে।

প্রথম আলোচনাঃ উপরোক্তিই হাদিসের বাহিক অর্থের বুঝা যায় যে, যে দুটি কারণে দুই কবরবাসীকে শান্তি দেয়া হয়েছিল, তা কবরীরা গুনাহের কারণে নয়।

যেমন, হাদিসে বর্ণিত আছেঃ ওয়ায়েয়ান ফি কিবির। অর্থাৎ পেশাব থেকে পরিভাষা না হওয়া এবং পরিনিদ্রা করা নিঃসন্দেহে এ দুটি কবরীরা (বড়) গুনাহ। অতএব, হাদিসটি ব্যাখার দাবী রাখেঃ

ক বলা হয় না তথা এমন কাজ যা পরিভাষা করা খুবই কষ্টকর।

তখন বাক্যাংশটির অর্থ হবে, তাদের দুজনকে এমন কোন কাজের উপর শান্তি দেয়া হচ্ছে না, যা পরিভাষা করা খুবই কষ্টকর ছিল। বরং এমন কাজের দরকার শান্তি দেয়া হচ্ছে, যা পরিভাষা করা ছিল খুবই সহজ।

খ) বাক্যাংশটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল—

লইস কিবিরা ফি চসুর ও কিবির ফি আলীব।
অর্থাৎ, প্রসার থেকে পবিত্র থাকা এটাতো আকৃতি বা গঠনগত কবিরা নয়, কিন্তু গৌহারের দিক দিয়ে তা কবিরা।

(৬) একার্থার উদ্দেশ্য হল লাস কীবরা ফি ইটাকে হা উল্লেখ আল্লাহ কবিরা।

অর্থাৎ, তাদের ধারণা অনুযায়ী ইহা কবিরা নয়, কিন্তু আলাহর নিকট ইহা কবিরা।

(৭) বাবিলিয়া ইহা (পেশাবর থেকে সতর্ক না থাকা) কবিরা ওনাহ নয়। কিন্তু ইহা যেহেতু নামায ভঙ্গের কারণ, তাই তা কবিরা।

(৮) উন্নত বিশ্ব সত্ত্বত্ত দিক থেকে কবিরা নয়, কিন্তু বারবার করার দ্বারা এবং অভয়াসে পরিণত করার দ্বারা তা কবিরায় পরিণত হয়। কোন থেকে কোন সৃষ্টী (ছোট) ওনাহ বারবার করার দ্বারা তা কবিরায় পরিণত হয়।

(নূমালে ইহা) 

(৪) সহীহ বুখারীতে সুসম্পর্কভাবে তুলে প্রত্যক্ষ (তুলে প্রত্যক্ষ) ওনাহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রথমে নবী করিম (সাত) এ দুটি বিষয়ে কবিরা হওয়ার ব্যাপারে ইলম না থাকার কারণে তিনি না বলেছিলেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ ওনাহ আসল যে, ইহা কবিরা। তখন তিনি (সাত) ওনাহ (হা), ইহা কবিরা) উচ্চারণ করে কবিরা সাধারণ করেন। অতএব, আর কোন অসামঞ্জস্য নেই।

(বখায়ত জ) 

(৫) দ্বিতীয় আলোচনায় উক্ত হাদিস অধ্যায়ে স্বভাবতই প্রথম জাগে, কবরের আযাব উল্লিখিত দুই ওনাহের সাথে কি যোগসূত্র (যোগসূত্র) রয়েছে? এর সঠিক জবাব হল, হাদিসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পবিত্রতা হচ্ছে নামাযের প্রথম ধাপ। অতএব, যে ব্যক্তি প্রাপ্ত ওনাহের অসতৃত্ব, তার পবিত্রতার অভাবে নামাযই শুধু হবে না।

পথ নিয়ে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বাদার হকসমূহের মধ্যে অন্যায়তার হতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আর এ হতার প্রথম ধাপ হচ্ছে চোগলখুবী বা পরনিদ্ধ। আর আধিকারিতের স্বরসমূহের প্রথম স্তর হচ্ছে কবর। সুতরাং আধিকারিতের এই প্রথম স্তর তথা কবরে আযাব হবে এটি যুক্ত।

(হুরর তদ্ধারা জ) 

(৬) তৃতীয় আলোচনায় কবরের উপর ফুল দেয়া বা ডাল গাড়ার হকসমূহ অনুসারে হাদিসের শেষাংশে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাত) তাদের কবরের আযাব লাঘু হওয়ার প্রত্যাশায় একটি কাঁচা ডাল দু’ ভাগ করে তাদের উত্তরের কবরে স্থাপন করে দেন। অতএব, প্রথম জাগে যে, এর দ্বারা যে কোন কোন বিদায়াতী কবরের উপর ফুল দেয়ার বৈধতার প্রমাণ পেশ করে থাকে, তা কত্তকু তুলে দেয়ার কারণে হচ্ছে তার সুখ।

(দর্শন আযাবের জ)
নির্তর্যোগ্য? এর জবাব হল, প্রমাণটি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, এ হাদিসে ফুল দেয়ার উপর কোন আলোচনা নেই। (দুর্বল সত্য, প. ১৩৫)

এ ব্যাপারে ফাতেহায়ে রহমানীয়া (১ম খণ্ড, প. ১৬০) আরো উল্লেখ আছে যে, মৃত বাক্তিকে ফুলের মালা বা তোড়ার মাধ্যমে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, শরীরের এর কোন ভিত্তি নেই। কোন নবী-রসূল, সাহরারে কিরাম, তাবেইন বা কোন রুজুরের লাশকে এমনভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোন প্রমাণ নেই। এতে যদি মৃত বাক্তির কোন উপকার হত, তাহলে অবশ্যই নবী-রসূল ও রুজুরের দীন এর উপর আমল করতেন। যেহেতু শরীরের এর কোন ভিত্তি নেই, অতএব ইহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। (ফলাওয়ার রহমানীয়া, প. ১২, ফিল্ড বার্ন, প. ৩১)

উল্লেখ যে, কবরে ডাল গাড়ার হুকুম নিয়ে উল্লেখ করার মতান্তরে রয়েছে। একদল মনে করে যে, এটা নবী করিম (সা:) এর বিশেষত্ব ছিল। অন্য দেখা যায় যে, এটা অন্য কারণেও হতে পারে যে আল্লাহ ইবন বাতাস ও আল্লাহ জামিরি (রহ) এর কারণে যে সকল রয়েছে। তার কবরে আধার হচ্ছে এবং এর সাথে এটাও জানানো হয়েছে যে, ডালের গড়ে বেরিয়ে করার প্রথা তাদের এই শাস্তি লাভ হতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি না করবারের আধার হওয়ার জন্য লাভ করতে পারে, না শাস্তি লাগু হওয়ার।

এ কারণে অন্যদের জন্য ডাল পুঁতে রাখাও দুর্স্থ নয়।

তবে, কবরে ডাল পুঁতে রাখার ব্যাপারটি কোন কোন হাদিসে দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত, তাই ইহা সরাসরি নিষেধ করা ঠিক নয়। তবে, এক্ষেত্রে যাতে সীমালঝন না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। (বদল মহফুজ, প. ১৫)

২৫. বাবের বুলোল সানি চৌচারী

দীঘিরে পেশাব করা

... বে হাদিস বাহাদুর রসূল ঈসলাম অব্বাস উল্লেখে নিয়ে স্বাশন স্বাতা দেন উল্লেখের প্রমাণ যার নায়ক হল নবী করিম (সা:)

তাহার দ্বারা তা মানে হয়েছে যে একরাজ বাবের বুলোল সানি চৌচারী।
দলীল: অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

* কেন কেন আহলে যাহির এর বিপরীতে বলেন, দাঁড়িয়ে প্রসার করা হারাম।
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, প্রসারের ছিota উড়ে আসার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে প্রসার করা যায়ে, অন্যথায় মারকাহ। (পরিলক্ষিত 1، প. 168)
* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও জম্মুহরের মতে, ওয়ার ছাড়া দাঁড়িয়ে প্রসার করা মারকাহ তানবীহী, হারাম নয়। (পালুল মহোদ 17, প. 17)

দলীল গুণ উমরে নাম বাবুল লেলাহ উল্লাহের, শেমোল ও বোম হাতের ফালাম, বাবুল নাম উমরে নাম বাবুল লেলাহ উল্লাহের জন্য। (প. 1)

দলীল গুণ উমরে নাম বাবুল লেলাহ উল্লাহের, শেমোল ও বোম হাতের ফালাম, বাবুল নাম উমরে নাম বাবুল লেলাহ উল্লাহের জন্য। (প. 1)

অর্থাৎ, উমরের (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রসার করতে দেখে বলেন, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রসার করো না।

দলীলে নবী করিম (সা) দাঁড়িয়ে প্রসার করতেন, তোমাকে তার কথা বিশ্বাস করো না। সে কেবল বসেই প্রসার করেন।

উল্লিখিত হাদিসপ্রতি শাস্ত হাদিসের প্রসার করা হারাম। কিন্তু অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসের প্রসার করা যেহেতু নবী করিম (সা) এর পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে প্রসারের প্রমাণ মিলে, তাই উভয় হাদিস একত্র করলে মারকাহ তানবীহী সাবান্ত হয়।

জবাবে অহ্নাফের পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবে অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসটি আমার সমুদায় গ্রহণ করে যে, নবী করিম (সা) জীবনে একবার দাঁড়িয়ে প্রসার করেছেন, তবে তা ছিল ওয়ারন্থত। (যার বর্ণনা পরে আসছে) সুতরাং এর দলীল ওয়ার ছাড়া দলাওভাবে জায়ে সাবান্ত করা ঠিক নয়।
যদি ব্যাপক আকারে জায়েরই হত, তাহলে তিনি (সাঁ) উমর (রাঁ)-কে সরাসরি নিষেধ করতেন না যে, হে উমর! তুমি দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করো না।

আহলে যাহিদের অভিমতের জবাবঃ তারা শুধু নেতিবাচক হাদীসগুলোর উপর ভিত্তি করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অথচ নবী করীম (সাঁ) থেকে তো দাঁড়িয়ে প্রস্তাবেরও দলিল পাওয়া যায়। সুতরাং যদি ব্যাপক আকারে হারাম হত, তাহলে নবী করীম (সাঁ) এমনটি কোনক্রমেই করতেন না।

ইমাম মালিকের অভিমতের জবাবঃ আসলে প্রস্তাবের ছিটা উড়ে আসার সাথে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা শক্ত জায়গায় বসে প্রস্তাব করলেও ছিটা উড়ে আসা সত্ত্বনা থাকে। ছিটা উড়ে আসার মাসুদা ও দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করার মাসুদা এক নয়, বরং ভিন্ন।

দাঁড়িয়ে প্রসার প্রসঙ্গে আল্লামা আনোয়ার শাহ কামীরী (রহ.)-এর সুচিত্তিত অভিমত হল, বর্তমানে বেহেতু দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করা আমুলিম ও কাফের-মুসলিমদের বেশিশত হয়ে দাঁড়িয়েছে, এজন্য এর কারণে দেখা মানের কারণে আকার ধারণ করেছে। আর যে মানকরঃ তানহী কাফেরদের বেশিশত হয়ে যায়, ইহার মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ, নবী করীম (সাঁ) ইরশাদ করেছেন—

মন্ত নিয়ে প্রশ্ন করো মোর, মন্ত দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করো। (আর্ব দাউদ ২৫৯ সূরা, ৫৫ কবর লিখার)

অর্থাৎ, যে যে জাতির সামগ্রিক অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

সুতরাং বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করা জায়ের নয়। আর এর উপরই ফাতওয়া।

নবী করীম (সাঁ) নিজের অভিযাদের বিপরীত কেন দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছিলেন, এর জ্ঞাতে মুহাম্মদদিনে কিরাম একাধিক জবাব দিয়েছেন?

(ক) নবী করীম (সাঁ) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন জায়ের বর্ণনা করার জন্য। আর এটা উম্মতকে জানিয়ে দেয়া ছিল তার দাঁড়িত। যাতে উম্মত বুঝে নেয় যে, বিশেষ পরিবর্তিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা দূর্বলীয় নয়।

(খ) অথবা, নবী করীম (সাঁ)-এর হাতে বাধা ছিল। যার ফলে তিনি বসতে পারিলেন না। (বায়হাকি)

(গ) ঐ স্থানে নাপাকী ছিল। বসলে হয়ত নাপাকী লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল।

(ঘ) ইবন খুয়াইতা বলেন, প্রথমদিকে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়ের ছিল, পরে তা রহিত (মাসুদ) হয়ে যায়।

(د) ইবন মশুম বলেন, মাসুদ দিকে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব

হাদিসবর্গে ঘনবর্গ (নিরসন) অনুসারে শুরুতে বর্ণিত হয়ত হুয়াফা (রাঁ)-এর হাদিস দ্বারা জানা গেল যে, নবী করীম (সাঁ) একজন দাঁড়িয়ে প্রস্তাব
বাবা মা যেতেন রজহলে যদি হরিজনে মৃতিমাত্র সেই
টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া

... গণ হাসরা আন্বলি সোলে লাল বাল অল্লাম কনা বো হরিজনে মৃতিমাত্র সেই

(তরুণ জঃ ১ সং এ হরিজনে মৃতিমাত্র, বন্ধু মধুর মধু জঃ)

বিশ্লেষণে মানুষ সাধারণত জুজু করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে যাকে। কিংবা প্রকৃতির
ভাবে সাংঘ দিতে যেয়ে টয়লেটে যাওয়া তথা পার্চিনার করার তো কোন জুজু করে
বাজ নয়। এরপরে কেন নবী করীম (সাহ) ক্ষমা প্রার্থনা বা ফুরানাকা পড়ো করে
মুহাম্মদ সাহেবের কিশোর এ ব্যাপারে অন্যেক জুজু দিয়েছিলেন।
কসুলে করীম (সাহ) সর্বদা মিষ্টি করতেন। কিংবা মুলির মিষ্টি করতে
ধারা বদন থাকত। এই মৌখিক মিষ্টি বদন থাকার কারণে তিনি ইস্তাম্বাদ পড়ো
কনা।

(দুরহে জঃ ১ সং)

খ. হরিজন গঞ্জুতী (রহ,) বলেন, প্রতাপ-পায়খানার সাহী মানুষ কীয় মল-মূত্র তথা
নাপাকগোলা প্রাপ্ত করে। এসব জাহির নগল দেখে মানুষ কীয় বাতিনো
নাপাকগোলার কথা সুন্দর করে। প্রকাশ থাকে যে, মনে মনে এই সুন্দর করা মরাট
ইক্তিয়ারের কারণ হবে। এজন্য মনোরথ বলার তাতিম দিয়েছিলেন।

গ. হরিজন মালিনা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ,) বলেন, পেশাব-পায়খানা,
মল-মূত্র মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তার সুস্থতা ও জীবনের জন্য আল্লাহ
তাআলার অনেক বড়ু নেয়ামত। আর এই ইতিহাসের বিধান জেনে যে, মানুষ এই নেয়ামতের শুকরিয়া পুরোপুরি আদায় করতে পারে না।

(য. আল্লামা মাগরবি (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে হারত আদম (আঃ)-এর সর্বপ্রথম মল-মূর্ত তাত্ত্বিক প্রায়োজন হয়েছিল। তখন এর দুর্বলত্তা তিনি নিষিদ্ধ পাচ্ছে ফল খাওয়ার কুফল এবং স্বার্থ ক্রিত কথা সুরু করেছিলেন। অতঃপর এই ধর্ম তাঁর সমস্তদের মধ্যেও অব্যাহত থাকে। বদল মঝুড়ে (জ ১৪ সং))

গুফ্রানক শব্দটি মূলতঃ শুকরিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সিবওয়াইহ লীয় গ্রাহে লিখেছেন যে, আরবদের নিকট গুফ্রানক বাগধারাটি প্রসিদ্ধ। এতে গুফ্রানক শব্দটি কৃতজ্ঞতার অর্থ এসেছে, যা কফ্রানক-এর বিপরীতে ব্যবহার করার মাধ্যমে বোঝা যায়।

তিনি বলেন, এখানে গুফ্রানক শব্দটি মূলতঃ শুকরিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সিবওয়াইহ লীয় গ্রাহে লিখেছেন যে, আরবদের নিকট গুফ্রানক বাগধারাটি প্রসিদ্ধ। এতে গুফ্রানক শব্দটি কৃতজ্ঞতার অর্থ এসেছে, যা কফ্রানক-এর বিপরীতে ব্যবহার করার মাধ্যমে বোঝা যায়।

তাহ্নুদ ল্যায় তায় আন্দুক ১ হে আন্দুকু আম্মুদ ২ বাবা মায়া আহার বার করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুখ্তা দান করেছেন।

বাবা মায় তা যেন তুমি আন্দুকু নির্দেশ

যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইয়িন্দ্য করা নিশ্চিত

... হে ব্যতিরেক মহাদেব বন্মেই কলকাতাম ও সে জানু এ বিশিষ্ট স্বদেশ লীলায় ব্যতিরেক স্বদেশ লীলায় তুমি তুমি কলকাতাম ও সে।

গুফ্রানক এর বর্ণিত হয়েছেয়, এই মানুষ মিলে একটি প্রতিনিধি দল নবী কর্মী (সাঃ)-এর স্থিতিতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মূর্ত্যাদ।

সাবি বলেন, তিনি বলেন, একদা জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নবী কর্মী (সাঃ)-এর স্থিতিতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মূর্ত্যাদ।

অন্যান্যা বলেন, এই মানুষ মিলে একটি প্রতিনিধি দল নবী কর্মী (সাঃ)-এর স্থিতিতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মূর্ত্যাদ।

কেন, মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবনার্ক ব্যবহার রেখেছেন। নবী বলেন, অতঃপর নবী কর্মী (সাঃ) এ ব্যবহার নিষেধজ্ঞা আরোপ করেন।
বিশ্লেষণে উল্লিখিত হাদিসে হাড়, গোবর ও কয়লা এই তিনটি জিনিস দ্বারা ইস্তিজ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু কি এই তিনটি জিনিস দ্বারা ইস্তিজ্জা করা মাঝরহ? এর জবাবে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে শুধু উল্লিখিত তিনটি বসু দ্বারা ইস্তিজ্জা করা মাঝরহ নয়; বরং আরো একটি জিনিস বসু দ্বারা ইস্তিজ্জা করা মাঝরহ। যার সাথে হিসেবে দেয়া বেশ কঠিন। তবে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, ফকীহগুলি এর দ্বারা গবেষণা করে নিষেধ বা মাঝরহ হওয়ার কারণ সবাইয়ের কঠিন। যে সমস্ত বসুতে নিয়ন্ত্রিত কারণসমূহের কোন একটি কারণ পাওয়া যায়, এর দ্বারা ইস্তিজ্জা করা মাঝরহ।

ক. সম্মানের বসু দ্বারা। যেমন- টুপি, কাপড় ইত্যাদি।
খ. খাদ্যের দ্বারা। যেমন- শুকনা রটিটি।
গ. নাপাক বসু দ্বারা। যেমন- শুকনা গোবর।
ঘ. ক্ষুতিযুক্ত বসু দ্বারা। যেমন- হাড়।

* আলোচ্য হাদিসে দ্বারা একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোবর ও হাড় জিনিদের খাদ্য হওয়ার অর্থ কি? এর অনেক জবাব রয়েছে।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনিদের সারের কাজ দেয়। এভাবে এটি তাদের খাদ্যের উপকরণ হয়।
খ. কেউ কেউ বলেছেন, গোবর জিনিদের পশ্চিম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তাদের পশ্চিমের খাবার মানে জিনিদেরই খাবার। যেমন, ইবন মাসউদ (রা) থেকে প্রতিটি শুক্ল গোবর তেজমানদের জুপরুলোর খাবার।

গ. কারা কারা মতে, গোবর মূলত জিনিদের খোরাক এবং তাদের জন্য এটি থেকে নাপাকী তুলে নেয়া হয়। তাদের জন্য গোবরকে আসল অবস্থায় ফিরিয়ে শেষে পরিণত করা হয়। যেমন, হাদিসে বর্ণিত আছে:-

**: ফসলের রাদ ফেরাও তাঁতে তাঁতে লেম আন এ তুমি পেল জুরে ই ও নীত আলি বেল বিনীত আল্লাহের খান**

(খোরাক) এর লেগে জেনে এক সুবিধা দিএ।

*অর্থং*, অতঃপর তারা (জিন) আমার নিকট খাদ্যের আবেদন করল। তখন আমি তাদের জন্য আলাউদ্দিন দরবারে দোয়া করলাম যে, তারা যদি কোন হাড় বা শুক্ল গোবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তার মধ্যে যেন তাদের খাবার পায়।

ঘ. হাড় জিনিদের খাদ্য হওয়ার অর্থ হল, এই হাড়গুলো জিনিদের জন্য গোরশে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়। যেমন, নবী করিম (সা) ইতিহাস করেন-
জন্মের মুহূর্তে দুর্নীতি প্রদর্শন করা হয়, যা তোমাদের (অনু) হাতে পড়ে সেগুলো সবচেয়ে বেশি মাসল হয়ে যায়।
তিরিক্ষিতে বর্ণিত আছে- (নাম্নু)- (তরমীদি জে চ ১১১ অব তদন্ত)

dুর্বিষ্ঠ মানুষের মধ্যে এই সব ঘটনা বর্ণিত হয়ে যায়। যদিও বাহিক অর্থে হাদিসদ্বয়ে আল্লাহর নাম সূত্রের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর সমাধানে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, হাদিসদ্বয়ের মূল উদেশ্য হল, (যেহেতু বা খাওয়ার সময়) হাড়ের উপর আল্লাহর নাম সূত্র করা হয়ে যা না হয়, উভয় অবহেলাতেই ইহা জিনদের খোঁজে পরিণত হয়।
কেউ কেউ বলেন, কুকুর যেমন হাড়ের ভিতরে থাকার কাজ সারতে পারে, এমনিভাবে জিনরাও। (তন্ত্র আল হাদুর এখানকার মন্ত্রের চ ১৪৪, অফিসার, চ ১১১, অফিসার রমাই জে ১১১)।
আবার কেউ কেউ বলেন, জিনরা হাড়দ্বারে পাকিয়ে তাদের খাদ্যের উপযোগী করে তুলে। যেমন, তিরিক্ষিতে ইবন মাসুউদের হাদিসে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে--

(জে ১১১)

যখন করলেন এই আইহামার বলতেন-- (তরমীদি জে ১১১)

অর্থাৎ, কারণ এগুলো (হাড়) তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য।

বাবু আনন্দের পালন করা

পাথার দ্বারা ইতিষ্ঠানুতম হাকর চ ১১১

... হামিদের কাছে অন্য বাহিক অর্থে বলা এবং যাতে যাতে একমাত্র বৈপরীত্য প্রকাশ করা হয় না সে পাথার প্রতি বর্ণিত। অনুবাদঃ ... আলিশা (রাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাজুলরিম্মাহের (সং) ইরাদে করেন, তোমাদের কেউ যখন পাখানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথার (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করতে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট।
দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

উল্লিখিত হাদীসীমে পাথর বেজোড় হওয়া এবং তিনটি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর উভয় হাদীসে নির্দেশমূলক শব্দ (সংলাপের) ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমর (নির্দেশ) ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (আলমালিযুজওব)।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহাবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ মতে, অনিয়মিত ব্যবহার করা ওয়াজিব। আর পাথর বা টিলার সংখ্যা তিনটি হওয়া সম্ভব এবং বেজোড় সংখ্যা হওয়া মুক্ত হবে।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদীসে বেজোড় হওয়াকে এক্ষতিতে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বেজোড় না হলে কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং ইহা কোন কমরেই ওয়াজিব হতে পারে না।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদীসে পাথর (টিলা)-এর সংখ্যা তিনটিকেই যথেষ্ট বলা হয়েছে।
আহকামুল হাদিস
পবিত্রতা অধ্যায়

দলীল (3)
... উন্মুক্ত হয়ে লোকদের সমিতির সাথে জোরে থাকলেও তাদের সুযোগ হয় না। তাই তাদের ক্ষেত্রে পানি দিতে হয়।

(27) অর্থাৎ ... আল্লাহ আল্লাহ উমম মসজিদ বা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্তমান। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রকৃতি করার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর আমার জন্য তিনি পাথর বা চিলা তালাশ করেন নিয়ে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমার জন্য তাঁর নিকট দুটি পাথর এবং চিলার চাকা দিয়ে এলাম। তিনি পাথর বা চিলা দুটি গ্রহণ করে শক্তি গ্রহণ করে তুক চিলার চক্রটি দিয়ে দিয়ে এবং বললেন এটি নাঙ্কাক।

উক্ত হাদীস বাংলা রূপে নিয়ে যে, যদি তিনি সংখ্যা ওয়াজিব হত, তাহলে তিনি (সঃ) আরো একটি পাথর আনার নির্দেশ দিতেন।

যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ যদি পানি দ্বারা ইতিহাস করা হয়, আর মলদ্বার এক-দু' বার ঘোষণা করার দ্বারা যদি নাঙ্কাক ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তাহলে তিনি বার ঘোষণা করার মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং পাথর বা চিলার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হওয়া উচিত।

কারণ উভয়টি উদ্দেশ্য এক।

(21) সুসংক্ষিপ্ত গ্রন্থ

আইনানগরের পক্ষ হতে শাফেক ও হামলার গ্রন্থার্থমূলক জবাবঃ

(1) যত রেন্যোয়েতে তিনি পাথরের কথা উল্লেখ করেছে তা স্বাভাব্য বা রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা, সাধারণত তিনি পাথর বা চিলার দ্বারা পবিত্রতা অন্তর্নিহিত হয়ে যায়। (2) তিনি পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুখার্জ বুধবার। ওয়াজিব বুধবার উদ্দেশ্য নয়। (3) হাদীসে যে তিনি পাথরের সংখ্যা উল্লেখ করেছে তা শর্ত হিসেবে নয়, বরং সতর্কতার জন্য। (4) তিনি পাথর বা চিলা হতেই হবে (ওয়াজিব) এই হাদীসটির বাহিক অর্থের উপর তো শাফেক নির্দেশ আমল করে না। কেননা, কেউ যদি একটি তত্ত্বাবধায়ন দিয়ে তিনি বার মাসেহ করে নেয়, তাহলে তাঁদের (শাফেক) নির্দেশ অন্তর্নিহিত হবে। সুতরাং এতে বুঝা যে, আসল উদ্দেশ্য তাঁদেরও তিন পাথর নয়, বরং তিনি বার মাসেহ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, পাথর বা চিলা দ্বারা ইতিহাস করা তখনই যথেষ্ট হবে, যখন নাঙ্কাকি বের হওয়ার ছানা থেকে এক টায়ার তাদের অধিক ছড়িয়ে না পড়ে। অন্যথায় পানি দ্বারা শোচক করা আবশ্যক হবে।

(20) যত রেন্যোয়েতে তিনি পাথরের কথা উল্লেখ করেছে তা স্বাভাব্য বা রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা, সাধারণত তিনি পাথর বা চিলার দ্বারা পবিত্রতা অন্তর্নিহিত হয়ে যায়। (2) তিনি পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুখার্জ বুধবার। ওয়াজিব বুধবার উদ্দেশ্য নয়। (3) হাদীসে যে তিনি পাথরের সংখ্যা উল্লেখ করেছে তা শর্ত হিসেবে নয়, বরং সতর্কতার জন্য। (4) তিনি পাথর বা চিলা হতেই হবে (ওয়াজিব) এই হাদীসটির বাহিক অর্থের উপর তো শাফেক নির্দেশ আমল করে না। কেননা, কেউ যদি একটি তত্ত্বাবধায়ন দিয়ে তিনি বার মাসেহ করে নেয়, তাহলে তাঁদের (শাফেক) নির্দেশ অন্তর্নিহিত হবে। সুতরাং এতে বুঝা যে, আসল উদ্দেশ্য তাঁদেরও তিন পাথর নয়, বরং তিনি বার মাসেহ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, পাথর বা চিলা দ্বারা ইতিহাস করা তখনই যথেষ্ট হবে, যখন নাঙ্কাকি বের হওয়ার ছানা থেকে এক টায়ার তাদের অধিক ছড়িয়ে না পড়ে। অন্যথায় পানি দ্বারা শোচক করা আবশ্যক হবে।

(21) সুসংক্ষিপ্ত গ্রন্থ
নবী করিম (সা‌হ‌) এর যুগে যেহেতু শুকনা জাতীয় খাবার খাওয়া হত, তখন তাঁদের মলও ছিল শুকনা, ফলে পায়ঝানা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ত না। যেহেন, হাগাল বা মোঠার মল। কিন্তু বর্তমানে মানুষ যেহেতু তৈলাক্ত খাবারে অভ্যস্ত এবং পায়ঝানা শুকনা না হওয়ার কারণে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে পবিত্রতার অর্জনের জন্য সীমিত সংখ্যক পাথর বা বকুলক যথেষ্ট নাও হতে পারে। তাই পানি ব্যবহার করার উপায় সজীবচীন।

(দ্রু মস্কোরা: ১৫ব)।

৮ বাবু দুঃখনা চু মিশ্রণ করা

... এগুলো গ্রহণ করো তোমরা আমি হতে যাচ্ছি।

বাবু দুঃখনা চু মিশ্রণ করা (বাবু দুঃখনা চু মিশ্রণ করা)

মিশ্রণ করা দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে:

(ক) মিশ্রণের শরণ মর্যাদাও।

(খ) মিশ্রণ কি নামায় সম্পূর্ণ না নাকি অপর সম্পূর্ণ?

প্রথম আলোচনা: মিশ্রণের শরণ মর্যাদা সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

* ঈমাম ইসহাক ও দাউদ যাহেরি (রহ.) থেকে দুটি মত বর্ণিত আছে। একটি হল, মিশ্রণ করা সম্পূর্ণ। অপরটি হল ওয়াজিব।

দলীলঃ "আল জামিউস সোনার" প্রথে রাফে ইবন খাদিজ (রা‌হ‌)-এর একটি রেওয়ায়েত। অর্থাৎ, মিশ্রণ করা এবং জমুআর গোসল করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

* জমুআরের মতে, মিশ্রণ করা সম্পূর্ণ; ওয়াজিব নয়। আন্নামা নবী (রহ.) মিশ্রণ করা সম্পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে উমরের ঈমাম (একমত) রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।
দলীলঃ অনুসংহারের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে নবী করীম (সাৰ্ফ) প্রতোক নামায়ে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়ার কেবল ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা বাক্তকে নির্দেশ দেননি।

জবাবঃ (১) উল্লিখিত ইমামদ্বয়েরও প্রসিদ্ধ মত হল, মিসওয়াক সুন্নত।
(২) ইজমার পরিপক্ষী মাত্র দুই মনীবীর মিসওয়াক ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্যে তেমন কিছু আসে যায় না। (دروز ترندية ج 1 ص 224-225) 
(৩) হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ) “তালখীসুল হাবীর” গ্রহে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর লিখেন— “এ হাদিসটির বন্দন করলে সব অর্থ এ হাদিসটির সন্দ দূরবল। অতএব, এ হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ মিসওয়াক নামায়ের সুন্নত নাকি অযুর সুন্নত, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম শাফেকী (রহ.)-এর মতে, মিসওয়াক নামায়ের সুন্নত, অযুর সুন্নত নয়।
দলীলঃ অনুসংহারের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে বলে প্রত্যেক নামায়ের কথা বলা হয়েছে, প্রত্যেক অযুর কথা বলা হয়নি।

* আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত, নামায়ের সুন্নত নয়।
বক্তৃত উল্লিখিত মতানৈক্যের তাৎপৰ্য এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অযু এবং মিসওয়াক করে এক ওয়াজিব নামায় আদায় করে, তাহলে তাকে অর্থ দ্বারা অন্য নামায় পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফেকী রহ.-এর মতে, নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনূন হবে।
আর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, যেহেতু ইহা অযুর সুন্নত, এজন্য দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না।

দলীল (১) হযরত আবু হুসেয়ার (রাছ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাৰফ) ইরশাদ করেন—

লোলা অন আছে উল্লেখিত সুন্নত মিসওয়াক মিসওয়াক (সম্পাদক হামিদ জ ১৪৪)

অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের উপর অযুর সাথে মিসওয়াক করাকে আবশ্যক করে দিতাম।

দলীল (২) হযরত আবিশা (রাছ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাৰফ) ইরশাদ করেন—

লোলা অন আছে উল্লেখিত সুন্নত মিসওয়াক মিসওয়াক (ঈসর সন্ন ২১)

অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামায়ের ক্ষেত্রে অযুর সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

দলীল (৩) হযরত আলী (রাছ) হতে বর্ণিত মারফু হাদিস।
লোক অনেক স্বপ্ন করতে নিজের অধিকার বিবেচনা করা শুনে ক্লান্ত হতে পারে, এবং বর্তমানে নবী করিম (সাহ) ইরশাদ করেন -
লোক অনেক স্বপ্ন করতে নিজের অধিকার বিবেচনা করা শুনে ক্লান্ত হতে পারে, এবং বর্তমানে নবী করিম (সাহ) ইরশাদ করেন -

উপরের স্পষ্ট হাদিস সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মিসওয়াক অমূর্ত সুন্দর, নামায়ের সুন্দর নয়।

আকবরী (বুদ্ধিত্তিক) দলীলঃ মিসওয়াক পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম, এর সম্পর্কে পবিত্রতার (অমূর্ত) সাথে, নামায়ের সাথে নয়। যেমন হয়তো আয়ার রাম (রাজ) -
এর সনদে বর্ণিত আছে -

তরফ হলে সাতার, বায়ো চারের পাঁচ বছর পর মিসওয়াক অমূর্ত হয় এবং পরিচ্ছ্ন এবং সুরম্য সম্পর্কের কারণ।
আর তাই দেখা যায়, মিসওয়াকের অনুসরণ পবিত্রতার অধ্যয়নে বর্ণিত হয়, নামায়ের অধ্যয়নে নয়।

জবাবঃ শাফেক ইসলামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহ্মদী বলেন -
(১) এখানে একটি মুখ (সমস্ত বিষয়) উঠে আছে। আর তা হল অর্থাৎ পত্র এবং পত্রের মূল বাক্যটি হবে এরপ অর্থাৎ পত্রের সময় মিসওয়াক করা সুন্দর। যা হানাফীদের দলীলের সমূহ দ্বারা সুপরিপুষ্ট।
(২) নামায়ের রেওয়ায়েতগুলোতে প্রতিটি স্থানে নিকটে, কাছে শব্দ এসেছে, যা প্রকৃত মিলন বৃধান না, বরং মিসওয়াক এবং সালাতের মাঝে যদি কিছু দেরিবে হয়, তবুও তার ক্ষেত্রে কোন মুম্বুর অপ্রাণী হতে পারে, এর পরিপ্রেক্ষিত হানাফীদের রেওয়ায়েতগুলোতে কোন কোন স্থানে মুম্বুর (সঙ্গে, সাথে) শব্দ বর্তিত হয়েছে। যা প্রকৃত মিলন বৃধান। আর এটি অমূর্ত ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
(৩) রেওয়ায়েতগুলো দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাহ) নামায়ে দাঁড়ানোর পূর্বকালে মিসওয়াক করতেন।
(৪) যদি নামায়ের সময় মিসওয়াক বিপুল হয়, তবে কোন কোন সময় কারো দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ার সত্যাবন্ধ রয়েছে। যা হানাফীদের মতে অমূর্ত ক্ষেত্রের কারণ।
শাফেক ইসলামের মতে একটি বিনিময়কৃত। সুতরাং এসব কারণে মিসওয়াকের যথার্থ স্থান অপূর্বী মনে হয়। (দর্শন তরমুজ ১ চার ২৩২-২৪ ২২০)
দলীল (১): হাদিসে সাধারণভাবে (মাল্যাফা) নামাযের কথা বলা হয়েছে। নামায় সাধারণ হওয়ার বিষয়টি কেবলমাত্র পূর্বাঞ্চল নামাযের ক্ষেত্রই প্রয়োজ্য হতে পারে। আর জানায়ার নামায় ও সিজদায়ে তিলাওয়াত হল অপূর্বাঙ্গ। কেননা, জানায়ারে রকু-সিজদা নেই এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতও রকু নেই।

দলীল (২): তাছাড়া বুধবারিতে ইবন উমর (র।)–এর আমল বর্ণিত আছে–
কান যে স্জাইচ্ছ তাঁতি দ্বারণ করতেন।

* চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেই, আহমদ), সাহাবা, তাবেইন ও জমহুরের মতে, নামায় চাই ফরম হোক কিংবা নফল, জানায়ার নামায় হোক বা সিজদায়ে তিলাওয়াত হোক, অষ্ট ছাড়া জানায়ে নয়। (নুরাহম ১ সং ১১৮)

দলীলঃ অনুষ্ঠিতের পররতে বর্ণিত হাদিস।
আহকামুল হাদীস

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ উত্তর হাদিসে মুহাম্মদ সা. আল্লাহু আলামিলাহু (যেকেন নামায়) শব্দটি লেখা ছিলো (নির্দিষ্ট) যা নেফি (না-সূচক অবয়)-এর পরে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন শব্দ যখন না-সূচক অবয়ের পরে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সামগ্রিকতা (عَمُومُ) এর অর্থ জাপন করে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসে বর্ণিত সালাতের অর্থ হবে যেকেন নামায, হোক জানায়ার নামায কিংবা সিজদায়ে তিলাওয়াত। কারণ সিজদায়ে তিলাওয়াতও এক ধরনের নামায। যেমন পবিত্র কুরআনে সিজদা বলে পূর্ণ নামায বুঝানো হয়েছে।

وَمَنَّ اللَّهُ فَسَجَدَ لَهُ وَسَبَحَهُ

অর্থাৎ, আপনি রাতে সিজদা করুন ও দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আলাহার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (সাহারা: ২৬)

আর জানায়ার যে এক প্রকার নামায, তার সমর্থন পাওয়ায় যায় নবী করিম (সা.)-এর বাণীতে এটি সাধারণ হয়ে আসে,

اللَّهُ فَسَجَدَ لَهُ وَسَبَحَهُ

অর্থাৎ, বেশ ছোট বড় নামায (জানায়ার) নামায পড়।

বিতৃষ্ণ দলীলের জবাবঃ প্রকৃতপক্ষে বুঝানোকে শরীরে বর্ণিত বাক্যাংশটি বিতর্কের উদাহরণ নয়। কঠিন, উসাইলীর কপিতে এর বিপরীত উল্লেখ আছে—

كَانَ يَسَجَدُ عَلَى

আর নিয়ম হল, যখন একই রেওয়ায়ত পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উজ্জ্বল পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

(যদি তুমি তা তেমন তা তেমন করো)

প্রাচীন আলোচনায় অর্থাৎ যার নিকট অযুক্ত জন্য পানি কিংবা তায়ামুমের জন্য মাটি কোনটিই নেই, এমন ব্যক্তি কি করবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাধ্যমে সাক্ষাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত হল, এরপর ব্যক্তি থেকে নামায চাইত (ساقاً)

হবে। অর্থাৎ তার জন্য তখন নামায পড়া জরুরী নয় এবং পরে কাজ করতে হবে না।

* আল্লামা মুহাম্মদ, ইবনুল মুনতাই ও ইমাম হামন (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, এমতাবহিঃ নামায আদায় করে নেয়া ওয়াজিব, পরবর্তীতে কাজ করা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর বিপরীত মত হল, এমতাবহিঃ নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং পরে কাজ করাও ওয়াজিব। এছাড়াও তাঁর থেকে আরো তিনটি মত পাওয়া যায়।
(ক) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অনুরূপ, (খ) তখন নামায় পড়া হারাম। পরবর্তীতে কাশ করা ওয়াজিব। আওয়াঈ এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর অভিমতও তাই। (গ) এমতাবস্থায় মুসলিম হিসেবে নামায় পড়ে নিবে এবং পরবর্তীতে কাশ করা ওয়াজিব।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ঠিক এই সময়ে নামায় পড়বে না; বরং নামায়ের শেষ সময় পর্যন্ত পানি বা মাটির জন্য অপেক্ষা করবে। এরপরও যদি পানি বা মাটি না পায়, তাহলে সে নামায় পড়বে না, বরং পরবর্তীতে তা কাশ করা ওয়াজিব। (পুল্ল মহেদোর ৫১ সু) (৩৮)

* সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে, এমন ব্যক্তি ওধুমাত্র নামায়ের তান করবে, কিন্তু কোন কিছু পাঠ করবে না। তবে পরবর্তীতে তার উপর কাশ করা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এরও এই মতের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রস্তাবনা আছে। আর হানাফীদের এর উপরই ফাতওয়া। এ উক্তিটি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং শর্যতে এর নথীরও পাওয়া যায়। যেমন কোন শিয়ার দিয়ে রময়ানের দিনে বালেগ হয় অথবা কোন কুফির মুসলমান হয় অথবা কোন ঝুঁকুলী মহিলা পরিবর্তা লাভ করে, তবে তাদেরকে রয়েছাদের অনুমরণে অন্তিম দিন খানা-পিনা, সহস্বস থেকে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে কাশ করে নিবে। (ফাতহ আলীম ২ সু) (২৮৭)

দোলীন

... অব্দুর রহমান বেন মুসলিম বেন উমাই বেন অসম আন্তি লিখী সচিও লাহো পাশ্চাত্য 

صلحه‘ وُسَّمَ فِيْ ٓعَطَالَ ٍصَفَطُمَ يَوْمَكُمْ ُهَذَا َقَالَوَا َلا َقَالَ َفَأَتِمُوا ٍيَوْمَكُمْ ُأَقْضُوَء َ(يُب) 

(বাব চ ৩২ চ ফার চ সুব) (২৮৭)

অর্থাৎ, ... আবু রহমান ইবন মাসলামা তাঁর চাচা হতে বর্ণিত করেছেন যে, একদা আসলাম পোতের লোকেরা নবী করিম (সা.)-এর ধ্বমণে হাজির হলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এ দিন রোয়া রেখেছ? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তোমরা বাকি দিন আর কিছু না থেয়ে রোয়া কর এবং পরে এ দিনের রোয়ার কাশ আদায় করবে।

উক্ত হাদিসটিতে অনুমরণের বুদ্ধিমত্তা দেয়া হয়েছে।

(৭) বাব মায়ে আয়ে সু যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়

... অব্দুর রহমান বেন উমাই বেন অসম আন্তি লিখী সচিও লাহো...
নবীর আখ্যায়

কুরআনের পাঁচো সূরায় নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে:

* ইমাম মালিক, দাউদ যাহেরী ও হাসান বসরী (রহ)-এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত নাপিতে নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

দলীল:

* আবু সাইদ আল-আলাহুরিয়া (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল সারাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করায় যে, আমরা কি বুদায় কুপের পানি দ্বারা অ্যাস করতে পারি? কুপটি এর মূল যেখানে ক্রীলাইকদের হায়েরে নেকড়া, কুকুরের গোষ্ঠ এবং দুর্গভূমির মস্তকের নিকেটে করা হয়। জাবাবে রাসূল (সা) বলেন, পানি পরিত্র, তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

কুরআন থেকে প্রতিযোগ্য হয় যে, একটি ছোট কুপে এতের নাপান জিনিস নিকেটের পরে নবী করিম (সা) শরীহের ভাবে পানি পানের পরেছিল। অতএব, পানির পরিমাণ কম হেক অথবা বেশি হেক, তাতে কোন আসে যায় না।

* আবু হানিফা, শাফেই, আহমদ, ইসহাক, মুজাহিদ (রহ) ও ইবন উমর (রা)-এর মতে, যদি পানির পরিমাণ কম হয়, তাহলে নাপাক পরিত্র হলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। যদিও এর একটি ঘুণও পরিবর্তিত না হয়। অর যদি পানি বেশি হয়, তবে নাপাক হবে না, যতক্ষণ না এর অধিকাংশ ঘুণও পরিবর্তিত হয়। মেটকথা,
হানাফী ও শাফেква দের মতে, পানি পাক ও নাপাক হওয়া পানি কম ও বেশি হওয়ার উপর নির্ভর করবে। (বদলুল মহফুদ জ ১৫ সং)

উল্লেখ্য যে, তাদের মতে, কম পানি ও বেশি পানির পরিমাণ কতটুকু, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতান্তর্ক রয়েছে:

* ইমাম শাফেква ও আহমেদ (রহ.)-এর মতে, পানি যদি দু’ কুলা (মটকা) বা এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে বেশি পানি বলা হবে, আর এর চেয়ে কম হলে একে কম পানি বলা হবে।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কম ও বেশি পানির সুনিদিহ কোন পরিমাণ নেই। তাঁর মতে, এ বিষয়টি অভিজ্ঞ বা যাচাইকারী ব্যক্তির মতের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যদি পানি দেখে বলেন, ইহা কম তাহলে কম এবং বেশি বললে বেশি পানি হিসেবে মনে নিতে হবে।

তবে, কেউ কেউ বেশি পানির পরিমাণ বৃদ্ধার গিয়ে বলেন-

* ইমাম কুদুরী (রহ.)-এর মতে, পানির এক পার্শ্ব না দিলে যদি অন্য পার্শ্ব না নড়ে, তাহলে বৃদ্ধার হবে ইহা বেশি পানি।

* ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যে পানিতে নাপাকীর ছাপ অন্যদিকে না পৌঁছে, তাই বেশি পানি।

* আবার কেউ কেউ বলেন, পানিতে রং দিলে, তা যদি সম্ভব পানিতে বিস্তার লাগ না করে, তবে তা বেশি পানি।

* পরবর্তীতে কোন কোন ফুকাহায়ে কিরাম সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে আবু সুলাইমা (রহ.) কর্তৃক (ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মসজিদের উপর কিয়াস করে) প্রদত্ত হিসেব গ্রহণ করে বলেন, যে জলাশয় দৈর্ঘ্য ও প্রচুর দশ হাত দশ হাত (১০০০= ১০০ বর্গহাত), তাই অধিক পানি। (লমায় তনফি জ ২৪৫ সং)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীলসমূহ:

* উঃ অ্যামিরি হীরারে বন্দি বেঞ্জারি তিনি কুলাতে তালিম মানো যোগত অর্ধেরে হামেকে।

বাবাতে শুলাইমার মীরচুরে কিতান বিধারণ দিয়ে লক্ষ্য করে আবু সুলাইমার (রহ.) কর্তৃক (ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মসজিদের উপর কিয়াস করে) প্রদত্ত হিসেব গ্রহণ করে বলেন, যে জলাশয় দৈর্ঘ্য ও প্রচুর দশ হাত দশ হাত (১০০০= ১০০ বর্গহাত), তাই অধিক পানি।

নবী করীম (সাহ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাহ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাহ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাহ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাহ) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সাহ) হতে বর্ণিত।

নবী করীম (সাহ) বলেন, তোমাদের কেউ মনে এমন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যার দ্বারা সে গোসন করবে।
দলীল (২) ৪ হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত-

(3) অর্থাৎ, নবী করীম (সাঁ) ইহ্মাদ করেন। কুকুর যদি তোমাদের আগে পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম হল, তা সাপ্তাহিক পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ধর্ষণ করতে হবে।

(4) উপরোক্তিতি হাদিসের মূলের মধ্যে কোন একটির পরিবর্তন হওয়ার শর্ত উল্লেখ নেই কিংবা দুই কালার (মটকা) শর্তারোপ করা হয়নি।

(5) বদাও কুপের বর্ণতায় ইহ্মাদ আবু দাউদ (রহ.) বলেন-

(6) অর্থাৎ, অতঃপর আমি কুপটি মেপে দেখি যে, এর প্রথ ছয় হাত পরিমাণ।

উক্ত হাদিসে আরো বর্ণিত আছে যে, তাতে পানি সর্বনিম্ন হাতু আর সর্বোচ্চ নাভি পর্যন্ত থাকত। অতঃপর এটা কিভাবে সত্য যে, তাতে হায়েরের কাপড় এবং মৃত
কুকুরের সংহতি নিকেপ করা হবে, অথচ এ পানির তিনটি গুণ অপরিবর্তিত থাকবে, অতএব, যদি হাদিসের বার্তিক অর্থের উপর আমাদের কারণ হয়, তাহলে পানির গুণ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও পরিব্রহ্ম বলা উচিত। অথচ ব্যাখ্যা ইমাম মালিকেও এর প্রবন্ধ নন।

(৩) আবু নুর বাগদাদী (রহ.) বলেন, বুদায়া কুপ্ত থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠানো হত। ফলে সকল নাপাকী তা থেকে দূর হয়ে যেত। সাহাবাদের সেখান থেকে নাপাকী উত্তোলনের পরও সংশয় হলে নবী করীম (সা) উক্ত করেছিলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, পানিতে নাপাকী পড়লেও তা নাপাকী হবে না।

(৪) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, বুদায়া কুপের পানি ছিল প্রবহমান। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, এর পানি দ্বারা বাগানগুলোতে সেচ দেয়া হত।

(৫) আল্লামা ইবন হুমাইম (রহ.) বলেন, এবং আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার তার কারণ হয়েছে। এর দ্বারা বিলুপ্তিভাবে উদ্দেশ্য বুদা কুপের পানি। এর অর্থ হল, তোমাদের সেদেহ- সংশয় কোন কুপে এটাকে নাপাক করে না। কেননা, জাতি যুগে এতে ভিক্ষা রকমের নাপাক ময়লা ফেললেও ইসলামের পর এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এরপরও সেদেহ হচ্ছিল যে, ইহা আসলে পাক কিনা। ফলে নবী করীম (সা) উক্ত করেছিলেন।

(৬) কেউ কেউ বলেন, হাদিসটির সনদে ইয়াতিরাব (গরমিল) রয়েছে।

* ইমাম শাফেক (রহ.) কর্তৃক প্রণীত ব্যবহার কুপাদির উপর মাত্র (২) ‘হিদায়া’ গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদীন (রহ.) এর জন্যে বলেন, হাদিসে বর্ণিত যে, তাহার সময় কুপাদির উপর প্রণীত যে হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদীন (রহ.) এর জন্যে বলেন, হাদিসে বর্ণিত যে, তাহার সময় কুপাদির উপর প্রণীত যে হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদীন (রহ.)

(১) হাদিসটির দুর্বল (যুক্তি) সঙ্গে মহামায়া ইবন ইসহাকের উপর নির্ভর হয়। আর তিনি হলেন যুক্তি (দুর্বল) রাবি। সুতরাং ইহা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) হাদিসটির সনদ, মতন, অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যেটি পরিমাণ গরমিল ও অসঙ্গতি (প্রাপ্ত প্রধান পাণ্ডব) রয়েছে।

সনদের গরমিলঃ কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে-
আহকামূল হাদীস

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

10. বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা

বাবু ব্রোকেন ক্লেরবুন অব কুক্কুরের লেহনকৃত পাত্র যৌথ করা
বিশেষণঃ এই অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(১) কুকুরের খুটা পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে।
(২) কুকুরের খুটা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনায় কুকুরের খুটা পবিত্র না অপবিত্র, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক ও বুখারী (রহ.)-এর মতে, কুকুরের গোষ্ঠ পাক। সুতরাং এর খুটাও পাক।

দশম (১) আল্লামা তাআলার বাণী-

"লাইন আন য়াই নোমাদ ম্যোনাতায়া নো ল ম্যোনাতায়া ফাইনিয়ার ফাইন কাঁটি ফাইন।" নই অর্থাৎ, কিন্তু মৃত অথবা প্রভাবিত রক্ত অথবা ধূসর মাংস- এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ। (আলামাই: ১৫৪, বাকারাই: ১৭৩, মায়েদাই: ৩, নাহল: ১১৫)

উক্ত আয়াতে হারাম বস্তুর তালিকায় মধ্যে কুকুরের উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এর খুটা পাক।

দশম (২) উত্তর মতে যে শিকারী জন্য শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তোমরা তা ভক্ষ কর। (মায়েদাই: ৪)

উক্ত আয়াতেও আল্লাহ তাআলা শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ দাত দিয়ে শিকার করার কারণে গোষ্ঠে অবশাই লালা লেগেছে।

এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের খুটা পাক।

দশম (৩) ইবন উমর (রাং) এর বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায় যে, মসজিদে নববীর ভিতর দিয়ে কুকুর আসা-যাওয়া করত, কিন্তু তাতে পানি ঢালা হত না। অথচ কুকুরের দাতাব হল যেদিকেই যাবে লালা পড়তে থাকে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের খুটা পাক। (বখারি ১ সঃ ২২)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেই ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, কুকুরের গোষ্ঠ নাপাক এবং এর খুটা নাপাক। (শরহ সালীম ১ সঃ ১৩৭)

দশম (৪) আল্লাহ তাআলার বাণী-

"য়াই নোমাদ ম্যোনাতায়া নো ল ম্যোনাতায়া ফাইনিয়ার ফাইন।" অর্থাৎ, তাদের জন্য তিনি যাবতীয় খেবী (অপবিত্র) খুটা হারাম করেন। (আরাফ: ৫৭)

আর কুকুরও খুটা বা অপবিত্র। অতএব, এর খুটা নাপাক এবং এর গোষ্ঠও নাপাক।

দশম (৫) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে সত্ত্বার পানি দিয়ে থেকার খুকুম দেয়া হয়েছে পবিত্র করার জন্য। আর পবিত্র করতে হয় নাপাক জিনিসকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুকুরের খুটা নিঃসরণেভে নাপাক।
দলীল (৩): এছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, কুকুরের লেহনকৃত খাদ্য যেন ফেলে দেয়া হয়। ওচক কোন বস্তু বিদ্যা নষ্ট করা হারাম। সুতরাং যদি নাপাকেই না হত তাহে ফেলে দেয়ার কুকুম দেয়া হত না। (সলিম ১: ১৩৭)

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ পবিত্র কুরআনে কুকুর বা অন্য কোন জন্তু ও বস্তু উল্লেখ না থাকা ইহা হলার হওয়ার দলীল হতে পারে না। কেননা, এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা হাদিসের দ্বারা হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই। এমন অনেক পশু-পাখি রয়েছে যেগুলোকে ব্যাখ্যা ইমাম মালিক (রহ.) ও হারাম বলে থাকেন, যা কুরআনে উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আয়াতটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, শিকারী কুকুরের শিকারকৃত পোষকে (কিছু শর্তাগুলো) যেহেতু করা ব্যাপক তা ভক্ষণ করা হলাল। কিন্তু যা কোন পদ্ধতিতে খাবে, তা তো অন্যান্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ একথা সবজনবিদিত যে, হোয়া ব্যতীতও কোন কোন জিনিস পাক করা সত্ত্বেও যেমন, বীর্য যদি খুব গাঢ় হয় এবং তা যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, এমনান্তর চুলের উপর তারা কাপড় পাক হয়ে যাবে। হোয়ার প্রয়োজন নেই। এমনভাবে মাত্র কোন নাপাক লাগলে তা শুকিয়ে গেলে এবং চুলে নিলে পাক হয়ে যায়। (দরস মশকুম জ ১: ১৩১-১৩২)

দ্বিতীয় আলোচনাঃ কুকুরের ঝুটি পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে। কুকুরের ঝুটি পবিত্র করার জন্য পাত কয়ঁবার ধোয়া ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক রয়েছে।

* ইমাম শাফেকি, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সাতবার ধোয়া ওয়াজিব।
* তবে আহমদ (রহ.) অসিকার মাত্র দিতে ধোয়ার জন্য জোর তাকিদ প্রদান করেন।
* উল্লেখ যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কুকুরের ঝুটি যেহেতু অপবিত্র নয়, সুতরাং তিনিও সওয়াবের জন্য (মৃত্যু প্রবন্ধ) এবং চিকিৎসা হিসেবে সাতবার ধোয়ার প্রবন্ধ। (নূরিজ ১: ১৩৮)

দলীল: অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসের উদর হাদিসে সাতবার ধোয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, কুকুরের ঝুটি অন্যান্য নাপাকের ন্যায় তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। (নূরিজ ১: ১৩৭)

... উনে আবু হরিয়ারার বলা হয়েছে 'রশুল ইলাহু সালাম আল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ উল্লাহ'।
অর্থাৎ, ইবন জুরায়জ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে তো কয়বার ধুতে হবে? উভয়ে তিনি বলেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সর্বকটিই আমি ওঠেছি।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আতা (রহ.) সাতরের হাদিসেরও রায়ী। যদি সাতরের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হত তাহলে তিনি কখনো এর বিপরীত অনুমতি দিতেন না।

নাবী দলিলঃ যেখানে কুকুরের কিংবা শূকরের পায়ের পায়ের বায়োচূড়ার দ্বারা নাপাক হলে সেই নাপাক তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কুকুরের লালা তো নিঃসদেহ তার কিংবা শূকরের মল-মূত থেকে অনেকখানি হালকা। সুতরাং বুটার ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার দ্বারা পাক হয়ে যাবে, এটিই যুক্তিযুক্ত।

জবাবঃ (1) হযরত আহুর হুরায়রা (রহ) সাতরের ধোয়ার হাদিস বর্ণনাকারী হওয়া সত্বেও তার থেকে তিনবার ধোয়ার হাদিস বর্ণিত হওয়ার দ্বারা প্রমাণ মিলে যে, সাতরের হুকুম ওয়াজিব বুখানোর জন্য নয়। (২) তিনবার ধোত করার হাদিস ওয়াজিব, আর সাতর ধোত করার হাদিস মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য করা হবে। অতএব, উভয়ের মাঝে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। (৩) ইবন রুশদ বলেন, সাতর ধোত করার হুকুম চিকিত্সা হিসেবে দেয়া হয়েছে, নাপাকীর কারণে নয়। কেননা কুকুরের লালা এক প্রকার বিষ থাকে, যা কেবল সাতর ধোত করা এবং মাটি দ্বারা ঘর্ষণের ফলেই দূষীভূত হয়। (৪) ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাতরের হুকুম ছিল, অতঃপর তিনবার ওয়াজিব করা হয়। আর সাতরের ধোয়ার মুস্তাহাব থেকে যাবে। (৫) সাতরের হাদিসগুলোতে অনেক গরমিল রয়েছে। যেমন, অনুমোদীর শূকর হাদিসে বর্ণিত আছে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করে। ইবন মুাফাফাল (রহ) এর রেওয়ায়েতে আছে- "ঔলিমানে ঘোরোটো লারাব- (আবু দাওজ ১) অর্থাৎ, অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর।"
কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে—

"আরোহণ ও অহংকার প্রতি—(তৃতীয় চ ১ সোম ২৪)"

ধর্মী, প্রথমবার ও শেষ বার মাটি দ্বারা যথার্থ করা।

আর কোন রেওয়ায়েতে আছে—

"আরোহণ ও অহংকার সত্ত্বা—(দায়ে চ ১ সোম ২৩)"

তথা সত্যমাত্র মাটি দিয়ে মাজ। অতএব, সাতিতার যেত করা যদি ওয়াজিব ধরা হয়, তাহলে অসৃষ্টিপ্রপূর রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে সামাজিক বিধান অস্থায়। কিন্তু সাতিতার যেত করা যদি মুক্তাহার ধরে নেয়া হয়, তাহলে কোন অসামাজিক সৃষ্টি হবে না; বরং প্রতিটি পদ্ধতির মাঝে সামাজিক বিধান স্থায়।

(দ্রষ্টাস্থি জ ১ সোম ১২১-১২৩, পরম্য জ ১ সোম ১৯০-১৯২, দ্রষ্টাস্থি জ ১ সোম ২২২-২২৩)
* তিন ইমাম (মালিক, শাফেকি ও আহমদ), ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, বিড়ালের বুটা বিনা মাকরহ পরিত।

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) হযরত আযিশা (রাণ) হতে বর্ণিত–

ফালাস্ত ইনি রসূল লাহে সিরা লাহে লাহে মসলাম কালে কালে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে লাহে 

মিন ত্যাদাদিতুম উল ইলাম 

অর্থাৎ, ... আযিশা (রাণ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সার) বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর আযিশা (রাণ) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সার)-কে বিড়ালের উচিষ্ঠ পানি দ্বারা অযু করতে দেখেছি। উত্তর হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিড়ালের উচিষ্ঠ নিঃসংদেহে মাকরহ ছাড়াই পাক। যেহেতু নবী খানে মাকরহ বা অপছন্দের কথা উল্লেখ করেননি।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বিড়ালের বুটা পরিত, তবে মাকরহ। অতঃপর ইমাম তাহবী (রহ.) বলেন, ইহা মাকরহ তাহবী। আর ইমাম কাশবী (রহ.)-এর মতে, মাকরহ তাহবী। অধিকাংশ হাদিস্কৃত কাশবী (রহ.)-এর মতকে প্রাথমিক দিয়ে মাকরহ তাহবী হয়ে উপর কাটাতে দিয়েছেন।

(دروস্ত তুমবী জ ১ সং ৩২৬, درس مشকুল ج ১ সং ১৮৭)

দলীল (১) আবু হুরায়রা (রাণ) হতে বর্ণিত–

واذا وَلِقَ الْهِرَ القَمْلَةَ (ابو داود ج ১ সং ১০, ترمدي জ ১ সং ২৭ পাব সোর তেলন)

অর্থাৎ, ... যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা একবার যৌন করতে হবে।

দলীল (২) হযরত আবু হুরায়রা (রাণ) হতে বর্ণিত–

يَغْسَلُ الْأَنْثَاءَ مِنْ الْهِرَ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ الْكَلْبِ (طحاوي ج ১ সং ১১)

অর্থাৎ, বিড়াল মুখ দিলে পাত্র এরপারেই ধুতে হবে, যেরূপভাবে ধুতে হয় কুকুর মুখ দিলে।

উল্লিখিত হাদিস ঘায়া বুঝা যায় যে, যদি অন্তর্গত মাকরহও না হত, তাহলে খোয়ার হকাম দিতেন না।

দলীল (৩) এরপারেই তাহবী (রহ.) স্বীয় কিতাবে ইবন উমর (রাণ)-এর আহারও বর্ণনা করেছেন–
হোকাত অবু সুমর রশ্দী অবিরুদ্ধ

অর্থাৎ, ইবন উমর (রা) আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা গাধা, কুকুর ও বিড়ালের উচ্চিষ্ট দ্বারা অমৃত কর না।

উত্ত হাদিসটিও অন্তত মাকরহ হওয়ার দাবী রাখে।

জবাবঃ ১) তিন ইসমাইল দলিল হিসেবে প্রদত্ত উভয় হাদিসে লক্ষ্য করলে প্রতিপাদন হয় যে, বিড়ালের ঝুঁট মাকরহ ছাড়াই যদি পবিত্র হত, তাহলে নাবি কর্মী (সাঁ) পরিক্ষার ভাষায় ইরাশাদ করতেন তথা বিড়ালের ঝুঁট পবিত্র। এমনভাবে পেঁচিয়ে কথা বলার দরকার ছিল না- ইহুদী টি ভিজিঃ এতে বিবাদ হয় যে, বিড়ালের ঝুঁট সত্ত্বগতভাবে তো নাপাকই, কিন্তু ইহা গুহে অধিক বিরোধকারী বিধান এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে ইহা পরিপূর্ণ পাকও নয়। এই কারণটি মাকরহ তানজিহাই হওয়ার প্রমাণ। যার প্রবল্লা হায়াজীগুণ।

(২) মাকরহ তানজিহাই বেদাতা একটি অংশ। অতএব, তিন ইসমাইল দলিল বেদাতা বা জায়েদ বর্ণনা ক্ষেত্রে প্রয়োজা। আর হায়াজীগুর রেওয়ায়ত মাকরহ তানজিহাইর উপর প্রয়োজা।

(নুরুল মুজহুর, ৩৯২, তন্ত্রী, ১ চ ১৮৬)

১১ সাগরের পানি দ্বারা অমৃত করা

১১ সাগরের পানি দ্বারা অমৃত করা

... আবু বিন তাহরা (রা) হতে আবদ্ধ। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইস্যা রাসূললালাহ। আমরা সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে (পান করার) সামান্য মিঠা (মিঠা) পানি রাখি। যদি আমরা তা দ্বারা অমৃত করি তবে পিপাসার্থ থাকব। এমতবাচ্চায় আমরা সাগরের (লবণাক্ত) পানি দ্বারা অমৃত করতে পারি কি? জবাবে রাসুললালাহ (সা) বলেনঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাপ্তি হালাল।

(সুন্নি)
বিশ্লেষণঃ উক্ত অনুচ্ছেদে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(১) সামুদ্রিক কোন কোন প্রাণী খাওয়া হারাম, আর কোন কোনটি হালাল। (২) পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছের হুকুম। (৩) চিংড়ি মাছ হালাল না হারাম?

তবে, এগুলো আলোচনার পূর্বে মূল হাদিসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় যে, (ক) সাগর হল বিশাল জলাধার। এতদসত্তেও সাহাবায় কিরাম কেন এমন প্রশ্ন করলেন যে, আমরা কি সাগরের পানি দ্বারা অম্ব করতে পারব? যা বাহিক দৃষ্টিতে অহেতুক মনে হচ্ছে। (খ) পক্ষান্তরে নবী করিম (সাঃ) এর উত্তরে প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী শুধু এতেকুক বাণীই তো যথেষ্ট ছিল যে, “সাগরের পানি পবিত্র“। কিন্তু তিনি একধাপ এগিয়ে কেন বললেন, “এর মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল।”

(ক) মুহাম্মদ সাহীব এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়েছেন-
(১) সাধারণত পানির রয়েছে তিনটি গুন- রং, পর্ণ ও স্বাদ। তাঁরা যখন সাগরের পানিতে সাধারণ মিঠা পানির বিপরীত রং ও স্বাদের পরিবর্তন দেখলেন, তখন তাঁদের সন্দেহ হল, এর দ্বারা অম্ব জায়েগে কিনা। ফলে এমন প্রশ্ন করলেন।
(২) সমুদ্র হল অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল। আর সেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার প্রাণী মারা যাচ্ছে। তাই তাঁদের মনে সায়াবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপি হল যে, এই মৃত প্রাণীর দ্বারা সাগরের পানি নাপাক হবে কিনা।
(৩) চতুর্দিক থেকে সাগরের পানিতে সর্বদাই নাপাক পতিত হচ্ছে, তাই তাঁরা ভাবলেন, হয়ত সাগরের পানি পবিত্র নয়।
(৪) অথবা, সন্দেহের কারণ এই ছিল যে, নবী করিম (সাঃ) এর পাত্র ইরশাদ করেছিলেন, এন তখ্তে লেখে৷ তাতুরা- (আবু দাউদ, পাপ রকু বহর এবং বিজ্ঞাপন ১৩৩) অর্থাৎ সমুদ্রের নিচে রয়েছে অগ্নি। যা জাহানামের আলামত। তাই সাহাবাগণ এমন প্রশ্ন করেছিলেন।

(খ) (১) সাহাবাগণের সাগরে যেমন পানির প্রয়োজন হবে, তেমনিভাবে খাবারেরও প্রয়োজন দেখা দেবে। তাই রাইমাতুল্লাহ আলামীন (সাঃ) উমাতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে একধাপ এগিয়ে বললেন, সাগরের মৃত প্রাণী খাওয়াও হালাল।
(২) মোহলা আলী কারী (রহ.) বলেন, যে সাহাবাগণ সাগরের পানি দিয়ে অম্ব করার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাঁরা তো এটিভেবেই নিয়েছিলেন যে, সাগরের মৃত মাছ হয়ত হালাল হবে না। যেহেতু কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- বেলা হোম্য উল্লেখ মুসলিম যে৷ (আরাফা ১৭৩) অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী। (বাকারাঃ ১৭৩)
তাই তাঁদের এই ভুল থেকে পরিস্থিতের জন্য তিনি অতিরিক্ত উদ্ধৃতি করেছিলেন।
(৩) সাহারাগণ যাতে আবার ইহা না বুঝে বসেন যে, পানি হয়ত জরুরতবশত পাক, কিন্তু এর মৃত প্রাণী হয়ত নাপাক।
(৪) এই অতিরিক্ত বাক্যটি বুদ্ধি করার উদ্দেশ্য হল, তাঁদের প্রশ্নের মূল কারণের অবসান ঘটানো। অর্থাৎ, যেখানে মৃত প্রাণী খাওয়া হালাল, যেখানে তো সাগরের পানি দিয়ে অযু করা নিসর্গদেহ জাগে।

প্রথম আলোচনাঃ সামুদ্রিক কোন কোন প্রাণী খাওয়া হালাল, আর কোনটি হারাম- এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতানুক্রম রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক (র.হ.)-এর মতে, সামুদ্রিক শূকর ব্যতীত জলজ সকল প্রাণী খাওয়া হালাল।

* ইমাম শাফেকী (র.হ.) থেকে এ সম্পর্কে ৪টি মত পাওয়া যায়-

(ক) হানাফীদের মত (যা সামনে আসছে)
(খ) যেসব প্রাণী শূলে হালাল, অনুরূপ জলভাগে বসবাসরত প্রাণীও হালাল। যেমন সামুদ্রিক গরু হালাল। আর যেসব প্রাণী শূলে হারাম, অনুরূপ জলে বসবাসরত প্রাণীও ভক্ষণ করা হারাম। যেমন, সামুদ্রিক কুকুর, শূকর হারাম। আর যেসব প্রাণী জলে বাস করে, কিন্তু শূলে এর নর্তীর নেই সেগুলোও হালাল।
(গ) ব্যাঙ, কুমির, কচ্ছপ, সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর এই পাঁচ প্রকার প্রাণী ব্যতীত অন্যসব প্রাণী খাওয়া হালাল। ইমাম আহমদ (র.হ.)-এর অভিমতও তাই।
(ঘ) ব্যাঙ ছাড়া অন্য সব সামুদ্রিক প্রাণী হালাল।

আল্লামা নব্বী (র.হ.) বলেন, এই সর্বশেষ উক্তিটির উপরই শাফেকীদের ফাতওয়া।

(বদলের মহফতুল হাসান ১৫ সং ৫৪)

তিন ইমামের দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সমুদ্রে প্রাণ্ত শিকার ও খাদ্য হালাল করা হয়েছে। (মছাদঃ ৯৬)
উক্ত আয়াতে চিড় (শিকার) শব্দটি চিড় (শিকারকৃত প্রাণী) অর্থে মুফত (কর্মপদ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর (সম্মৃপদ) ব্যাপকতার জন্য ব্যবহৃত হয়।
অতএব, আযাতের মর্মান্ত হল- সমুদ্রের সকল শিকারলগ্ন প্রাণী ভক্ষণ করা জাগে।
এখানে আমাদের বলা হয়েছে। কোন কিছুকে খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়নি।

dলীল (২) অনুজ্জ্বেদের মুখে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসেও আমাদের (ব্যাপকতাবে) সমস্ত মৃত প্রাণী খাওয়ার বৈধতার প্রমাণ মিলে। কেননা, হাদিসে কোন কিছুকে খাস করা হয়নি।
দলীল (৩) হাদিসে হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে—

"...ফালেকিঃ কেনা বুধ্বর দাবীতে যোকাল হুল আন্দান কালনা এর নিচে নিচে শহর।" (বহুর জ)

(চৌদ্দ৪-২২৬ বাব আন বয়ে করো হর)

অর্থাৎ, অতঃপর সম্মান আমাদের জন্য একটি প্রাণী নিকেপ করল। যাকে আমরা বলা হয়। আমরা এটি থেকে অর্থ মাস ভক্ষণ করেছি।

এই রেওয়ায়েতে ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। আর মাছের জন্য কখনো দাবায় শব্দ ব্যবহার হয় না। এতে বুধ্ব যায় যে, আমরা কোন মাছ ছিল না। অতএব মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও ভক্ষণ করা হলাল।

ইমাম মালিক (রহ.) নিম্নলিখিত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেন:

ইমাম মালিক (রহ.) নিম্নলিখিত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেন–

এলাম হরম আলেকম মিয়েতান ওলাম ওলম খনীর।

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের উপর হরাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শুকরের গোষ্ঠ। (বাকরা ১৭৩)

যাতে আমার লহম খনীর (শুকরের গোষ্ঠ) এর ব্যাপকতার কারণে সামুদ্রিক শুকরকেও খাওয়া হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম আফেক (রহ.) ব্যাঙ মারার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদিসগুলোর কারণে ব্যাঙকে হালাল থেকে ব্যতিক্রমপূর্তক করেন। (দেশ তুর জ ১২, ১০২)

* ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাদী (রহ.)-এর মতে, পানিতে বসবাসরত প্রাণীদের মধ্যে মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়গায় নেই।

(বদল মহোব ১২, ১০৯, বনমূন ১২, ১০৭)

দলীল (১) আলাহ তাআলার প্রাণী–

"বুধ্বর হরম আলেকম মিয়েদ ওলীম খনীর।"

অর্থাৎ, তাদের জন্য তিনি যাবতীয় অপবিত্ত বক্ত হারাম করেন। (আরাফঃ ১৫৭)

আলাহ আইনি (রহ.) কুরআনের এই আয়াতের বিভিন্ন ভিত্তিতে বলেন, খবাস শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব মাখলুক যেগুলোকে মানুষ বহাবতং ধরা করে। মাছ ছাড়া সামুদ্রিক প্রাণী এরপো, যেগুলোকে বহাবতং মানুষ ধরা করে। অতএব, মাছ ছাড়া সামুদ্রিক অন্যান্য প্রাণী–এর অস্ত্রুভূক্ত হবে।

দলীল (২) আলাহ তাআলার প্রাণী–

"ইমাম হরম আলেকম মিয়েদ।" (বকরে এই ১৭৩)
এতে বুঝা যায় যে, প্রতিটি মৃত জন্ত হারাম। হুমের হোক কিংবা জলের হোক। তবে শরপি দলীল দ্বারা প্রমাণিত যেসব মৃত প্রাণী (মাছ) ব্যতিক্রমত্ত্ব করা হয়েছে সেগুলো আলাদা।

"আর যাদের হার আল্লাহ তাদেরকে না মৃত করেন, তাদেরকে মৃত করেন।" (৩)

অর্থাৎ, আবুল-কবুর ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল সাইয়ার (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাদের জন্য মৃত বন্দু এবং মৃত প্রাণী হলাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটি হল- মাছ ও পশুপাল। আর মৃত প্রাণী হল- কলিরা ও গৃহী।

দলীল (৪): সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলীল হল, নবী করিম (সাঃ)-এর সারার জীবনে তিনি এবং তৎপরতার সাহাবায় কিছু মৃত ছাড়া অন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণীর তক্ষণ প্রমাণিত নয়। যদি এ প্রাণীগুলো হলাল হত তবে তিনি কোন কোন সময় বেধতার বিবরণের জন্য হলেও অবশ্যই তা খেতেন। যেহেতু তা করেননি, তাই সেগুলো হলাল হবে না।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ সচিব মফুল শবদটিকে অর্থে ব্যবহার করা রূপক (মজার)। আর প্রয়োজন ব্যতিক্রম রূপকের শরণাপন্ন হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

তাই হানাফীগণ বলেন যে, এখানে শিকার (খেলাপোল) শব্দটি প্রকৃত হচ্ছে অথবা ব্যবহত হয়েছে।

মোট কথা হল, হানাফীদের মতে, আয়াতটির অর্থ হবে, তোমাদের (মুহুরিমের) জন্য সমুদ্রের প্রাণী শিকার করা হলাল। আর ইমামজর আয়াতটির অর্থ হবে, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হলাল (যেকোন প্রকার) ভক্ষণ করা হারাম। অঞ্চল আয়াতটির পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে হানাফীদের প্রদত্ত অর্থে মেনে নিতে হয়। কেননা, আলোচনা চলছে মুহুরিম ব্যক্তির জন্য কোন কোন কাজ করা প্রয়োজনীয় আর কোন কোনটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উক্ত আয়াতের উত্থান হল ও একথা বলা যে, মুহুরিম ব্যক্তির জন্য সমুদ্রে শিকার করা হলাল তথা জায়গা। এর দ্বারা যেকোন প্রকারের প্রাণী খাওয়া যে হলাল তা প্রমাণ করে না।
দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) আলোচনা হাদিসে মীতে (সমুদ্রের মৃত্যু)-এর মধ্যে যে সম্প্রতি (উদেশ্য) রয়েছে এর দ্বারা সব মৃত বুখানো উদেশ্য নয়; বরং সুনীতিস (মৃত) জন্ম হালাল বুখানো উদেশ্য। আর সেই সুনীতিস প্রার্থীর হচ্ছে মাছ। অন্য কিছু নয়।

(২) যদি মীতে দ্বারা ব্যাপকর বুখানো হয়, কিন্তু পরবর্তীতে নবী করিম (সংগ) আহিলত না মেইতান সম্ভ এল্জারা। (অর্থাৎ, আমাদের জন্য দুইটি মৃত বন্দু হালাল।
একটি হল মাছ, অপরটি পশ্চাল বলে দুটিকে খাওতে দিয়েছেন।

(৩) আল্লামা শাহীখুল হিন্দ (রহ.) বলেন, যদি সম্প্রতি পদটি (সংগ) সম্প্রতি ল্যাখ (সংগ)
বুখানোর জন্য মেনে নেয়া হয়, তাহলে শান্ত দ্বারা উদেশ্য রেখা নয়; বরং প্রতিশাস্ত। আর বাক্যের দ্বারা প্রতিশাস্ত সংক্রান্ত চলে আসছে। সুতরাং নবী করিম (সংগ)-এর বাণী হিলে মীতে-এর অর্থ হবে, “সমুদ্রের মৃত প্রাণীগুলো প্রতি থাকে।”

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ সহীহ বুখারীতেই আমার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা
হয়েছে। - (খার পত্র ২৪৬-২৪৫) (২)

তৃতীয় আলোচনাঃ প্রথমে জানা থাকা দরকার যে, অসামান্য মাছ বা
সম্প্রতি যে মাছের সম্পর্কে বলা হয়, যা পানিতে কোন বহির্গত করণ ব্যাপিত
সাহাবিকভাবে মরে পেট উল্টে ভেসে থাকে। সুতরাং পানিতে মরে ভেসে উঠা মাছ
ছাড়া জানায় কিনা - এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবাদের রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এরপক্ষ মাছ খাওয়া হালাল।

দলীল (১): অনুচ্ছেদের এরতে বর্ণিত হাদিসে। উল্লেখ হাদিসে মীতে উল্লেখ রয়েছে,
যার দ্বারা জবাইবিহীন মৃত উদেশ্য। হাদিসে এর বৈধতার ক্রুদ্ধ দেখা হয়েছে।

দলীল (২): আমার সংক্রান্ত হাদিসে। সাহাবায় কিরিম এটি পেয়েছিলেন মৃত
অবস্থায়। তা সত্ত্বেও তারা এটাকে অর্থমান পরাম থেকে থাকেন।
দলীল (৩) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একটি আহ্বান। যেটি সুনামে বায়হাকী ও দারা কুতুনি তে হযরত ইবন আব্দাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এই আহ্বানের মরে ভেসে ওঠা মাছকে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। (মুফতির সন্ন ২০৫)।

* ইমাম আবু হানিফা, ইবরাহিম নাখি, শাবি, তাউস, সাদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) ও হযরত আলী, ইবন আব্দাস এবং জাবিব (রাঃ)-এর মতে, এরূপ মাছ খাওয়া হালাল নয়।

দলীলঃ হযরত জাবিব ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم مَا أَلَّقَ الْبَحْرِ أَوْ جَزَّرَ عَنْهَ فَكَفَّلَهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَأَ فَلَا تَأْكُلُوهُ। (আয়াত ২২:১৭, বিবেকের বিভাগ নামে সম্পূর্ণতা বিচার)

কৌন বলত যে সমুদ্র মাছ বাদাম মাছ নয়, সাফতে অ্যাড করতে এটি ক্ষুধাতুল্লাহ (রাঃ) বলা হয়। সম্পূর্ণতা অর্থ সমুদ্রে অতিথি লাগার করার চেয়ে আমাদের পেড়েছে, তেলম দেটি ক্ষুধা করা। অর যেটি পানিতে মরে ভেসে উঠল তা ভক্ষণ করা না।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবে ইবরাহিমবি জন্ম বুখানো হয়নি; বরং এমন জন্ম বুখানো হয়নি, যার রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আমর সংক্রান্ত হাদিসের উদ্যোগ হল, এটা মরে ভেসে ওঠা মাছ বলে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। এটা শুধু সে মাছকে বলে, যেটি কোন বাহিরের কারণ ব্যাপী নিজে নিজে পালিতে মরে ভেসে উঠায়। পশ্চাতে যদি কোন মাছ কোন বাহিরে কারণে স্থান প্রচুর গরম ও শৈত্য প্রবাহে বা চেত-রক্ষপর কারণে অথবা তীরে উঠার পর পানি সরে যাওয়ার কারণে মরে যায়, তবে সেটি তাকি নয়। এটা খাওয়া হালাল। আমর সংক্রান্ত হাদিসেও সংক্ষিপ্ত মাছটি পানি থেকে তীরে উঠার আসার কারণে মরে গিয়েছিল বলে স্পষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের হালাল হওয়া সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আবু বকর সীদিক (রাঃ)-এর আহ্বানের উত্তরে বলা যায়, প্রথমতঃ তা এতে প্রচুর ইটিতরাব রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি এটাকে সূর্যস্তভাবে সুন্দর মনে নেয়া হয় তবে এটি একজন সাহিবের এই ধর্ম হতে পারে, যা মারফু হাদিসের বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। তৃতীয়তঃ, এটাও হতে পারে যে, এখনো মৃত মাছ যা এমন মাছ বুখানো হয়েছে, যেটি বাহিরে কারণে মারা গেছে।
তুঁতীয় আলোচনায় চিংড়ি মাছ হালাল না হারাম?
শাফেঈ এবং মালিকীদের মতে তো এর হালাল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।
তবে হানাফীদের মতে এটা মাছ কিনা, বিষয়টি তার উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এ
বিষয়টি নিয়ে বিশেষতঃ ভারতীয় উলামায়ে কিছু মাঝে বিতর্ক রয়েছে। আল্লামা
দমীরী (রহ.) ‘হায়াতুল হাযাৎ’ নামক গ্রন্থে এটাকে এক প্রকার মাছ সাবান্ত
করেছেন। এ কারণে ভারতীয় কোন কোন আলিম এর হালাল হওয়ার প্রবন্ধ।
তাদের মধ্যে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও আছেন। তিনি ‘ইমদাদুল
ফতওয়া’তে এটা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ‘ফাতওয়া হাম্মাদিয়া’ গ্রন্থকার ও
অন্যান্য কোন কোন ফকহী এটাকে মৎস বলে অধিকার করেছেন। কেননা
প্রাণিবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট এ সম্পর্কে তাহকীক করা হলে, তাদের সবাই চিংড়ি
মাছ নয় বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাদের মতে, মাছ হল এরপূর্বে মেরদণ
বিশিষ্ট প্রাণী যেটি পানি ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না এবং এটি চোয়াল দিয়ে শুস
নেয়। এতে চিংড়ি প্রথম শর্ত দ্বারাই বাদ পড়ে যায়। কেননা চিংড়ির কোন মেরদণ
নেই। কোন কোন প্রাণী বিষয়বস্তু তা একে পোষক অন্তর্ভুক্ত প্রাণী বলে সাবান্ত
করেছেন। আর পোষা ভক্ষণ করা জায়েম নেই। অতএব, যে বিষয়ে হালাল-হারামের
প্রমাণদি বিপরীতমুখী সেখানে হারামেরই প্রাধান্য হবে। এজন্য এটা খাওয়া থেকে
পরহেয় করা উচিত।

সুতরাং যে, আল্লামা তাকী উসমানী অনেক পবেশনার পর সবরেশে সুচিত্তিত অভিমত
প্রকাশ করেন যে, চিংড়ি না খাওয়াই উত্তম। যেহেতু শরীয়তে উরফ বা প্রাচ্যর প্রথা
ধর্মী, আর আমাদের দেশেও যেহেতু সবাই এটাকে মাছ হিসেবে গণ্য করে, তাই
চিংড়ি খাওয়া হালাল। এতদঘনলের সর আলিমই তিন ইমামের সাথে ঐকতত্ত্ব পোষণ
করে থাকেন।

(ফতুল আলিম জ-3 স-5-14-511)

০. বাবু ফি ইস্পাহ ত্রুত্রু স-১৩

অধুর পরিপূর্ণতা

عن عِبَّدِ اللّهِ عِمْرُو اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَأَى قُومًا وَ أَعْقَابُهُمْ
تَلَوَّحُ فَقَالَ وَبِضَلَّ اللَّاِعِقَابُ مِنَ الدِّيَارِ أَسَيَّرَهُمُ الْوُضُوُءُ (بِعَجَارِي ج-১ স-৩৮) ১৫
বাবু চিঙ্গলার অফার থাকে, মস্তে জ-১৪ স-১৫ পাব ওব ওফ জর্জিয়ন, তোমস জ-১২ স-১২
বাবু চিঙ্গলার অফার থাকে, মস্তে নিসানি জ-১ স-১৩ পাব ওব ওফ জর্জিয়ন, আন মাঝে স-৩৬

অনুবাদঃ ... আবুলুলাহ ইবন আমর (রাও) হতে বর্ণিত। রাসূলুলাহ (সাহ) এমন এক
সম্প্রদায়ের পাঠক, যাদের পাখের পোশালি (পানি ভালভাবে না পোশার কারণে)
ঝাঁকছ করছে। তিনি বলনঃ এতে পায়ের গোড়ালি ওয়ালা তাদের জন্য দেখাচ্ছে শান্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে অমু কর।

বিশেষণঃ অমুর সময় উভয় পা ধৌত করা জরুরী নাকি মাসেহ করতে হবে, এ নিয়ে কিছুটা মতান্তরিকা রয়েছেঃ
* শিয়া সম্প্রদায়ের রাফিকীদের মধ্য হতে ফিরিকৃতে ইমামিয়ার মতে, অমুর সময় উভয় পা না ধৌতে বরং মাসেহ করা ফরম।

দলীল (১ঃ) আরাহ তাআলার বাণী-
যাইহে তাদুদ্রীর অন্য জন্য আই তুমি তুমি মাঝে মাঝে পালন কর।

অর্থাং, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নামাবে জন্য দৃষ্টান্ত হয়, তখন হীর মুক্তিপ্রলো ও উভয় হাত কনিষ্ঠ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং উভয় পা টাকস্নুষ। (মায়েরাহঃ ৬)

উক্ত আয়াতে তারা নামাবে শক্তি না হরফে বে দিয়ে পড়ে। তাদের যুক্তি হল, এই শক্তি পূর্বের শক্তি পূর্বের শক্তি এর উপর উপস্র এর উপর (সংযোজন) হয়েছে। অধিকতর, মাথা মাঝারি মাসেহ করা ফরম, অনুরূপ হুমুম পদ্ধতির কেন্দ্রেও প্রায়স্যা।

দলীল (২ঃ) আবু নুআমাই উবাদা ইবন তামিম সূত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন-
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على لحيته وزوجليه

(মজমু আল-জাত ১\\2, ২২৩, কনে আলম জঃ ৫ স্থান)

অর্থাং, তিনি বলেন, আমি রসূল-রাহিম (স) কে দেখেছি তিনি অমু করেছে এবং তাঁর দাড়ি ও উভয় পা মাসেহ করেছেন।

* আবু আলী জাবারীর (মুতায়িলা) ও ইমাম ইবন জারীর তাবারী (শিয়া)-এর মতে পদ্ধতি ধৌত করা কিংবা মাসেহ করা উভয়টি জায়ে আছে।

দলীলঃ আযাতে বর্ণিত শক্তি যেহেতু যব কিংবা পা উভয় কিরাতে পড়া জায়ে আছে। সুতরাং বৃদ্ধ যায় অমুকারী বেদেন একটির উপর অমুল করলেই হবে।

* আহলে যাহিতের মতে, মাসেহ করা এবং পা উভায়টি করতে হবে।
দলীলঃ যেহেতু অরজিল্কি শিক্ষিতে যবরমোগে এবং যেরমোগে উভয় কিরাইতে পড়া সুপ্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং যৌথ ও মাসেহ উভয়টি করলে কোন মতানীক্ষ থাকবে না।

* চার ইমামসহ জমহুর সাহাবা ও তাবেঈনের মতে, মোজা না থাকবে অযুর সময় উভয় পা যৌথ করা ফলবিত।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী, যা পুরৌর বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আয়াতে অরজিল্কি যবরমোগে পড়তে হবে। কেননা, এটি অতি একতার সংহপ্লোজন) হয়েছে ও আল্লাহ এর উপর। মুখ এবং উভয় হাত যৌথ করা যেমন ফলবিত, তেমনিভাবে পদময় যৌথ করাও ফলবিত।

দলীল (২)ঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (৩)ঃ নবি করিম (সা) পুরো নবওয়াত জীবনে মোজাবীহীন অবস্থায় পদময় না ধুয়ে মাসেহ করেছেন, এসমতি একসময়ে প্রমাণিত নেই। অতএব, পদময় মাসেহ করা যদি ফলবিত হত অথবা মাকরহের সাথে যদি জায়ে হত, তাহলে তারা কমপক্ষে একবার হলেও ইহার উপর আমল করে দেখিয়ে দিতেন। যেমন তারা অনেক মাকরহ বিষয় বৈধ বর্ণনার জন্য আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায়, পদময় মাসেহ করা ফলবিত তো দূরতের কথা, মাকরহের সাথেও জায়ে হয় না।

দলীল (৪)ঃ আবুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেন, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অযুরে মোজাবীহীন অবস্থায় পদময় যৌথ করা ফলবিত।

(درس مشكوّة ج) ص ১৬৩-১৬৪ (১৬৪)

জবাবঃ ফিরকারে ইমামিয়া ও অন্যান্যদের প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

(১) উক্ত আয়াতে অরজিল্কি (پرژوسک) এর মধ্যে যের দেয়া হয়েছে কাছাকাছি শের (پرژوسک) যের হওয়ার কারণে। অন্যায় অরজিল্কি (پرژোসক) এর অতুল হয়েছে ও অরজিল্কি (پরেজোসক) এর উপর।

(২) যের কিরাইতে মোজা পরিহিত অবশ্য প্রযোজনা, আর যবরের কিরাইতে প্রযোজনা সাধারণ অবহৃত।

(৩) প্রক্রিয়াক উহ ক্রিয়ার (محمود) কর্ম (محمود) হিসেবে যবর হয়েছে। আসল বাক্যটি ছিল- (محمود) (محمود): (محمود) বা (محمود) (محمود)

কিন্তু পাশাপাশি দুটি সম্পাদন করলে একটি আসল উা (حذف) হাজার এর পৃথক পৃথক তালকে একটি আসল উা (تول) রেখে এর তুলনে কে প্রথম মামূলের উপর অত্যন্ত করে তার ইরাব দেয়া যায়। আর এর ভিত্তিতেই এর উা (پرেজোসক) এর উপর অত্যন্ত করে অরজিল্কি (پرژোসক) পড়া জায়ে আছে।
(৪) আনোয়ার শাহ কাশীরী (রহ.) বলেন, কুরআনের বিবরণ বুঝার সবচেয়ে
নির্ভরযোগ্য পথ হল, রাসূলুল্লাহের (সা)-এর আমল। আর তাঁর থেকে মোজাবিহীন
অবস্থায় পদদণ্ড মাসেহ করেছেন এমন একটি রেওয়ায়েতও খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৫) চতুর্থ দিকের জবাব দিয়ে (১) হয়ত নবী করিম (সা) তখন মোজা পরিহিত ছিলেন।
তাঁহার মাসেহ করেছেন। (২) ইজমা ও মুতাওয়াতের হাদিসের বিরোধিতার
কারণ এই হাদিসটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। আর তা হল, এখানে মাসেহ শর্তটি
হলকা ধোয়ার সাথে সাথে ঘষা বা ডলা অর্থে প্রয়োজ্য। যার প্রমাণ হল, দাড়ি
সম্পর্কেও মাসেহ শর্ত ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব ইহার ধোয়ার অন্ত।
(৫) যে সমস্ত হাদিসে পা মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সমস্ত হাদিস রহিত
(মানসূক) হয়ে গেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অম্মত পা ধোয়াই যদি আল্লাহ তাআলার কাম্য
হয়, তাহলে উল্লিখিত আয়াতে বাকরিতে এমন অস্পষ্টতা রাখা হল কেন?
পাগুলাকে স্পষ্টভাবে ধোয়ার আওতায় কেন উল্লেখ করা হল না, যাতে কোনরকম
বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকটি ফায়দা ও হিকমত নিম্নে প্রদত্ত হল।
(১) একথা বিবেচনা যে, কোন কোন সময় পায়ের উপরেও মাসেহ কলার বিধান
রয়েছে। যেমন, মোজা পরা অবস্থায়। যদি এই শর্ত যেমনে কিরাআত পড়ার
অবকাশ না থাকত, তাহলে আয়াত দ্বারা সর্ববিষয়ক ধোয়াই সাব্যস্ত হত এবং মোজার
উপর মাসেহের রেওয়ায়েতগুলো এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হত। এ কিরাআতের
কারণ এই বৈপরীত্যের অবসান ঘটেছে।
(২) মাথা মাসেহের এবং পা ধোয়ার বিষয়টি কোন কোন হুকুমে যৌথ। যেমন, 
তায়াম্বুমে উভয়টি বাদ পড়ে যায়।
(৩) শর্তটিকে রোসুনকুলুমে-এর পরে উল্লেখ করে মাসনুন তারতীবের দিকে ইঙ্গিত
করা হয়েছে। অতএব, এর উল্টো তারতীবে এ ফায়দা অর্জিত হত না।
(৪) মাথা মাসেহ এবং পা ধোয়া এ দুটি বিষয়ের মাঝে সামঞ্জস্য হল, উভয়টি
শরীযুত প্রবর্তকের বিধি প্রবর্তনের কারণে জানা গেছে। অতচে চেহারার ও হাত ধোয়ার
বিধান অম্বুর পূর্বেও আরবদের নিকট ছিল। এ হিসেবেও এ দুটি বিষয়কে এক সাথে
উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল।
তাহাড়া আরও অনেক অজ্ঞাত হিকমত থাকতে পারে।

(دروس ترملي ج ۱ ص ۲۵۱-۲۵۷، درس مشكولة ج ص۱۶۴-۱۶۵)
বাবে নন্দিত্তে উপরের উপরে সব ১৩
অমুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা

... অন্বেষে সাধ্য বল কহল তাছাদে নাম হুমায়ুন তাছাদে নুর প্রেমায়।
বাবে নাম হুমায়ুন বল কহল তাছাদে নাম হুমায়ুন তাছাদে নুর প্রেমায়।

বিশ্বাসঘাতে অমুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্দর না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* আহলে যাহানি, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, অমুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। তবে, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, যদি কেউ জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তাহলে পুনরায় অমু করা ওয়াজিব। আর যদি তুলে ছেড়ে দেয় তাহলে অমু দোহাৰাৰো ওয়াজিব নয়।

দলীল: অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ধিত হাদিস।

* আবু হানিফা, মালিক, শাফেক রহ. ) ও জমুহরের মতে এবং ইমাম আহমদ রহ. ) এর এক উক্তি অনুযায়ী, অমুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা সুন্দর, ওয়াজিব নয়।

( হামাবি ১ সং ১৯৫ )

দলীল (১) আল্লাহু তাআলার বাণী -

যাহারা তাছাদে নাম হুমায়ুন তাছাদে নুর প্রেমায় তাছাদে নাম হুমায়ুন তাছাদে নুর প্রেমায়।

দলীল (২) আবু হুরায়ার মারফত বাণী -

উক্ত আযাতে অমুর ফরম হিসেবে শুধু চারটি অংশ কথা উল্লেখ রয়েছে বিসমিল্লাহর কথা উল্লেখ নেই।

দলীল (২) আবু হুরায়ার (রহ) থেকে মারফত হাদিস বর্ণিত -
ঔহাকামুল হাদিস

পরিত্রাতা অধ্যায়

মন তোং জ্ঞাত স্নান ঐলার উপাক ওজোনে কান্ত মুখ হোং হস্তে ওলান ওম তম যোগর

অর্থাৎ, যে অরুর সময় আল্লাহর নাম নিয়ে অবু করে, ইহা তার গোটা দেহের পরিত্রাতর কারণ হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আর যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে অরু করে, ইহা তার অরুর অধ-প্রত্যাঙ্গের পরিত্রাতর কারণ হবে।

উপরিন্তু হাদিস দ্বারা সম্পূর্ণ স্বীকৃত যায় যে, বিসিমিলাহ ছাড়াও অরু শক্ত হবে। যদিও বিসিমিলাহ বলা সুন্দরত।

দলীল (৩) অরু হুরায়ারা (রাঃ) থেকে আরো একটা মারফু হাদিস-

"কাল রসূল ঐলার স্বাত্ত্বিক ওলান উচ্চারণ ও আল্লাহর নাম বিষা অব্যাহারিক বিশ তা অবশ্যই হয় আল্লাহর হোং ক্ষতিক তার মহিমা বৃহদাকার হয় আল্লাহর অবস্থাত হয় ভুক্ত কিতন হয় হয়ে অবশ্যই হয় বিশ কিতন হয় হয়ে অবশ্যই হয় বিশ কিতন হয় হয়ে অবশ্যই হয়।"

(নাফি সাহিবী নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে অরু হুরায়ারা। তুমি যখন অরু কর, তখন বল বিসিমিলাহ, ওয়ালহামদুলিলাহ। কারণ তোমার রক্ষক ফেরেশতারা তোমার জন্য এই অরু থেকে (পুনরিত্র) অপরিণত হওয়ার পূর্ব পর্যায় নেকি লিখিত থাকবন। এ হাদিসটি বিসিমিলাহ সুন্দর হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। কেননা, এতে আল্লাহমদুলিলাহ বলারও নিদর্শ দেয়া হয়েছে। যা করার মত ওয়াজর নয়।

দলীল (৪) অনেক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর অরুর বিবর্ণ সুবিধার দিয়েছেন। তাতে কোথাও বিসিমিলাহ আলেঁচনা পাওয়া যায় না। যদি বিসিমিলাহ পাড়া ওয়াজর হত, তবে সেসব হাদিসে অব্যাহার এর আলেঁচনা করা হত।

জবাব (১) বিসিমিলাহ প্রমাণিত হয়েছে বর্ণ ওয়াহিদ দ্বারা। সুতরাং বিসিমিলাহকে যদি ওয়াজর মানা হয়, তাহলে ইহা কুরআনের উপর বৃদ্ধি করা হবে। যা জানিয়ে নয়। কেননা, কুরআনে ওখুর চারটি অবশ্যই উল্লেখ রয়েছে।

(২) উোহ হাদিসে নফী (না) দ্বারা নফী কামিল (অপূর্ণস্ত) উদ্দেশ্য। এর দ্বারা অবিধাতা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং হাদিসের মূল উদ্দেশ্য হল-

লা থুক্তে তালেবাতুর কেমিল এল ম থুক্তে ঐলার উচ্চারণ অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির অরু পরিপূর্ণ নয়, যে অরু বিসিমিলাহ বলে না। যেমন অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে-

লা থুক্তে জাবর ঐলার মুস্তাজ্জি এলা ফি মুস্তদি (দার ওল্তে জ ১ সো ৪২৪)

অর্থাৎ, মসজিদের প্রতিবেদীর নামায মসজিদ ছাডা হয় না। এখানেও নফী (না) দ্বারা নফী কামিল উদ্দেশ্য।
(৩) বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোন শক্তিশালী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়। স্বয়ং ইমাম তিরমিয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে-

লা أَعْلَمُ ِفِي هِذَا الْبَابِ حُدْيَةٌ لِّهِ إِسْتِفَادَ جَبَّيَدٍ (تَرْمِيِّدُ ۡجُرْجُرُ) ۚ (ص ۱۳)

অর্থাৎ, এই অনুচ্ছেদে উক্ত সনদ বিশিষ্ট কোন হাদিস সম্পর্কে আমার জানা নেই।

بابّ صفة وظُوءَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ص: ٤

নবী করিম (ص):-এর অযুর বর্ণনা

عنِّ حمْرَان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فافرع على يديه ثلاة فغسلهم.

ثمَّ تمضَّض واستنثر وغسل وجهه ثللاة وغسل يده اليمنى إلى المرافق ثللاة ثمّ اليسرى مثل ذلِك. ثمّ مسح رأسه ثمّ غسل قدمه اليمنى ثللاة ثمّ اليسرى مثل ذلِك. ثمّ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوءي هذا الخ

(بخاري ج ۱ ص ۲۷-۲۸، الباب الوصوئ ثلاثة تلائج/ ج ۲۲، باب مسح الرأس مرة، مسلم ج ۱ ص ۱۱۹)

باب صفة الوصوئ وكماله، نسائي ج ۱ ص ۳۱ باب حذ الغسل)

انواع الد: ... حمْرَان هذِه وقِيت. تَنَّ بَلَدْهِنَّ: آمَّنُبِنَبِنَبِينَفِنَفِنَفْ، (ص):-كَأَحْوَ وَلِدْه أنَّ دُوِّيّ حَذَرَوْرِ جَرَدِرِ، تَنَّ (لَلَّذِي مَثَلَّ) تَنَّ مَسَحْ رَاسِه ثُمَّ غَلِسْ قَدَمَهُ الْيَمِينِي ثللاة ثُمَّ الْيَسِئُرْي مَثَل ذلِك. ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُولُ اللَّهِ صلِّي الله عليه وسلم توضأ مثل وضوءي هذا الخ

ابن عدي: ٤٢١-٤٢٢، باب الوصوئ ثلاثة تلائج/ ج ۲۳، باب مسح الرأس مرة، مسلم ج ۱ ص ۱۱۹)

انواع الد: ... حمْرَان هذِه وقِيت. تَنَّ بَلَدْهِنَّ: آمَّنُبِنَبِنَبِينَفِنَفِنَفْ، (ص):-كَأَحْوَ وَلِدْه أنَّ دُوِّيّ حَذَرَوْرِ جَرَدِرِ، تَنَّ (لَلَّذِي مَثَلَّ) تَنَّ مَسَحْ رَاسِه ثُمَّ غَلِسْ قَدَمَهُ الْيَمِينِي ثللاة ثُمَّ الْيَسِئُرْي مَثَل ذلِك. ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُولُ اللَّهِ صلِّي الله عليه وسلم توضأ مثل وضوءي هذا الخ

ابن عدي: ٤٢١-٤٢٢، باب الوصوئ ثلاثة تلائج/ ج ۲۳، باب مسح الرأس مرة، مسلم ج ۱ ص ۱۱۹)

বিশ্লেষণে অযুর সময় মাথা তিনবার মাসেহ করা সুন্দর নাকি একবার, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেকী (রহ.):-এর মতে, অযুর সময় তিনবার মাথা মাসেহ করা সুন্দর।

ইমাম আহমদ (রহ.): থেকেও অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণিত আছে।

دِلْلُيّة: ۴:

عنِّ شَفِّيق بنِ سَلِمَة قالَ رأيت عثمان بن عفان غسل دِرْعَّةٍ ثُلُّثا٥

الذِّي مَثَلَّ...
ফ্রান্স রাসূল মুহাম্মদ ﷺ দেখা দিয়েছেন তিনি একটি বিষয়ে যে তিনি একটি ভূমিকা পালন করেছেন।

(ابو داوود ج 1 ص)

অর্থাৎ, ... শাকে ইবন সালামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবন আফ্যান (রা.)-কে অ্যায়র মধ্যে দুই হাতের কন্ধে সমেত তিনিবার করে ঘোষ করতে এবং তিনিবার মাথা মাসেহ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ص) এর করে একটি রূপ করতে দেখেছি।

উক্ত হাদিসে তিনিবার মাথা মাসেহ করা উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর, ইহা সম্ভব।

কিয়াসী দলীল: অযুর অন্যা অঙ্গসমূহ তিনিবার ঘোষ করা সম্ভব। আর মাথাতে অযুর অঙ্গসমূহের একটি অঙ্গ। সুতরাং ইহাও তিনিবার মাসেহ করা সম্ভব।

(درس مشكوكة ج 1 ص 163)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী ও আহমদ (রহ.)-এর এক উদ্ধত অনুযায়ী, মাথা ও শুধু একবার মাসেহ করা সম্ভব।

দলীল (১) অনুন্ধেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে নরী করীম (سা) এর অ্যায়র প্রতিটি খুলে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রতোকটি অঙ্গ তিনিবার ঘোষ করার কথাও উল্লেখ রয়েছে, যা সম্ভব। কিন্তু মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে তিনিবারের কথা উল্লেখ নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করাই সম্ভব, তিনিবার নয়।

দলীল (২) ২২ বর্দ্ধা না বি তিলার যাত্রা তিলার তিলার তিলার তিলার তিলার তিলার

(ابو داوود ج 1 ص)

আর্থাৎ, ... আবু রোহান ইবন আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আলী (রা) কে অ্যায় করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনিবার ঘোষ করেন এবং দুই হাতের কন্ধে সমেত তিনিবার ঘোষ করেন। অতঃপর তিনি একবার মাথা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ص) এইরূপে অ্যায় করতেন। (পূর্ববর্তী সূত্রসমূহ দ্বিতীয়)

দলীল (৩) ... এই বাক্যে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ দেখাদেখি নির্দেশ করেছেন তিনি নির্দেশ করেছেন।

(ابو داوود ج 1 ص 16)
অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল(সা)কে অমূল করতে দেখেন। তিনি (সা) অমূল সময় প্রতিটি অঙ্গ তিনিবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণপয়েন্ত একবার মাসেহ করেন।

উপরের বিবৃতি হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথা একবার মাসেহ করা সুন্দর।

কিয়াসী দলীলঃ মোজা ও পিটর উপর একবার মাসেহ করলে তা যথেষ্ট হবে। সুতরাং মাথা মাসেহও একবারই হওয়া উচিত।

জবাবঃ (১) শাফেইদের পক্ষে বর্ণিত হাদিসটি শায় (বিরল)। কারণ শুধু দু’একটি হাদিস ছাড়া উসমান (রা)-এর সকল রেওয়ায়েত শুধু একবার মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে। তাই যাঁদের ঈমাম আবু দাউদ (রহ.) শাফেইদ মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনিবার মাসেহ বিশিষ্ট রেওয়ায়েতটিকে এই বলে রদ করে দিয়েছেন যে—


(ব) দাওয়া ১ স৫

অর্থাৎ, হযরত উসমান (রা) হতে বর্ণিত সহীহ হাদিসসমূহে প্রমাণিত হয় যে, অমূল মধ্যে মাথা মাসেহ শুধু একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী অমূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গলী তিনিবার করে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় কেবল তখন মস্তু রুসী তথা ‘মাথা মাসেহ করেছেন’ উল্লেখিত আছে, কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। অর্থাং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে তিন-তিনিবারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

(২) ‘হিদাযা’ গ্রন্থকার বলেন, নতুন পানি দিয়ে যদি তিনিবার মাসেহ করা হয়, তাহলে ঈহা.আর মাসেহ রইল না; বরং অন্যান্য অঙ্গের মতই গোসল বা ধৌত হয়ে যাবে।

(৩) যদি মেনে নেয়া হয়, তিনিবার মাসেহ সংক্রান্ত হাদিসটিও বিশ্বাস, তবে তা বৈধতার (জায়েহ) জন্য প্রয়োজা, সুন্দর ছিলেন নয়।

(৪) আসলে হাদিসে তিনিবার মাথা মাসেহ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি ছিল পূর্ব মাথা মাসেহের একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ, মাথার সামনের অংশ, পিছনের অংশ এবং উভয় পার্শ্ব- এই তিন অঞ্চল নবী করিম (সা) হয়ত শিক্ষা দেন যাজ্ঞ আলাদা আলাদা তাবে মাসেহ করেছেন। আর এটিকেই রাবী তিনিবার বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

কিয়াসী দলীলের জবাবঃ শাফেইদের কিয়াসী দলীলটি সহীহ নয়। কেননা বোয়ার উপর মাসেহ-এর কিয়াস করা ছুদ্ধ নয়।
তাহাঁতে অন্যান্য অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হল, পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা- যা ফর্যাহ। বিন্দু একবারে পূর্ণ অঙ্গটি ধৌত করা অনেক ক্ষেত্রেই অসত্য বিধিয়া তিনবার ধূতে হয়, যা সুন্নত। পক্ষান্তরে, মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফর্যাহ নয় এবং প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো নয় ফর্যাহ নয়। এজন্য তিনবারেরও প্রায়োজন নেই। ফলে ইহা সুন্নতও নয়। (দীর্ঘ মশোকেজ, ১৬৩)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি শর্ত কিনা - এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতান্তর্কা রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) সহ জমহুরের মতে, মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া শর্ত। অতএব, কেউ যদি হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাসেহ করে, তবে তার অহে অহে হবে না।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অহে বিশিষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অহে বিশিষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অহে বিশিষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অহে বিশিষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অহে বিশিষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নত, তবে অহে বিশিষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত নয়।
পাগড়ির উপর মাসেহ করা

বলিয়াছিলেন: জায়ের নয়। শাকসী ও অন্যদের নিকট, কোন পানি অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বেই তা ব্যবহৃত পানি' হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর হানাফীদের মতে, পানি তত্ত্বক পর্যন্ত ব্যবহৃত সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

(দরের তৃতীয় প্রকাশ পত্রিকা সং ২৪২)

অনুবাদঃ ... সায়রাব্ব (রাঘ) হইতে বর্ণিত। একদা রাসূল সাইয় (শক্রিদের সাথে মুকাবিলার জন্য) একদিন সোনা প্রেরণ করেন। তারা ঠাণ্ডায় আক্রস্ত হন। অতঃপর তারা রাসূল সাইয় (সাঘ)-এর নিকেত ফিরে এলে তিনি (সাঘ) তাদেরকে পাগড়ি ও মোজার উপর মাসে করার আদেশ অনুমতি দেন।

বিশেষণঃ আমার ক্ষেত্রে মাথা মাসেহ না করে কেবল পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়ের কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাথা মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম আহমদ, আওয়াদি, দাউদ্র যাহেরী ও ইহাসাক (রহ) -এর মতে, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়ের। আর এতেই অযু শুদ্ধ হয়ে যাবে।

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (৩) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।
কিরামী দলীলঃ পায়ে মোজা পরিধানের ফলে মোজার উপর মাসেহ করা যেমন জায়েম, তেমনিয়াতে মাথার উপর পাগড়ি থাকলে এর উপরও মাসেহ করা জায়েম।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, শাবি ও ইবরাহীম (রহ.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েম নয়।

দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাগীনী

বাংলা যাচ্ছেঃ প্রতি স্কম-

অর্থাৎ, তোমাদের মাথা মাসেহ কর। (মায়েদাঃ ৬)

উক্ত আয়াতে মাথা মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। পাগড়ি মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়নি।

দলীল (২)ঃ মাথা মাসেহ করার হাদিসসমূহ মুতাওয়াতির এবং অসংখ্য।

কিরামী দলীলঃ পবিত্র কুরআনে যে তায়ামুমের জন্য মুখ ও হাত মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে যদি মুখ ও হাতের উপর কোন প্রকার কাপড় থাকে, তাহলে এই মাসেহ আদায় হবে না। এর মূল কারণ হল মাথাখানে কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা। আর এক্ষেত্রেও পাগড়ি হল মাথার জন্য প্রতিবন্ধকতা। অতএব, পাগড়ির উপর মাসেহ করলে, তা শুদ্ধ হবে না।

জবাবঃ (১) পাগড়ির উপর মাসেহ করার হাদিসগুলো খবরে ওয়াহিদ এবং সংখ্যায় খুবই কম। যা দ্বারা কিতাবুলাহ ও মাথা মাসেহ সংক্রান্ত অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদিসের বিদান খবর করা যায় না।

(২) আল্লাহ হাফিজ যায়লাই (রহ.) বলেন, যেসব রেওয়ায়েতে পাগড়ির উপর মাসেহ করার আলোচনা রয়েছে, সেগুলো সংক্ষিপ্ত। যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে।

যেমন মূলে ছিল সন্ধির তালিকা ও উপবন্ধী

অর্থাৎ, তিনি তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগ ও তাঁর পাগড়ি মাসেহ করেছেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে-

... ইন্ত কিনা মা কালা রাইমন রয়েল ইল্লা সুলাম ইল্লা উল্লা সুলাম সুলাম সুলাম 

ফুস্স পাকার ও তুট্টি ও তুট্টি ও তুট্টি

(২) আল্লাহ হাফিজ যায়লাই (রহ.)

অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাও) কে একটি কিতাব পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় অরু করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করেন, কিন্তু পাগড়ি খুলেননি।
বিশ্বেষণঃ মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

* খারেজী ও রাফেজীদের মতে, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েষ নয়।

দলীলঃ আল্লাহ তালালার বাণী-

বলেনা আঃ মস্জিদ ৩০ চৌঁ। ৭৩ (বৃত্ত মহেদ ৩৫)

অথৰ্তি, আমরা জানতে পারা যে, পাগড়ীর উপর মাসেহের আমল প্রথমে ছিল, পরবর্তীতে তা পরিহার করা হয়েছে।

আবুল হায় লাখনী (রহ.) লিখেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর উক্তিটি দ্বারা পাগড়ীর উপর মাসেহের বিষয়টির এইভাবে চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায় যে, এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে।

(দৃষ্ট তম্রদি ১ চৌঁ ৩৩৮-৩৩৯, এলাহের সন ১ চৌঁ ২৭)

বিশ্বেষণঃ মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ কিনা, এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।
অষ্টাদশ হাদিস

অর্থাৎ, যে মুঘলের হাসিয়া তাদের সময়ের সময়ে দাড়াও, তখন ব্যাপক মুখ্যমন্ত্রী ও হাতেমুহূর কল্যাণসহ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর ও পদ্যাঞ্জলি ঠাকুন সহ ধৌত কর। (মায়েদাহ ৬)

উক্ত আয়াতে মূলের পদ্যাঞ্জলিকে ধৌত করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুন্তরাং মাসেহ করা জায়েষ্ট নয়।

* চার ইমামসহ সকল ফরীহর মতে, (চামড়ার) মোজাজ উপর মাসেহ করা জায়েষ্ট আছে।

দলীল (১) অনুসারে হাদিসের গুরুত্ব বর্তমান হাদিস।

দলীল (২) আবু বিন উমরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে: যে ইমাম তাদের সাথে যে নিয়মটি আন্দোলন করেছিল তিনি তাদের মাথা মাসেহ করেছিলেন।

দলীল (৩) আবু বাদর আহমদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে: যে ইমাম তাদের সাথে যে নিয়মটি আন্দোলন করেছিল তিনি তাদের মাথা মাসেহ করেছিলেন。

অর্থাৎ, ... আবু বাদর আহমদ আবু বাদর সাহেদি (রা) হতে বর্ণিত। একদা হারম জারীর (রা) পেশাবরের পর অনুমান করা সময়ে মোজাজ মাসেহ করেন এবং বলেন, (মোজাজ উপর) আমাকে মাসেহ করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা, আমি রসূল (সা)কে উদ্যোগ এবং মাসেহ করতে দেখেছি। উপস্থিত ফালকেরা বলেন, এটা সূরা মায়েদাহ নামিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মায়েদাহ নামিল হওয়ার পরই ইসলামে দীক্ষিত হই।

ইমাম মোজাজ উপর যে মাসেহ করা জায়েষ্ট, এর উপর ইমাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যেমন হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-

* ইমাম আবু হাসান বসরি (রহ.) বলেন-
বাবু তোতোচিত ফি মস্ঝ স ২১ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

(ফতে ইসলাম ১ স ১৩২, বিলিয়া জ ১ স ৮১)

بَابُ التَّوَقِيْتِ فِي الْمُسْحِ ص ٢١
মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

(ফতে ইসলাম ১ স ১৩২, বিলিয়া জ ১ স ৮১)

بَابُ التَّوَقِيْتِ فِي الْمُسْحِ ص ٢١
মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

* বাবু তোতোচিত ফি মস্ঝ স ২১ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

(ফতে ইসলাম ১ স ১৩২, বিলিয়া জ ১ স ৮১)
অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন।

বিশেষণঃ চামড়ার মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা করদিন, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।
* ইমাম মালিক, হাসান বসরী ও লাইছ ইবন সাদ (রহ.)-এর মতে, মাসেহের কোন সুন্নিদিক্ত সময়সীমা নেই; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর মাসেহ করতে পারবে। মুসাফির হোক কিংবা মুকীম।

(টিপিয়ে চেন্দে জ ১ সংখ্যা ২৪৪)

দলীল (১) অনুমানের গুরুত্ব বর্ধিত হাদিস। হাদীসটির শোষাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন দিনের বেশি মাসেহ করা জায়গায় আছে। অর্থাৎ, একই মাসেহ দ্বারা তিন দিনেরও অধিককাল নামায় পড়া জায়গা।

দলীল (২) আল্লাহ তাঁর তুলনামূলক উপাদান কর্তা যাঁই তাঁর জন্য স্নেহের সম্প্রতি করে আল্লাহ তাঁকে আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী। আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে আল্লাহ তাঁর সাথে তাঁকে

নুম্ম মা যাদাক - (আবু দাউল জ ১ সংখ্যা ২১, বিং মাহা সংখ্যা ২৪)

অর্থাৎ, ... উরাই ইবন উমরা (রা) হতে বর্ধিত। ইয়াহইয়া ইবন আইউব বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায় পড়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? তিনি বলেন, হী। রাবী তাকে এক, দুই ও তিন দিন পর্যন্ত মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে ইহার অনুমতি দিয়ে বলেন, তুমি যতদিনের জন্য ইচ্ছা কর। ... অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাতদিন পর্যন্ত পোঁছান। জবাবে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন হী; যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর।

উক্ত রেওয়ায়েতের সময় অনিদিষ্ট থাকার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট।

কিয়াসী দলীলঃ মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে মেহেতু কোন সময়সীমা নেই; তাই মোজা মাসেহের ক্ষেত্রেও সময়সীমা না থাকা উচিত।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, সাহেবাইন, আওয়াঈ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মুকীম একদিন একরাত মাসেহ করবে, আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত।
দলীল

... এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সাহ) মাসালা জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বললেন, আমু মুহাম্মদ (রা)-এর কাছে এলাম মোহাম্মদ উপর মাসে করার মাসালা জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বললেন, আবু তালিবের পুত্র (আলি রা)-এর কাছে গিয়ে এ মাসালা জিজ্ঞেস করে। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাহ)-এর সাথে সফর করতেন। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) মুসাফিরের জন্য তিনি দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকুমের জন্য এক দিন এক রাত।

দলীল

(২) অর্থাৎ, সাফওয়ান ইবন আব্দাল (রা)-এর ছবিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন মুসাফির হতাম তখন যেন সোসাল ফরয হওয়া ব্যতীত আমাদের মোজাকালা তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত না মিলি।

(৩) অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্তিত হাদিস।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ হাদিসে বর্তিত (আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময় চাইতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন) এই অতিরিক্ত অংশকু সমী বৃহ নয়। আলামা মায়লাস ও আলামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ) এটিকে দুর্বল সাব্য করেছেন।

(২) কেউ কেউ বলেন, এটা হযরত খুয়াইমা (রা)-এর নিজস্ব ধারণা, যা শরের মতে প্রমাণ নয়।

(৩) কতিপয় আলিম বলেন, এটি প্রথম দিকের ঘটনা। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। (দৃস তুম্রী জ-১ স ম ২২২)

(৪) যদি এই অতিরিক্ত অংশটি প্রমাণিত হয়, তবে এ রাক্ষা দ্বারা সময়ের অনিয়ন্ত্রিত প্রমাণিত হবে না। কেননা, রাক্ষাধিকার বলা হয়েছে, যদি আমরা নবী করীম (সাহ)-এর নিকট সময় আরো বেশি চাইতাম তাহলে তিনি আরো সময়
বড়ভিত্তির দিতেন; যেহেতু আরও অধিক সময় চাওয়া হয়নি, এজন্য সময় সৃষ্টিও করা হয়নি। (নব আল বরায় ১ ص ১৭৯)

দ্বিতীয় দফারের জবাবঃ (১) উক্ত হাদিসটি সন্দেহভাবে দুর্বল। যাঁছ আরু দৌদ (রহ,) হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন-

وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِيِ إِسْتَدَادِهِ وَلَيْسَ هُوُ یَتَفَوَّقُ - (ابো দাউদ ১ ص ২১)

অর্থাৎ, এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে। এটি শক্তিশালী নয়।

অতএব, এমন একটি দুর্বল হাদিস দ্বারা মূতাত্যাতির হাদিস বর্ণনা করা উচিত নয়।

(২) অথবা, নবী করিম (সাঃ)-এর বাণী- (হাঁ, তুমি যতদিনের জন্য ইচ্ছা কর। হাঁ, যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর)-এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল, সফর অবস্থায় তিন দিন তিনিদিন করে এবং মুক্তিমূল অবস্থায় একদিন একদিন করে যতদিন ইচ্ছা শরীর নিয়মানুযায়ী মাসেহ কর।

(৩) অথবা, প্রথম দিকে মাসেহের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

কিয়াসী দফারের জবাবঃ (১) কোন বিষয়ে কিয়াস তো তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কোন বর্ণনা না পাওয়া যায়। কিন্তু মোজামাসেহের ক্ষেত্রে তো একাধিক সর্বীহ হাদিস বর্ণিত আছে। সুতরাং সর্বীহ হাদিসসমূহের মুক্তিমূল কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) তাছাড়া কিয়াসটি সুদৃশ মাত্র। কেননা, মাধ্যম মাসেহ করা এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফরয়, যার বিকল্প অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আর মোজার উপর মাসেহ করা এটি পাওয়া করার পরিবর্তে একটি বিকল্প পদ্ধতি। সুতরাং উদ্ধৃতির ব্যতিক্রম হবে, এটিই যুক্তিসঙ্গত।

বাবার কিয়াস মাসেহ করার পদ্ধতি

... অন্বেষণ বিশেষ ফলে যোগের দিন বলে নানা আকারগুলো আছে, যেগুলো তাদের স্তরে রয়েছ এবং তাদের দিকের আল্লাহ বচন দিয়েছেন যাতে তাদের যেমন আল্লাহ তাআলা।

বিয়েদারের বিজ্ঞাপনের উপর নির্বাচন হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ না করে নিম্নাংশে মাসেহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী হযরত আলী (রাবঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাহেব (সাঃ)-কে মোজার উপরের অংশে মাসেহ করতে দেখেছিলেন।

রাসূল সাহেব (সাঃ)
বিশেষণঃ মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে হবে, নাকি নিম্নভাগ- এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, ইসহাক, যুহরী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, মোজারের উপর ও নিচে উভয়দিকে মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, উভয়দিকে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, উপরের অংশে মাসেহ করা ওয়াজিব, আর নিচের অংশে মাসেহ করা সুন্নত বা মুমতাহাব।

দলীল ৪

... উন স্বরূপে বললেন প্রথমে তাদের ছাপে স্বীকারেন আল্লাহ তাঁর নাম, অবশেষে তাঁর নাম

zysta ৫

গুণীতা তোলে ফসাহ অভিনেতাদের দেখায় আল্লাহ। (তরীব বিশ্বাস, তন্মধ্যে আই সে বাবাতের প্রথম সুতোতে, এবং মাহে চতুর্থ সংখ্যাঃ ৩২, তরীব বিশ্বাস, তন্মধ্যে আই সে বাবাতের প্রথম সুতোতে, এবং মাহে চতুর্থ সংখ্যাঃ ৩২)

অর্থাৎ, ... যুহরীরা ইবন শোরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুথে নবী করীম (সা) কে অর্থাৎ করিয়েছি। তখন তিনি মোজার উপরের ও নিচের অংশ (উভয়ই) মাসেহ করেন।

* ইমাম আবু হানিফা, আহ্মদ ও সুফিয়া সাওরী (রহ.)-এর মতে, মোজার ও উপরের অংশ মাসেহ করা আবশ্যক। নিচের অংশ মাসেহ করা বিধানসমূহত নয়।

দলীল (১) অনুমতির শুধুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২)

... উন স্বরূপে বললেন প্রথমে তাদের ছাপে স্বীকারেন আল্লাহ তাঁর নাম, অবশেষে তাঁর নাম

yasas ৫

অর্থাৎ, ... যুহরীরা ইবন শোরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে দেখেছি, তিনি মোজার উপরের দিকে মাসেহ করেছেন।

জবাবঃ (১) উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর ব্যাখ্যা আবু দাউদ (রহ.) হাদিসটি দুর্বল (ঈকিফ) সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন-

* অর্থাৎ, আমার নিকট (এ কথাতে) পোষ্টে যে, সাওর এই হাদিসটি রাজা (মানব ব্যক্তি) থেকে শোনেনি।

(২) ইমাম তিরমিয়া (রহ.) হাদিসটিকে তাকিয়েকুল (মালুল) বলেছেন।

(৩) হাদিসের সন্দেহ রাজি ওলিদ মুলামিস।

অতএব ঈকিফ, মালুল ও মুলামিস রাজি বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রদত্ত দলীল প্রায়োগিক নয়।

(৪) সর্বোপরি বলা যায়, যদি এটাকে প্রামাণ্যতা মনেও নেয়া হয়, তখন এর উত্তর হল, হয়ত নবী করীম (সা) মোজার নিচের অংশ ধরে ও উপরের অংশে মাসেহ করেছেন। আর নিচের অংশে ধরাকে রাজি মাসেহ মনে করেছেন।
বিশেষণঃ মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া অমু ভঙ্গের (নাপাক প্রস্তুত) কারণ কিনা—
এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবৈষম্য রয়েচে।
* ইমাম মালিক, শাফেইদী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, মহিলাকে স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া অমু ভঙ্গের কারণ। তবে ইমামগণ এতে কিছুটা শর্তারোপ করেছেন।
** ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তিনি শর্তের সাথে তা অমু ভঙ্গের কারণ—
(১) মহিলা বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।
(২) গায়রে মাহরাম (যাদেরকে বিয়ে করা হারাম নয় এমন) মহিলা হতে হবে।
(৩) শাহওয়াত বা কামনার সাথে স্পর্শ করতে হবে।

শাফেইদীদের নিকট ওধু একটি শর্ত, তা হচ্ছে স্পর্শ আবরণহীনভাবে হলে। অতএব আবরণহীনভাবে কোন ছটি কিংবা বড় মেয়ে, মাহরাম কিংবা গায়রে মাহরাম, কামনার সাথে কিংবা কামনা ছাড়া হোক, স্পর্শ করলেই তা অমু ভঙ্গের কারণ হবে। এমন কি কোন কোন শাফেইদ মতাবলম্বী বলেন, যদি কেউ মহিলাকে চূড়া-থাপড়া দেয় অথবা তার জখের চিকিৎসা করে, তবেও তার অমু ভঙ্গে যাবে।

(বদলে মহেরাজ ১:১০৭)

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী—
(১) ও লস্তাম দেবী কোটেন মাতো কিসুমত সুন্দীর তুর্ডিত বেনাশ্বা দাদাতে।
অর্থাৎ, ... অথবা তোমরা যদি নারী স্পর্শ (সমন) করে থাক, কিন্তু পরে পানি না পাও, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্বুম করে নাও। (নিসাম ৪৩)

এটা আর্তের প্রকাশবদ্ধ হয়েছে, যার অর্থ- হাত দ্বারা স্পর্শ করা। আর আয়াতে নারী স্পর্শ করার পর পানি না পেলে মাটি দিয়ে তায়াম্বুম করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, বুঝা যায় যে, নারী স্পর্শ বা চুমু অমু ভঙ্গের কারণ।
* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী ও যুকার (রহ.)-এর মতে, মহিলা স্পর্শ করা বা চুয়া খাওয়া সাধারণভাবে অযুক্ত ভঙ্গের কারণ নয়।

(হকাম পরিসর ছোট জে ২ পৃষ্ঠায়, নতুন নকল ১৩৪)

দলীল (১) অনুসারে গুরুত্ব দিলীল।

দলীল (২) হযরত আরিশা (রাহ) থেকে বর্ণিত -

... লাদি রাখিত রসূল মস্তি লার এবং শুল্লার য়িতি যাতা মুহতার ময়লা স্ন্তোষ গেড়া। 

আরাদ আরাদ ধুমি প্রতি দিয়ে তাঁর যে কি স্তরসূত্র তাঁর যে তাঁর যে তাঁর মসজিদ তাঁর যে তাঁর মসজিদ তাঁর মসজিদ তাঁর মসজিদ 

সত্র মসজিদকে নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। 

সত্র মসজিদকে নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। নির্দেশ করে। অর্থাৎ, আবু রাসূলুল্লাহ (সাহ) কে এবং অবশ্য নামায় পড়তে দেবে যে, আবু রাসূলুল্লাহ (সাহ) কে এবং অবশ্য নামায় পড়তে দেবে যে, আবু রাসূলুল্লাহ (সাহ) কে এবং অবশ্য নামায় পড়তে দেবে যে, 

দলীল (৩) উদাহরণ দিয়ে বর্ণিত - তিনি রাখা এবং না রাখা বলতে যাতা মসজিদ তাঁর মসজিদ তাঁর মসজিদ তাঁর মসজিদ তাঁর মসজিদ 

দলীল (৩) উদাহরণ দিয়ে বর্ণিত - তিনি রাখা এবং না রাখা বলতে তিনি রাখা এবং না রাখা বলতে তিনি রাখা এবং না রাখা বলতে 

রকুন ও সজ্জন নমাজ) ১ পৃষ্ঠায়, নতুন নকল ১ ৩৮ পৃষ্ঠা ও নয়।

জবাবঃ (১) মুফাস্সিরকুল শিরোমানি হযরত আবু ইবন আব্বাস (রাহ) উক্ত আরাতে বর্ণিত হয় যে, মহিলা স্পর্শ অযুক্ত ভঙ্গের কারণ নয়। যদি স্পর্শ অযূক্ত ভঙ্গের কারণ হত, তাহলে আরিশা (রাহ)-এর স্পর্শের কারণে নবী করিম (সাহ) নামায় ছেড়ে দিতেন।

জবাবঃ (১) মুফাস্সিরকুল শিরোমানি হযরত আবু ইবন আব্বাস (রাহ) উক্ত আরাতে বর্ণিত হয় যে, মহিলা স্পর্শ অযুক্ত ভঙ্গের কারণ নয়। যদি স্পর্শ অযুক্ত ভঙ্গের কারণ হত, তাহলে আরিশা (রাহ)-এর স্পর্শের কারণে নবী করিম (সাহ) নামায় ছেড়ে দিতেন।
উদেশ্য হল স্পর্শ করা, সহবাস নয়। কিন্তু একথা দিবালোকের নায় সুস্পষ্ট যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে ইবন আকাবাস (রাঃ)-এর তাফসীর অধিক নির্ভরযোগ্য। যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন।

(২) যখন মস (স্পর্শ, হোয়া, পরশ, সংস্পর্শ)-এর নসিব মহিলার দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হবে সহবাস। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী -

৬৫: অর্থাৎ, যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দাও।...

(বাকারাঃ ২৩৭)

উক্ত আয়াতে সর্বসম্মতিক্রমে মস সহবাস উদেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদেশ্য নয়।

(টনোমিজ ১০ সং ১৩৫)

(৩) তাহাড়া, কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রদত্ত দলিলে একটি বাপ মাত্র যে থেকে এসেছে, যা কিয়ারাফ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে অস্বতন্ত্র দুরূহায়। আর এই অস্বতন্ত্র সহবাস ও কী মিলেই হতে পারে।

(দ্বৃত্তোচ্চরিত ১৪৪ সং ১ ১০ সং ১১)

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে অথ

বাবু দ্বিধারে মস্তঞ্চ করা সহবাসে এই করণের অথ

- গুরুত্বপূর্ণ ত্রালৌকিকতা উপর রাখা প্রত্যেক মস্তঞ্চ করণের প্রকৃতি মানে মোটামুটি উপর রাখা প্রত্যেক মস্তঞ্চ করণের প্রকৃতি মানে মোটামুটি

ফলে মস্তঞ্চ করণের একটি আসলে সমৃদ্ধ রোধের সাধনা তেমনি মস্তঞ্চ করণের একটি আসলে সমৃদ্ধ রোধের সাধনা তেমনি

স্বপ্ন সমৃদ্ধ রোধের সাধনাও তেমনি মস্তঞ্চ করণের একটি আসলে সমৃদ্ধ রোধের সাধনা তেমনি

ফলে মস্তঞ্চ করণের একটি আসলে সমৃদ্ধ রোধের সাধনা তেমনি

চোখ হানাফী সমৃদ্ধ রোধের সাধনাও তেমনি মস্তঞ্চ করণের একটি আসলে সমৃদ্ধ রোধের সাধনা তেমনি

চোখ হানাফী সমৃদ্ধ রোধের সাধনাও তেমনি

বাবু দ্বিধারে মস্তঞ্চ করা সহবাসে এই করণের অথ

(তরুণী ১ সং ১৪৫ বাবু দ্বিধারে মস্তঞ্চ করা সহবাসে এই করণের অথ ৩২৮ বাবু দ্বিধারে মস্তঞ্চ করা সহবাসে এই করণের অথ)

অনুবাদঃ ... উরওয়া (রহ,) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে অথ করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তা কি রূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনত
সাক্ষাৎকার (রাঙ্গুন্ত) আমাকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাৰ্মতা)ভেদতে গুনেন, যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন অবশেষকে অত্যন্ত করে নেয়।

বিশ্লেষণঃ পুরুষাঙ্গ বা নিজের লজ্জাহীন স্পর্শ করা অত্যন্তকে করণ কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে এখানে ফরায়েছে।

* ইমাম শাফেইয়া ও আহমদ ইবন হামলের মতে এবং মালিক (রহ.)-এর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অত্যন্ত ভ্রেন্দা হয়ে। ইসহাক, আওয়াই, যুহীরী ও মুসাহিদ (রহ.)-এর অভিমত মুহূর্ত অনুরূপ। তবে এ ব্যাপারে তিন ইমামের মাঝে কিছুটা এখানে ফরেছে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শে অত্যন্তকে তিনটি শর্ত রয়েছে—

(ক) হাতের তালু দ্বারা স্পর্শ করা, (খ) কোন পার্দা ছাড়া সরাসরি স্পর্শ করা, (গ) হাদ বা উপাদানের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ নিষেধ করে অত্যন্ত ভঙ্গকারী।

ইমাম শাফেইয়া (রহ.) বলেন, যদি খোলা হাতের তালুতে লজ্জাহীন স্পর্শ করে তবে তা অত্যন্ত ভঙ্গকারী হবে। তাঁর মতে, মহিলাদের লজ্জাহীন স্পর্শ করার হুমকি ও তাই।

ইমাম শাফেইয়া (রহ.) ‘কিতাবুল উম্মে’-এ সপ্তো ভাষায় লিখেছেন যে, পায়েন্থপ স্পর্শ করানো অত্যন্তকে করণ।

তিন ইমামের দলিলঃ অনুভূতদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাহধ, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখী ও হাসান বদরী (রহ.)-এর মতে, পুরুষাঙ্গ, মহিলার লজ্জাহীন ও পায়েন্থপ স্পর্শ করা অত্যন্ত ভঙ্গকারী হয়। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত ও তাই।

দলিলঃ

... দুইরা দুইরা হাদ দুইরা হাদ, চারিরা চারিরা হাদ, বাঁচিরা বাঁচিরা হাদ।

যখন হাদ ফেলে বাজে বাজে ফেলে, তখন হাদ ফেলে বাজে বাজে ফেলে।

এর মতে যে হাদ ফেলে বাজে বাজে ফেলে, তার হাদ ফেলে বাজে বাজে ফেলে।

মাত্র আগাম বাজে বাজে ফেলে বাজে বাজে ফেলে।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাহধ, ইবন মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখী ও হাসান বদরী (রহ.)-এর মতে, পুরুষাঙ্গ, মহিলার লজ্জাহীন ও পায়েন্থপ স্পর্শ করা অত্যন্ত ভঙ্গকারী হয়।

অর্থাৎ, ... কায়েস ইবন তাস্ক থেকে তাঁর পিতার সূত্র বর্ণিত। একদা আমরা নবী

করীম (সাৰ্মতা)-এর নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রামী লোক

আগমন করে মহানবী (সাৰ্মতা)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর নবী! অত্যন্ত করবে তবে?

যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?
রাসূলুল্লাহ (صلى الله ﷺ আله وسلم) বললেন, পুরুষের তা তার দেহের গোষ্ঠের একটি টুকরা যা খণ্ড বাঁচিত ছিল না।

উক্ত হাদিসে একথা বুঝানো হয়েছে যে, অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করার কারণে জীবন অমৃত নষ্ট হয় না, অন্য পুরুষের শরীরের অন্যান্য অঙ্গের নায় একটি অঙ্গ মাত্র।

তাই এটিকে স্পর্শ করলে অনু ভঙ্গ হবে না।

d) হযরত ইবন আবাস, ইবন মাসউদ, হুযায়ফা ও আলী (রা)-এর আহার। তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে বললেন-

মার্জাল্য ন্নিরী মসনেন্ত ফিরি সলুতো ও ডানি অন্ফিয়ি (طهاره ج ص ৪

দলীল (৩) গেলোন মন সুন্দর না সুন্দর সুন্দর সুন্দর না সুন্দর সুন্দর না (مجمع الزوائده ج ص ২৪)

(গ্রেটার নিয়মণ ও উল্লম্ব মূল অঙ্গ স্পর্শ করার, তা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই।

দলীল (৩) দলীল দলীল দলীল দলীল দলীল দলীল (مجمع الزوائده ج ص ২৪)

যে বসারা প্রেরিত সুস্ফাত মান সুস্ফাত মান সুস্ফাত মান সুস্ফাত মান (مجمع الزوائده ج ص ২৪)

(একটি অঙ্গকে অঙ্গকে অঙ্গকে অঙ্গকে অঙ্গকে অঙ্গকে অঙ্গকে)

(তালুকের হাদিসে অক্ষরী প্রণয়নযায়।)

(২) বুরুজর হাদিসে মারুজান নামক এক রায়ী রয়েছেন। যিনি খলীফা হওয়ার পূর্বে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু খলীফা হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে তিনি অনির্ভরযোগ্য হয়ে যান। তাছাড়া, তিনি বুরুজর নিকট এক পুলিশ পাঠায়ে উত্তর হাদিসে জেনে নেন।

(৩) তালুকের হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম তিমুরিয় (রহ.) বললেন-
পাবেন পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অযু না করা

... উন বিগ্রহে আন রসূল আলী মেলাতে ভাগ করেন এবং আলী সন্ত আলাদা হতে বর্তমান। একদা রাসূল সাই বকরীর রান খাওয়ার পর অযু না করেই নামায আদায় করেন।

বিশেষণে: আঙ্গন পাকানো জিনিস খেলে অযু ভেঙে যাবে কিনা তথা অযু করা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে প্রথম দিকে সাহাবায় কিরামের মাঝে মতানৈক্য ছিল।

* হযরত আবু হুরায়রা, আমুলুল্লাহ ইবন উমর ও যাব্দেদ বিন সাবিত (রাণী)-এর মতে, আঙ্গন পাকানো কোন বস্তু খেলে অযু ভেঙে যাবে। তাই নামায আদায়ের জন্য নতুন করে অযু করা ওয়াজিব।

দলীল

"আমি হরিতা বললাম রসূল বিন অলী আলী সন্ত আলাদা হতে বর্তমান।" (৫)

"আন্দোলন হতার" (আবু দাউদ জ ২৬ বাব তিনীর, মোস্মানি জ ১৮, তরমীর জ ১৪৭, মোস্মানি)
অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, রহমকৃত দ্ব্যাদি আহার করলে অসু করতে হবে।

দলীল (২) হযরত আরিশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

অর্থাৎ, আগে রামা করা খাদ্য আহারের পর তেমন অসু কর। (সূত্রঃ ঐ)

উল্লিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে অসু করা ওয়াজিব।

* খোলাফায় রাশিদা, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, জাবির, আলাস (রাঃ) ও চার ইমামসহ জমুর সাহাবা-তাবেদীনের মতে, আগে পাকানো বন্ধ থেকে অসু ভাঙ্গে না।

দলীল (১) অনুসারে দুর্নীতি বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) কাল কাল পূর্বে আগ্নেয় বুলের দিনে মিনু-কন্তীফ (রাঃ)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাঃ) তাঁর সামনের দাঁত দিয়ে (কর্করি) ঘাড়ের গোষ্ঠ খান। অতঃপর তিনি অসু না করেই নামায় পড়েন।

দলীল (৩) জাহির কালে অন্য অন্য মানুষের মুখে রাসূল উচিত। (রাঃ)

অর্থাৎ, ..জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'টি কাজের সর্বশেষ কাজ এই ছিল যে, তিনি রামা করা খাদ্য আহারের পর অসু করেননি।

উপরোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা এবং আরো অন্যান্য অনেক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক্ষেত্রে অসু ভাঙ্গে না। তাই অসু করা ওয়াজিব নয়।

জবাব (১) আগে পাকানো জিনিস থেকে অসু করতে হবে, এর হুকুম যদি থেকেও থাকে, তবে তা বহিত হয় গেছে। এর দলীল হল, উপরে বর্ণিত হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদিস।

(২) হাদিসে বর্ণিত অসু দ্বারা শরীর বা পারিভাষিক অসু উদেশ্য নয়, অভিধানিক অসু উদেশ্য। অর্থাৎ, খাওয়ার পর খাত-মুখ হৃদি করা। যেমন ইকবাল ইবন যুসীব (রাঃ)-এর দাওয়াত সংক্রান্ত এক হাদিসে বর্ণিত আছে-
বাংলা ভাষায় পাঠানো হয়েছে।
বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

বিশ্বাসঘরের থেকে রক্ত বের হওয়া অমু ভঙ্গের কারণ কিনা- এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেঈ, রবীআ ও মাককুল (রহ.)-এর মতে, পেশাবর-পায়খানার রাজা ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে অযুভাঙ্গ না।

দলীল (১): অনুমানের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসের শেষের দিকে বর্ণিত আছে যে, আনসারী সাহাবী (আব্বাব ইবন বিশর রা.)-কে পরপর তিনটি তীর্থ দ্বারা রক্তাক্ত করার পরেও তিনি রক্তু-সিজদা করেছেন। আর রক্ত বের হওয়াতে যদি অযু ভেঙ্গেই যেত, তাহলে তা তিনি অযুবিহীন অবস্থায় নামায পড়তেন না।

দলীল (২): দারা কুতুনীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস-।

(নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা - (নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা)

অর্থাৎ, নবী করিম (সা) শিক্ষা লাগানোর পর অযু না করে নামায পড়তেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, আহমদ, আওয়াঈ, সুফিয়ান সাওরী, কাতাদা, ইব্রাহীম নাখী ও যুবরী (রহ.)-এর মতে, শরীরের মোকান অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে পড়ে পড়লে অযু ভেঙ্গে যাবে。

দলীল (১): হযরত আরিসা (রা) হতে বর্ণিত মারফু হাদিস-।

(... সুন্ন দর্শনের উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা - (নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা)

অর্থাৎ, ... আরিসা (রা) বলছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্দ্রশাদ করেছেন, যার বাম হয়েছে অথবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে অথবা পেট থেকে মুখে পানি এসেছে কিংবা মদ্য (বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত অপেক্ষাকৃত তরল ভ্রম) বেরিয়েছে, তবে যে নকি গিয়ে অযু করে। অতঃপর সে ইতোমধ্যে যদি কথা না বলে থাকে, তাহলে বীর্য নামাযের উপর ভিন করে অর্থাৎ পূর্বে যখন থেকে নামায ভঙ্গ হয়েছে সেখান থেকে পূর্ণ করে।

দলীল (২): নবী করিম (সা) থেকে বর্ণিত একটি বাচানিক (ফোলি) মারফু হাদিস-।

(নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা - (নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা)

অর্থাৎ, প্রতিটি প্রবাহিত রক্তের কারণে অযু করতে হবে।

দলীল (৩): উন্ন উপচ্চ প্রাপ্ত ইসহাস বলেছেন যে কান্ত না তোমাদের প্রাক্তন বলেছেন।

লেখা লেখুন ইসহাস উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা - (নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা)

কান তার কানের সাথে উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা - (নিঃ: উল্লাহ বিশ্বাম এন্ত এক্সিমোন ও তাহে তা যোক্তানা)
অর্থাৎ, ... ফাতিমা বিনত আবু হুরায়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ইস্তেহাসগ্রন্থ (রক্ষণদার) হয়ে নবী করিম (সাঃ) তাঁকে বলেন, হয়ে অবস্থান নদী হতে যে কালো রং বর্ণ দেখা দিয়ে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দিবে, তখন থেকে অব করে নামায আদায় করবে। কেননা, এটা বিশেষ শিখিয়ে হতে নির্গত রুক্ত।

উপরোক্ত হাদিসের সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রক্ত বলে হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদিসে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নামক একজন রাজী রয়েছেন। তার ব্যাপারে মুহাদিসগণ অনেক সমালোচনা করেছেন।

যেমন, কেউ কেউ তাকে মিথ্যাক বলেছেন। আবার কেউ তাকে দাজ্জল বলতেও কৃপণতা করেননি। তাছাড়া হাদিসে 'আকিল' নামক সে রাজি রয়েছেন তিনি অজাত।

অতএব, এ হাদিসটি দলীল্যোগ্য নয়।

(২) ইহা ছিল এক সাহাবীর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। যা বাচনিক (কাওলী) হাদিসের মুকাবলায় দলীল্যোগ্য নয়।

(৩) এমনও হতে পারে যে, রক্ত বলে হওয়া যে অযু ভঙ্গের কারণ, এই ইলম (জ্ঞান) তখন পর্যন্ত ঐ সাহাবীর জানা ছিল না।

(৪) অথবা, রক্ত বলে হওয়া যে অযু ভঙ্গের কারণ তখনে এ বিধান ছিল না, পরবর্তীতে এই বিধান নির্ধারিত হয়েছে।

(৫) সাহাবী হযরত আব্বাদ (রাঃ) নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগে এতটা বিভাগ ছিলেন যে, হয়তো তার রক্ত বলে হওয়ার খবরই ছিল না। অথবা খবর ছিল কিন্তু তিলাওয়াতের স্বাদ উপভোগের প্রাথমিক কারণে নামায ভঙ্গ করতে পারেননি। যেমন হাদিসটির শেষে বলা হয়েছে-

ইন কেন্ত ফি সৌরা আফ্রোলাফ ফেল্ম অহবে আন অফেমাহার। (অর্থ পূর্বে দেয়া হয়েছে)

সুতরাং এটা ছিল অবশ্যক প্রাথমিক। যার দ্বারা কোন ফিকহী মাসআলা উৎসারণ করা যায় না। কারণ এটি একটি বিচিত্র ঘটনা।

নবীর দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদিসে সালেহ বিন মুতাকিম এবং সালমান ইবন দাউদ উভয়ই দুর্বল রাজী। সুতরাং উক্ত হাদিস দলীল্যোগ্য নয়।

(২) অথবা, হাদিসে বর্ণিত অযু না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি তাঁকাকান্দ অযু করেননি। আর তাঁকাকান্দ অযু না করার দ্বারা তিনি যে একবারেই অযু করেননি, এমনটি বলা ঠিক নয়।

(১৩৮) (নুবুসন্দেহা শাহীর আনুমানিক ১৩৮)
বাবু ফিরুজ মাদী (বীর্যসর) সম্পর্কে

... এই হয়নি কথার মাত্র দৃষ্টিতে আগে হিসেব করে তুমি তোমার ছবি দেখেছ। তাই তোমায় স্মরণ করা হলো সুন্নাহের প্রথায় স্মৃতি হলো আল্লাহর দেখা দেন। তাই স্মরণ করা হলো সুন্নাহের প্রথায় স্মৃতি হলো আল্লাহর দেখা দেন।

বিশ্বাসঘাতক দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-

(ক) কাপড়ের মাদী লাগলে পাক করার পদ্ধতি কি হবে?

(খ) মাদী নির্ণয় হলে লিঙ্গ ধোয়ার বিধান সম্পর্কে।

প্রথম আলোচনায় কাপড়ের মাদী লাগলে তা পাক করার পদ্ধতি কি হবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে।

* ইমাম আহমদের সময়, কাপড়ের বোঝা করার কোন প্রয়োজন নেই; নির্দেশিত হলে বাংলাদেশের ভাষা রয়েছে।

কাপড়ের মাদী লাগলে পাক করে তার চেষ্টা করুন অন্ন বিভূজ হলে লিঙ্গ ধোয়ার বিধান সম্পর্কে।

* সামান্য কামোচ্চনার ফলে যে পাতলা আঠাল পানি পুরকাখার হতে নির্গত হয় তাকে মাদী বলা।

তা বের হলে ওরু অদ্ভুত হয়।
আহকামুল হাদিস

টাখাঁ ক্ষুদ্র মাত্র ফাত্তাথ বিভিন্ন তথ্য হিবের অর্জন ও সূচনার অভাবে। (আবু দাউদ জ. ২৮)

ত্রম্য জ. ৩১ পানি বলি বাপে নাম নামেন পুষ্প, ইন মাজী পানি (৩৫)

অথবা, ... সাহেব ইবন হুনাইফ (রা) হেতু বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মহী নির্গত হত। তাই আমি অর্থিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সারা) কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মহী বের হওয়ার পর অমূল করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইন্ত রাসূলুল্লাহ! আমার কাপড়ে মহী লাগলে কি করব?

তিনি বলেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, কাপড়ের যে অংশ মহী লেগেছে তাতে এক আজান পানি দেবে। যাতে তা দূরীভূত হয়।

উত্ত হাদিসে নির্ণয় শক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল, পানি ছিটিয়ে দেয়া। সুতরাং ধোয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেই রহ. এর মতে, কাপড়ে যদি মহী লাগে তাহলে তা ধৌত করা ওয়াজিব, যেতাম পেশাব লাগার কারণে ধৌত করা ওয়াজিব। শুধু পানি ছিটানোর ঘাটা কাপড় পাক হবে না।

দৈর্ঘ্যের অনুসারে বর্ণিত হাদিস। উত্ত হাদিসে নবী করিম (সারা) হযরত আলী রা. কে নির্দেশ দেন যে, আগশ দক্ষ (তোমার পুরুষাঙ্ক ধৌত কর)। পুরুষাঙ্ক ধৌত করার হুকুমের কারণ হল, মহী লাগ। অতএব, কাপড়ের হুকুম তাই হবে।

আকবর দৈর্ঘ্যের মহী এটা তো নাপক। সুতরাং নাপাক প্রশ্ন কাপড়ে লাগার কারণে যদি কাপড় ধৌত করা জরুরী হয়, তাহলে মহী কাপড়ে লাগলেও তা পবিত্র করার জন্য ধৌত করা জরুরী।

জবাবের যে সমস্ত হাদিসে নির্ণয় শব্দ এসেছে এর দ্বারা পানি ছিটানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল হালকাভাবে ধৌত নেয়া। যার ইসতিয় হযরত আলী (রা) এর হাদিসের প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আরবী ভাষাভাষীরা নীল দ্বারা গোসল বা ধৌত করা উকিয়ে থাকে।

দীর্ঘতায় আলোচনা মহী নির্গত হলে কী ধৌত করার বিধান কি- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানীক্ষা রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, মহী নির্গত হওয়ার পর পুরুষাঙ্ক ও অণুকোষ উভয়টি ধৌত করা ওয়াজিব। মহী লাগুক কিংবা না লাগুক।
দলীল

... অর্থাৎ, ... উরোয়া (রহ.) হতে বর্ণিত। ... রাবী বলেন, মিকদাদ (রা) নবী করীম (সা)কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল লাহাদ (সা) বলেন, ঐ ব্যক্তির বীর্য লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ঘোষ করা উচিত।

দলীল

... অর্থাৎ, ... আবুল হাসান ইবন সাদ আল-আহসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল লাহাদ (সা)কে গোলস ফরম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবর্সের পর ময়ি নিষ্কট হওয়ার বাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, ঐ হল ময়ি এবং পুরুষ থেকে যখন ময়ি নিষ্কট হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাগ্রস্ত ও অন্ডকোষ ঘোষ করি। অতঃপর নামায আদায়ের জন্য অস্বীকার করেন।

উপরোক্ত হাদিসসহ লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ঘোষ করার কথা সুপ্রস্তুতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেক (রহ) এর মতে, শুধু ঐ জায়গাটিকু বিধ করাও ওয়াজিব, যেখানে ময়ি লেগেছে। পূরো লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ঘোষ করা ওয়াজিব নয়।

দলীল: অনুচ্ছেদের সূত্রে বর্ণিত হাদিস। উত্তর হাদিসে নবী করীম (সা) হাতে আলী (রা)কে শুধু লিঙ্গ ঘোষ করার হকুম দিয়েছেন। অন্ডকোষ ঘোষ করার হকুম দেননি।

আলীদলীলে কোন জায়গা তখনই ঘোষ করা ওয়াজিব, যখন তাতে নাপাক লাগে। সুতরাং অন্ডকোষ বা পূরো লিঙ্গ ময়ি (নাপাক) না লাগলে তা ঘোষ করা কোন ক্রমেই ওয়াজিব হতে পারে না।

জবাব: (১) যে সকল হাদিসে পূরো লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ঘোষ করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা ওয়াজিব উদেশ্য নয়; বরং মুতাহাব উদেশ্য।
(২) ইমাম তাহাবী (রহ) বলেন, অন্ডকোষপ্রয় ঘোষ হকুম শরীই নয়; বরং চিকিৎসার্থে। কারণ ঠাট্টা পানি যেমনভাবে পেশাব ও দুঃখ বদ্ধ করে দেয়, এরপ্রভাবে ময়িও বদ্ধ করে। কারণ অন্ডকোষের সাথেই ময়ির সম্পর্ক।
স্বাভাবিক আলোচনা ও মোকাল্যাহাণ চাষী ক্রিয়াকর লেখার সাথে মেলামেশার ও খাওয়া-দাওয়া

খুশিত নির্দিষ্ট স্বাভাব লেখার অধ্যায় ১৮

```
(ক) বা মোকাল্যাহাণ বা সংসদের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।
(খ) বা নাভির উপর ও হাঁটুর নিচে মেলামেশার দ্বারা ফায়দা নেয়া।
(গ) অর্থাৎ, নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দৌড় এবং গৌরব ব্যতীত মেলামেশা করা।

প্রথম প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন-

যদি খুলুনক খাদ্য প্রদান করা হয় তখন আত্মা অবতীর্থতা করে।

থাকৃ তার ফায়দা হয় না। কাজেই তাস্মান স্বাভাব গৌরব থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পরিকল্পনা করে যায়। (সবারাণ ২২২)

অধিকাংশ আল্লাহের অভিমত হল, ইহাকে হালাল মনে করা কুফরি।

আর দ্বিতীয় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। এই মেলামেশা চাই পুরুষাঙ্গ দ্বারা হোক কিংবা চাই মহিলাকে হোক অথবা স্পর্শ-আলিসনের দ্বারা হোক এবং চাই কাপড়ের উপর দিয়ে হোক কিংবা কাপড় ছাড়া হোক, স্বাভাবিক যায়ে আছে।

তবে তৃতীয় প্রকারটি হালাল কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হামল, ইসহাক, আওয়াই, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহিম নাখ্ও, শাবী ও মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, কোন প্রকার কাপড় ছাড়াই নাভির নিচ থেকে
```
দলীল (২) ওমরাব ইবনে ওয্যন-এর ফুস হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট হযরত অবজ্ঞায় স্বামীর সাথে সহাবতাহারের সঠিক পদ্ধতি কি, তা জানতে চাইলে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলন-  

... প্রার্থনা করো আর প্রার্থনা করো আর ... 

কোন সফার তাত্পর্য করে না। 

অর্থাৎ, ... একদা রাতে নবি করীম (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন আমি রক্তক্ষতি ছিলাম। তিনি সম্প্রতিকার নবীভী যান। অতঃপর আমি যুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবাধ্য ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকট এসো (আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম, আমি তো রক্তক্ষতি। নবি করীম (সা) বলেন, তুমি তোমার উক্তির উত্তরে উদ্ধৃত কর। তখন আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। 

কোন প্রোটি ফ্রক্টিক উত্তরে উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। তিনি তাঁর মূখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল গরম হওয়ার জন্য। আমার উক্তির উদ্ধৃত করি। 

তাত্পর্য প্রধানত হেতু করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে যাই শুশ্রুষা করে।
উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করিম (সাহ) নাভি ও হাতের মাঝখানে কাপড়ের অন্তরাল ছাড়াই উদ্দুক্ত অবস্থায় ফয়দা নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তা জায়েহ আছে।

দলীল (৩) পরিকল্পনা এ ব্যাপারে যে হুকুম এসেছে, তাতেও প্রবিধান যৌনাঙ্গ উপভোগ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেক, সাইদ ইবনুল মুসাতিব, তাউস, আতা ও কাতাদা (রহ.) প্রমুখের মতে, কোন প্রকার কাপড়ের অন্তরাল ছাড়া নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাটের উপর পর্যন্ত কোন ব্যাপার থেকেই কোন প্রকার ফয়দা নেয়া জায়েহ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি অভিমতও অনুরূপ।

দলীল (১) অনুসারেও এক্ষেত্রে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিস ব্যাপারে কোনো যে, কাপড় নিচ দিয়ে কাপড়ের নিচ দিয়ে ফয়দা নেয়া জায়েহ নয়।

দলীল (২) উন্ন মুর্তাবি বং জিলা ফাল্ল সাহালি আল্লাহ চেলি আল্লাহ উল্লেহ ও স্লম।

দলীল (৩) এক অফ্পোল—(বৃথ দাও জ ১।৫২)

(অর্থাৎ, ... মুআয় ইবন জাবাল (রাখ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের আমি রাসূল লুলুহী (সাহ)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, মূলধনী অবস্থায় স্বল্পেক পুরুষের জন্য কতগুলু হলাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যাতকুক সত্ত্বা। তবে এটা তাদের বেচে থাকা উক্ত।

দলীল (৪) উন্ন উদ্ধান ফাল্ল কান আসুল চেলি আল্লাহ উল্লেহ ও স্লম যামর।

(অর্থাৎ, ... আজিয়া (রাখ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল লুলুহী (সাহ) আমাদের কেউ মূলধনী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একটি শ্যাম করতেন। বাপ এক বর্ণনায় হয়তো আজিয়া (রাখ) বলেন, তিনি (সাহ) কোন কখনো তাঁর সাথে রাত যাপন করতেন।

(উপরোক্ত হাদিসের সহ আরো এক অনেক হাদিস রয়েছে, যেখানে পাজামা পাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পাজামার উপর দিয়ে ফয়দা উল্লাসের অনুমোদন দিয়েছেন। যদি পাজামার নিচ দিয়ে ফয়দা উল্লাসে জায়েহ হত, তাহলে কাপড়
আহকামুল হাদিস ৯৪
পরিভাষা অধ্যায়

বাঁধার নির্দেশ দিতেন না। এতে বুঝা যায় যে, পাজামার নিচ দিয়ে ফায়দা উঠানো জায়ের নয়।

জবাবঃ হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের দলীলের একটি সার্বিক জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীলসমূহ হালাল বা জায়ের সংক্রান্ত, আর আমাদের দলীলসমূহ হারাম সংক্রান্ত। আর ফিকহের একটি মূলনীতি হল, যখন একই বিষয়ে হালাল ও হারাম নিয়ে ছদ্ম দেখা দেয়, তখন হারাম সংক্রান্ত দলীলসমূহ প্রাধান্য পাবে।

প্রথম দলীলের জবাবঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদিসে যে নকাহ শব্দটি বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা শুধু সহবাস উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা সহবাস ও সহবাসের দিকে আকৃষ্টকারী বিষয়ও উদ্দেশ্য। প্রকৃতিপক্ষে যে জিনিস হারাম, তার আনুষ্ঠানিক বিষয়ও হারাম।

(২) নবী করিম (সা) ‘নিকাহ’ বলে ইসলামে পাজামার নিচের কার্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদিসে আদুর রহমান ইবন যিয়াদ নামক একজন রাবি রয়েছেন, যাকে ইয়াহইয়া ইবন মুঈন, ইমাম আহমদ, আবু যুসুফ ও ইমাম তিরমিয়ি (রহ.) সহ অনেকেই যক্ষ বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণিত হাদিস দলীলযোগ্য হতে পারে না। (বদল মেহেনত ১১৬ সং)

(২) অথবা, এটি ছিল নবী করিম (সা)-এর জন্য খাস। যা অন্যের জন্য জায়ের নয়। কারণ নবী করিম (সা)-এর বীর নফস পুরোপুরি নিয়মিত ছিল। যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত আরিশা (রাঃ) নিজেই বলেন-

... ওয়ায়কুম যিমালক ইর্বাহে কমা কান রসূল মুসলিম ইল্লে উল্লম্ব যিমালক ইর্বাহে–(আবু

দাওদ জ ১১ সং, ১২ সং, ১৪ সং)

অর্থাৎ, ... তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোদীদানা নিয়মে করার ক্ষমতা আছে কি, যেমন রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর ছিল?

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত আয়াতে ফাতিমেরা বলে সহজের নিষেধ করা হয়েছে।

আর নবীর নিকটবর্তী হয়ে না) বলে পাজামার নিচে যে সহবাসের কামোদীপক্ষ উপকরণ রয়েছে, তা থেকে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে।

(তন্ত্রে আশুতোষ ১১২-১১৩)
পাপের ফল অক্সাল সমুদ্রের দুই পাঁচ একদিন স্থাপন করার জন্য আল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নিঃসন্দেহে আরোহণের পর রূপান্তরের সূত্রগুলি উল্লেখ করে কিন্তু তা হয়নি।

এরপর তিনি গোসালের নির্দেশ দেন এবং পূর্বস্তু অনুষ্ঠিত রচিত করেন।

বিশ্বাসের পুরুষের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যৌনাঙ্গের অগ্রভাগে প্রবেশ করার ফলে গোসাল ওয়াজিব হবে কিনা, এ নিয়ে ফকিহদের মাঝে মতান্তর রয়েছে।

* ইমাম দাউদ যাহেরির মতে, ওহু পুরুষের অগ্রভাগ মহিলার যৌনাঙ্গের অগ্রভাগে ভুক্ত দ্বারা গোসাল ওয়াজিব হবে না; বরং গোসাল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যপাত শর্ত।

প্রথম দিকে হযরত উসমান, আলী, যুবাইর, তালহা ও উবাই ইবন কাব (রা) -এরও অভিমত তাই ছিল।

(السُّنَّة ١ ص١٠٠)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেই, আহমদ, ইসহাক, সুফিয়ান সাওরী, ইব্রাহীম নাখোর (রহ.) ও জমহুর সাহবাদরের মতে, পুরুষের অগ্রভাগ মহিলার যৌনাঙ্গের অগ্রভাগে প্রবেশ করলেই গোসাল ওয়াজিব হবে।

বীর্য বের হওয়া জরুরী নয়।

(بضِ مُهْجُوُد ج١ ص١٤٣, تَعِلْمِ الصِّبح ج١ ص٢١٧)

* অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।
আহকামুল হামিদ

পবিত্রতা অধ্যায়

দলীল

... জানা যেতে হবে যে নবী (সাও) বলেন যে, ল্যান্ডম্যার্ক

শুধুমাত্র এতে তিনি বলেন যে, ল্যান্ডম্যার্ক এর উপর উপাধি ব্যবহার করা হয় এবং পুরুষদের আপাতভাবে তীর যানীর আপাতভাবে প্রবেশ করার জন্য উপরে গোসল ওয়াজিব হবে।

দলীল

... যে হচ্ছে তাই জানো তিনি, নবী (সাও) বলেন যে, ল্যান্ডম্যার্ক এর উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়ারা (র।) নবী করীম (সাও) এর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামসূহাল চরিত্রকর উদ্দেশ্যে শরীফ উপরে উপাধি ব্যবহার করে এবং পুরুষদের আপাতভাবে তীর যানীর আপাতভাবে প্রবেশ করার জন্য উপরে গোসল ওয়াজিব হবে।

অর্থাৎ, ... আরিশা (র।) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন পুরুষদের আপাতভাবে রমলীর যৌনাঙ্কের আপাতভাবে অপ্রতিক্রিয়া করে তখন গোসল ওয়াজি বিদ্যমান হবে। আরশেদ ও রাসূলুল্লাহ (সাও) অনুসারী তাদের একটি বলে যাতে তাদের যৌনাঙ্কের আপাতভাবে মিলিত হলে গোসল ওয়াজি হবে, বীর্য বের হওয়ার জন্য নেয়।

জবাবঃ (১) আলু সাইদ আল-খুদরী (র।)-এর হাদিসটি রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিসটি। (২) অথবা, হাদিসের আলমার বৈশিষ্ট্য এর মাধ্যমে হাদিসটি সত্যি করা। অর্থাৎ, মূর্ত দ্বারা তো গোসল ওয়াজি নয়, কেবল বীর্যের দ্বারাই গোসল ওয়াজি হয়।

(৩) অথবা, এই হাদিসটি স্পষ্টদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ, স্পষ্ট যা কিছুই দেখুক না কেন, বীর্য স্থলন হচ্ছে গোসল ওয়াজি হবে না।

(ট্রাম্য ১চ ৩২)
পাপ ফি জন্মে য়দখল মসজিদ চতুর্থ অধ্যায়ের অপভিত্তিক বিষয়গুলিতে প্রবেশ

... ও উচ্চারণের জন্য যে রসূল মুহাম্মদ মসজিদের বিভাগ এবং সুলতান তার সহকারী কর্তব্য হবে।

শরাতের হামার মসজিদ ফাতেম ও রাপুরী মসজিদের ভিত্তি।

অনুবাদঃ আরিশা (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনিই বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাহ) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যে তার সহকারীর জন্য অথবা তাঁর জন্য এটি থাকতে হতে দিতে হতে দিতে যে অবকাশ সৃষ্টি করেন নির্ধারণ নামে হতে পারে।

অতঃপর নবী করিম (সাহ) হতে প্রবেশ করেন।

সাহারায় ঘরের নির্ধারণ করেন নি যে, হয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে রুখ্চত অবকাশ সৃষ্টি করতে হতে পারে।

অতঃপর নবী করিম (সাহ) বের হয়ে পুনরায় নির্ধারণ দেন, তাঁদের যে নির্ণয় দেন তার জন্য মসজিদের নির্ধারণ করেন নির্ধারণ করেন।

কেননা সুবিষুদ্ধ ক্রীবারাত ও অপভিত্তিক ব্যক্তির জন্য মসজিদের নির্ধারণ করা আহ্মদ (বৈদ) যে করে না।

বিশ্লেষণঃ এই অনুসিদ্ধে আলোচনা বিষয় দুটিতে

(ক) অপভিত্তিক অবস্থায় মসজিদের প্রবেশ করা জায় কিনা।

(খ) নামকীন অবস্থায় মসজিদের নির্ধারণ করে চলাচল করা জায় কিনা।

প্রথম আলোচনায় ইবনুল মুনতির মতে, গোলাম ফরহাদ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কর্তব্য মহিলা নিন্ধারণের মসজিদের প্রবেশ করতে পারবে।

দলীলঃ

... তার বিভাগ অন্য ব্যক্তি স্বীকার করে।

জন্ম ফালায় এই মসজিদ না পরিবর্তিত হয়েছে। (আবু দাউদ জ 20) বাবে নির্ধারণ বিচার, সুলতান 10 চরণ 41 নিন্ধারণে নিন্ধারণে নিন্ধারণে নিন্ধারণে নিন্ধারণে নিন্ধারণে নিন্ধারণে 

অর্থাতঃ ... হামারী ফালায় (রাজ) হতে বর্ণিত। একদা নবী করিম (সাহ)-এর সাথে তাঁর সহকারী হয়। তখন তিনি (সাহ) তাঁর সাথে মসজিদের নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে হতে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।
দেন। তখন হুমায়ুনা (রাঘ) বলেন, আমি অপবিত্র। নবী করীম (সাঘ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি কখনো অপবিত্র হয় না।

* ইমাম আহমদ ইবন হামল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, অপবিত্র ব্যক্তি যদি অত্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করে, তবে জায়েশ আছে।

দলীলঃ রূপে অর্থাৎ সাহাবাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নাপাক অবস্থায় সংঘে (গৌসল না করে) নামাযের অমূর্ত অমূর্ত করে মসজিদে বসতেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেক (রহ.) ও জমহুর উমেরের মতে, অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান করা জায়েশ নয়।

দলীলঃ অনুস্মারণ তুলুনপ্রতি বর্ণিত হুদীস।

জবাবঃ প্রতিপক্ষের দলীল সমূহের বিপক্ষে একটি সামগ্রিক জবাব হলঃ প্রতিপক্ষের দলীলসমূহ হালাল সংক্রান্ত আর তিন ইমাম ও জমহুরের দলীলটি হারাম সংক্রান্ত। অতএব উসলু মোতাবিক হারামটি প্রাধান্য পাবে।

ইমাম মাবিনের প্রতিক্ষে আসলে উক্ত বাগী মুসাফাহার ক্ষেত্রে বলা হয়, অর্থাৎ, মুসলমান কখনো এমন অপবিত্র হয় না, যার ফলে তার সাথে মুসাফাহা করা যায় না। নতুনা বলা হবে যে, সত্বা বাগীর প্রতি অর্থ নেয়া হয়, তাই তো একাধিক বলা সহী হবে যে, বীর্যপতি বা রক্ষপারের ফলেও একজন মুসলমান নাপাক হবে না।

* ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ মারফু হুদীসের মুকাবিলায় সাহাবাগণের আমল দলীলযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ নাপাক অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করা জায়েশ কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

* ইমাম শাফেক (রহ.)-এর মতে, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জায়েশ আছে, তবে মসজিদে অবস্থান করা জায়েশ নয়।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাগী-

যাইহু লোকেরা ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে তাঁদের মাঝে কোন সজ্জা হয় না তাঁদের উপর তাঁদের লেখা মানসিকতা হয় না।

...
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাপ্রাপ্ত থাকে, তখন নামায়ের ধারে কাদেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ। আর (নামায়ের কারণ যেও না) অপবিত্র অবস্থায়। কিন্তু পথ অতিক্রমকারীর কথা ভিন্ন। (নিসাই ৪৩)

ইমাম শাফেকে (রহ.) আদুল্লাহ ইবন মসুদ (রাঃ)-এর তাফসীর গ্রহণ করে বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত স্বল্প এর দ্বারা উদেশ্য হল তথা মসজিদ আর উদ্দেশ্য স্বল্পের অর্থ হচ্ছে, মসজিদের ভিতর দিয়ে গমনকারী। সুতরাং আযাতাংশের অর্থ হবে, নাপাক যব্ধি মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারবে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক (রহ.) ও জমহুর ফকিহগণের অভিমত হল, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা এবং অবস্থান করা কোনটিই জায়ে নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস। নবী করিম (সা) মসজিদমূখী ঘরের দরজার তো এজন্যই বঙ্গ করতে বলেছিলেন, যাতে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করার কোন সুযোগ না থাকে। যদি নাপাক অবস্থায় চলাচল করা যায় এই হত, তাহলে মসজিদমূখী ঘরের দরজা বন্ধের জন্য নির্দেশ দিতেন না।

জবাবঃ (১) তাফসীরের ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য হল হযরত আদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর। আর তিনি আযাতটির তাফসীরে বলেন- স্বল্প দ্বারা নামায উদেশ্য, মসজিদ উদেশ্য নয় এবং স্বল্পের দ্বারা উদেশ্য হল মুসাফির। তখন আযাতাংশের অর্থ হবে, তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ো না। কিন্তু যদি মুসাফির হও, তাহলে ভিন্ন কথা অর্থাত এমতাবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্বুম করে নামায আদায় কর।

(২) তথা মসজিদ অর্থ নেয়া হলে এটি হবে রুপক (মজাজি) স্বল্প (حقيقي)। আর নিয়ম হল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শব্দের প্রকৃতি অর্থ নেয়া সত্যব, ততক্ষণ পর্যন্ত রূপক অর্থ নেয়া জায়ে নয়। আর উক্ত আযাতে প্রকৃতি অর্থ নেয়া অনাযাসে সত্যব, যা ইবন আব্বাসের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) নামাযে কিরাআত পড়া শর্ত। আর আযাতটিতেও গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, “হই তালমু মা তালমুন” উল্লেখ করার দ্বারা এই শর্তের সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

সুতরাং সালাত দ্বারা যদি মসজিদ উদেশ্য হয়, তাহলে এই শর্তারোপের কোন মূল্য থাকে না। তাছাড়া আযাতটির শানে নুযূলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও প্রতীয়মান হয় যে, আযাতটি নামায সম্পর্কেই নামিল হয়েছে, মসজিদ বুধবার উদেশ্যে নামিল হয়নি।

(নুসাই ১:১৭, হাকাম আর্ৰাহা)।
যাবত মাতা রঘুবরী আনন্দুকা মহাদেবী বিশ্বাস গৃহীত কিছু গুণ সত্য

ইতেমহাত্মাত্ম কবিন্দাদের প্রত্যেক নামায়ের সময় গোসাল করা
সম্পর্কে বর্ণিত হাদিদামূল

... এতে নিজের নিজের স্থান করে আমি মহিষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত
হনা তা রসূল সুলাহ তার স্থান করে আমি মহিষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত
করছি।

স্যায় স্যায় ফাতিমাবিয়া আপনার অধিকারে হোক এই বিষয়ে নিজের
নিজের হস্তে ফাতিমাবিয়া আপনার অধিকারে হোক।

রসূল সুলাহ তার স্থান করে আমি মহিষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত
করছি।

... এতে অপর নামায়ের সময় গোসাল করা

মানুষের স্বরূপ হতে পারে এই বিষয়ে স্নায় স্নায় ফাতিমাবিয়া
আপনার অধিকারে হোক।

* ইবন উমর, ইবন যুবাইর ও আতা ইবন আবী রাবাহ (রাওস) এর মতে,
ইতেমহাত্মাত্ম মহাদেবীর জন্য প্রত্যেক নামায়ে গোসাল করা ওয়াজিব।

দলীলঃ এতে নিজের নিজের স্থান করে আমি মহিষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত
হনা তা রসূল সুলাহ তার স্থান করে আমি মহিষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত
করছি।

(পান হাস্তাঃ প্রথম সুলাহ ১৪, প্রথম সুলাহ ১৫১, প্রথম সুলাহ ১৫২, প্রথম সুলাহ ১৫৩)
অর্থাৎ, ... আহিশিখা (রাখ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবিবা বিনত জাহশ (রাখ) রাসূলুল্লাহ (সাফি) এর যুগে ইসহায়াগণ্ন হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাফি) তাঁকে প্রত্যেক নামায়ের সময় গোসলের নির্দেশ দেন। অতএব, উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামায়ের জন্য গোসল করা ওয়াজিব।

* হযরত আলী (রাখ) ও ইবন আব্বাস (রাখ) -এর মতে, দুই নামায়ের মধ্যবর্তী সময়ে একবার গোসল করবে। অর্থাৎ, যোগার ও আসরের নামায়ের জন্য একবার গোসল করে যোগারের নামায়ের শেষ সময়ে এবং আসরের নামায়ের শেষ সময়ে একটি অগ্রসর করে আউয়াল ওয়ান্দে পড়বে। কিন্তু প্রত্যেক নামায় ওয়ান্দের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর মাগরিব ও এশার নামায়ের জন্য একবার গোসল করে মাগরিবের নামায়ের শেষ সময়ে এবং এশার নামায়ের প্রথম সময়ে আদায় করে নেবে। তবে প্রত্যেক নামায় ওয়ান্দের মধ্যে হতে হবে। অতঃপর ফজরের নামায়ের সময় আরেকবার গোসল করবে। অতএব, পাঁচ ওয়ান্দের নামায়ের জন্য মোট তিনবার গোসল করবে। তাঁদের মতে, প্রত্যেক নামায়ের সময় গোসল করার হুমকু মানসূখ হয়ে গেছে।

দলীলঃ

... অনু ‘গাত্রে কাল তঁর সেই সময় পূজায় স্নায় মুসলমান যেন আপি দেহকে শরীয় করতেন না তাহলে আমরা তোমাদের কর্তৃত্বের সাধারণতা শরীয় করতেন। অন্য তোমাদের কর্তৃত্বের সাধারণতা শরীয় করতেন। 

اللهُ عليهِ وَسُلَّمُ قَامَرَهَا آنَ تَفْتَسِيلَ عِنْدَكُمْ كَلَّا صَلُوًةٍ فَلَمَّا جِهَدَتْ ذَلِكَ أَمِرُهَا أَنَّ

تَجِمعُ بِيَّنَ الْوَهْرِ وَالْعَصْرِ يُقْسِمُ وَالْمَغْرِبُ وَالْغَيْضَةِ يُقْسِمُ وَتَفْتَسِيلِ للصُّحِبَةَ

(ابو داود ج1 ص414 باب من قال تجتمع بين الصلاةين الغ، نسائي ج1 ص50 ذكر افتراض المحتاجة)

অর্থাৎ, ... আহিশিখা (রাখ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহিহা বিনত সুহাযেল (রাখ) ইসহায়াগণ্ন হওয়ায় নবী করিম (সাফি)-এর যুগে আগমন করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক নামায়ের জন্য গোসলের নির্দেশ দেন। তাঁর জন্য এটা কষাড়ক হওয়ায় নবী করিম (সাফি) তাঁকে যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের নামায়ের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন।

* সাউদ ইবন মুসায়িব ও হাসান বসরী (রহ) প্রমুখের মতে, ইসহায়াগণ্ন মহিলা প্রত্যেক দিন যুহরের সময়ে মোট একবার গোসল করবে।

دلالهঃ

َحَدِيثَهُنَّ الْعَقَيْدَيِّيْنِ ... آنَّ الْقَعَايَةَ وَزَيَّدَ بِنَ أَسْلَمْ أَرْسَالَهُ إِلَىٰ سَعِيدِ بِنَ

المُسْبِبَ يُسَالَهُ كَيْفَ تَفْتَسِيلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَتَقُولَ تَفْتَسِيلُ مِنْ ظُهْرِهِ إِلَىٰ ظُهْرِهِ وَتَوْضُّعًا

لِكُلُّ صَلُوَةٍ اللَّهِ (ابو داود ج1 ص424 باب من قال المستحثة تفعتيل من ظهر الى ظهر)
অর্থাং, আল কানাবী ... আল-কাকা এবং যাহেদ ইবন আসলাম (রহ.) উভয়ই সুমাইয়াকে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়িবের নিকট ইত্তেহাসাত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দৈনিক এক মুহূর্ত থেকে পরবর্তী মুহূর্ত পর্যন্ত একবার গোসল করতে হবে। (অর্থাং প্রতাহ দুপুরের সময়) তাকে প্রতূলক নামায়ের জন্য অশু করতে হবে।

* চার ইমাম ও জমহুরের মতে, ইত্তেহাসাতু মহিলার হযরত প্রস্তাবনায় সময়সীমা যখন চলে যায়, তখন হযরত বদের সময় শুধু একবার গোসল করে নেয়াই যথেষ্ট। প্রতূলক দিন প্রতূলক নামায়ের জন্য অপর দুই নামায়ের মাঝখানে গোসল করার কোন প্রয়োজন নেই। ইবন মাসুদ, আয়িশা, উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালামায় বাবু আল্লামায় (রাঃ) প্রমুখের অতিমতও তাই। (১১৩ পৃষ্ঠা)

দলীল (১৪) হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা�) উমমে হাদিবা বিনত জাহল (রাঃ)-কে লক্ষ করে বলেন-

ইদা আফিলত হযরত আয়িশার স্থলতে ফাতিমিয়ী উসলিয়া ওয়ালী। (আবু নাদজ ১৭৫)

বাবা যদি আফিলত হযরত আয়িশার স্থলতে ফাতিমিয়ী উসলিয়া ওয়ালী। (১১৪ পৃষ্ঠা)

অর্থাং, যখন তোমার হযরত হযরত জন্য নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায় হতে বিতর্ক থাকবে এবং উভে সময় অধিবাসিত হবে গোসল করে নামায় আদায় করবে।

উক্ত হযরতে জমহুর হযরত বদের পর গোসলের হওয়া দেয়া হয়েছে। বারবার গোসল করার কথা বলা হয়নি।

দলীল (২) প্রথম উল্লেখিত হযরত নামায়ের তদন্ত মুসলমান আয়ীশার কথা সম্পাদন করে।

তাত্ত্বিক গুন্ধা ও আদায় হতে দেখা গেছে। (হাদাজ ১৭৬)

অর্থাং, হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ইত্তেহাসাতু (রজতপ্রদর্শন) মহিলার ব্যবহারে বলেন- সে হযরতের দিনসমূহে নামায় ছেড়ে দিবে। অতঃপর একবার গোসল করবে এবং প্রতূলক নামায়ের জন্য অশু করবে।

হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ফাতওয়া সম্পূর্ণভাবে জমহুরের মতে মিলে যায়।

দলীল (৩) হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। ফাতওয়া বিনত আবু বারানেশ নবী করিম (সা�)-এর নিকট ইত্তেহাসাত সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করলে নবী করিম (সা�) বলেন-

ইত্তেহাসাতু যে তোমাকে লেখাটি স্থলতে উসলিয়া ওয়ালী (আবু নাদজ ১৭৫ পৃষ্ঠা) তোমাকে গোসল করে, যে পর্যন্ত প্রতূলক নামায়ের পূর্বে অশু করে নামায় আদায় কর।

দলীল (৪) প্রথম উল্লেখিত হযরত নামায়ের তদন্ত মুসলমান আয়ীশার কথা সম্পাদন করে।

তাত্ত্বিক গুন্ধা ও আদায় হতে দেখা গেছে। (হাদাজ ১৭৬)
জাবান (১) প্রতিপক্ষদের থেকে বর্ণিত "প্রত্যেক নামায়ের সময় গোসল করা" এবং দুই নামায়ের মাঝখানে একবার গোসল করা" উভয় হাদিসের রাশ হলেন হযরত আরিশা (রাশ)। অতঃপর হযরত আরিশা (রাশ)ই উল্লিখিত হাদিস দুটির বিপরীত হযরত বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করার ফাতওয়া দেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে বর্ণিত হাদিসের মূল রহিত হয়ে গেছে। (১৩ উত্তেজণ জ ১) (২) যখন একই বিষয়ে হাদিসের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন সবচেয়ে বিশ্বুদ্ধ হাদিসটি প্রাধান্য লাভ করে। জমিদারের দলীল শাহী রুখার্য ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে, যা সনদের দিকে দিয়েছে শক্তিশালী অতঃপর জমিদারের হাদিসের প্রাধান্য পাবে। (৩) যে ঢোকানী মেয়ের হযরতের অভিযোগ জানা থাকে, হযরত ও ইতেহাবের মাঝে পার্থক্য করে পারে, এমন মহিলার জন্য হযরত বন্ধ হওয়ার পর শুধু একবার গোসল করতে হবে। যদি কোন মহিলা হযরত এবং ইতেহাবের মাঝে পার্থক্য করতে না পারে এবং পূর্বে স্বভাবত হযরতের সময়কাল কতদিন হত তা জানা না থাকে, এমন মহিলার জন্য প্রত্যেক নামায়ে গোসল করার হুকুম প্রয়োজন হবে। এবং যে মহিলার নিজের অভিযোগ জানা নেই, কিংবা যে রক্ষা মধ্যে পার্থক্য করে না পারে, তবে কখনোর রক্ষা আসে এবং কখনো রক্ষা বন্ধ হয় যায়, এমতাবস্থায় ঐ মহিলার জন্য হুকুম হল দুই নামায়ের জন্য একবার গোসল করবে।
(৪) যে হাদিসে দুই নামায়ের মাঝখানে একবার গোসল করার হুকুম রয়েছে, এটি মন্তব্য, যা চিকিত্সা হিসেবে বলা হয়েছে। যাতে ঠাড়ার দর্পণ রক্ষা করা বিষয়। নতুন আসল হুকুম তো হল, হযরত বন্ধ হওয়ার পর একবার গোসল করা। আর এই হুকুম হচ্ছে উল্লেখিত হিসেবে।

(১৩) উত্তেজণ জ ১

বাবু মনে করল তুহলে মনে দুনিয়া মেইনো তুহলে পৃথিবী কাবা হুকুমের মধ্যবিত্ত সময় গোসল

... উন্মুক্ত বন কাবা এনে তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে 

মৃত্যুর দিনে যদি বন কাবা এনে তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে স্রোত উন্মুক্ত তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে তুহলে 

মধ্যবিত্ত সময় গোসল
আহকামুল হাদিস

অনুবাদঃ ... আদী ইবন সাবেত (রহ.) তাঁর পিতার ও দাদার সুত্রে এবং তিনি নবী করীম (সাখি)-এর নিকট থেকে ইতেমোহাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, তারা হায়েরের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে নামায় ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্রতার জন্য গোপন করে নামায় আদায় করবে। এরপর প্রত্যেক নামায়ের জন্য কেবলমাত্র অনু করতে হবে।

বিশেষণঃ ইতেমোহায়া ও সমস্ত মায়ূর, যারা ধারাবাহিকভাবে নাপাকীর শিকার অর্থাৎ যাদের অনু থাকে না এবং চার রাকাআত নামায় অনু ভঙ্গ ছাড়া পড়তে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* রবীআতুর রায় ও দাউদ যাহেরীর মতে, ইতেমোহায়ার রক্ত অযুক্তকারী নয়। এজন্য তাদের মতে ইতেমোহায়া বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামায়ের জন্য অনুর হুকুম মুন্তাহাবরপে প্রয়োজন। ইমাম মালিক (রহ.-এর মতেও ইতেমোহায়া অযুক্তকারীর করণ নয়। কেননা, এটা সরাসরি জরায়ু থেকে বের হয় না; বরং দেহ থেকে অর্থাত্বিকভাবে একটি বিশেষ শিকা থেকে নির্গত হয়।

* সুফিয়ান সাওরী ও আবু সাওরের মতে, এমন ব্যক্তি এক অনু দ্বারা শুধু ফরয় পড়তে। সুলতন ও নফলের জন্য আলাদা অনু প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ প্রতিটি স্বতন্ত্র নামায়ের জন্য অনু জরুরী।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস। তাঁরা উক্ত হাদিসে বর্ণিত অলৌকিক অর্থ গ্রহণ করে বলেন, এর আবেদন হল, প্রতিটি নামায়ের জন্য স্বতন্ত্র অনু করা।

* ইমাম শাফেই (রহ.-এর মতে, এমন ব্যক্তি এক অনু দ্বারা ফরয় এবং এর অধীনস্থ সুন্দর ও নফলগুলো আদায় করতে পারবে। কিন্তু এগুলো আদায়ের পর উক্ত অনু ভঙ্গে যাবে এবং এরপর যদি কুরআন তিলাওয়াত বা কোন নফল নামায় পড়তে চায়, তাহলে আলাদা অনু করতে হবে।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস। তাঁদের মতে, “প্রতিটি নামায়ের জন্য অনু”-এর অর্থ হল, “ফরয়সহ একসময়ে আদায়কৃত নামায়সমূহ।”

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, যুফার ও আহমদ (রহ.-এর মতে, শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত এই অনু থাকবে এবং এর দ্বারা ফরয় নামায় ও অন্যান্য নফল এবং কুরআন তিলাওয়াত করা জায়ের আছে।

অবশ্য ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই অনু ভঙ্গে যাবে।
দলীলঃ হযরত আরিশাঃ (রাঃ) হতে বর্ষিতঃ। নবী করিম (সাঃ) ফাতেমা বিনতে জাহশ (রাঃ)কে ইত্যেহ্যার ব্যাপারে নিদেশে দেন যে-

ত্যাগশীল লোকের কল সৌম্য— (কথাবর্তী অর্থ ১১ সং)

অর্থাৎ, তুমি প্রত্যেক নামায়ের ওয়াকের জন্য অযু কর।

কিরায়াসী দলীলঃ ইমাম তাহবী (রহ.) বলেন, মোঃ আর মাসেহকারীর ক্ষেত্রেও সময় শেষ হয়ে যাওয়া অযু ভঙ্গের কারণ। নামায় থেকে বের হয়ে আসা কোন কমেই অযু ভঙ্গের কারণ নয়। অনুুর্বরভাবে এখানেও অযু ভঙ্গের কারণ ওয়াকি শেষ হয়ে যাওয়া, নামায় নয়। (তৎপরারী পু. ১৪)

জবাবঃ রবীআতুর রায়, দাউদ যহেরী ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে জবাবঃ

(১) ইতিপূর্বে হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীর থেকে নির্গত প্রবাহিত রক্ত অযু ভঙ্গের কারণ।

(২) বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করিম (সাঃ) ইত্যেহ্যার ফলে অযুর নিদেশ দিয়েছিলেন। অতএব, যা বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এর উপর কিরায়াস করার কোন অবকাশ নেই।

সুফিয়ান সাওয়ারী ও আবু সাওরের দলীলের জবাবঃ এর দ্বারা বাহিক অর্থ গ্রহণ করা আদৌ ঠিক নয়। বরং এর দ্বারা পুরা নামায় বুঝানো হয়েছে।

ইমাম শাফেক (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ যে সকল হাদীসে বলা হচ্ছে না কল সৌম্য বাহিক অর্থে প্রমাণিত হয়েছে, এর দ্বারা খোদ নামায় ও নামায়ের সময় ওয়াকির সহায়তার নামে কেদুন্তে, এই শব্দ প্রায়ই ওয়াকের অর্থে প্রয়োজ্য হয়। আর হরফটিও সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, নবী করিম (সাঃ) বলেন, তোমাদের প্রক্ষে লামের হরফটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, এর অর্থ হবে, শরীয়ত নামায়ের প্রথম ও শেষ ওয়াকি রয়েছে। (তৎপরারী পু. ২০২)

হায়েম, ইত্যেহ্যার ও নেফাস সম্পর্কিত সংজ্ঞায় আলোচনাঃ

হায়েম, ইত্যেহ্যার ও নেফাসের বিষয়গুলো ফিকহ ও হাদীসের জটিলতম মাসাইলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোর সাথে দীনের অনেক আহকাম সম্পৃক্ত। যেমন, নামায়, রোহা, তওয়াফ, মসজিদে প্রবেশ, সহবাস, তালাক, ইম্ডিত, খুল্লাম, কুরআন ভিত্তিতে ইত্যাদি। আর এজন্য সম্ভাব্য উলামায়ে কিরায়াস এগুলোর সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এ বিষয়গুলোর উপর দুইশত পৃষ্ঠার,
হায়েমাহায়ে (حیض) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হল- প্রবাহ, নিঃসরণ, ঝুঁপ্তাব্দ, মাসিক, রাজ্যব্রহ্ম ইত্যাদি। পরিভাষায় হায়েম বলা হয়।

হো দেম যোরহিয়ে রহম দেম মরাহে বড় নিভুহে ফি দেয়া ফারিয়ে মুক্ততার মুক্তকরি মুফতি হয় লাত পালাতে (ফিরিদি চ ১৩৮, ফিরিদি চ ১১১)

অর্থাৎ, হায়েম হল এমন রক্ত, যা প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার জরায়ু থেকে বীতিসিদ্ধ সময়ে বের হয়, সম্ভাব্য প্রসবের কারণে নয়।

হায়েমের হক্কি সজ্জন নিষ্কিন্দ ঝুঁকু অবসাহায় সহবাসে লিপ্ত হওয়া হারাম। পরিবর্ত কূরআনে এমন মহিলার সাথে সম্মলে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা করেছে। (পূর্বে এ বিষয়ে বিভাজিত বর্ণিত হয়েছে) এই নিষেধাজ্ঞা উপলক্ষে করে যদি কেউ সজ্জন করে তাহলে সাঁজ্জ ইবন যুবাইর, হাসান বসরি, আওয়াই, আহমদ ইবন হাম্ল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এর কাফকারা সর্বোপরি এক বা অর্থ দিনার সদর্দ করা ওয়াজিব। আর তিন ইমামের মতে, সদর্দ আদায় করা ওয়াজিব নয়; বরং এই কবীরা গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে খোট মনে তবুও ও ইসহাককার পদ্ধত হবে।

নামায়রোয়া নিষ্কিন্দ হায়েম অবসাহায় নামায় আদায় করা ও রোয়া রাখা নিষ্কিন্দ। আল্লামা নববী (রহ.) বলেছেন, আহলে সুমাত ওয়াল জামামাতের ইজ্মা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ঝুঁকুতী মহিলার জন্য নামায় কাম্য করার প্রয়োজন নেই, তবে রোয়া কায়া করতে হবে। এ ব্যাপারে শুধু খায়েজীদের মতোরো রয়েছে। তারা হাদিস অনুযায়ী করে বলে, রোয়ার ন্যায় নামায় ও কাম্য করা জরুরী। (মান্তে চ ১৩৯)

নামায় কাম্য মোকে হওয়ার সম্পর্কে বলা যায়, এই হক্কি কিয়া দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়। এটি শুরীয় প্রবর্তকের নির্দেশ। তবে ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হায়েমকালে নামায় পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। যা আদায় করা করভাদ্য। আর এরপর কম শুরীয়তে থাকার কথা নয়। কিন্তু রোয়া এর পরিপর। কেননা, রোয়ার সংখ্যা খুব বেশি হয় না।

কুরআন তিলাওয়াত নিষ্কিন্দ: ইমাম মালিক ও দাওদ যাহেরীর মতে, গোসল ফরয়বিশিষ্ট্ব ব্যক্তি ও ঝুঁকুতী মহিলাতের ক্ষেত্রে তিলাওয়াত সাধারণত জায়েন।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেই, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ও ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে, ঝুঁকুতী ও গোসল ফরয়ে হয়েছে এমন ব্যক্তি শুধুমাত্র
হায়সের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সময়লীলায় ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, হায়সের সর্বনিম্ন কৌনসময় সুনিদিনে নেই; বরং এক ফোটা বা একবার রক্ত প্রবাহী মাসিক হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর মতে, হায়সের সর্বোচ্চ কাল হল সতের দিন। ইমাম শাফেকি ও আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, এর সর্বনিম্ন সময় হল একদিন একরাত। আর আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, দুদিন ও তৃতীয় দিনের অধিরাজ্য।

তবে ইমাম শাফেকি (রহ.)-এর মতে, এর সর্বোচ্চ কাল হল পনের দিন। আর ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, হায়সের সর্বনিম্ন সময় হল তিন দিন তিন রাত। আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হল দশ দিন দশ রাত। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে এর সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে উল্লিখিত তিনটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

আর পরিত্রাণ সর্বনিম্নকাল নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানিফা, শাফেকি (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম আহমদ ও মালিকের একরেওয়ায়েত অনুযায়ী পরিত্রাণ সর্বনিম্ন কাল হল ১৫ দিন।

(নতুন আশেপাশে ১২৮০-২০৯)

আল্লামা ইবন কুদাদি, ইবন কুদাদি এবং আল্লামা নবী (রহ.) লিখেছেন যে, সংহু ও পরিত্রাণের সময় সম্পর্কে এই ব্যাপক মতবিরোধের কারণ হল, রেওয়ায়েতগুলো এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বিবরণ নেই। তাই ফুকাহাই কিরাম হ-হ পরিবেশের অভিজ্যুতা, চাকুরী দর্শন এবং প্রচলিত প্রথার দিকে লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা যাযালাই (রহ.) বলেছেন, সংহু এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে হানাফীদের প্রমাণ হয়ে আসিয়া, মুহাম্মদ ইবন জাবাল, আনাস, ওয়াসিলা ইবন আসকা ও আবু উমামা (রাও)-এর রেওয়ায়েত। এই রেওয়ায়েতগুলো যদিও কিছুটা দুর্বল, কিন্তু সুত্রাধিকের কারণে হাসানের স্কুর্ষ পৌঁছে যায়।

(নতুন আশেপাশে ১২১১-১২১২)

ইত্তেহাসাত (ইতেহাস) শব্দটি থেকে উদ্ভূত। বাবে ইতিফাকের মানসার। এর আতিথেয়িক অর্থ হল- রক্ষণদাত।

পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ বাহরুর রায়িক প্রভূতার বলেন।

-হা, তিনি যেন মাত্র মাত্র শীতল মনের মুরাদে লিখিয়া থাকে,
অভ্যন্ত, নারীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরের মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই ইজ্জেহায়া।

* ড. আ.ফ.ম. আবুকবর সিদ্দীক বলেন, হায়েখ অথবা নিফাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও যেসব কীলোকের রক্তপ্রায় হয়ে থাকে তাকে ইজ্জেহায়া (রক্তপ্রদর) বলে।

ইজ্জেহায়া ও মাসিকের রক্তের রঙ্গ ইমাম শাফেইঈ (রহ.)-এর মতে, শুধু লাল এবং কাল রঙের রক্ত হয়ে। এছাড়া অন্যান্য রঙ ইজ্জেহায়ার রক্ত। হামযাহাদের মায়াযাহাও এটাই। ইমাম মালিক (রহ.) হলুদ এবং মলিন রঙকেও হাযেখ সাব্যস্ত করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, মাসিকের সময়ে যে রঙের রক্তই বের হেক না কেন তা হাযেখ হিসেবে গণ্য হবে। তবে পরিকার সাদা প্রাপ্ত বের হলে সেটা হাযেখ নয়। উল্লেখ্য যে, হানাফী মতাবলম্বী হিদায়া প্রচুর বলেছেন, হাযেখের রঙ ছয় প্রকার।

যথা: কাল, লাল, হলুদ, মলিন, সবুজ ও মেটে। (দর্শন তর্ক, p.211)

ইজ্জেহায়াবস্তু মহিলার হুকুম: এরূপ মহিলার জন্য শরীয়তের হুকুম এই যে, তারা তাদের হাযেখ ও নিফাসকালীন পূর্ব নির্ধারিত স্বাভাবিক সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোসাল করে নিয়মিতভাবে নামায় আদায় করবে এবং প্রত্যেক নামায়ের জন্য তাদেরকে অনু করতে হবে। আপরপক্ষে যে সমস্ত মহিলার ঋষিভূতি হওয়ার প্রথম হতেই ‘ইজ্জেহায়া’ দেখা দিবে তারা শরীয়তের নির্ধারিত সময় (হানাফী মতে, হাযেখের জন্য ১০ দিন এবং নিফাসের জন্য ৪০ দিন সর্বোচ্চ) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসাল করে নামায় আদায় করবে। ইজ্জেহায়ার সময় সীমাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ এবং তাকে রমজানের রোয়াতা রাখতে হবে।

নিফাস নফস (নেফাস) শব্দটি আরবী। এটি নীফস য়নফস থেকে সিফাতের সীমা। যার অর্থ হল নেফাসবিশিষ্ট মহিলা। এর আছে আভিধানিক অর্থ হল, প্রসূতি-অবস্থা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

পরিভাষায় নেফাস বলা হয়, সন্তান প্রসবের পর মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্ত বের হয়।

(আলীবি, p.118)

সময়সীমা ও হুকুমে এ ব্যাপারে একটি রয়েছে যে, নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। এমনকি কোন মহিলার নেফাস নাও হতে পারে। কাজেই যখনই নেফাস থেকে পরিভাষা অঙ্কিত হবে (দু'একদিন বা দু'এক ঘন্টা হেক না কেন) তখনই গোসালস্থ নিয়মিতভাবে নামায় আদায় করতে হবে এবং নামায়ের স্থলে ব্যবহারও করতে পারবে। তবে নিফাসকালীন অবস্থায় যেসব নামায় ছেড়ে দিয়েছে এর কায়া আদায় করতে হবে না, কিন্তু রোয়াতা কায়া করতে হবে।
নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফেই, শাবী ও আতা (রহ.)-এর মতে, নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৬০ দিন। তবে ইমাম মালিক ও হাসান বসরী (রহ.) থেকে ৫০ দিনের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ হল ৪০ দিন। ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়াতেও তাই। ইমাম তিরমিপীর (রহ.) উক্তি মুতাবিক ইমাম শাফেই (রহ.)-এর মায়হাব এটাই।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলতঃ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন মারফু হাদিস নেই।

তাই ফকুহাহাবে কিরাম ব্য অভিজ্ঞতার আলোকে এসব সময় নির্ধারিত করেছেন।

অবশ্য হানাফী একক্ষেত্রে কিয়াসের পরিবর্তে হযরত উমেম্ম সালামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির উপর আমার কাছে অমুল করেছেন।

"... আমরা সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লালা (সাঃ)-এর সময় নেফাসপ্রতি হওয়ার পর মহিরার ৫০ দিন অথবা ৪০ তাতে অপেক্ষা করতেন।

রাবী বলেন, আমরা আমাদের চেহারার কান গায় উঠবার যাত্রা এক ধরনের 'ওয়ায়স' নামকৃত সুগম ঘাস ব্যবহার করতাম।

তায়াস্মুম

"... যাবৎ তৈম সাহি তায়াস্মুম

"... আমরা ইবন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট তায়াস্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একুশ হাতের তলু লাগিয়ে উভয় হাত ও মুখমুল্লা মাসেহ করবে।

বিশেষণঃ উক্ত অনুভূতি দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) তায়াস্মুমে মাটিতে করবার হাত লাগাতে হবে।
(২) উভয় হাত কত্তুকু পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।
প্রথম আলোচনায় তায়াস্যুমে মাটিতে কয়বার হাত লাগাতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতের বেদ রয়েছেঃ
* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আতা, মাকহুল ও আওয়ালি (রহ.)-এর মতে, মুখ এবং উভয় হাতের জন্য শুধু একবারই মাটিতে হাত লাগানো যেতে। দুইবার প্রয়োজন নেই।

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।
দলীল (২) হযরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) আম্মার (রা.)-কে বলেন—

... এমনা কান্ত ক্ষয় ও প্রভূ তষ্ঠিত যে চ্ছলে ইলাহ আল্লাহ উল্লাহ উস্তাদে ইলাহ আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ 

ফি ইমায়াম এবং বহারে জগতে ও রানি আল্লাহ—(বো দাউদ জ ১ ৫৪)। প্রথিত জে চোট মিতে নামে চোট মিতে

অর্থাৎ, ... তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের মাটিতে হাত লাগান। অতঃপর হাতে ফু দিয়ে মুর্যম এবং দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহ করেন।

উক্ত হাদিসেও দেখা যাচ্ছে, নবী করীম (সা.) মাটিতে একবার হাত লাগিয়ে মুর্যম এবং উভয় হাত মাসেহ করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, মুসফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, ইবরাইম নাখবি ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, মুখ ও উভয় হাত মাসেহ করার জন্য একবার মাটিতে হাত লাগানো যথেষ্ট নয়; বরং এককেটির জন্য আলাদাভাবে হাত লাগাতে হবে। অর্থাৎ, মোট দুইবার হাত লাগাতে হবে।

দলীল (৭) জাদুর তুমি লালিয়া শুরুক আল্লাহ উল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ

ও শরীয়তে দেরীতে তুমি মার্জাতে—(দার আনামীল ১:১৮১)

অর্থাৎ, জাদুর (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়াস্যুম একবার চেহারার জন্য হাত লাগাবে এবং আরেকবার কনুনই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত লাগাতে হবে।

দলীল (২) আম্বুলাহ ইবন উমর বানি (রা.) হতে বর্ণিত—

কান্ত তুমি আল্লাহ উল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ

নামে তুমি মার্জাতে—(সবদক্ক হাম্ম জ ১:১৭৯, দার আনামীল ১:১৮০)
আহকামুল হাদীস । ১১১ | পবিত্রতা অধ্যায়

অর্থাৎ, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, তায়াস্মুম হল দুইবার মাটিতে হাত লাগানো। একবার চেহারার জন্য, আর একবার কদমই পর্যন্ত হস্তঘোরীর জন্য।

দলীল ৪| আল্লাহ তাআলার বাণী-

قَبِيمُوا صُدُّيٰدا طَيِّبًا فَأَمَسِحُوا يَوْجُهُوْهُمْ وَأَيِّهِمْ

অর্থাৎ, ... তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াস্মুম করে নাও। (এর পদ্ধতি হল) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তঘোরীকে মাসেহ কর। (নিসান ৪৪)

উত্ত আয়াতে মুখমণ্ডল ও হস্তঘোরীকে আলাদাভাবে মাসেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর অযুতে যেহেতু একই পানি দিয়ে উভয় অঙ্কে মাসেহ করা জায়ে নয়, তেমনভাবে তায়াস্মুমের ক্ষেত্রেও একই মাটি দ্বারা উভয় অঙ্ক মাসেহ করা জায়ে নয়। কেননা, তায়াস্মুম হল অযুর হত্যাকাণ্ড। (تنظيم الاشتات ج ۱ ص۴۰۲)

জবাবঃ দলীল হিসেবে বর্ণিত হযত আম্মার (রাণ)-এর হাদীসদ্ব্য সংক্ষিপ্ত। এর বিস্তৃত বিবরণ আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে হযত আম্মার (রাণ)-এর বাণী দ্বারা জানতে পারি-

... قال عمر بن أبي الأسود المعميِّن آمَّة تذكَرُ إذ كَانَتُ آنَا وَأَنِتَ فِي الْأَبِيلِ فَاصْبَنِتَا

جَذَابَة فَأَمَّا آنَا فَتَسَمَّكَتْ الْحَجَّ (ابو داود ج ۴۶ ص۴۴، بخاري ج ۱ ص۸۸، مسلم ج ۱ ص۱۶۱)।

مجة ص۴۲)

অর্থাৎ, ... আম্মার (রাণ) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা সূরণ নেই, যখন আমি এবং আপনি উটের চারণভূমিতে ছিলাম, তখন আমরা উভয়ই অপবিত্র হই। এ সময় (পানি না পাওয়ার কারণে তায়াস্মুম দ্বারা) পবিত্র হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই।

আর এই সংবাদ যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট বললেন, তখন নবী করীম (সা) সংক্ষেপে উক্ত বাণী ইরশাদ করেন, যা প্রতিপক্ষ দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এর দ্বারা তায়াস্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তায়াস্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল। আর তাহলে এই যে, পোসল ফরয় অবহয় পানি না পেলে তায়াস্মুমের জন্য এভাবে জমির উপর
ঔদ্যোগিক অধ্যায়

গড়াগড়ি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি একবারই হাত লাগানো যশেষ্ঠ হত, তাহলে হযরত আমার (রা) থেকেই দুইবার হাত মারার অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হত না।

এমনই একটি উদাহরণ অন্য একটি হাদীসে পাওয়া যায়-

... এবং জবির ব্যস্ত অদৃশ্য দেখিয়া তাহ দেখিতে ছাড়িয়া যাইয়া রাসূল লা� ইলাহি সুলাই ইলাহি বিশেষ হন কথাগুলিই আতা আনা কোনো কোনো কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই 

মিন নাজাবাই ফিরতি রাসূল লাইলা সুলাই ইলাহি বিশেষ হন কথাগুলিই আতা আনা কোনো কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই আতা আনা কথাগুলিই 

ওয়াশার বিদ্যুত কিন্তু হাতের চাক্ষুস - (আবু দাউদ জ ১ সাল ৩২ পার্থি সাল ২৭ পাগল) 

অর্থাৎ, ... যুবারের ইবন মুত্তায় (রা) হতে বর্ণিত। সেদিন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঁ) - এর নিকট অপবিত্রতার গোসলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। (কেননা তাঁরা ফরয় গোসলে বীর্য কঠোরতা অবলম্বন করতেন।) তখন রাসূলুল্লাহ (সাঁ) বলেন, আমি তো আমার মাধ্যমে উপর তিনি পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন।

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এই নয় যে, ফরয় গোসলে শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট, অবশিষ্ট শরীর ধোয়া জরুরী নয়। এরপরতাবে হযরত আমার (রা)-এর হাদীসেও এই উদেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দুই হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট; বরং এর দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (দ্বিতীয় আলোচনাঃ তারামুমের ক্ষেত্রে উত্তর হাত কতটুকু মাসেহ করতে হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতান্তর রয়েছে।

* ইবন শিহাব যুহেরর মতে, উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-

... ফুটি ফুটি সত্য হাত দেখিয়া পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই ও হাত পাই 

উল্লেখ যে, আরুন আরামে উভয় হাত কনিষ্ঠ পর্যন্ত ধোয়ার কথা পবিত্র করার্কে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু অরুন আরামে মাসেহের ক্ষেত্রে শুধু হস্তমার্ণের কথাই উল্লেখ রয়েছে; কনিষ্ঠ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়নি। অতএব, পূর্ণ হাত মাসেহ করতে হবে।

দলীল (২) আবু ইয়াসির (রা) হতে পাই ও হাত পাই ও হাত পাই 

অর্থাৎ, আমার ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। ... অতঃপর তারা তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন।
* ইমাম আহমদ, ইস্হাক, আতা, অওয়াঈ ও ইবন মুনফিয়র (রহ.)-এর মতে, উভয় হাতের কড়ি পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

দলিলঃ প্রথম আলোচনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দ্বিতীয় দলিল দ্রষ্টব্য। উভয় হাদ্দিসে দুই হাতের কড়ি পর্যন্ত মাসেহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

কিয়াসী দলিলঃ পরিবর্ত কুরআনে আল্লাহ তাআলা চূরির শাস্তির বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- অর্থাৎ, পুরুষ চোর ও মহিলা চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। (মায়েদাহঃ ৩৮)
চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে, আর এর পরিমাণ হল দুই কড়ি। তারপর মাসেহের ক্ষেত্রেও গুহু হাত মাসেহের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর পরিমাণও হবে দুই কড়ি পর্যন্ত।

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী, হাসান, শাবি (রহ.) প্রমুখের মতে, তায়াম্মুনের ক্ষেত্র হল উভয় হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ করা।

দলিল (১)ঃ প্রথম আলোচনায় তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলিলসমূহ।

দলিল (২)ঃ

... عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى ﷺ

المُرْفِقِينَ (ابو داود ج1 ص47)

অর্থাৎ, ... আম্মার ইবন ইয়াসির (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাও) বলেছেন, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে।

জবাবঃ ইবন শিহাব যুহরী দলিল হিসেবে যে আযাত পেশ করেছেন, এর জবাব হল, আল্লাহ তাআলা আযুর ক্ষেত্রে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়ার বিধান বর্ণনা করে তায়াম্মুনের ক্ষেত্রে ফামসহও বোজোমক্ক রায়েকম ফাসি করেছেন। আর ইহা তো সুস্পষ্ট যে, তায়াম্মুন হল আযুর স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু আযুর ক্ষেত্র হাত ধোয়ার পরিমাণ “কনুই পর্যন্ত” উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং তায়াম্মুনের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

বিশেষভাবে জবাবঃ উক্ত হাদ্দিসটি সাহাবগণের আমল। যেখানে পাঁচটিও অধিক মারফু হাদ্দিস দ্বারা কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার প্রমাণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সাহাবগণের আমল দলিলসমূহ নয়। তাছাড়া আম্মার ইবন ইয়াসার (রাও) থেকেও কনুই পর্যন্ত মাসেহের হাদ্দিস বর্ণিত আছে।
নাযিম তায়ামুম হয়তো এল্মাব্ব বেধে সে যুটি ছাইসাগী সালতানে। তাহাদের আদায়ের পর ওয়াক্ফ থাকতে সই পানিপাওয়া গেলে আবু সাইদ আল-খুদ্দরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদান দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামায়ের সময় উপনীত হওয়ায় তারা পানি পাওয়ায় তায়ামুম করে নামায় আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামায়ের সময়ের মধ্যে পানি গ্রাহ হওয়ায় তাদের একজন অমু করে পুনরায় নামায় আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায় আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বাধিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (সা) বলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি নামায় পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্মত মোতাবেক কাজ করে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি অমু করে নামায় আদায় করে তার সম্পর্কে বলেন, তুমি বিশ্ব সওয়ারের অধিকারী হয়েছ।

বিশেষণে প্রথম আলোচনাতঃ তায়ামুম করে নামায় শুরু করার পর যদি নামায় থাকতেই পানি পাওয়া যায় (যেমন কেউ পানি নিয়ে আসল) তবে দাউদ যাহেরীর
মতে, নামায় ছাড়বে না; বরং এমতাবস্থায়ই নামায় শেষ করবে। তাঁর মতে এমতাবস্থায় নামায় ভেঙে দেয়া হারাম।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী -

লা নিব্দেরা আমালক”

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আমলকে বাতিল (বিনষ্ট) করো না। (মুহাম্মদঃ ৩৩)
অতএব এমতাবস্থায় নামায় ভঙ্গ করা আমলকে বাতিল করার শামিল। ফলে ইহা হারাম।

* চার ইমামের মতে, এমতাবস্থায় নামায় ভেঙে দিয়ে পুনরায় নামায় আদায়ের জন্য অযু করা ওয়াজিব।

দলীলঃ নিদিম্প সময়ের মধ্যে পানি থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার আদেশ হল-

যাচ্ছে তা তোমরা আমল বাতিল করবেন যদি কেউ ফাগস্লা ও জোহুক নাম করেন।

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামায় দাড়াও তখন মুখ ধৌত কর ... 
(মায়েদাহঃ ৬) সুতরাং এর উপর অবশ্যই আমল করতে হবে।

জবাবঃ দাউদ যাহের যে আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এর উত্তর হল, এমতাবস্থায় নামায় ছড়ে দেয়া বাহিকভাবে যদিও আমল বাতিল (বিনষ্ট) হওয়া বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটাই আমলের পরিপূর্ণ রূপ।

বিভিন্ন আলোচনাঃ কোন ব্যক্তি নামায় আদায়ের নিমিত্তে তায়স্মুম সম্পন্ন করেছে, এমন সময় পানি পাওয়া গেল, তখন এর হুকুম কি, এ নিয়ে মাতৃনিত্য রয়েছে?
* দাউদ যাহের মতে, অযু করা ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে তায়স্মুম বাতিল হয়ে যাবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেন, এটা আল্লাহ তাআলার বাণী -

লা নিব্দেরা আমালক”

এর পরিপূর্ণ। কেননা, তায়স্মুমও তা এক প্রকার আমল।

* চার ইমাম সহ জমকুরের মতে, এমতাবস্থায়ও আল্লাহ তাআলার হুকুম আদায়ের নিমিত্তে অযু করা ওয়াজিব।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাণী -

যাচ্ছে তোমরা আমল বাতিল করবেন যদি কেউ ফাগস্লা ও জোহুক নাম করেন।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামায় দাড়াও তখন মুখ ধৌত কর ... 
(মায়েদাহঃ ৬)

জবাবঃ এখানেও প্রত্যক্ষ ও বাহিকভাবে যদিও আমল বাতিল করা হচ্ছে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে আমলকেই পরিপূর্ণ করা হচ্ছে।
জন্মআর দিনের গোসল

মুম্ব বাবুর ইফ্রিদাল জন্মবাদ লিখিতে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, একদিন খয়ের হামিদ ইবনে ইবনে হামিদ (রাঘ) জন্মআর খুঁতন দিয়েছিলেন। এমন সময়ে সেখানে এক বাক্য প্রবেশ করে হামিদ (রাঘ) তাঁকে বলেন, তাওমরা কি নামায়ে আসতে দেখি? তখন আপত্তিকে বাক্য (হয়রাত উসমান রাঘ) বলতেন, আমি তো আযান হেন অযু করলাম। হয়রাত উমর (রাঘ) বলেন, শুধু কি আয? আর কিছু? তুমি কি রাসুলুল্লাহ (সাবে) কে বলতে পেলেন অনেক, যখন তোমাদের কেউ জন্মআর নামায়ে আদায়ের ইরাদা করে, সে যেন গোসল করে।
বিশেষণঃ জুমুআর নামাখানের জন্য গোসল করা ওয়াজিব নাকি সুন্দর, এ নিয়ে দুর্দিন মাঝে মতত্বের পরিলক্ষিত হয়।
* দাউদ যাহেরীর মতে, জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

ধলীল (১) অনুসারে দুর্দিনের গ্রুপের বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে উল্লেখ আছে-

এই বন্ধুর সেরা জমিদারী ফেলিছেন।

ধলীল (২) অনুসারে, বন্ধুর সেরা জমিদারী ফেলিছেন।

যাদু হিসাবে ওঠে তালুকীর কাছে (ব্যা. বাদুজ জিভ, চলি ১ চলি, নেসা ২০, সি. ১৪) বলেছেন, ন্যায় প্রাপ্ত বয়স্ক বন্ধুর জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

৪. বর্ণিত হাদিস সহ দুর্দিনের ব্যাখ্যাও প্রতীক্ষিত হয় যে, জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

* চার ইমাম ও জমহুরগণের মতে, জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব।

ধলীল (১) অনুসারে...

* ইমাম ও জমহুরগণের মতে, জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব।
দলীল

... উনি সম্রাট কাফেল সুলতান, যিনি সালাম করলেন, নেতাতে আত্মীয় সম্মান উপস্থাপন করেন। (২)

বিশেষত তিনি নিজের সাথে পরিপ্রেক্ষিত করেন না, তিনি সমাজের জন্য কর্মদাতা হন। (৩)

তবে কাফেল সম্পর্কে কথা বললেন, তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। (৪)

দলীল

... উনি সম্রাট কাফেল সুলতান, যিনি সালাম করলেন, নেতাতে আত্মীয় সম্মান উপস্থাপন করেন। (৫)

বিশেষত তিনি নিজের সাথে পরিপ্রেক্ষিত করেন না, তিনি সমাজের জন্য কর্মদাতা হন। (৬)
অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করত এবং ঐ সমস্ত পরিধেয় বন্দ পরিধান করেই মসজিদে যেত। তাদেরকে বলা হল (নবী করীম সাঃ বলেন), যদি তোমরা গোসল করে মসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত)।

উপরের বিবর্ধিত হাদিসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, জুমুআর দিনে গোসল করা মুতাহাব, ওয়াজিব নয়।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) যদি জুমুআর গোসল ওয়াজিব হত, তাহলে হযরত উসমান (রাঃ) কথনো গোসল পরিহার করতেন না এবং হযরত উমর (রাঃ)ও তাঁকে ফিরে গিয়ে গোসল করে আসার নিদেশ দিতেন। যেহেতু তা করেনি, অতএব বুঝা যায়, গোসল ওয়াজিব নয়।

(২) অথবা, ফ্লিগসল বলে এখানে মুতাহাব হিসেবে হুকুম দেয়া হয়েছে, ওয়াজিবের জন্য নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ এমনও হতে পারে, হুকুমটি ওয়াজিবের জন্যই ছিল, কিন্তু পরে মানসূখ হয়ে গেছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জমিনুরের পক্ষে বর্ণিত প্রথম দলীল দ্বারা।

কাপড়ে বীর্য লাগলে


অনুবাদঃ ... আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত। আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাঃ (রাঃ)-এর কাপড় হতে মনী (বীর্য) ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতেন।

বিশেষণঃ বীর্য পবিত্র না অপবিত্র, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম শাফেক্ত, আহমদ ইবন হায়ল ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বীর্য (মনী) অপবিত্র নয়।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস।
দালীল

... উন্নত হয়ে উঠালনে আল্লাহ কান ইলাহে আদাইয়ায় ফাহত্তল মাসুরতে (২) 

জারিয়া লুরাশে শত যুগস তার জন্য যে তোমার স্বাক্ষর তোমার তোমরা ফাহত্তল উন্নত অস্ত্রে 

ফালাত লসু রায়িতিনি আনাহ বার্ক তোমার স্বাক্ষরের আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব 

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

অর্থাৎ, ... হাম্মাম ইবন হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াশা (রাঃ)-এর মেহমান 

ছিলেন। তার সপ্তমোর হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীর্য হৌস করেছিলেন। তা 

আয়াশা (রাঃ)-এর বাঁধি দেখে তাকে (আয়াশাকে) অবহিত করেন। তখন আয়াশা 

(রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড় হতে তা খুঁটে তুলে ফেলে দিতাম। 

উপরের বিখ্যাত হাদীসসম্বন্ধে বীর্য খুঁটিয়ে বা বর্ণে তোলার বিবর্ধ রয়েছে। অতএব, বীর্য 

যদি নাপাকই হত, তাহলে খুঁটিয়ে তোলা বা বর্ণে তোলা যথেষ্ট হত না; বরং রকের 

ন্যায় খোয়া জর্জুরী হত।

দালীল

(৩)

(৩) উন্নত হয়ে উঠালনে আল্লাহ কান ইলাহে আদাইয়ায় ফাহত্তল মাসুরতে (২) 

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) সুক্তে মারফু আকারে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বীর্য (যদি) কাপড়ে লেগে যায় (তাহলে কি 

করবে?) উত্তর তিনি বলেন, এটা তো শেখার মত। 

ইমাম শাফেকে (রহ.) বলেন, উপর হাদীসে বীর্যকে নাকের শেখার ন্যায় বলে পরিসর 

সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তা অপবিত্র নয়।

দালীল

(৫) তঁর ছন্দে বলেন ইমাম শাফেকে (রহ.) বলেন, অসংখ্য আম্বিয়া কিরামের জন্মের মূল 

উৎস হল বীর্য। অতএব, পরিসর এই মানুষগণের মূল উৎস বীর্যকে কিভাবে নাপাক 

বলতে পারি? (কাপাব ইমান)

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য 

নাপাক বলেন 

(৫) তাহলে আল্লাহ বলেন স্বত্নম হল কান রসূল আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব 

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য 

নাপাক বলেন 

(৫) তাহলে আল্লাহ বলেন স্বত্নম হল কান রসূল আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব 

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য 

নাপাক বলেন 

(৫) তাহলে আল্লাহ বলেন স্বত্নম হল কান রসূল আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব 

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য 

নাপাক বলেন 

(৫) তাহলে আল্লাহ বলেন স্বত্নম হল কান রসূল আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব 

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য 

নাপাক বলেন 

(৫) তাহলে আল্লাহ বলেন স্বত্নম হল কান রসূল আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব 

(১৪) সুলতান চ ১ (১৩)

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, বীর্য 

নাপাক বলেন 

(৫) তাহলে আল্লাহ বলেন স্বত্নম হল কান রসূল আল্লাহ চালীর স্বামী, স্বত্নম (বো দাঁব
অর্থাৎ, ... মুহাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনি বলবেন যে, তিনি তাঁর বোন এবং রাসূল সাহাবাও (সা) এর পুত্রী সুমস্তা হাবিবা (রাজ) কে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী সহকারে পরিচিত বলে নবী করিম (সা) কি নামাজ পড়তেন? তিনি বলবেন, হাঁ পড়তেন, যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন।

উল্ল হাদীসে বীর্যযে নাপাক বলা হয়েছে।

"অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার-এর সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলবেন, আমি আরিশা (রাজ)-কে বলতে অনেকি যে, তিনি (আরিশা) রাসূল সাহাবাও (সা)-এর কাপড় হতে মনী (বীর্য) হোক করতেন। তারপ্রতি বন্দ্যের উপর ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হত।

অতএব, মনী যদি পবিত্রই হত, তাহলে ধোয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দলীল (৩): হানাফীমের প্রমাণ সেসব রোগোয়ারেরও যাতে বীর্য কুইটিয়ে, যে বা দলে তোলা কিংবা ধুয়ে তা পরিকার করার নিদর্শ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত রোগোয়ারের থেকে প্রমাণিত হয় যে, বীর্য কাপড় রেখে দেয়া তিনি বর্দমান করতেন না। যদি এটি নাপাক না হত, তাহলে তো কোথাও না কোথাও বৈবিধ্যতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হত যে, বীর্য কাপড় বা দেখে রেখে দেয়া হয়েছে অথবা যা নিয়ে নামাজ পড়েছেন। এবং নুন তম পক্ষ বৈবিধ্যতা বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাবান্ত করা হত। অথচ গোটা হাদীস ভাঙ্গার কোথাও এর নবীর নেই। অতএব, বীর্য পবিত্র নয়।

দলীল (৪): পবিত্র কুরআনে বীর্যকে "তুচ্ছ পানি" বলা হয়েছে। এটাও অপবিত্র হওয়ার সহায়ক।

আকলী দলীলঃ পেশাব, মসী, ওয়াদী সবই সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। অথচ এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে অমূল্য ওয়ার্জিব। অতএব, বীর্য আরো অধিক নিয়ন্ত্রিত নাপাক হওয়ার উচিত। কেননা, এর ফলে পেসাল ওয়ার্জিব হয়। (দুর্বলতা চৌকি ১ পৃষ্ঠা ২০৫)

জব্যাি প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জব্যাি নাপাক জিনিসের পাক করার পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো পাক করার জন্য ঘোষে করা আবশ্যক, আবার কখনো
ধৌত করার প্রয়োজন নেই। যেমন- মাটি বা জমি শুক্র হওয়ার সাথে সাথেই পাক হয়ে যায়। ধৌত করার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে তুলা পাক করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ধুনে ফেলা। আর বীর্য মিশ্রিত কাপড় বা ঠান পাক করার একটি পদ্ধতি হল, বীর্যকে খুঁটি বা ঘষে তুলে ফেললেন। কিছু শর্ত হল বীর্য শুক্র ও ঘন হতে হবে। যদি ভিজা এবং পাতলা হয়, তাহলে অবশ্যই ধুতে হবে। যা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে।

قَالَتْ كَانَتْ آفَرُكَ الْمَلِيِّيَّ مِنْ نُوحٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَأَغْسِلَهُ إِذَا كَانَ رَأْبِطًا- (إِثْرُ السَّنَةِ 141 ص 111, المغني ج 1 ص 126)

অর্থাৎ, আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা�)-এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটা শুক্র থাকত। আর ধুয়ে ফেলতাম, যখন ভিজা হত। সুতরাং শাফেয়াদের পক্ষে প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিসে বে বীর্য ঘষে তোলা হয়েছে, এটি ছিল পাক করার একটি পদ্ধতি। যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে।

প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, বাংলাদেশসহ বর্তমানে সরা বিশেষের মানুষের বীর্য ঘেতু পাতলা, সেমতে কাপড় বা শরীরে লাগলে তা ধৌত করা বা পাক করার অন্য কোন পদ্ধতি নেই।

তৃতীয় দলিলের জবাবঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকেই বিশ্ব্ব সূত্রে বর্ণিত আছে-

قَالَ إِذَا أَجْنَبُ الرَّجُلُ فِيُنَوبٍ فَقُرَأَ فِيهِ أَنْ لاَ يُرِى أَثْرًا فَلْيَغِسَلْهُ وَأَنَّ لَمْ يَرْأَ أَثْرًا فَلْيِنْضَحَهُ- (مَسْنُونَ ابن ابن طيبة ج 1 ص 82)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন একটি কাপড় পড়ে অপবিত্ত হয়, অতঃপর তাতে এর নিদর্শন দেখে, তবে সে যেন অবশ্যই তা ধৌত করে। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেন হালকাধুলে ধৌত করে।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর নিকটও বীর্য নাপাক। অতএব, এই বৈপরীত্য অবসানের জন্য "الملع بعندلة المخاط" বাক্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যথা-

(ক) কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয়; বরং উপমার কারণ হল, বীর্য শ্লেষ্মার মত আঁটালো বা পিছিল হওয়া।

(খ) আয়ার কেউ কেউ বলেছেন, তুলনা দেয়ার উদ্দেশ্য হল, নাকের শ্লেষ্মা যেমন সুভ তবিতে ধূমা জমায়, তেমনিভাবে বীর্যেরপক্ষে মূর্তার উদ্দেশ করে।


বাবে বোল সাব্বক বিস্বত নিয়ম চিন্তা ।

শিষ্টদের পেশায় কাপড়ে লাগলে

... অন্তর্নিহিত মহুয়স্ত বিরল আত্মা ইন্দ্রিয় স্বর্ণপ্রশস্ত নিয়ম যাকে অচেতন মেলাতে ঢুকে।

রসূল মক্কা নিয়ম তার উপরে ইস্লাম বিশ্বাস নিয়ম ফাজিলতে রসূল মক্কা নিয়ম ইস্লাম নিয়ম খাঁজ।

হে মহারাজ! আরোহন দৃষ্টি দেওয়া এবং ফলে নিঃশ্বাস বিনষ্ট হওয়া নিঃশ্বাস বিনষ্ট হওয়া।

খারাজি চুক্তি ১ সুফি ৩৫ বল ইস্লাম, মসলমান ১ সুফি ১৩৯ বল হক বল তেল বল, তুন্দ ১ সুফি ২১ বল নষ্ট বল তেল বল নষ্ট।

নসাইব ১ সুফি ৫৬ বল ইস্লাম, বসন্তের মেঝ ৪।

অনুবাদঃ ... উদ্ধে কায়েন বিনত মিহীসান (রাও)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর দুর্দশোষা শিষ্টকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাৰু)-এর বিদমতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাৰু) শিষ্টের কোর্সে নেয়ার পরে সে তাঁর কাপড়ে পেশায় করে দেয়। অতঃপর তিনি পানী আনিয়ে কাপড়ের উত্স হামে দিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা ধোত করেননি।

বিশেষ্যঃ দাঊদ যাহের মতে, দুর্দশোষা ছুলে শিবির পেশায় পাক। কিন্তু অন্য সকলের মতে দুর্দশোষা ছুলে শিবির পেশায় না। তবে ছুলে শিবির এবং মেঝে শিবির পেশায় পরিবেকার পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেই, আহমদ ইবন হামল, ইতনাক, হাসান বসরি ও আতা (রাও)-এর মতে, ছুলে শিবির পেশায় ধোয়ার পরিবর্তে এর উপর পানী ছিটিয়ে দেয়া যেত।

তবে দুর্দশোষা কন্যা শিবির প্রসার বৌত করা জরুরী।
দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২): বা বাবা বিন হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) রাসূল লাহাম (সাঃ)-এর কোলে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর (সাঃ) কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বলি, আমি আন্ন একটি কাপড় পরিধান করতে এবং এই কাপড় দুটি আমাকে খোদ করতে দিন। রাসূল লাহাম (সাঃ) বলেন, মেয়ে শিশুর

পেশাব কাপড়ে লাগলে তা খোদ করতে হয় এবং হেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।

উল্লিখিত হাদিসের আলাদা বিভাগে দুর্দোপোয়া হেলে শিশুর পেশাব থেকে কাপড় পাক করার জন্য হাদিসে নষ্ঠা ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ ছিটানা।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সান্দ্র ইবনুল মুসায়েব, ইবরাহীম নাখসী ও সুফিয়ান

সাতোরী (বহ.)-এর মত, কন্যা শিশুর পেশাব ন্যায় হেলে শিশুর পেশাব থেকে খোদ করার জন্য। পুনরায় পানি ছিটালেই পাক হবে না। অবশ্য দুর্দোপোয়া হেলে শিশুর প্রসার অধিক খোদ জন্য নয়; বরং সামান্য খোদাই যথেষ্ট। (উল্লিখিত ১ স. ৮৮৯)

দলীল (১): নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেন:

ইস্তেরোহা ফান বাহাল উত্তাহার ফুলে মনে- (স্থানক হাকিম ১ স. ১৮৩, মুরাফ

(সন ১ স. ২৭৫))

অর্থাৎ, তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাক। কেননা, কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণে হয় থাকে।

দলীল (২): হযরত আমার (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদিস। এতে উল্লেখ রয়েছে:

ইমান তেগ্রুর ফুলক হন বাহাল (নজমুল আহসান ১ স. ১৩৩, ডোর্স মশকুল ১ স. ১১৪)

অর্থাৎ, পেশাব লাগলে তোমার কাপড় খোদ করবে।

উল্লিখিত হাদিসের আলাদা বিভাগে প্রশাসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। হেলে শিশুর পেশাব

হেক বা কন্যা শিশুর পেশাব হেক, মানুষের পেশাব হেক বা অন্যান্য জীবজন্তুর
পেশাব হোক, বালেগের পেশাব হোক বা নাবালেগের পেশাব হোক, আমাদের বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, হাদিসের এই ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, ছেলে শিতর পেশাব এবং কন্যা শিতর পেশাবের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না, রবি শকিরের পেশাবই ঘোষ করা জরুরী।

দলীল

৩. বিচারে পারস্তন ছত্তী চিহ্নের অর্থেই ব্যবহৃত হয় না; রবি গোল করা যা ঘোষ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অতএব, নতুন সহ অর্থ হবে হামারকাহাবে ঘোষ করা। আর জন্য হল শে নিয়ম বা বালবাবে ঘোষ করেননি। আর হাফাফিরে তা একথা স্বীকার করে যে, ছেলে শিতর পেশাব হাদিসের ধুলে পাক হয়ে থাকে। উল্লেখ যে, এখন শব্দটি যে ঘোষ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর উদাহরণ হাদিসেই পাওয়া যায়। হযরত আলী (রা) বলেন যে—

"আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-কে নবী করিম (সাহ)-এর নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি নবী করিম (সাহ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের মরি বের হলে কি করবে? জবাবে নবী করিম (সাহ) বললেন, তুমি অধ কর এবং তোমার লজজাহান ঘোষ কর।

উক্ত হাদিসে মরি বের হলে লজজাহান ঘোষ করার কথা বলা হয়েছে। এবং শাকী মায়াহাবের অভিজ্ঞতাতে এই যে, মরি বের হলে লজজাহান ঘোষ করার হবে, শুধু পানি ছিটানা যথেষ্ট নয়। অথচ স্বয়ং শাকী (হর) উক্ত হাদিস ঘোষ শব্দটির অর্থ করেছেন ঘোষ করা, ছিটানার অর্থ গ্রহণ করেননি।"
নামায় ওয়াক্সসমূহ

৫৬

নামায় ওয়াক্সসমূহ

محمد হাদিয়া ওয়াক্সসমূহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ জিবরাইল (আঃ) বায়তুলাহ শরীফের নিকটে দুইবার আমার নামায় ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন, যখন সূর্য পশ্চিমকাশে সামন্যা ঢলে পড়েছিল এবং জুতার এক কিতা পরিমাণ সামান্য ছায়া বায়তুলাহর পূর্ব দিকে দেখা গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বক্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায আদায় করেন- যখন রোয়াদার ইফতার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় একার নামায আদায় করেন, যখন পশ্চিমকাশের লাল শুভ রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফজরের নামায আদায় করেন, যখন রোয়াদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হওয়া হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায ঐ সময় আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বক্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের নামায আদায় করেন, যখন প্রত্যেক বক্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরেবের নামায আদায় করেন যখন রোয়াদার ইফতার করে। পরে তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের নামায ঐ সময় আদায় করেন, যখন দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে লক্ষ্য করে।
বলেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্ববর্তী আহ্মদের জন্য এটাই নামায়ের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই নামায়ের সময়।

বিশেষণগুলি উপরালিখিত হাদিসের আলোকে প্রশ্ন উত্তরপন্থা হয়ে যে, নিঃসংদেহে হযরত জিবরাইল (আঃ)-এর তুলনায় নবী করিম (সাঃ) আফজল বা উত্তম। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাইল (আঃ) কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে উত্তম না হয়ে ইমামতি করার সংক্ষেপে এর জবাব হল—

(১) হাদিসে শব্দ উল্লেখ আছে, যার অর্থ হল, হযরত জিবরাইল (আঃ) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন এবং হযরত জিবরাইল (আঃ) মুকাদ্দি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নামায়ের তালিম দিয়েছেন।

(২) অথবা, যদিও নবী করিম (সাঃ) উত্তম, কিন্তু এ সময় জিবরাইল (আঃ) একটি অংশ বিশেষে অতিক্রম জন্য ছিলেন।

(৩) অথবা, তিনি নামায়ের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন দিতে এসেছিলেন বলে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এতে নবী করিম (সাঃ)-এর প্রেরণাষ্ঠের কোন হানি হয় না।

(৪) সাধারণত তুলনামূলক কম মর্যাদাধীন ব্যক্তির ইমামতি করা দূষণীয় নয়। আর এখানে নবী করিম (সাঃ) যদিও জিবরাইল (আঃ)-এর তুলনায় উত্তম ছিলেন, তাতে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু, নবী করিম (সাঃ) অতিমাত্রে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। এমনিভাবে রাবির (সাঃ) আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ)-এর পিছনেও নামায আদায় করেছেন।

(ابو داود ج1 ص20 باب المسح على الخفين)

যুহরের নামায়ের শেষ সময় ও আসরের নামায়ের প্রথম সময়ঃ যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢালে পড়ার সাথে সাথে যুহরের নামায়ের সময় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যুহরের শেষ এবং আসরের নামায শুরু হওয়ার সময় নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেকী, আহমদ ইবন হায়ল ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, এক মিসর তথা যখন প্রতীক বক্তা যায় যে বক্তা হয়ে এক শুরু বৃহৎ পার্বত্য তখন যুহরের সময় শেষ এবং আসরের নামায়ের সময় শুরু হবে।

(فتح العلم ج1 ص191)

দশেটঃ

... উন্নৎ উচ্চ আর স্মরণ কর, জ্যোৎস্না আর ফালত আশুৎসা এরা আল্লাহর সম্মতি হয় ।

ওকান আলির ধর্মী করে ইমাম আলোয়া এ মূল অর্থ দেওয়া কী ইন্দির মূল অর্থ দেওয়া হয় ।

(سلم ج1 ص232 بابِ اوقاتِ الصلاةَ)

(الخمس)
দলীল (২) আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

... এই বলতে হলে কোনো নিয়ম নেই, কিন্তু আমরা এটি প্রকৃতপক্ষে করতে পারি। প্রথমে তুমি তোমার সঙ্গে একটি দৃষ্টি করি।

যে প্রথমে তুমি থাক এবং পরে তুমি যাও এবং তুমি তোমার সঙ্গে একটি দৃষ্টি করি।

বর্ষার মাঝে তোমার তোমার সঙ্গে একটি দৃষ্টি করি।

(বোদ্ধসারি বলে)- এটি একটি বাক্য যা তোমার তোমার সঙ্গে একটি দৃষ্টি করি।

অর্থাৎ, যে আবু বুয়ারাজ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) হতে বর্ণিত।
উপরোক্তিতে হাদীসের সময় যুহুরের নামা পড়ার সময় হয় না। তাছাড়া বুকারীতে বর্ণিত আছে, অর্থাৎ তিনি এমন সময় যুহুরের নামায় পড়েছেন, যখন দেখিয়ে তিনি এক মিসল পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। জ্যাভিশ।

(নেনসি চৈ ২২৩ স) (১) আল্লামা উসমানী (রহ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত আছে, যুহুরের প্রথম সময়ের কথা, যা আল্লাহর কথা বলা হয়।

(২) অন্যদিকে, উক্ত হাদীস নামায় সময়ের ব্যাপারে বিশেষ বিবরণ সহলিত হয়।

(৩) অন্যদিকে, উক্ত হাদীসে উত্তম ও সত্তরতামূলক সময় বর্ণনা করা উচিত।

(দ্রুস মস্কো জো নো ছো (১২) স)

প্রাচীন আলাওচনার উল্লেখে থেকে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সূর্য পশ্চিম আধারে চলে পড়ার পর যদি কোন বিশ্ব হয়, তাহলে আসার ওয়াকদ শুরু হয় যাবে। এবং তখন যুহুরের নামায় সময়ও বাকি থাকবে। সুতরাং তাঁর মতে, এই এক মিসলে সময় হচ্ছে যৌথ সময়।

(দ্রুস মস্কো জো নো ছো (১২) স)

দালিলঃ হাদীসে জিবরাঙীল (আঃ)-

... صلى بي العصر (في اليوم الأول) حين كان ظله منه وصلى بي الظهير (في اليوم الثاني) حين كان ظله منه—

(নুবাদেদের শুরুতে পূর্ণ হাদীসটির অর্থ দেয়া হয়েছে)

উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একই মিসলে যুহুর ও আসার উত্তর ওয়াকদের নামা আদায় করেছেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমুনর ইমামগণের মতে, যুহুর ও আসার ওয়াকদের মধ্যে কোন যৌথ সময় নেই। বরং যুহুরের সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আসার সময় শুরু হয়ে যাবে।

(দ্রুস মস্কো জো নো (১২) স)
আনুমানিক ১৩০
নামায অধ্যায়
দলীল
আল্লাহ বিশ্বাসিন হাদিসে বলেছেন যে সে বিশ্বাসিন হাদিসে বলেছেন যে সে বিশ্বাসিন হাদিসে বলেছেন যে সে বিশ্বাসিন হাদিসে বলেছেন যে সে 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল যা 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব ছিল 
ক্তি তার মুহতর গুরুত্ব 
ক্তি তার মুহতর 
ক্তি তার 
ক্তি তার 
ক্তি তার 
ক্তি তার 
ক্তি 

cতেহ হে মহলাহ সিরাজ আল্লাহ করেন। নবী করিম (সা) ইরশাদ বলেন, নবী করিম (সা) ইরশাদ বলেন, নবী করিম (সা) ইরশাদ বলেন, নবী করিম (সা) ইরশাদ বলেন,

লিখিত এতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন,

... আয়ত। .. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, নিশ্চিত নামায়ের গুরু ও শেষ সময় আছে। যুহোরের নামায়ের প্রথম সময় হল,

খো সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে গুরু করে। আর শেষ ওযাক্ত হল, যখন আসরের ওয়াক্ত গুরু হয়।

... বিভিন্ন উদ্যোগে তারা নামায়ের তারা নামায়ের তারা নামায়ের তারা 

... আয়ত। .. আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আসরের নামায়ের সময় আরবের পূর্ব পর্যন্ত যুহোরের নামায়ের সময় অবশিষ্ট থাকে এবং সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামায়ের সময় থাকে।

মাগরিবের নামায়ের সময় হল পশ্চিম আকাশের শাফুক অজ্ঞাত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এশার নামায়ের ওযাক্ত রাতের অধিক সময় পর্যন্ত এবং সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামায়ের সময়।

সুতরাং উপরোক্ত বিবিধ মূল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৌখিক সময় বলতে কোন ওযাক্ত নেই।

জবাবঃ হাদিসে জিবরাইলের জবাবঃ ১৮ জমুয়রের পক্ষে দলিল হিসেবে বর্ণিত তৃতীয় হাদিস দ্বারাত মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা উক্ত হাদিসে প্রত্যেক নামায়ের সময় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
(২) প্রথম দিন আসরের নামায় আরম্ভ করেছিলেন যখন প্রত্যেক বস্ত্র ছায়া তার
সম্পরিমাণ ছিল এবং পরের দিন যুহুরের নামায় শেষ করেছিলেন এক মিসাল
হওয়ার সাথে সাথেই। যদিও বাংলিকভাবে উল্লেখিত একই ওয়াকফ হয়েছিল বলে
মনে হয়, কিন্তু উল্লেখিত ওয়াকফ ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

* (হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্ববর্তী আমিয়াদের
জন্য এটাই নামায়ের নির্ধারিত সময়) বাংলা বাণ্ডা-
উল্লিখিত বাংলা একটি প্রশ্ন জানে যে, এই পাঁচ ওয়াকফ নামায় কি তাহলে সকল
নবীর সময়েও ছিল? অথচ আমরা জানি যে, তা কখনো ছিল না। বরং হযরত
আরিশা (রাও) হতে বর্ণিত হাদিসে পাই, হযরত আদম (রাও)-এর বেহেশত থেকে
নির্দেশনার পর ফজরের সময় তাঁর তবও কবল হলে তৎক্ষণাৎ তিনি দুই রাকাত
নামায আদায় করেন। সেখান থেকেই ফজরের নামাযের সূচনা। আর যখন হযরত
ইবরাইম (রাও) ব্রীয় পুরুষ ইসমাইল (রাও)-কে যুহুরের সময় কুরআনী করতে
 পারেননি; বরং বেহেশতী দুষ্ক্রীয়া হলে তখন তিনি শুরু হযরত রাকাত
নামায আদায় করেন। তখন থেকেই যুহুরের চার রাকাত নামায শুরু হয়। হযরত
উওযর (রাও) একশত বছর মৃত থাকার পর যখন আলাহ তাআলা আসরের সময়
জীবিত করলেন, তখন তিনি শুরু হযরত আপন পূর্বক চার রাকাত নামায আদায
করেন, তখন থেকেই আসরের চার রাকাত নামাযের প্রচলন হয়। মাগরবের সময়
হযরত দাউদ (রাও)-কে কথা করা হলে তিনি শুরু হযরত রাকাত চার রাকাতের নিয়ত
করে তিন রাকাত আদায়ের পর কামায় ভেঙে পড়েন। বাকি এক রাকাত আর
আদায করতে পারেননি। সেখান থেকেই মাগরবের নামায তিন রাকাত হিসেবে
পড়া হয়। (তৃতীয় হাদিস ১১ সং)-

আর আমাদের নবী করিম (সাহং) সর্বপ্রথম এশার নামায আদায় করেন। যেমন
হাদিসে এসেছে-

... উন্মুক্ত বন জিলে ... ফেকাল আহ্মারী ইহাদের স্থিত ফালক্রম ক্ষুবৃতে তিন ইহার
সাদর আর তম নামায ফালক্রম - (খোদাদুল 1 সং ১২ বাব বিশ্ব আহ্মদের আর্থল)
অর্থাৎ, ... মুহাম্মদ ইবন জাবাল (রাও) সূত্র বর্ণিত। ... নবী করিম (সাহং) ইরাষাদ
করেন, তোমরা এই (এশার) নামায বিলায় আদায করবে। কেননা, এই নামাযের
কারণেই অন্যান্য উম্মতগণের উপরে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে কেন
নবীর উম্মত এই নামায আদায় করেনি।

উল্লেখ যে, পূর্ববর্তী নবীগণের সময় এশার নামায ছিল না, কিন্তু এ হাদিস দ্বারা
সকল নামাযেরই বুধানো হয়েছে। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবন হাজার
অসকালায়িন (রহ.) বলেন, হাদিসে যে কোনও বলা হয়েছে তা বহুবচনের জন্য-পৃথকীকরণ বুঝানোর জন্য নয়।

* আল্লাহ বায়াতী (রহ.) বলেন, এশার নামায় পূর্ববর্তী নবিগণের উপর ফরম ছিল না। কিন্তু নবি গণ্ড বিরল হিসেবে আদর্শ করতেন। এ জন্য পাঁচ ওয়াজন নামায়ের উল্লেখ করেন। অথবা হাদিসের এ উক্তি দ্বারা নামায়ের দিকে ইস্তিম করা হয়নি; বরং পূর্ববর্তী আহ্মদের কিরামের ওয়াজনের প্রতি ইস্তিম করা হয়েছে।

(যদি বিষয়টি কোন তথ্য নেই)

* উপরিভাগ হাদিসের আলোকে আরে একটি প্রশ্ন উঠে যে, হযরত জিবরাইল (আঃ) তো নামায়ের জন্য অবিভিন্ন নন। সুতরং তাঁর উপর নামায় বড় জোরের নফল হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু নবি করিম (সাঃ)-এর উপর তো নামায় ফরম।

সুতরং এককথাতে নফল নামায় আদায়কারীর পিছনে ফরম নামায় আদায়কারীর ইকিলি হচ্ছে- যা হানাফী মাযহাব মতে জায়ম নয়। এর উল্লেখ হল-

(১) কাফির ইয়াহ (রহ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায়ের আকৃতি ও পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত নবি করিম (সাঃ)-এর উপরও নামায় ফরম ছিল না, বরং নফলই ছিল। আর নফল নামায় আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইকিলি নিঃসন্দেহে জায়ম।

(২) অথবা, এটা তো ইসলামের একবারে প্রাথমিক যুগের ঘটনা। সুতরং ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয় তো নফল নামায় আদায়কারীর পিছনে ফরম আদায়কারীর ইকিলি জায়ম। যেহেতু, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামায় চলাফেরা করা বা কথাবার্তা বলা জায়ম ছিল। অতঃপর এগুলো রহিত হয়ে যায়।

(৩) আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, নামায় শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা জিবরাইল (আঃ)-কে আদেশ করার ফলে তাঁর উপরও নামায় আদায় ফরম হয়ে গিয়েছিল। সুতরং জিবরাইল (আঃ)ও ফরম আদায়কারী ছিলেন।

(নতুন সংখ্যা ২২৬ মাস)
অনুবাদঃ ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা-র) এর সাথে যুহরের নামায আদায় করতাম। তিনি এক মুষ্টি পাথরের নুড়ি ঠাট্টা হওয়ার জন্য আমার হাতে দেন, যেন আমি অত্যধিক গরমের কারণে তা আমার সিজদার হননে রেখে তার উপর সিজদা করতে পারি।

বিশ্লেষণঃ যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম, নাকি বিলম্বে পড়া উত্তম- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

* ইমাম মালিক, শাফেক ও আহমদ ইবনে হায়ল (রহ.).-এর এক উক্তি অনুযায়ী, যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। তবে গ্রীষ্মকালে উষ্ণ দেশে এবং দূর দূরাদূত থেকে লোকজনের জামাআতে শরীক হওয়ার সন্তাননা থাকলে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া উত্তম।

(ফ্রেয়ালেম জ ২ সৈ ১৯৭)

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। নবী করিম (সা-র) যাদি বিলম্বেই নামায আদায় করতেন, তাহলে তা অত্যধিক গরম থেকে বৌচার নিমিতে সিজদার হনে রাখার জন্য পাথরের নুড়ি জাবিরের হাতে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (সা-র) যুহরের নামায বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।

دالیل (٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ عَلَىْهِ السَّلَامُ قَالَ أَلْوَقَتُ الْوَقُتُ الْأَوَّلُ مِنَ الْصِّلَوَةِ رَضْوَانَ اللَّهِ

وَالْوَقُتُ الْآخِرُ عَفُوُّ اللَّهِ - (ترمذي ج ١ ص ٤٣) باب في الوقت الأول من الفضل، دار قطب ج ١ ص ١٣)

অর্থাৎ, হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা-র) ইরশাদ করেন, নামাযের প্রথম ওয়াকু হলো আলাহার সম্পূর্ণ অর্জন। আর শেষ ওয়াকু হল আলাহার পক্ষ হতে মার্জনা।

دالیل (٣) عَنِ عَلَیِّهِ اَنَّهُ عَلَیِّهِ السَّلَامُ قَالَ يَا عَلِيُّ ۖ كِلْثُ لَا تُؤْتَحَرَّها الْصِّلَوَةُ إِذَا أَنَتْ الح - (ترمذي ج ١ ص ٤٣)

অর্থাৎ, আলী (রা-র) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা-র) ইরশাদ করেন, হে আলী! তিনটি শুভ কন্ধো দেরী করবে না। নামায- যখন ওয়াকু এসে যায়।

উপরালিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রতিযোগ্য হয় যে, যুহরের নামাযও তাড়াতাড়ি আদায় করাই উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, ইসহাক, ইবন মুবারক ও আহমদ ইবনে হায়ল (রহ.).-এর এক মতানুসারী, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায বিলম্ব করে পড়া এবং গীর্জাকালে যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।

(شرح مسلم ج ٢٤٤ ص ٢ )
দলীল (১): হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) ইংরেজি করেন–

… হয়তো রায়াতা ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী ফেনী 

(ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদিসের অর্থ ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

দলীল (২):

… উন্নানি হযরত রসূল লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের লেটের 

(ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদিসের অর্থ ও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।)

দলীল (৩):

… অন্ন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন আন 

(বহারি জ ১ স ১২৪ খান)

(আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা আত্মায় বাবা 

অন্তঃ, … আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) প্রচুর শীতের সময় নামায আগে পড়তেন এবং প্রচুর গরমের সময় নামায পড়তেন ঠান্ডার সময়ে।

উপরোক্ত হাদিসে মূল্য গুণা রয়েছে যে, শ্রীমকাল এবং শীতকালের নামায আদায়ের সময়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এবং এর হরফখো ভিন্ন অন্তঃ শ্রীমকাল নামায বিলম্ব পড়া মুখার্য এবং শীতকালে নামায তাড়াতাড়ি পড়া যুক্তার্য।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমাম তাহারী (রহ) বলেন, যে সমস্ত হাদিস দ্বারা তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে।

ব্যক্তিত ও ব্যক্তিত দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদিসেই প্রথম ওয়াকে দ্বারা উত্তম ওয়াকের প্রথম সময়েকে বুঝানো হয়েছে, সাধারণ ওয়াকের প্রথম সময়েকে বুঝানো হয়নি।

সুতর্ক তাড়াতাড়ি নামায পড়িয়ে যে হাদিস তা শীতকালের জন্য উত্তম ওয়াকে হিসেবে গণ্য হবে এবং দেখিতে নামায পড়িয়ে যে হাদিস তা শ্রীমকালের জন্য উত্তম ওয়াকে হিসেবে প্রয়োজন হবে। আর হযরত আনাস (রা)-এর উল্লিখিত হাদিসটি স্পষ্টভাবে এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে। অতএব কোন মতানিকের অবকাশ নেই।

(নৃনীতে একটি ১ স ২২৯)
আহকামুল হাদিস

১৩৫

নামায অধ্যায়

দলীল (১) বলেন— তাকে কলা করা সহজ নয় কিন্তু আহমদ হামল এবং ইসহাক (রহ) প্রমুখের মতে, আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা কমিয়ে। উল্লেখ যে, শাফেকি (রহ) বলেন, সূর্য হলুদ বর্ষ হলেই আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা মুক্তাহার।

দলীল (২) অনুমতির শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (৩) রাফিবন খাশিজ (রাই) বলেন—

* আওয়ালী হল মদিনার পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। মদিনা হতে এর নিকটতম দূরত্ব হল দুই মাইল এবং শেষ প্রাপ্তের দূরত্ব হল আট মাইল।
...কন্থা নিজেই এই যুগ যুগের মধ্যে রসূল মুহাম্মদ সালাহিদ্দিন আলেহাসালাম বলে দেখালেন যে-মন রাজত্বের জীবনের জন্য শুরু হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাহি)-এর সাথে আসার নামাজ আদায় করতাম। অত্যন্ত উজ্জ্বল হত এবং তা দেখা সমস্ত বিভ্রম ও উপাদান হ্রাস করা হত। অত.parentNodeির পূর্বেই আমরা তাদের গোষ্ঠে খেললাম।

সুতরাং, আসার পর এই কাজ তখনই সম্পন্ন, যখন আসার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া হবে।

সুতরাং উপরায়ক্ষিত হাদিসের মূল দ্বারা প্রতীয়মান হয়ে যে, আসার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়াই উচিত।

* আর আসার নামাজের শেষ ওয়াকেতের দলীল- আওয়াঈ (রহ,) বলেন-

... ওই কথা তার মা উল্লেখ করলেন বাংলাদেশের স্বাধীন চর্চা- (এবং অল্প চর্চা)

(গল্প-)

অর্থাৎ,... আসার মাধ্যমে সময় হল যখন সূর্যের স্থম হলুদ রঙ দূরত্বে প্রতিভাত হতে দেখা যায়।

* ইমাম আবু হাজারা (রহ.)-এর মতে, আসার নামাজ সূচনালোক ফায়ারে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেরি করা উচিত। উল্লেখ যে, ইমাম আবু হাজারা (রহ.)- সহ জমাহুরগণ বলেন, আসার নামাজের শেষ সময় হল সূর্যের প্রতি পর্যন্ত। (যদিও মাকরাহ)

(ফিরদী গণ ১১৫)

দলীল (২) হয়ত উঠে সালামা (রাজি) হতে বর্ণিত-

... কান্থা বলেন রসূল মুহাম্মদ সালাহিদ্দিন আলেহাসালাম বলে দেখালেন যে-মন রাজত্বের জীবনের জন্য শুরু হয়ে থাকে।

(ফিরদী জ ১ ১২৪) বাংলাদেশের তাজ্জুহার যুগের পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে আদায় করার জন্য।
অর্থাৎ, ... তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সার) যুহেরের নামায তোমাদের চেয়ে অনেক আগে পড়তেন। আর তোমরা তাঁর চেয়েও অনেক আগে আসব পড়।
উক্ত হাদিসে আসবের নামায তাড়াতাড়ি না পড়ার জন্য পরোক্ষভাবে আদেশ করা হয়েছে। অতএব বিলম্ব আদায় করাই উত্তম।

দলীল (৩) ৪রাফি ইবন খাদিজ (রা)-এর রেওয়ায়েত-

٠٩٤٤٤٤٤٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ১

অর্থাৎ, নবী করিম (সার) আসবের নামায দেরি করে পড়ার নির্দেশ দিতেন।
উক্ত হাদিসে দ্বারা আসবের নামায দেরি করে পড়া মুহাতিয়ব বুঝা যায়।

দলীল (৪) ৪সূরাত পর্বত আসবের নামাযের ওয়াকত থাকার দলীল-

٠٩٤٤٤٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ٠٤ ১

অর্থাৎ, ... আবু হুরাইয়ারা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সার) ইরিখাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সূরাতের পূর্বে আসবের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে মেন পুরা নামায (ওয়াকতের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কায় গণ্য হবে না)।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাব (১) ৪হাফিজ ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এখানে হুজরার ঘারা উদ্দেশ্য হল আরিয়া (রাণ)-এর কক্ষ। যদি ধরে নেয়া হয় হুজরারটি ছিল হাদবিকিষ্ট, এমতাবায় সূরের আলো ঘরে প্রবেশ করার পথ ওয়ুহ দরজাই হতে পারে। আর আরিয়া (রাণ)-এর কক্ষের দরজা ছিল পশ্চিম দিকে। কিন্তু হাদব যেহেতু ছিল নীচু এবং দরজাটিও ছিল ছোট, এজন্য তাতে সূরের আলো তখনই ভিতরে আসা সম্ভব, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটিকু নীচে চলে যায়। সত্যিই উক্ত হাদিসের হানাফীদের মাযাহ মুতাবিক আসব দেরিতে পড়ার প্রশ্নে মিলে, আন পড়ার নয়।

(২) ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, হযরত আরিয়া (রাণ)-এর হুজরারটি ছিল হাদবিহীন। এমতাবায় সূরের আলো কক্ষে প্রবেশ করার পথ হবে ছাদের দিকে ওপর দিক। কিন্তু যেহেতু দেয়ালগুলো ছিল ছোট এজন্য সূর্য অনেক পর্বত হুজরার উপরে থাকত, আর সূরের আলো দেয়ালের উপর পড়ত একেবারে শেষ গমন। দেখা যে ছোট ছিল একের দলীল হল- কতক সময় নবী করিম (সার) হুজরার
ভিতরে থেকে ইমামতি করতেন আর সাহাবাগণ বাইরে থেকে ইকতিদা করতেন।
আর এটা তখনই সন্দেহ, যখন দেয়াল ছোট হয় এবং মুক্তাদি ইমামের অবস্থা
দেখতে পায়। সুতরাং উক্ত হাদিসটি দ্বারা আসরের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার দলীল
পেশ করা যায় না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) ‘আওয়ালী মদীনা’ যাওয়ার ঘটনাটি এমন লোকের দ্বারা
সংঘটিত হয়েছে, যারা খুবই দৃঢ়তাতিতে চলতে পারতেন অথবা যোগার উপর সওয়ার
হয়ে তারা সেখানে দৃঢ় মেতেন। অতএব, এর দ্বারা তাড়াতাড়ি প্রমাণিত হয় না।
(২) প্রীতিবেদ সময় আসরের নামাযের পরেও অনেক সময় বাকি থাকে। হয়ত ইহা ঐ
সময়ের ঘটনা।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) কসাই এবং বাবুর্চি যদি সুধাকস হয়, তবে আসরের পর
স্থল সময়ের মধ্যেই এগুলো আনজাম দেয়া কোন ব্যাপারই নয়। বিশেষ করে
আরব জাতির জন্য। কেননা, তারা এখনো অর্ধসিম্ভ গোষ্ঠত থেকে পছন্দ করে। আর
এজন্য খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। এক-দেড় ঘটা যথেষ্ট। আর যদি
তাড়াতাড়ি আসরের নামায পড়া হয়, তাহলে তো তিন ঘটার উপর সময় থাকে।
আর এ সময়ে তো সবাই এই কাজ করতে পারবে। বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।
সুতরাং এর দ্বারা দেরি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।
(২) আসরের পর উটের গোষ্ঠত রায়া করে খাওয়া, এগুলো ঘটনাচক্রে হয়েছিল, ইহা
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল না। সুতরাং এগুলো দ্বারা আসরের নামায তাড়াতাড়ি
আদায় করার দলীল দেয়া যায় না। কারণ, বাতিক্রম কখনো উদাহরণ হয় না।

(প্রথম শেষ পংক্তি ২০ ষ্টে, দ্বিতীয় শেষ পংক্তি ২৪৪, ২৩১-২৩২, দ্বিতীয় শেষ পংক্তি ২২, দ্বিতীয় শেষ পংক্তি ২৪১)

রায়ার তালিকা দলীলের সময় যে আসর (গ্রুপ) শেষের অর্থ হল নিম্নলিখিত, যা কোন ব্যক্তি
শেষ অংশকে রুখানো হয়ে থাকে। সুতরাং আসর দিনের শেষ অংশ মাগরনের এক-
দেড় ঘটা পূর্ব মুহূর্তটি হওয়াই যথেষ্ট হয়।

* আসরের নামাযের শেষ ওয়াকের দলীলের জন্য ইমাম শাফেকী (রহ.) যে দলীল
পেশ করেছেন, এর জন্য হল- (১) উক্ত হাদিসে মুহতাবব সময়ের শেষ ওয়াকের
কথা বলা হয়েছে, মুত্তলক বা নিরস্কু ওয়াকের কথা বলা হয়নি।
(২) তবে, সূর্য হলদ হওয়ার পর (উপরিতর্ক) থাকে না, সেকথা বলা
হয়েছে। তবে উত্তর (অপূর্ণ ওয়াকে) সূর্যপূর্ণ পর্যন্ত মাকরনের সাথে বিদ্যমান থাকে।
বাবু মন্ত আদর্ক রক্তম মন চলালু ফবড় আদর্কহ সি।

যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পেল সে যেন পুরো নামায পেল

... উন আবু হোরারা (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনিবনেল, রাসুলুল্লাহ (সার) বলেছেন যে ব্যক্তি সূর্যকের পূর্বে আসেন নামায়ের এক রাকাত আদায় করতে সম্মত হয়েছে, যে যেন পুরো নামায (ওয়াকে মধ্য) আদায় করল (এবং তা কাদা গণ্য হবে না)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যের পূর্বে ফজরের এক রাকাত আদায় করতে পারল সে যেন পুরো নামাযী (ওয়াকে থাকতেই) আদায় করল।

বিশেষণ: উপরিত্তু হাদিসের শাক্তি অর্থ দ্বারা বুঝা যায়, সূর্যে এবং সূর্যের পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামায পেলেই একধাকা বলা যায় যে, যে পুরো নামায পেয়ে গেছে, অবশ্যই নামায আদায় বা পূর্ণ করার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সকল উলমাদের অভিমত হল এই যে, বাকী নামায আদায় করা অবশ্যই জরুরী। অতএব নিয়ন্ত্রণেই এই হাদিসের বিশেষণের অর্থকাশ রাখে। যথাঃ

১। মন্ত আদর্ক চার্চ রক্তম ফবড় আদর্ক ওল্ফ্র

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আসেন এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, সে ব্যক্তি আসেন নামায এর সময় পেল। এমনিভাবে—

মন্ত আদর্ক ফজর রক্তম ফবড় ওল্ফ্র ওল্ফ্র

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকাত নামায পড়ার সময় পেল, সে ব্যক্তি ফজরের নামায়ের সময় পেল।

২। অথবা, এই হাদিস মাসরুক (যে পরে এসে ইমামের পিছনে নিয়ত করল) ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন।

মন্ত আদর্ক রক্তম মন্ত আদর্ক ফজর ফচ্চল জম্মু ফচ্চল ফচ্চল ফচ্চল ফচ্চল

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে আসেন এক রাকাত নামায পড়ার সুযোগ পেল সে যেন পুরো জামাতের সৌধায় পেল।

৩। অথবা, মন্ত আদর্ক রক্তম ফবড় ফবড় ফবড় ফবড় ফবড় ফবড় ফবড় ফবড় ফবড় ফবড়
সম্মতিতে মৃত্যুর উপর নিয়ম, সম্প্রদায়ের অনুমতি, মাঝে মাঝে জন্মদিন অনুষ্ঠানের একটি অংশ।

৪. অর্থাৎ, ইহা নেফাস ও আলুকাবী মহিলাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এমন মহিলা যদি সুরূপাদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয়ে এক রাকাত নামায় পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে সেই নামায়কে কায়া করবে।

৫. অর্থাৎ, এমনকিং যদি কোন কাফের মুসলমান হয় বা কোন শিয়া বালের হয় যে, সে সুরূপাদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামায় পড়ার সময় পেল, তাহলে ঐ নামায় তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং কায়া আদায় করে নিবে।

৬. অর্থাৎ, উক্ত উক্তির অর্থ হবে- ফেছ আদরহ হক্কি সুল্মা- কোন ব্যক্তি মান্ত করল যে, ঢাকা যাওয়ার পর যদি আমি আজকের আসর অথবা ফজরের নামায় পাই, তাহলে আমার গোলাম আয়াদ। আর ঐ ব্যক্তি ঢাকা ঐ সময় পৌছল যে, সে এক রাকাত নামায় পড়ার মত সময় পেল। তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর নামায় পাওয়ার বিধান ধারা হবে। এমনকিং তার গোলাম আয়াদ হয়ে যাবে।

৭. অর্থাৎ, যদি আদরহ হক্কি সুল্মা- ফেছ আদরহ নামায় পড়ার মত সময় পেল, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর নামায় পাওয়ার বিধান ধারা হবে। এমনকিং তার গোলাম আয়াদ হয়ে যাবে।

(দৃষ্টি তরেক জ্ঞ ১ চ ১৩৪, ফল এলম ২ চ ৬৪)}

মাসরেবের নামায়ের ওয়গাত

"বাবু জ্যামেস মুর্বার চয়ৎ।... আসন বী মালিক কাল কেন নোচি মুর্বার মধ্যে পালি স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা স্ত্রীরা" (বখার। ১ চ ৭৯ বাবু দীর্ঘ মুর্বার, মসলিম জ ১ চ ২২৮ বাবু অব দীর্ঘ মুর্বার, নর্মাল জ ১ চ ১১ তুমার মুর্বার, বাবু মাজার চ ৫০ অব্বার শান্ত ইবনে মালিক (রা।) হতে বিষ্কৃত। তিনি বলেন, আমেরা নব্ব করী মাসরেব (সাঙ্গা)-এর সাথে মাসরেবের নামায় পড়ার অজ্ঞাত আমারা তুর নিষেপ করলাম। তা পতিত হওয়ার স্থান আমাদের যে কেউ দেখতে পেত।
বিশেষণঃ মাগরিব নামায়ের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে জমাহর ইমামগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। ইহা সূর্যাস্তের সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায়। তবে এর শেষ সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেকি এবং আওযঘী (রহ.)-এর মতে, সূর্যাস্তের পর আযান ও ইকামত সম্পন্ন করে পাঁচ রাকাত নামায আদায় করতে যে সময়টিকে লাগে, ঠিক ততটিকা সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। এরপর থেকেই এরাই নামায়ের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীলঃ হাদিসে জিবরাইল। জিবরাইল (আঃ) পরের দু’দিন একই সময় মাগরিবের নামায আদায় করেন। হাদিসটিতে উল্লেখ আছে—

ওয়াক্তে বিদ্যার হিসেবে অফ্তর স্থলেম এখ—

(পূর্ব হাদিসটি নামায অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে)

যদি মাগরিবের সময়লাগার ক্ষেত্রে প্রশংসার অক্ষম থাকত তবে তিনি উভয় দিনের মধ্যে তার নামায পড়তেন না। আর অন্যান্য ওয়াক্তের নামায তিনি দু’দিন ব্যাখ্যা আদায় করেন।

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ও সাহেবাইন (রহ.)-এর মতে, “শাফাকক”* অনুসারে এখানে পর্যন্ত মাগরিবের নামায়ের ওয়াক্ত থাকে। এর পর থেকে এরাই নামায়ের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দলীলঃ ... খন্নার উল্লাহ ব্যান্ত উফরুল ব্যান্তিয় বলে, খন্নার ওয়াক্তে একথা সেই উম্মতে ওয়াক্তে ... আকিম এর মুত্তাম ও মুত্তাম মতের মার্গ পর্যন্ত মাগরিবের নামায়ের সময়ে মার্গের পাশে “শাফাকক” জিকিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

মাগরিবের নামায়ের সময়ের ব্যাপারে যে বাচকন হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সবখানেই “শাফাকের” কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব, মাগরিবের নামায়ের শেষ সময় হল “শাফাক”-এর সমাপ্তিকাল।

* ইমাম শফেকির ও অধিকাংশ আলেমের মতে, সূর্যাস্তের পর প্রথম দিনটি সে লাল বাড়া দেখা যায় তাকে “শাফাকক” বলে। ইমাম আবু হানিফার একটি নতুন মতে, লাল বাড়া দুটোকুটি হওয়ার পরে যে অমর্যা উন্মুক্ত হয় তাকে “শাফাকক” বলে।
বাবাঃ (১) হাদিসে জিবরাইল উক্ত হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা উক্ত হাদিসে প্রত্যেকটি নামায়ের সময় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(২) অথবা, মাগরিবের নামায যে সর্বদা প্রথম ওয়াকে আদায় করা মুন্তাহাব, একথা রুঝানিও জিবরাইল (আঃ) উত্তরে দিন প্রথম ওয়াকে নামায আদায় করেছেন। তবে একথার সত্য যে, মাগরিবের নামায বিলম্ব করা সর্বসম্ভবতিত্নমে মাকরহ। কিন্তু একথা বলা আদী সমীচীন নয় যে, পাঁচ রাকাতের পরে আর মাগরিবের ওয়াকেই বাকি থাকে না।

(প্রফেসর) 

যাবে ওয়াকে দেখে এই নামাযের শেষ ওয়াকে

... উন মুমান বনান কান আন আলম নাস তোলা ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম... বিশ্লেষণ করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে দুটি বিষয়ে চিহ্নন করা হয়েছে 

কিন্তু এই অনুচ্ছেদে দুটি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যথা-

(ক) এই নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম নামায মুহার্রর এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা উত্তম।

(খ) এই নামাযের শেষ সময় কখন?

প্রথম আলোচনা এর মতে, এই নামায শাফাক বিলীন হওয়ার পর তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।

দেখীল, মুহাররম ওয়াকের শেষ বর্ণিত হাদিস। আর তৃতীয়াংশ চাইতে শাফাকের একটিই পরেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এর দ্বারা এই নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম প্রমাণিত হয়।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ (রহ) প্রমুখের মতে, এই নামায রাকের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করা মুতাহাব।

দেখীল, ... ভাষায় ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম 

... উন মুমান বনান কান আন আলম নাস তোলা ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম ইসলাম
নদীর ছায়া ছিলেন আমি শুনে তোমাকে আর বলব তোমাকে দিনের খুঁজাতে তোমার ছায়া দেখি নি আল্লামা।

তালিকা: ২৪ (৫২) 

ফাঁকা সাক্ষাৎ জন্য থেকে আর তোমার মুহর্দার সাক্ষাৎ আমার মুহর্দার সাক্ষাৎ আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যেমন আমরা যেমন যে�
জবাবঃ ইমাম শাফেকী (রহ.) নোমান ইবন বশীর (রাহ)-এর যে হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে জমশূর আলিমগণ বলেন যে, (১) যদিও দ্বিতীয় তারিখের চাঁদ শাফাক বিলুপ্ত হওয়ার পরপরই অস্তিত্ব হয়ে থাকে, কিন্তু তৃতীয়ের চাঁদ বেশ দেখতে অস্তিত্ব হয়। কেননা, জ্যোতির্বিজ্ঞানগণ বলেছেন যে, চাঁদ প্রথম রাতে প্রথম রাতের তুলনায় প্রায় ৪৮ মিনিট আকাশে বেশি থাকে। এরপরে তৃতীয় তারিখে চাঁদের অন্ত সূর্যের প্রায় আড়াই বা পৌনে তিন ঘণ্টা পরে হয়ে থাকে। ফলে তৃতীয়ের চাঁদ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অতএব, এ হাদিসটি শাফেকীর দলীল নয়; বরং জমশূরের দলীল। (২) নোমান বিন বশীর (রাহ)-এর হাদিসটি ক্রিয়াবাচক আর জমশূরের প্রদত্ত দলীল বাচনিক। সুতরাং বাচনিক দলীলই প্রাথমিক পারে। (তন্ত্র আশ্রত ১২ সং ২৩)

দলীলঃ

২. খুন আব্দুল্লাহ র. আমর (রাহ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাহ) ইরশাদ করেন, ... এশার নামায়ের ওয়াক্ক রাতের অর্থে অর্থে সময় হয় পর্যন্ত।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ জমশূরের মতে, এসার নামায়ের আখেরী ওয়াক্ক হল সূর্যের সাদিক পর্যন্ত। (যদিও মাকরহ)

দলীলঃ আবু হানিফা (রাহ) হতে বর্ণিত—

AEI অর্থাং এশার প্রথম ওয়াক্ক হল যখন শাফাক অস্তিত্ব হয় এবং এর শেষ ওয়াক্ক হল যখন ফজর উদিত হয়।

জবাবঃ সুফিয়ান সাওরী (রহ.) ও অন্যান্যরা যে হাদিস পেশ করেছেন, এর জবাব হল, এর ধরা নির্বাচিত সময় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। যা সকলেই বলে থাকে।

* আলায়া ইবন মুহাম্মদ ও তাহীর (রহ.) বলেন, এসার শেষ সময় নিয়ে যে এখনে লাফ রয়েছে, এর সমাধান হল এই, রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মুক্তিহীন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্থরাত্র পর্যন্ত মাকরহ ব্যাপী জায়েহ এবং অর্থরাত্র থেকে নিয়ে ফজর উদিত পর্যন্ত জায়েহ তবে মাকরহসহ। আহনাফগণের মায়াবাদও তাই। (দেস মশকোত ২ সং ১৫-১৬)

(দেস রম্যদি ১ সং ৩১৪)
ফজরের নামায়ের ওয়াকে

... জন্য উদ্দেশ্যে একাদশ ইফিলেন বলে কোনো সাধারণ মন্তব্য না করা হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূল সাহেব (স.প.ু.) এমন সময় ফজরের নামায়ে পড়া যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং আদায়কারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

বিশ্বাসের এ ব্যাপারে বিশ্বাস একমত যে, ফজর শুরু হয় সুবেহ সাদিক থেকে এবং এই শেষ হয় সূর্য উদয় পর্যন্ত। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যেকোন সময় ফজরের নামায়ে পড়া তা আদায় হয়ে যায়। এতে কোন মাত্রায় এই হল। তবে মায়ের মতন টিকে ও উত্তম সময় নিয়ে?

* ইমাম মালক, শাফেকি, আহমদ ইবন হামল এবং ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে, ফজরের নামায়ের শুরু ও শেষ অন্তর্গত থাকতে হবে হওয়া উত্তম।

দলীল (১) অনুসারীদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। এতে রুখা যায় যে, নবী করীম (স.াব.) ফজরের নামায়ে অন্তর্গত শুরু করে অন্তর্গত শেষ করতেন। নতুন তাদেরকে না চেনার কোন কারণ নেই।

দলীল (২)

... অম্ত ফরোয়া ফাল্ত সুন্দর ইল্লাত বলে সুন্দর স্মৃতি দিয়ে আদায় হল।

দলীল (৩)

... আল্লাহ দ্বারা আল্লাহর অর্থাৎ, উদ্যোগ করত। তিনি বলেন, রাসূল সাহেব (স.প.ু.)-কে উত্তম অমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ওয়াকের প্রথম ভাগে নামায়ে আদায় করা সর্বোচ্চ অমল।

দলীল (৪)

... আল্লাহর অর্থাৎ উদ্যোগ করা হল। নবী করীম (স.াব.) এরশাদ করেন, নামায়ের প্রথম উচ্চ হল আল্লাহর সম্পর্কে অর্জন, আর শেষ উচ্চ হল আল্লাহর পক্ষ হতে মার্জনা।
উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামায় প্রথম ওয়াকু তথা অস্থকারে পড়াই উত্তম।

দলীল (৫) হযরত আবু বকর ও উমর (রা) অস্থকারে নামায় পড়তেন।

* ইমাম তাহবী ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ফজরের নামায় অস্থকারে শুরু করে ফরসা অস্থকারে শেষ করা উত্তম।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরের নামায় শুরু ও শেষ করে ফরসা অস্থকারে উত্তম।

তবে এটিকে সময় হাতে রেখে নামায় পড়া উচিত, যাতে নামায় ভুল হয়ে গেলে সুন্নত কিন্তু দ্বারা পুনরায় আদায় করা যায়। (তালিম ১ সংখ্যা ১৩১)

দলীল (৬) হযরত আবু বকর ও উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাহেব (সা) বলেছেন, তোমরা পূর্ব দিগন্ত পরিক্ষা হওয়ার পর ফজরের নামায় আদায় করবে; কেননা এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।

দলীল (৭) হযরত আবু বারাবাহ আসলামী (রা) হতে একটি সুদীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত আছে-

... ও কুর্সিয়াল গ্রহণের দিকে উমর ও নজীর জলেস (নাপির জলেস) ১ চুন্ন শুরু থেকে পর্যন্ত আছে।
অর্থাৎ, ... তিনি ফজর নামায় থেকে তখন প্রত্যাবর্তন করতেন, যখন একজন ব্যক্তি তার পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে পারত।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে নবীর দেয়ালগুলো ছেট ছিল এবং ছাদ ছিল নীচু। অতএব, মসজিদের ভিতরে পাশের লোকজনকে তখনই চেনা সম্ভব, যখন বাইরে পূর্ণ ফরসা হয়ে যায়।

দলীল (৩) ... সলোচ সলোচ এলা লওতাকি এলা পাঞ্জুল জেম জেম বীজ মগ্রে ও উচ্চার পাঞ্জুল পাঞ্জুল

সলোচ সলোচ মিন চেল পিল লওতাকি (ইবু দাউদ। ১: ২৭৭ কনকাত মনসাক বাবল সলোচ পিল)

অর্থাৎ, ... ইবন মসাউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ওয়াকাত ছাড়া অন্য কোন সময়ে নামায আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি মূলদালিফাতে মাগরিব ও এসার নামায একত্রে আদায় করেন। আর পরবর্তী দিন ফজরের নামায আদায় করছেন ওয়াকাতের পূর্বে।

উক্ত হাদিসে দ্বারা সবসম্ভাব্যতে উদ্দেশ্য হল, ঐ দিন তিনি স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে তথ্য অস্কারে ফজরের নামায আদায় করেছিলেন, তবে সুবেহ সাদিকের আগে নয়। এতে প্রমাণিত হয়, নবী করিম (সা) এর সাধারণ রীতি ছিল ফরসা হলে নামায পড়া।

( Drum. ১: ৪২লে) দলীল (৪) হযাতর রাফি (রা) হতে বর্ণিত হাদিস-

সুফিত রসূল দে সলো দে উলে উলে যোল নোবল নোবল দলো লাব যজমান হাদিসে ফরসা হলে নামায পড়া।

অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইরিশাদ করতে চেয়েছি, তোমরা ফজরের নামায এটি ছাড়া ফরসা হওয়ার পর আদায় কর যখন কওমের লোকজন তাদের তীর্থ নিক্ষেপের সুল দেখতে পায়।

জবাবঃ সামাতিক জবাবঃ (১) অন্ধকারে নামায পড়া যে রেওয়ায়ে তা মানসুখ বা গিয়ে হয়ে গেছে। কেননা, অন্ধকারে নামায পড়া যে রেওয়ায়ে এটা ঐ সময়ের উপর ভিত্তি করে পড়া হত, যখন মহিলারাও ফজর নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হত। অতঃপর যখন মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার হুকুম দেয়া হল, তখন এই অন্ধকারের হুকুমও মানসুখ হয়ে গেছে।
(২) অফ্কারে নামায পাদার যে হাদিস তা ফিয়াবাহক (ফুলী) এবং আলোকিত অবস্থায় নামায পাদার যে হাদিস তা ফিয়াবাহক এবং বাচনিকও (ফুলী)। অতএব, ধরনের সময় উসূল মোতাবেক বাচনিক হাদিস প্রাধান্য পাবে।

(৩) ইমাম তাহারি (রহ.) অফ্কারে নামায পাদার যে সকল রেওয়ায়েত রয়েছে সেগুলোকে নামায শুরু করা হিসেবে এবং আলোকিত অবস্থায় নামায পাদার যে রেওয়ায়েত রয়েছে সেগুলোকে নামায শেষ করার হিসেবে গণ্য করেছেন।

অথবা, হুজুর (সাঃ) সফরে কোন ওয়ার থাকার কারণে অফ্কারে নামায পড়েছেন এবং যে সময় ওয়ার ছিল না তখন আলোকিত অবস্থায় নামায পড়েছেন।

সত্ত্বে জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) হাদিসের বাণী- মাযুরাকটি মনে করুন (অফ্কারের কারণে তাদের চেনা যেত না)। এখানে গল্প বা অফ্কার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসজিদের আভাসের অবস্থায় বুঝানো, মসজিদের বাইরের অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। অতএব যদি মসজিদের ভিতরের অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মসজিদের ছাদ যেহেতু নিচু ছিল এ কারণে মসজিদের ভিতর ছিল অফ্কার। ফলে তাদেরকে চেনা যেত না। কিন্তু বাহির তো ফর্সাই ছিল। সুতরাং কোন বন্ধ নেই।

আর যদি গল্প দ্বারা মসজিদের বাহির অবস্থায় বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এই চেনার দ্বারা হয়ত কোন জাতি বা শ্রেণী (মুফত জেনে) চেনা উদ্দেশ্য হবে, অথবা পুরুষ না মহিলা। অথবা নিদিষ্ট কোন ব্যক্তিকে (মুফত ব্যক্তিকে) চেনা উদ্দেশ্য হবে।

(২) অথবা, মাযুরাকটি হযরত আমিলা (রাঃ)-এর নয়; বরং তাঁর উক্তি পুর্বাংশ শব্দটি হযরত আমিলা (রাঃ)-এর নয়; বরং তাঁর উক্তি বা শব্দটি হযরত আমিলা (রাঃ)-এর নয়; বরং তাঁর উক্তি যুক্তি ছিল যে, মহিলারা যেহেতু চাদর গায়ে দিয়ে আসত এজন্য তাদেরকে চেনা যেত না। কোন রাবী মনে করেছেন, এই চেনা না যাওয়ার কারণ হযরত অফ্কার। এজন্য মাযুরাকটি রাবী নিজের পক্ষ থেকে বাড়ির যুক্তি দিয়েছেন। (১বন মাহ, শুতা।)
ফতুহ বাজ জ ২ সু, সুচিবন বং বিষমা ১ সু (১৬৮)

পঞ্চম দলীলের জবাব সহ আবু দাউদ (রহ.) নামাযের উল্লিখিত এ অংশটিকে করিতে মুহূর্তের মালুকু সম্বন্ধে সম্মানসূচক। কেননা উমামা বিন যায়েদ ব্যাঙ্গ আর কেউ নামায়ের ওয়াক্ত সংক্রান্ত এ অংশটিকে ব্যাখ্যা করেননি।

( ফতুহ বাজ জ ২ সু, সুচিবন বং বিষমা ১ সু (১৬৮) )

পঞ্চম দলীলের জবাব সহ এ প্রমাণ তখনই পূর্বাঙ্গ হতে পারে, যখন প্রমাণিত হবে যে, তারা অপরকে নামায শুরু করে অন্ধকারের শেষ করতেন। আহ্মত এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়; মর্যাদা এর বিপরীত প্রমাণিত। প্রমাণিত আছে-

১. অনেক এবং আগ্রহ তখন তেমন ফাল লেন তাদের ওম হাফিজা হলে বিশেষ করে এ প্রমাণ (মসন বং বিষমা ১ সু)

অর্থাৎ, অনাস (রাও) হতে বর্ণিত যে, আবু বকর রাও ফজরের নামায সূরা বারার তিলাও তারা করে। তখন উমার রাও তারা নামায থেকে অসার হওয়ার পর বললেন, সূর্য তাদের উদিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে গেছে। উত্তরে আবু বকর রাও বললেন, যদি সূর্য উদিত হয়ে যায় তবে তুমি আমাদের উদাসীন পাবে না।

৭১। বৈবাদী আহ্মার সংবাদ

১. অনেক বিবৃত না রাবে না অনেক কি বিবৃত না রাবে না অনেক কি বিবৃত না রাবে না অনেক কি বিবৃত না রাবে না অনেক কি বিবৃত 

২. হয় রসুল বহু লোক আহ্ম বহু লোক আহ্ম বহু লোক আহ্ম বহু লোক আহ্ম
আহকামুল হাদীস

নামায অধ্যায়

ললি সিলার আল্লাহ উল্লেখ করে মাস্ত খাবুরাহেরা সেখানে রাখার জন্য শেখা ও লাল করল তার জন্য করা যায়। কেউ কেউ পারমাণ্ড দেন যে, লোকদেরকে নামায়ের জন্য করিম একটি করা যায়। কেউ কেউ পরমাণ্ড দেন যে, নামায়ের সময় হলে খাবা উড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন লোকেরা তা দেখে তখন আগে নামায়ের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু নবী করীম (সাহ) এর মনোনিত হয়নি। অতঃপর কেউ একটি প্রতিষ্ঠা করে যে, শিখ ফুকা হয়। যিযাদ বলেন, শিখ ছিল হুদীদের ধর্মীর প্রতিকৃত। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাহ) তা অপছন্দ করেন। রাবী বলেন, অতঃপর একজন ঘটা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাবী বলেন, উপাসনার সময় ব্যাধি করা ছিল নামায়ের বীর। এজন্য নবী করীম (সাহ) তাও অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক শেষ হয় এবং সকলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাব) ও রাসূলুল্লাহ (সাহ) চিহ্নিত থাকার কারণে ব্যাখ্যা হয় নেবে স্বপ্নে প্রতিষ্ঠা করেন। ... অন্য রেওয়ায়েতে আবদুর ইবনে যায়েদ (রাব) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিখা হাতে নিয়ে যায়েছ। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বাদা! তুমি কি শিখা বিক্রয় করেন? সে বলে, তুমি শিখা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার সাহায্যে নামায়ের জামাতের লোকদের ডাকব। সে বলে, আমি কি এর চেয়ে উলম কোন জিনিসের সুস্থ তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপে শুরু উচ্চারণ করেন: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ...” অতঃপর তাঁর বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাহ) এর থিয়েটার হাস্যরহ হয়ে তাঁর নিকট আমার ব্যক্তির বর্ণান্ত করি। নবী করীম (সাহ) বলেন, এটা অবশ্যই সত্য ব্যক্তি। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ স্থপৎ দেখেছ, তুলিন তুলিন শিখা দাও- যাতে সে (বিলাল) ঐরূপে আযান দিতে পারে। কেননা, তাঁর কল্পনা তোমার হয়ে চাইতে উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল (রাব)কে সেদিন নিয়ে দাঁড়াই এবং তুলিন ঐ তোমার শব্দগুলি শিখা দিতে থাকি এবং তিনি উচ্চারণপূর্বক আযান দিতে থাকেন। বিলালের ঐ আযান-খনি উমর
আহকামুল হাদিস

১৫১

নামায় অধ্যায়

ইবনুল খাট্টাব (রা) নিজ আবাসে বসে শুনতে পান। তা শুনে উমর (রা) এত দৃঢ় পদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আগমন করেন যে, তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! যে মহান সত্য আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি এরপূর্ব সম্পূর্ণ দেখেছি যেরূপ অন্যা দেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আযানের আতিথদানিক অথ্যঃ আল্লাহ শব্দটি বাবে তফ্তিল এর মাসদার। অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

১. বা ঘোষণা দেয়া (তন্মে ১ সং ২৪৪) আল্লাহ বা জানিয়ে দেয়া।

২. বা জানিয়ে দেয়া।

৩. বা আহবান করা, ডাকা ও স্নাত বা সালাতের জন্যে ডাকা।

পবিত্র কুরআনে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে–

ওয়াদান মনঃ দিল ও পৌরোধ এত নামস্ত যারা হোল হিজ অকব্রির অম্বু, আর মহান হজ্জের দিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদেরকে জানিয়ে দিন। (তওরান ৩)

আযানের পরিভাষিক সংজ্ঞাঃ

হু আল্লাহ পোর্ট ত চলোর পালের দর্ষোচনা। (তন্মে ১ সং ২৪৫)

অর্থাং, নির্দিষ্ট শব্দমালার সাহায্যে নামায়ের সময়ের কথা জানিয়ে দেয়া ই হ অযাচ্ছ।

হু আল্লাহ পোর্ট চলোর পালের দর্ষোচনা। বিশেষ শব্দমালার সাহায্যে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাতের সময় হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়া।

অর্থাং, প্রতি সালাতের ওকে একজন আহবানকের উচ্চতর সালাতের কথা জানিয়ে দেয়া।

মোটকথা, আযান হল শরীয়ত নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ এমন কিছু বাক্য যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় হওয়ার কথা জানানো হয়।

ইকামের আতিথদানিক অথ্যঃ আল্লাহ শব্দটি বাবে এর মাসদার। অভিধানে এর অর্থ লিখা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা, হাপন, উত্তোলন, অবহান, বসবাস, ডাঁড়াইয়ে আহবান করা, কাতারবন্ধী হওয়া ইত্যাদি। (আলমুমুল দৌলায়ি ১০৯)
ইকামতের পারিভাষিক সংজ্ঞা—

আর্থাৎ, ইকামত হল নামায়ীদেরকে জামাঅতের প্রতি আহবান জানানো।

হী দৃঢ়তা মুসলিমদের জন্য আহবান জানানোর প্রক্রিয়াই হল ইকামত।

প্রক্রিয়াকে ফরমান সালাত শুরু পূর্বে ইসমাম ব্যাপী মুসলিমদের মধ্য থেকে কোন একজন (সাধারণত মুহাম্মদীন) আযানের মত বাক্য দিয়ে লোকদেরকে জামাঅত শুরু সংবাদ দেয়ার জন্য একটি উচ্চ করে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাকে ইকামত বলে।

আযান প্রচলনের সময়কালে ইসলামে আযান কখন এবং কোথায় প্রবর্তিত হয়েছে, এ সম্পর্কে মুহাম্মদ গণের চারটি মত পাওয়া যায়। যথা—

(1) উলমাদের একদল মেন করেন, হিজরীতের আগে মক্কায় আযান প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে—

अन जिब्राईल उँलिक़ूल आर्थाৎ, যখন নামায় ফরমান হয়, তখন জিব্রাইল (আহ) নবী কোরিম (সাহ)-কে আযানের আদেশ দেন।

আর সালাত যে মক্কায় ফরমান হয়েছে, এ বাক্যারের কোন দ্বিতীয় নেই। সুতরাং আযান মক্কায় প্রবর্তিত হয়েছে।

(2) অন্য একদল মুহাম্মদ মেন করেন, মিরাজের রাতে রাসূল (সাহ)-কে সালাতের সাথে সাথে আযানও মানিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে, যখন সালাত ফরমান হয় তখন জিব্রাইল (আহ) মহাব্রী (সাহ)-কে আযান দোয়ার নির্দেশ দেন।

আর সালাত তো মিরাজের রজ্জীতেই ফরমান হয়েছিল।

(3) জমকুর মুহাম্মদীন ও ইতিরানাবিদের মতে, আযান ১ম হিজরীতে মদিনাতে প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন, এক বর্ষায় এসেছে, ইবন মানজুর বলেন, রাসূল (সাহ) মক্কায় সালাত ফরমান হওয়ার পরও আযান ছাড়াই সালাত আদায় করতেন। মদিনায় হিজরীতের পর আযানের বিধান চালু হয়।

(4) ইবন হাজার আসকালানী (রহ.)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে মদিনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এরপরে হছে—

হাড়ালা হোসেন এসে তাকে দেখিয়ে মুসলিমদের মন্ত্রিতে যাতে তাদের বিভিন্ন জম্মু ভাগে পাঠানোয়। আর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন যখন তোমাদেরকে সালাতের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আলাদার সুরু থেকে মন্ত্র কর। (জুমআহ) ৯

যেহেতু আযানটি বদর যুদ্ধের কিছুদিন আগে নামিয়ে হয়েছে, সুতরাং তখন থেকেই আযান প্রচলিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।
বাবু কীফ আদান স ৬ ৪ আযানের নিয়ম

... উপর তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্র বর্ণিত। রাজী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সাত) কে বলি, আমাকে আযানের নিয়ম-পর্যায়ত্ত সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাজী বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলির দিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি বলবে- আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, তা উচ্চরে বলবে। অতঃপর আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার- বালার সময় গলার বরো শীঘ্র করবে। অতঃপর উচ্চকণ্ঠে বলবেও আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাহার। অতঃপর বলবে হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ। অতঃপর ফজরের নামায়ের আযানের সময় বলবেও আস-সালাতু খাইরাম মিনান নাওম, আস-সালাতু খাইরাম মিনান নাওম। অতঃপর বলবেও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাহার।”

(তারজি)-এর সংজ্ঞা এবং আযানে এর হুকুম শব্দটি বাবে তুমী শর্ত এর মাঝার। এর মূল ধাতু আ-হ। এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে বা পুনর্ব্য করা, প্রত্যাবর্তন করা। পরিভাষায় তারজি হল-
হো রফুে সুতো প্রস্নে শহাদাতীন বা আশহাদু আল্লাহ ইল্লাহাই ও আশহাদু আল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বাক্যগৌরের প্রথমে নিয়মের দুইবার করে উচ্চারণ করে পুনরায় দুইবার করে উচ্চারণে পড়াকে তারজী বলে।

আযানে তারজী করার ক্রমে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তারজী করার না করার উভয় অবস্থায়ই আযান গুরু হয়ে যাবে। তবে আযানের মধ্যে তারজী করা উত্তম কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম মালিক ও সাকেশী (রহ.)-এর মতে, আযানে তারজী করা সুন্তন।

* ইমাম আব্দুল হামিদ (রহ.)-এর মতে,

التَّوْجِينَ ِوَعَدَّةُ كَلَّامُهُ جَاثِرٌ وَلَكِنَّ تَرْكُهُ أَحْبَبُهُ - (নোমুন 1:45)

আর্থর, আযানে তারজী করা না করা উভয়ই জায়েহ, তবে না করাই আমার পছন্দ।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, আযানে তারজী করা সুন্তন নয়, বরং মাকরাহ।

(ফতুল্লাহ 2:530)

* আযানের বাক্য সংখ্যায় আযানের বাক্য সংখ্যা কয়টি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, আযানে বেহেতু তারজী উত্তম, তাই তাঁর নিকট আযানের বাক্য ১৭টি। যেমন,

- আল্লাহু আকবার - ২ বার
- শাহাদাতাইন - ৮ বার
- হায়তালাতাইন - ৪ বার
- আল্লাহু আকবার - ২ বার
- লা-ইলাহা ইলাহারহ - ১ বার

মোট ১৭ বার

দলিল

عن إناس قال أَمِيرُ هُلاَل أن يشفع الأذان ويؤمر الإقامة - (ابو داود ج 7:45)

باب في الاقامة، بخاري ج 1 ص 588 باب الآذان مثلى مثل، مسلم ج 1 ص 164 باب الأمر يشفع الآذان،

ترمذي ج 1 ص 318 باب افراد الاقامة، نسائي ج 4 ص 116 تلبية الآذان، ابن ماجة ص 563)

أرجوُ أنَّهُما (رَأِب) حديثاً موثقاً. তিনি বলেন, বিলাল (রাওয়ান)-কে আযান জোড় শন্দ্রে এবং ইকামত জোড় শন্দ্রে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।
* ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, আযানের বাক্য সংখ্যা ১৫টি। কেননা তাদের মতে, আযানে তারজী সুমত নয়।

আল্লাহু আকবার - ৪ বার
শাহাদাতাইন - ৪ বার
হয়ায়ালাতাইন - ৪ বার
আল্লাহু আকবার - ২ বার
লা- ইলাহা ইল্লাহাল - ১ বার
মোট - ১৫ বার

দলীল

... উন্ন উদ্দীন বৃন্দ রুবি কান লমা অম্র রসূল উল্লু সুল্ল ইল্লা উল্লু নোম নোম (১)

... ইগুফুস যুমলি লিয়ুর লালুস লেগুজ এল্লুত তাফ পী অনা টাইম রুগল যুমলি
নাকুস ফিয়ি পিয়ুলট যা উদ্দীন ইতিনু তাফুস ফুল ও মো চিন ফিয়ুলট নুডুল
য়ে ইলো এল্লুতো ফুল অফলু আলতু মাহ হুরুই বিন নিকু ফিয়ুলট লে লুই কুল ফুল
তুলুল উকির উল্লু অকির অশেদ আন লে উকির অশেদ আন লে উল্লু অশেদ আন
মুহাম্মদ রুসূল উল্লু অশেদ আন মুহাম্মদ রুসূল উল্লু হুরুই ইলো এল্লুতো
হুরুই ইলো এল্লুতো হুরুই ইলো এল্লুতো আকির উল্লু অকির লে উল্লু অশেদ আন
(ইবন দাওর জ.

অর্থাং, ... আম্মুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ
(সা) শিংগা ধনি করে লোকের নামায়ের জন্য একত্র করার নির্দেশ প্রদান
করেন। তখন একদা আমি স্পন্দে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হতে নিয়ে যাছে।
আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর বাদা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? তার বলে, তুমি
শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তো মাঝামাঝি নামায়ের জামায়েত
লোকদের ডাকবে। তার বললে, আমি তো চেয়ে উত্তম কোন জিনিসের সম্ভাব
তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাই। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব
উচ্চারণ করবে- “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু
আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইরালাহা, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইরালাহা,
আশহাদু আলা মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আলা মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া
আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ, হাইয়া আলাল-ফালাহ, হাইয়া আলাল-
ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইরালাহা।”
উক্ত হাদিসে দেখা যায় যে, যাকে (আবদুল্লাহ ইবন যাযেদ) স্পষ্ট যোগে আরাম শেখানো হয়েছিল, তাতে তারজী ছিল না।

দলীল (২) হযরত বিলাল (রাজ) আজীবন তারজী ছাড়া আরাম দিতেন। হযরত সুয়াইদ ইবন গাফালা (রাজ) বলেন-

সম্ভাব্য প্রায় যোগ মতো পালন মতো - (শর সানী তানার)

অর্থাৎ, আপনি বিলালকে জোড়া শুনে আরাম ও ইকামত দিতে শেখা হয়েছি।

দলীল (৩) আবদুল্লাহ ইবন যাযেদ (রাজ)-এর রেকর্ডের মতো-

কাল হযরত আলাউদ্দিন রসূল রাজ কো কাল এই আলোকে আলোকে ও খুলে শুনতে ফিরিয়া আলোকে ও ইমামের আলোকে (তরমী জ২ ৪৮ বাব ইন ইমাম মতো)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাহী-এর আরাম ও ইকামতের শেষকুল ছিল জোড়া জোড়া।

দলীল (৪) হযরত আবু বকর (রাজ)-এর যামানায় মুখর্দিন তারজী ছাড়া আরাম দিত। এর দ্বারা সাহাবাগণের পক্ষ থেকে তারজী না হওয়ার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* তাহাড়া হযরত আবু বকর (রাজ)-এর যামানায় মুখর্দিন তারজী ছাড়া আরাম দিত। এর দ্বারা সাহাবাগণের পক্ষ থেকে তারজী না হওয়ার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(নন্দমৃত) ১৭ সাল (৪৪)

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহমতুল্লাহ)-এর দলীলের জবাবঃ হযরত আবু মহিয়ারা, বিলাল, আব্দুল্লাহ ইবন যাযেদ (রাজ) প্রমুখের আরাম স্কিন রোক্যানাতে স্পষ্টতাবাদ চারবাহ তাক্কবিরদের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাক্কবির হল, দুই আলাযার এবং

দুই হায়া আলা দুইবার পড়া।

অন্যা, এটো হতে পারে, যেহেতু আলাহু আকবার আলাহু আকবার দুইবার এক শব্দে আদায় করা হয়, এজন্য দুই করে চার তাক্কবিরকে শাখু জোড় বলা হয়েছে।

(দীতী জ২ ৪৫ সাল (৪৫)

ইমাম শাফেঈ (রহমতুল্লাহ)-এর দলীল মুহুর্তের (তারজী রুদ সহ) জবাবঃ
1. আল্লামা উসমানী ‘ফাতহুল মুলহিম’ গ্রহে বলেন, হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মহানবি (সাং) আযান দিয়ে সালাত আদায় করলে কাফিরদের বাক্ক-বালিকারা এ সময়ে বিদ্রো করে আযানের বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো। এদের মধ্যে আবু মাহ্যুরাও ছিলেন। রাসূল (সাং) তাঁকে ডেকে বললেন, আযান নাও। তখন অভাবগত কারণে আবু মাহ্যুরা শাহাদাতাইন নিয়মমুক্তে পড়েছেন। ফলশ্রুতিতে রাসূল (সাং) তাকে বললেন, “আদে বলছ কেন? উচ্চ করে বলো।” তখন আবু মাহ্যুরা দ্বিতীয়বার শাহাদাতাইন উচ্চকণ্ঠে বললেন। এতে তাজিরী প্রমাণ হয় না।

2. কিংবা বলা যায়, তাজিরী তখন কেবল মকার জন্য খাস ছিল। কেননা, এর আগে এখানে শাহাদাতাইন ছিল জীবনের জন্য হুমকি বরুণ। তাই শুরুরিয়া বরুণ মকার সীমিত সময়ের জন্য তাজিরীর প্রচলন করা হয়েছিল।

(নতুন জ সংখ্যা ৫৫-৫৬, ফিরতি বাণী ২:৪-৬, তুলনা এ সংখ্যা ২০)

3. অথবা, তাজিরীর বিষয়টি আবু মাহ্যুরার জন্য খাস ছিল। কেননা এটি ছিল তাঁর ইসলাম কর্মের কারণ; তাই তিনি এটাকে বরকতময় মনে করে উচ্চারণ করতেন। এ হুকুম সাব্যস্তজন হবে না। যেমন, হাদিসে বর্ণিত আছে,-

... কোল কোল আবু মাহ্যুরার নামাজ না বাজুর নামাজের না ফরুকাতের না লাগাদি, যা লাগাদি না লাগাদি না স্বীকৃত না স্বীকৃত না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানান না জানান না জানান না জানান, অথবা, যা জানান না জানা
অনুবাদঃ ... যিহোদিয় ইরিনুলাহ হারিচ আস-সুদাই (রাঘ) বলেন, যখন আয়ানের প্রথম সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম (সাহ) আয়ান দেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আয়ান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলবাহার। আমি ইকামত দিব কি? তখন নবী করীম (সাহ) পূর্ব দিকের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, না। অতঃপর পূর্বকাশ পরিক্ষার হওয়ার পর তিনি তার বাহন হতে অবতরন করেন। অতঃপর তিনি ইঙ্গিত করে আমার নিকট আসেন, তখন সাহাবারে কিন্তু তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি অমূল করেন। এ সময় হযরত বিলাল (রাঘ) ইকামত দিতে চাইলে নবী করীম (সাহ) তাঁকে নিষেধ করে বলেন, (তোমার) ভাই যিহোদিয় আস-সুদাই আয়ান দিয়েছেন এবং (নিয়ম এই হে), যে ব্যক্তি আয়ান দিবে, সেই ইকামত দেওয়ার অধিকারী। রাশবি বলেন, আমি ইকামত দেই।

বিশেষণঃ যে ব্যক্তি আয়ান দেয়, তাকেই ইকামত দিতে হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফী ও আহমদ ইবন হামল (রহ)-এর মতে, যে আয়ান দিবে, সেই ইকামত দেবে। মুমিয়য়মি ব্যতীত অন্য কলার ইকামত দেয়া মাকরহ। অন্যজন ইকামত দিলে মুমিয়য়মির মনে কঠিন হক বা না হক এবং মুমিয়য়মি অন্যকে অনুমতি দিব বা না দিক। (তুলোম ১ সং ২৪৬)

দলীলঃ অব্যক্তের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক ও আরু সাওয়ার (রহ.)-এর মতে, মুমিয়য়মি ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ইকামত দেয়া জারীয় আছে। তবে শর্ত হল, এক্ষেত্রে মুমিয়য়মির সম্বন্ধে থাকতে হবে। অন্যথায় মাকরহ হবে। (দ্রু মুকুট ২ সং ২৮৬)

দলীলঃ

... ক্ষত্র পূর্বে মুমিয়মি বলেন এ ক্ষত্র আরা আরা ইবনে ইবলে স্তি ইবলে । (৫)

... উল্লেখ করেন যে আদিন আদিন দিকে যাচাই করুন ইবলে উল্লেখ করেন যে আদিন আদিন দিকে যাচাই করুন ইবলে উল্লেখ।

(সুরা আমাদ) বলেন যে আদিন আদিন দিকে যাচাই করুন ইবলে উল্লেখ।

(আসব আইদ) বলেন যে আদিন আদিন দিকে যাচাই করুন ইবলে উল্লেখ।

অর্থঃ ... আদিন আদিন দিকে যাচাই করুন ইবলে উল্লেখ।

তিনি বলেন, রাসূলবাহার (সাহ) বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আয়ান প্রথা চালু করা সম্পর্কে চিহ্ন করছিলেন। কিন্তু বিশেষ করে এর কোনটি গৃহীত হয়নি। হযরত
বাব আহ্মদ আসর উল্লাহ 

আহ্মদ আসর উল্লাহ (রাঃ) হতে বিবর্ধিত হয়েছে। ফলস্থতি তিনি নবী করিম (সাঃ)-এর স্থিতিতে হারিয়ার হয়ে স্পর্শের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তুমি তা বিস্তারিত শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা বিস্তারিত শিক্ষা দাও।

দলীল (২) কোন কোন সময় হরমের শিল্প বিনলাল (রাঃ) আযায় দিতে এবং ইবনে উমমে মাকতুম (রাঃ) ইকামত দিতেন। কোন কোন সময় এর বিপরীত হত।

(রোহিদ হাসাইল ১ সং)

মুসলিম হয়ে ইবনে হারিয়ার হতেছে, তিনি হিজা নও মুসলিম। অন্যের কেউ ইকামত দিতে সাহায্য তিনি এতে ব্যবহৃত হতে পারেন। এখন চিনে করেই রসূলুলাহ (সাঃ) বিনলাল (রাঃ)-কে ইকামত দিতে নিষেধ করলেন।

(২) অথচ, এর দ্বারা নবী করিম (সাঃ)-এর এ বিষয়টি মুঘলো উদ্ধুন্ত ছিল যে, মূুমায়িনের ইকামত দেয়াই মুঘলো, যার প্রকাশ হামানিগো।

(দর্শন তমুলি জ ১ সং)

পাব আহ্মদ আসর উল্লাহ 

আযায়ের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ

... বন্ধ নেন বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ বন্ধ 

(রোহিদ জ ১ সং)

নামায অধ্যায়

আহ্মদুলাহ ইবন যাহেদ (রাঃ)-কে স্থলের আযায়ের শব্দ জাত করা হয়। অতঃপর তিনি নবী করিম (সাঃ)-এর স্থিতিতে হারিয়ার হয়ে স্পর্শের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তুমি তা বিস্তারিত শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা বিস্তারিত শিক্ষা দাও।
বিশ্লেষণঃ আযান, ইমামতি, কুরআন তালিম ইত্যাদি ইবাদতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েথ কি- এ নিয়ে ইমামগণের মাধ্যমে এখানেলাফ রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.-এর মতে, আযান কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ।

(বল্লেন জ ১ সং ২০২)

দলীল (১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাজ) হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস- কোন এক সফরে তিনি এক গোলার সর্প দখলি নেতাকে সুরা ফাতিহা পড়ে ফ্যাক দিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে স্থল এক পাল বক্রী গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মদ্দেন এসো এ বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)-কে জানালে তিনি তা অনুমোদন করে বলেছেন:-

... কেন্দ্র অবুতেম একেং পালেরা লেন নুরুম স্যামান পাশ্চাত্য লাভী স্যামান লা আল্লাহ

ওয়াল্লাহু (খবরি জ ১ সং ২০২৪ বাবা মহতী এ দায়ালী তা, অবি দায়ালী চ ২ সং ৪৪, তৃতীয় জ ২ সং ২৬)

বাবা একে এর পুরীক্ষন (তামোদিক)

অর্থাৎ, তিনি করেছে। এগুলো বস্তা করে দাও। তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ বস্তা করে দাও। অতঃপর তিনি (সাঃ) হেসে দিলেন।

দলীল (২) হযরত আবু মাহযুরী (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সাঃ) আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন, অতঃপর আমি আযান দিলাম। আমার আযান দেয়া শেষ হওয়ার পরে তিনি আমাকে একটি রৌপ্য ঝুড়ি দিলেন।

* পূর্ববর্তী আহ্মান ও ইমাম আহমদ (রহ.-এর অনুসারীদের মতে, আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়।

দলীল (১) অনুসারের অনুমতি বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) হযরত উবাই ইবন কবর (রাজ) বলেন:-

"উল্লিত রঞ্জাল আলফারীন ফাতিহাই দেন ফোর্সা ফাত দেন লাভী লাভী আল্লাহ উসুল" ওয়াল্লাহু ফকাল ইন অন্তর্ভুক্ত ফোর্সা মন দার ফোর্ড দেন - (গ্রে মাছার জ ১৫৭ বাবা এর)

অর্থাৎ, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিখালাম। সে আমাকে একটি তীরের ধনুক দিয়েছিল। এ বিষয়ে আমি রাবরু লাহান (সাঃ)-এর নিকট আলোচনা করে তিনি
বলেন, যদি তুমি তা গ্রহণ করে থাক, তাহলে জাহানামারে একটি তীর-ধনুক গ্রহণ করলে। অতঃপর আমি তা ফেরত দিয়ে দেই।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ আবু সাইদ খুদরী (রা।) সূরা ফাতিহা পড়ে যুক্ত দিয়ে যে সর্প দংশনের ব্যথা ভাল করেছিলেন, তা কোন ধর্মীয় বিষয় ছিল না, বরং ইহা ছিল চিকিৎসা। আর চিকিৎসার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া খেয়। সুতরাং এ হাদিসটি দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আবু মাহয়ারাকে মহানবী (সাঃ) যে রৌপ্য খণ্ডটি দিয়েছিলেন, তা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। আর উসমান ইবন আবুল আস (রা।) তাঁর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং উসমান ইবন আবুল আসের হাদিস দ্বারা ঐ হাদিসটি রহিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী আহনাফেদের অভিধাতঃ দীনকে প্রচার-প্রসার করার নিমিত্তে প্রয়োজনের তালিকায় আযান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়ে বলে বীবুতি দিয়েছেন।

দলীলঃ ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে রাত্রিয় কোষাগার থেকে মুআয়খিন, ইমাম, মুফতি ও মুআলিমগণের জন্য ভাতার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী হুকুমাত না থাকার কারণে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব, এখন যদি তাদেরকে কোন পারিশ্রমিক না দেয়া হয়, তাহলে এক সময় দেখা যাবে মসজিদে আযান ও নামায় ঠিকমত হচ্ছে না। এবং সমস্ত দীনী নিদর্শনগুলোতে বিশেষভাবে ও aYংসের মারাত্মক আশঃকা দেখা দেবে। তাই সুমারী দীনকে প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ইমাম, মুআয়খিন ও মুআলিমগণকে বেতন বা পারিশ্রমিক নেয়া জায়ে বলে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

* একটি মাসআলা জানা থাকা আবশ্যক যে, কুরআন মাজীদ ও সহীহ বুখারী খতম দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া তখনই বৈধ হবে, যদি তা কোন পারিশ্রমিক উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য পড়া হয়। কিন্তু যদি ইহালে সোওয়ারের উদ্দেশ্যে পড়া হয়, তাহলে পারিশ্রমিক নেয়া বিলকুল নাজায়ে হবে। আর এজন্যই মসজিদের ভিতরে বসে কুরআন মাজীদ ও সহীহ বুখারীর খতম দেয়া বা তাবিজ লিখে ও অন্যান্য খতম পড়ে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া জায়ে নয়। কেননা, মসজিদে দুনিয়াবী কাজ করা হালাল নয়। আর এগুলো হল দুনিয়াবী কাজ।

(درس ترميزي ج 1 ص47، تنظيم ج 1 ص44، معارف القرآن سورة البقرة الآية 41)
ব্যাপ্তি না হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

... তার ২৪৯ সালের মধ্যে ইবনে আল-আস্তান এর ইবনে আহ্মদ এর আযান ওয়াক্কে ও মুহাম্মদ এর আযান।

* ইবনে সাতিন এর ইবনে আল-আস্তান এর আযান ওয়াক্কে ও মুহাম্মদ এর আযান।
দলীল (১) বলা হলে যে, রসূল নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক সাংগঠনিক অনুমতি না দেন?

হাদিস: (১) বলা হলে যে, রসূল নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক সাংগঠনিক অনুমতি না দেন?

অর্থাং, ... হযরত বিলাল (রাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ নামে আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি আযায় দিবে না- এই বলে তিনি বীর্য হতরায় উত্তর ও দিকে দিকে প্রসারিত করেন।

দলীল (২) আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি আযায় দিবে না- এই বলে তিনি বীর্য হতরায় উত্তর ও দিকে দিকে প্রসারিত করেন।

দলীল (৩) বলা হলে যে, রসূল নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক সাংগঠনিক অনুমতি না দেন?

নাহো যে (আবু দাউদ ১ সং)

অর্থাং, ... হযরত উমর (রাহ)-এর মুঃআবিন্দন মাসরহ হতে বর্ণিত। তিনি সুবেহ সাদিকের পূর্বে আযায় দিলে উমর (রাহ) তাকে পুনরায় আযায় দেয়া নির্দেশ দেন।

উপরালিখিত হাদীসবাদুহ হতে প্রমাণিত হয় যে, সুবেহ সাদিকের পূর্বে আযায় দেয়া জানায় নেই। যদি জানায় থাকত, তাহলে পুনরায় আযায় দেওয়ার নির্দেশ দিতেন না।

আকাশ দলীলঃ আযায়ের মূল লক্ষ ও উদেশ্য হল নামায়ের ওয়াকু সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া। সুতরাং রাতে আযায় দিলে ঘোষণা হয় না, বরং বিভ্রান্ত করা হয়।

(দ্রষ্টরদ্ধ ১ সং)

জবাবঃ (১) হযরত বিলাল (রাহ)-এর আযায়ের উপর কখনো নিষ্ঠ করা হতো না, বরং ওয়াকুতের পরে পুনরায় আযায় দেয়া হত। যদি হযরত বিলাল (রাহ)-এর আযায়ের যথেষ্ট হত, তাহলে অতীত একবার হলেও তার আযায়ের উপর নিষ্ঠ করা হত। কিন্তু এমনটি কোন সময়ই করা হয়নি। এতে সুপ্রস্তাবে প্রমাণিত হয় যে, সময়ের পূর্বে আযায় দেয়া জানা হয়।

(২) অথবা, হযরত বিলাল (রাহ)-এর আযায়ের ছিল রামায়ের সেহারী খাওয়ার জন্য এলান বরুণ বা তাহাজ্জুরের নামায়ের জন্য।

(ভূরদ সং)

যোগ্য হাদীস এভাবে-

... বলা হলে যে, রসূল নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক সাংগঠনিক অনুমতি না দেন?

হাদিস: (১) বলা হলে যে, রসূল নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক সাংগঠনিক অনুমতি না দেন?

(২) অথবা, হযরত বিলাল (রাহ)-এর আযায়ের ছিল রামায়ের সেহারী খাওয়ার জন্য এলান বরুণ বা তাহাজ্জুরের নামায়ের জন্য।

(ভূরদ সং)

দলীল (১) বলা হলে যে, রসূল নিয়ন্ত্রিত তাৎক্ষনিক সাংগঠনিক অনুমতি না দেন?

নাহো যে (আবু দাউদ ১ সং)

অর্থাং, ... হযরত বিলাল নামে আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি আযায় দিবে না।

(দ্রষ্টরদ্ধ ১ সং)
ব্যাব তান্ত্রিদ হাফিল তর্কিত জমামাত পার্থিত্য করের পরিবর্তি

... উন্ম হাজারা গান শুন রস্তা দেখি আল্লাহ ক্ষুদ্র তিন ওসের লুকা... আমার অমর প্রদু ফরিদ থেম রসুল ফিলাসত মেনে অন্তর্ভুক্ত করে পরিগত মাঝে হাজার হেমন মন হচ্ছে হাতে আছে।

হায় আবু হুয়ায়ারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাহাবা (সাঃ) ইরশাদ করেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জমামাতের সাথে নামাজ আদায়ের নিদর্শ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিয়োগ করি। অতঃপর আমি কাঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামামাতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দেই।

বিশ্লেষণ: জমামাতে নামাজ আদায়ের হুকুম কি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতঘাট হয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হামল, ইবন খুয়াইমা, ইবনুল মুহম্মদ, আতা, আওয়াঈ এবং আবু সাউদর (রহ.)-এর মতে, জমামাতে নামাজ পড়া ফরয়ে আইন। এবং ইমাম আহমদ থেকে একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, বিনা ওজরে এককী নামাজ আদায়কারীর নামাজ ফাসেন।

দশীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাফিল। উক্ত হাফিলে যারা জমামাতে শরীক হয় তাদের ঘর-বাড়ি জালিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সূত্রাং এতে বুধা যায় (স), জমামাতে নামাজ পড়া ফরয়ে আইন। নতুনা রাসূল সাহাবা (সাঃ) এমন কঠিন না। উচ্চারণ করতেন না।
দলীলঃ ... অবন উমেদে মার্কুম (রাঘ) হতে বর্ধিত। তিনি নবী করীম (সার)কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি অর্ধ, তদৃশি মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূর। কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা-নেওয়ার জন্য লোক আছে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরশ) নামায আদায় করতে পারি? নবী করীম (সার) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আমায় হুদু পাও? আমি বলি, হু। নবী করীম (সার) বলেন, আমি তোমার জন্য (জামাতাত থেকে) অব্যাহতির কোন কারণ পাছি না।

অতএব, উক্ত হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জামাতাতে নামায পড়া ফরহে আইন।

* কতক আধলে যাহিরের মতে, জামাতাতে নামায আদায করা ওয়াজিব এবং নামায গুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাতাত শর্ত।

* ইমাম শাফেই, তাহবী ও কারকী (রহ.)-এর মতে, জামাতাতের সাথে নামায আদায করা ফরহে কিফায়া।

দলীলঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলসমূহ।
দলীল (১) ঐ সকল হাদিসের মূল যাতে জামাআতের ফরীদের বর্ণিত হয়েছে তো নিম্নের আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে- 

"যিন তো আবু ঈবানাহান করান এই নিয়ম সবে উল্লেখ করা গিয়েছে যে এই নিয়ম অনুসারে থাকিয়ে রাখিয়ে দিতে হবে যে এই নিয়ম অনুসারে থাকিয়ে রাখিয়ে দিতে হবে। এই জন্য যাতে আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে।"

নসাই মসজিদে নিম্নোক্ত উপাদান নিয়ম নিয়ম বিষয়ে আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে।

দলীল (২) নিম্নোক্ত উপাদান নিয়ম নিয়ম বিষয়ে আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে।

"যিন তো আকবর বিন আবু ঈবানাহান করান এই নিয়ম সবে উল্লেখ করা গিয়েছে যে এই নিয়ম অনুসারে থাকিয়ে রাখিয়ে দিতে হবে যে এই নিয়ম অনুসারে থাকিয়ে রাখিয়ে দিতে হবে। এই জন্য যাতে আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে।"

দলীল (৩) নিম্নোক্ত উপাদান নিয়ম নিয়ম বিষয়ে আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে।

"যিন তো আকবর বিন আবু ঈবানাহান করান এই নিয়ম সবে উল্লেখ করা গিয়েছে যে এই নিয়ম অনুসারে থাকিয়ে রাখিয়ে দিতে হবে যে এই নিয়ম অনুসারে থাকিয়ে রাখিয়ে দিতে হবে। এই জন্য যাতে আল্লাহ নিখুত অনুবাদ হবে।"
উপরোলিখিত হাদিসের মূল বিশ্লেষণ হয় যে, জামাইতে নামায আদায় করা একক সয়ারের কাজ এবং খুব বড় ওয়ার ব্যতীত জামাইত তাগ করারা একজন মুমিনের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। তাই বলে, জামাইতে নামায না পড়লে নামায হওয়া হবে না বা কোন কাজ আদায় করলেই ফরমে কিছু হিসেবে আদায় হয়ে যাবে এমনটি বলা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, জামাইতে নামায পড়া বলিষ্ঠভাবে সুন্দর মুনাফিকাদাহ।

জবাবঃ (১) প্রতিপক্ষণ যে ঘর-বাড়ি জালিয়ে দেয়ার হাদিস উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা ধীরক ও ইংলিশিয়ার এবং জামাইতের গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। প্রকৃত অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

(২) কারী আযাজ (রহ.) বলেন, নবী করিম (সা.) পুড়িয়ে বা জালিয়ে দেয়ার জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা পোষণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা বাস্তবে জালিয়ে দেননি। গতীয়ভাবে চিন্তা করিয়ে বুঝা যায় যে, আসলে তা ফরম হয়, নতুনা তিনি তা অবশ্যই পুড়িয়ে দিতেন। কেননা রাসুল (সা.)-এর সামনে কোন ফরম তরক হবে, আর তিনি তা শুধু মুমুখেই প্রকাশ করে নির্ভুল হবেন, এমন ধারণা করা উচিত নয়।

(৩) অথবা, এমন ইংলিশিয়ার ঐ কোন প্রতি প্রাদান করেছেন, যারা খোদ নামায কেই ছেড়ে দেয়, শুধু জামাইতকে নয়।

(৪) ইবনে বারাযাহ বলেন, অনেক উক্ত হাদিস দ্বারাই জামাইত ফরম না হওয়ার দলিল পের করে থাকেন। কেননা, জামাইত যদি ফরমই হত, তাহলে নামাযবর জামাইত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জামাইত তায়গকারীদের শাক্তি দেয়ার জন্য নায়ন্ত্রনবী করিম (সা) জামাইত তাগ করে তাদের দিকে অভিমুখী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন না।

ছত্রিয় দলিলের জবাবঃ নামায করুল না হওয়ার অর্থ হল নামায পূর্ণাঙ্গ না হওয়া।

কিন্তু একবারে না হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, হাদিসে এসেছে- "লাহোরের মসজিদে অ. সোলতান আব্দুল্লাহ ইবন মাকতম (রাশি) কে জামাইতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যে জামাইত ফরম হওয়ার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং জামাইতের ফরমীলত ও গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে এই হুকুম দেয়া হয়েছিল।

* অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে জামাইতে নামায পড়া ফরম ছিল। পরে তা রহিত হয়ে গেছে। নতুনা জামাইতে নামায যদি ফরমে আইন হত, তাহলে একথা
বলার কোন অবকাশ থাকে না যে, জামাতে নামায় পড়লে পঁচিশ গুণ সওয়ায় বেশি। কেননা, একাকী নামায় পড়লে যেখানে নামায়ই করুন হবে না, (ইমাম আহমদের মত) সেখানে পঁচিশ গুণ সওয়ায় বের কি মূল্য রাখে?

(২১৮ স পাতা ৬ অধ্যায়)

বাবা সা জাহা ফি হরুজ লাসাণ থেকে মসজিদ শেষে

মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত

... অনে বাবু হোর যাতা অন্তর উল্লাল হতে সাল তলাম ফালা লা তালায়আ আলাল মসাহাজে লাল অ্যাল্যাম তালাম অলাম তালাম টালাম বাবু হোর অলাম তালাম বাবু হোর হতে বর্তিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাহ) ইয়ালাদ করেছেন: তোমরা আলাহর বাঁশীদের (মহিলাদের) আলাহর মসজিদসমূহে যাতায়াতে নিষেধ করো না। কিন্তু খোসবু ব্যবহার না করে তারা মসজিদে যাবে।

বিশ্লেষণঃ মহিলাদের নামায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া কতকটা বৈধ, এ নিয়ে ফকীহগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

পূর্ববর্তীগণের মাঝে মতবিরোধ:

* ইমাম সাফা (রহ.)-এর মতে, নামায়ের জামাতের উদ্দেশ্যে মহিলাদের বের হওয়া মুক্ত (অনুমোদিত)। এবং বৃদ্ধদের জন্য ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া মুক্তাহার।
* হযরত আবু বকর, আলী ও ইবন উমর (রাছ)-এর অভিমতও অনুরূপ।

(মুযাফর সন ১ ৪৪ চ স পাতা ৩ ১৮ বাবু হোর নামায়ে বের তালাম আল সালাম আলুলাম তালাম বাবু হোর অলাম তালাম বাবু হোর হতে বর্তিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাহ) ঈদের নামায়ে যাওয়ার জন্য আমাদের (মহিলাদের) নিদর্শ দেন। ...)

দলীল (১) অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্তিত হাদীস।

দলীল (২) হযরত উমর আতিয়া (রাছ)-এর হাদীস—

... অনে বাবু হোর যাতা অন্তর উল্লাল হতে সাল তলাম ফালা লা তালায়� আলাল মসাহাজে লাল অ্যাল্যাম তালাম বাবু হোর হতে বর্তিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাহ) ঈদের নামায়ে যাওয়ার জন্য আমাদের (মহিলাদের) নিদর্শ দেন। ...)

* ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, বৃদ্ধদের জন্য দুই ঈদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের জামাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।
দলীলঃ ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম শাফেকে (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত উভয় দলীলকে বুদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজা মনে করেন। আর সাহেবাইন বলেন, যেহেতু বৃদ্ধা হওয়ার কারণে তাদের প্রতি করো আকর্ষণ জাগরে না, ফলে ফিতনারও কোন আশান্তকা নেই। (সন ২৭৮)  

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাধারণ নামাযগুলোতে ফয়র, মাগরিব এবং এশায় বৃদ্ধাদের উপস্থিতিতে কোন দোষ নেই। (হুদায়া ১১ সু ১২৬) 

দলীলঃ যেহেতু সাধারণত এই সময়গুলোতে ফিতনা-ফাসাদের আশান্তকা কম এবং বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে যুবকীদের তুলনায় ফিতনা অনেকটা কম, তাই তাদের জন্য বেশি।

পরবর্তীদের ইজমাঃ পরবর্তীতে হকারী সকল ফকির ও আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষ্ণ করেন যে, রিসালত যুগে প্রথমতঃ ফিতনার সৃষ্টিবাদ ছিল কম, দ্বিতীয়তঃ মহিলারা সাজসজ্জিত বাইরে বের হতেন। এজন্য নামাযের জমাআতে তাদের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঙ্গ) এর পর তারা সাজসজ্জায় নব অনুমতি অবলম্বন করছে। তাছাড়া ফিতনার সৃষ্টিতে বেঁধে গেছে বহুমাত্র। অন্যভাবে, এখন তাদের কোন প্রকার জমাআতেই উপস্থিত না হওয়া উচিত। যদি নবী করীম (সাঙ্গ) জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনিও এ যুগে মহিলাদেরকে নামাযের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিতেন না বলেই মনে হয়। এ কারণে পরবর্তী যুগে উলামায়ে করামের ফাতওয়া হল, বর্তমান যুগে (যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধ হোক) কোন মহিলাই ঘর থেকে বেরীয়ে মসজিদের দিকে যাওয়া সমীচীন নয়।

দলীল অর্থাৎ, ... হযরত আয়শা (রাগ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঙ্গ) সরকার দেখতে পেতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, যেসব বনী ইসরাইলের ক্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল।

দলীল (২৪) আল্লাহ তাআলার বচন- ওর মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (আহাবাঙ্গ ও)
দলীল (৩) মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায় পড়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অধিক সওয়াব অর্জন করা। অথচ বহু হাদীসে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(ক) আবু বাহেদ ইবনে আমির (রা) বলেন, কিংবদন্তি নামায় আদায় করা সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।

অর্থাৎ, আবু আলুদাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, নবী করিম (সা) বলেন, মহিলাদের নামায় আদায় করা বলতে সওয়াব স্বীকৃত।

(খ) ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, কিংবদন্তি নামায় আদায় করা সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।

মারুনে মসজিদে নামায় আদায় করা সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।

(প) আবু আমর শাহীদ বলেন, কিংবদন্তি নামায় আদায় করা সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।

অর্থাৎ, তিনি হযরত আবুল উমর (রা) বলেন, তিনি মসজিদে নামায় আদায় করার সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।

(য) হযরত আবু বহেদ হাদীস বলেন, কিংবদন্তি নামায় আদায় করা সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।

**আন্তর্গত উপাদান প্রয়োগ করুন।**

* অনেকেই হযরত আবু বহেদ হাদীস বলেন, মহিলাদের মসজিদে নামায় আদায় করা সুখীজনক নয়, বরং অসুখীজনক।
যামানায় কি হুকুম হবে? বিষয়টি ভেবে দেখা আবশ্যক। আর তাই আমরা সাহাবী যুগেই দেখতে পাই যে, আন্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)'-এর পুত্র বিলাল এ ব্যাপারে বলেন-

وَاللَّهُ لَا نَأْدَنَّ نَهْنُ قَيْنَعِيْنَهُ دَعَالًا وَاللَّهُ لَا نَأْدَنَّ لَهُنَّ الْخَ (ابو داود ج 1ص، 84)

اللهِ لا نَأْدَنَّ نِهْنَ قَيْنَعِيْنَهُ دَعَالًا وَاللهِ لا نَأْدَنَّ لَهُنَّ الْخُ (ابو داود ج 1ص، 84)

মসল 1ص 183، ترمدي ج 1ص 127 باب خروج النساء ال المساجد)

অর্থাৎ, ... আল্লাহর শপথ! আমি তাদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এতে তারা ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে কিছুতেই অনুমতি দেব না।

باب في الجمع في المسجد مرتين ص 85

কিন্তু নামায় দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা

عن أبي سعيد الخزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصَر رجلاً ينصب على هذا فصلى معه (ترمدي ج 1ص 127 باب الجماعة في مسجد الخ)

অনুবাদঃ ... আবু সাইদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্তিত। তিনি বলেন, রাসূল লাহ (س) এক বাইকে (জামাআতের পর) একটি নামায় আদায় করতে দেখে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যে এ বাইকে সদকা দেয়, যাতে সে তাকে সঙ্গে নিয়ে নামায় পড়তে পারে?

বিশেষণঃ যদি কোন মসজিদে নিদিষ্ট ইমাম না থাকে তাহে তদীয় পদের মসজিদ হয় বা ব্যাপারের মসজিদ হয়, তবে তাতে পন্রায় জামাআত জায়েখ আছে। এমনিভাবে যদি মহল্লাহর মসজিদ হয় যেখানে ইমাম-মুআমতিন সুনিদিষ্ট সেখানে যদি মহল্লাবাসী ছাড়া অন্যরা এসে জামাআত করে, তাহলে মহল্লাবাসীর দ্বিতীয় বার জামাআত করার অধিকার রয়েছে।

(دروس مشكوة ج 2ص، 102)

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি মহল্লার মসজিদে ইমাম-মুআমতিন নিদিষ্ট থাকে এবং তাতে মহল্লাবাসী একবার জামাআত পড়ে থাকে, সেই মসজিদে অন্যদের জন্য দ্বিতীয় জামাআত জায়েখ কিনা? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ইবন হামল, আহলে মাহির এবং ইসহাক (রহ) '-এর মতে, মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত আদায় করা জায়েখ আছে।

دلية (1) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্তিত হাদিস।
দলীল (২) হযরত আনাস (রা)-এর সেই ঘটনা, যা ইমাম বুখারী (রহ.) প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন-

... ওগো আসে বন মালকে তো মসজিদ প্রের সেই ফয়াজে ফয়াজে আছ তা শুন ও তো জমাতে জমাতে (بخاری ج1 ص89 باب ضعف حديث الجماعة)

অর্থাৎ, আনাস (রা) এক মসজিদে এলেন, যেখানে নামায পড়া হয়ে গেছে। তিনি এসে আখান-ইকামত দিয়ে জামাতে নামায আদায় করলেন।

উপরোক্ত মাধ্যম দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় জামাত জায়েখ আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিকি ও শাফেঈ (রহ.) সহ জমহুরের মায়বাদ হল, যে মসজিদে ইমাম-মুআয়নিন নির্ধারিত এবং তা এলাকাবাদে একবার জামাতে নামায পড়ে ফেলেছে, সেখানে দ্বিতীয়বার জামাত করা মামলাহ তাহরিমী।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর একটি রেওয়াতে আছে, যদি স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ মহিমু থেকে সরে আখান, ইকামত ও আহান ব্যতীত দ্বিতীয় জামাত করে, তাহলে জায়েখ আছে। (কিন্তু ফাতওয়া হল, এতাবাদে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েখ নেই।)

জমহুরদের দলীল

عن ابي بكر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)

اختلف من نواحي المدينة بزيادة الصلاة فوجد الناس قد صلى فمال إلى منزله

فجمع أنه صلى الله عليه وسلم (2) (آثار السنن ص13، مجمع الزوائد ج2 ص4)

অর্থাৎ, হযরত আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (صা) মদিনার আশপাশ থেকে এসে নামায পড়তে চাইলেন। সেখানে লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। অতঃপর তিনি ঘরে যেয়ে পরিবারের লোকজনকে একত্র করে তাদের নিয়ে জামাতে নামায আদায় করলেন।

অতঃপর, উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাত আদায় করা জায়েখ হত, তাহলে তিনি মসজিদে নববীর ফরাইত ছেড়ে বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হতেন না। সুতরাং মসজিদে পুনরায় জামাত করা যে মামলা, এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

... عن أبي بكر بن بكار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد (2)

هممت أن أمر بالصلاة فقمتم ثم أمر رجلاً فصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال مبعتم حром من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأخرج علىهم بيوتمهم بالثائر...
আহকামুল হাদিস

(1) আলোচনা হাদিসটি একটি বিচিত্র ঘটনা ছাড়া গোটা হাদিস ভাবার এরপক কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না, যাতে মসজিদে নবীর দ্বিতীয় জামাইত করার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং ইহা দলিলের যোগ্য নয়।

(2) এই জামাইতটি ছিল সর্বমোট দুইজনের এবং আহবান ব্যতীত। আর আমাদের (জমকুর) মতে আহবান ছাড়া কথনো কথনো পুনরায় জামাইত জায়েষ্ঠে মানে। বস্তুত আহবানের সীমার কোন কোন ফকীহ এই নির্ধারণ করেছেন যে, ইমাম ছাড়া চারজন হবে।

(3) আলোচনা হাদিসে ঐ ব্যক্তির সাথে যে নামায় পড়েছিলেন তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রাঁ), যিনি ছিলেন নফল আদায়কারী। আর আলোচনা মাসআলা হল, ইমাম ও মুকামী উভয়ে হবে ফরয আদায়কারী।

(4) সর্বোপরি বলা যায় যে, বৈধ ও মাকরণের বিরোধের সময় মাকরণের প্রাধান্য হয়।

দ্বিতীয় দলিলের জবাবঃ (1) ইহ ছিল বনু সালাবাবর মসজিদ, যা পথে অবস্থিত ছিল।

সুতরাং এটি সাধারণভাবে দলিলের যোগ্য নয়।

(ফতু বারী ২ সঃ ১০৯)
(২) স্থায় হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ

ইনে অস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাতুর্স্দা উল্লাহে নামায় কানাও এমন ফাতেমের সম্মানে চলিয়া যাইলেন।

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (سے) এর সাহারীগণের যখন জামায়েত ছুটে যেত, তখন তারা মসজিদে এককী নামায আদায় করতেন।

এটা দ্বিতীয় জামায়েত না হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল।

যাব মনে এর প্রাক্তন সমাজকারী চুড়ি

ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি কে?

... উন্মুক্ত সাহেব বহিনি চালান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাতুর্স্দা উল্লাহে নামায় কানাও এমন ফাতেমের সম্মানে চলিয়া যাইলেন।

চরমের ব্যক্তি বিশ্বাস ফাতেমের কর্তৃত্বে যান কানাও ফাতেমের কর্তৃত্বে যান কানাও ফাতেমের কর্তৃত্বে যান কানাও ফাতেমের কর্তৃত্বে।

হজরতে কানাও ফাতেমের হজরতে ফাতেমের হজরতে ফাতেমের হজরতে ফাতেমের কর্তৃত্বে কর্তৃত্বে কর্তৃত্বে কর্তৃত্বে কর্তৃত্বে।

... না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের না ফাতেমের 

বিশেষণঃ নিম্ন বর্ণিত বিষয়বলীতে মসরীরদের মধ্যে অধিক ব্যক্তি ভ্র্যাম নিয়োগ করা যায়। যথা-

(১) দীন সম্পর্কে যিনি বেশি ইলম ও জ্ঞান রাখেন। বিশেষ করে নামায়ের মসরীরা-মসরীরা সম্পর্কে যিনি বেশি জ্ঞান।

(২) প্রয়োজনীয় কর্তার বিশ্ব থাকার পর যার করুন তেলাওয়াত বেশি শহীদ ও ভাল।
(৩) যিনি বেশি মুতাকী ও পরহেয়গার।
(৪) যার চরিত্র তুলনামূলকভাবে বেশি ভাল।
(৫) যার বংশ উত্তম এবং কঠিন ভাল।
(৬) যিনি বেশি পরিকার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন।
(৭) যার বয়স বেশি। (ফাতোয়ায়ে রাহমানিয়া ১৪২৫৮, ১০৭ সাল)

* ইমামতির ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ কারী (ইমাম) (যিনি তাজতেদ ও করাতে অভিজ্ঞত এবং
যার কুরআন বেশি মুক্ত আছে) অধিক হকদার, নাকি শ্রেষ্ঠ আলিম (এ
নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।
* ইমাম আহমদ ইবন হামল, ইসহাক, আবু ইউসুফ ও ইবন স্বীন (রহ.)-এর মতে,
ইমামতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আলিমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারী অধিক হকদার। ইমাম মালিক ও
শাফেঈ (রহ.)-এর অনুরূপে। (درس مشکوُة ২৬ (১০) সাল)

দলীল-৪ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসের আলোকে প্রমাণ মিলে যে,
ইমামতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কারী অগ্রগণ্য হবে।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ইমামতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আলিম ও
ফককাহকে শ্রেষ্ঠ কারীর উপর প্রাধান্য দিতে হবে। মালিকী ও শাফেঈদেরও দ্বিতীয়
রেওয়ায়তে অনুরূপ। (فح العلم ২৩ সাল)

দলীল-৪ আবু মোসা (রাখ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাহ) মুতাবেশযার যাব ইরশাদ
করেন- (مَوَّلَآ أَبَا بْكَرِ فَلْيَصْلِبْيَ إِلَّا اللَّهُ) (بخاري ج ১২২ সাল হাল উদ উদ্দিসে হালামাতা)
অর্থাৎ, তোমরা আবু বকরকে বল, তিনি যেন নামায়ে ইমামতি করে।

সুতরাং, এমতাবেশযার হযরত আবুকবর (রাখ)-এর ইমামতি অধিক জানা হওয়ার
ভিত্তিতে ছিল। এর দলীল হল, হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাখ) বলেন-

وَكَانَ أَبِيَ بْكَرُ هُوَ أَعْلَمُناً - (بخاري ج ১০৬ সাল কিবব-আনাফ)
অর্থাৎ, আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম।

এতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রেষ্ঠ আলিম শ্রেষ্ঠ কারীর উপর প্রাধান্য পাবে। কেননা, যদি
শ্রেষ্ঠ কারীকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো, তাহলে তো নবী করিম (সাহ) উবাই ইবন
কাব (রাখ)-কে ইমাম বানাতেন। যেহেতু হাদিসে হযরত আনাস ইবন মালিক (রাখ)
হতে বর্ণিত, শ্রেষ্ঠ কারী উবাই ইবন কাব।
জবাবঃ সাহাবার কিরামের সময়ে যেহেতু শ্রেষ্ঠ আলিম ও শ্রেষ্ঠ কারীর মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না; বরং যে শ্রেষ্ঠ আলিম ছিল, সে শ্রেষ্ঠ কারীও ছিল। তাই উক্ত হাদিসে কিতাবুল্লাহের শ্রেষ্ঠ কারী ধারা কিতাবুল্লাহের অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝানো উদ্দেশ্য।

কিন্তু অনেকেই বলেন, এ জবাব সত্যিক নয়। কেননা শ্রেষ্ঠ কারী ধারা যদি শ্রেষ্ঠ আলিম বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো কারী উবাই ইবনে কাব (রা) সাহাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম মনে নেয়া হয়। অথচ তা ইজমার পরিপন্থী। তাছাড়া আরেকটি অভিযোগ হল, কেন কেন হাদিসে তো কিতাবুল্লাহর শ্রেষ্ঠ কৌরিয়ের পরে সৃষ্টিতের সবচেয়ে বড় আলিমের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

... عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْلَّيْبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَانَ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ ِسُوَاءً

قَأَلُّهُمُ بِالْسُّلَةِ ... (ابো দাউদ জ ২৬, মসলম ১৩৬, তমরদি জ ১৫৫)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু মাসুউদ (রা) হতে বর্তমান। নবী করিম (ص) ইরশাদ করেন, যদি সকল কেরাতের মধ্যে সমান হয়, তবে যে ব্যক্তি সুমাহ সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ (আলিম), সেই ইমামতি করবে।

অতএব, এর ধারা যদি বুঝানোই উদ্দেশ্য হত, তাহলে হাদিসের আলাদা এবং কেনে উল্লেখ করা হল? এতে তো পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং সঠিক জবাব হল এই যে, উল্লিখিত হাদিসে শ্রেষ্ঠ কারীকে ইমামতির জন্য প্রধানত দেয়া ইহা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। এ সময়ে কুরআনের আযাত মুখ্যকারী খুবই বিরল ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির এতটুকু পরিমাণ আযাত পর্যন্ত মুখ্য ছিল না, যদিও মাসুন কিরাতের হক আদায় হয়। তখন হিফজ ও কেরাতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ইমামতি শ্রেষ্ঠ কারীকে প্রধানত দেয়া হয়েছিল।

পরবর্তীতে যখন কুরআন ভালরূপে প্রচলিত হয়ে গেল, তখন সবচেয়ে বড় আলিম হওয়াকে ইমামতির জন্য উত্তম বা মুন্তাহাব হওয়ার সব্যস্থ্যম মানিয়া সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ কারীর প্রয়োজন শুধু একটি রুক্ষ তথা শুধু কিরাতে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আলিমের প্রয়োজন নামায়ের সবগুলি রুক্ষ হয়ে থাকে। মোটকথা, রাসূল (ص) অতিমশয়ের সময় হযরত আবু বকর (রা)-কে ইমাম নিয়ূক্ত করেছিলেন শ্রেষ্ঠ আলিম হওয়ার কারণে; আর যেহেতু এ ঘটনাটি একবারে অক্ষমকালের, এজন্য এটি সেসব হাদিসের জন্য রহিতকারীর মর্যাদা রাখে, যেগুলোতে শ্রেষ্ঠ কারীর প্রাধান্যের বিবর্ণ রয়েছে।

(দ্রস তরোমী জ ১৩, ২৩৬)
প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাবালেগ শিশুর ইমামতির

... মনে আছে যে ইমাম বাবুর কথা সাইতেন বলে। ইমাম বাবুর কথা মুঘল সেনাবাহিনীর সামনে স্বীকার করেন ও তার বিরুদ্ধে কর্মরী হন। ইমাম বাবুর কথা সাইতেন বলে, যে ইমাম বাবুর কথা মুঘল সেনাবাহিনীর সামনে স্বীকার করেন ও তার বিরুদ্ধে কর্মরী হন।

অনুবাদঃ ... হযরত আমর ইবন সালামা (রাঘব) হতে বর্ণিত। ... রাবী বলেন, একদা আমার শিশুর গোসংগুলোর প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাইতেন)-র নিকট যান। তখন তিনি তাদেরকে নামাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং এককাহ বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার জন্য ইমামতি করে। আমি অধিক কুরআন মুখ্য আছে সে বলে ইমামতি করে। আমি অধিক কুরআন মুখ্য করি ও শিক্ষা দিয়ে তিলাতাকারি হিসেবে তারা আমাকেই ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর আমি তাদের ইমামতি করতে থাকি।

এসময় আমার গায়ে হরদ বর্ণের একটি ছোট চাদর ছিল। নামাজের সময় যখন আমি সিজন্দায় যেতাম, তখন তা খুলে যোগতো মহিলাদের মধ্যে একজন বলেন, তোমরা কোন ইমামের সতর্ক থাকার ব্যবস্থা কর। ... আমি এমন সময় ইমামতি করতে আস্ত করি যখন আমার বয়স ছিল ৭ বা ৮ বছর।

বিশ্লেষণঃ নাবালেগ ইমামতি জায়ের কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেই ও ইমাম বুখারী (রহ.)-র মতে, নাবালেগ শিশুর ইমামতি জায়ের আছে। তবে শর্ত হল, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণের কমতা থাকতে হবে।

দলীলঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদিস। উড়ি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আমর ইবন সালামা (রাঘব) ৭/৮ বছর বয়সে ইমামতি করেন।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, ইব্রাহিম ইবন হাবাল, ইসহাক ও সাওরী (রহ.)-র মতে, নাবালেগ ছেলে ইমামতি জায়ের নেই।

দলীলঃ ... যে ইমাম বাবুর কথা সাইতেন বলে। ইমাম বাবুর কথা মুঘল সেনাবাহিনীর সামনে স্বীকার করেন ও তার বিরুদ্ধে কর্মরী হন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাবালেগ শিশুর ইমামতির

... বিশ্বাস এবং মুভাবের মূল্য হয়। (দলীল ১/০), ১/১ চ ৮৭ বাবাম বটে উল্লেখ করা হয়।
ব্যক্তির একবার নামায় আদায়ের পর ঐ নামায় পুনরায় ইমামতি করা

... উন্ন জাহার বন উবীদ আল্লাহ অন মুহাজ্ব বন হেবল কান উদিলি মু রসূল আল্লাহ ৷ ৷ ৷ উলিবেল উস্তান কেম কারী কোমে ফৈসলারি পুবৌল তৃতী উল্লাতাতে (পাত্রো জি ১৮ সালস হুবুহ চার্লি)

মাত্রে কোমে নামায় আদায়ের পর ঐ নামায় পুনরায় ইমামতি করা

... উন্ন জাহার বন উবীদ আল্লাহ অন মুহাজ্ব বন হেবল কান উদিলি মু রসূল আল্লাহ ৷ ৷ ৷ উলিবেল উস্তান কেম কারী কোমে ফৈসলারি পুবৌল তৃতী উল্লাতাতে (পাত্রো জি ১৮ সালস হুবুহ চার্লি)
অনুবাদঃ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয় (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এশার নামায আদায়ের পর বীরে গোনে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের ঐ এশার নামাযে ইমামতি করেন।

বিশেষণঃ উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত মুআয় (রা) একবার নামায আদায়ের পর পুনরায় ঐ নামাযেরই ইমামতি করেছেন, অর্থাৎ ইমাম হচ্ছেন নফল আদায়কারী (মন্তব্য) (মন্তব্য)। সুতরাং প্রশ্ন উত্তাপিত হয় যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজিদা জায়েয কিনা। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম শাফেকি, ইবন মুনতিয়া, আতা, তাউস (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবন হামলের এক রেওয়ায়েত মোতাবেক নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজিদা জায়েয আছে। (ফতুহ আলীম জ 24 সো ২২)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ণিত হাদীস। প্রমাণের কারণ হল, হযরত মুআয় (রা) নবি করীম (সা)-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর নিজের কাও গিয়ে সেই নামাযই পড়তেন। অতএব, দ্বিতীয়বার তিনি হতেন নফল আদায়কারী। অর্থাৎ তাঁর মুক্তাদীরা ছিলেন ফরয আদায়কারী।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, যুবরী ও হাসান বসরী (রহ.)-এর মত এবং আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইজিদা জায়েয নেই। (মুরাফ সলতন ২৬১/৬১-৬২)

দলীল (১)ঃ হযরত আনােস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। নবি করীম (সা) বলেন-

* ইসমাইল আলাম লীয়মান ইনসান ইমাম (রা) তোমাদি পিয়ার... (ইবো দাওড জ ১০০ বাবে ইলাম বুলে মন কুড়ир, বিরাট জ ১০০ পুল কামান ইশলাম তুমদি জ ১০০ পাব এলাম)

* ১০০ পাব শিয়া কামান, মসলেম জ ১০০ পাব এলাম ইমাম ফাতেহ ইমাম তুমদি জ ১০০ পাব এলাম

অর্থাৎ, ... ইমামকে এজন্যই নিয়ুক্তি করা হয়েছে, যেন তার অনুসরণ করা হয়।

সুতরাং উক্ত হাদীসে দ্রুত সুপ্রস্তুত হয় যে, খোদ নামায, নামাযের জিয়াসমূহ, নামাযের বিশিষ্টসমূহ এবং নামাযের নিয়তসহ সব বিষয়ে ইমামের অনুসরণ ও অনুসরণ করা জরুরী। সুতরাং ইমাম-মুক্তাদীর নিয়ত যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাকে তার অনুসারী বলা যায় না।

দলীল (২)ঃ... ইবন ইইসরাের কালে কালে রসূল ইলাম সুল্তান ইলাম উল্লেখ করেন। (ইবো দাওড জ ১০০ পাব বা হিবাল উল্লাম ইমাম তুমদি জ ১০০ পাব ইলাম ইমাম ফাতেহ ইমাম)

(বাবে ইলাম পাবে ইলাম)
অর্থাৎ, ... আবু হুরায়ারা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, নবী করিম (صلى الله عليه وسلم) ইরশাদ করলেন, ইমাম হলো মুসলমানদের বিম্বিকার এবং মুহম্মদ ইমাম আরাফাতদার।

সুতরাং ইমাম নফল আদায়কারী হয়ে ফরয আদায়কারীর বিম্বিকার হতে পারে না। কারণ কোন কিছু তার উপরের জিনিসের বিম্বিকার হয় না।

আক্ষরিক দলীলঃ যদি নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর নামায় জায়েষ্ট হত, তাহলে শংকাকালীন নামায়ে (صلوة الله عليه) এত কষ্ট স্বীকার করে পড়ার কারণ দরকার ছিল না; বরং সহজ পদ্ধতি এই ছিল যে, একই ইমাম দুই দলকে দুইবার পৃথক পৃথকভাবে নামায় পড়িয়ে দিতে পারতেন। প্রথম দলের কেন্দ্রে ফরযের নিয়ত এবং অপর দলের জন্য নফলের নিয়ত করলেই হত।

(درس مشكوة ج2 ص77)

জবাবঃ (১) হযরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم)-এর পিছনে হযরত নফলের নিয়তে শরীক হয়েছিলেন এবং কওমকে নামায় পড়াচ্ছিলেন ফরযের নিয়তে।

(২) যদিও মেনে নেয়া হয় তিনি নফলের নিয়তে ইমামতি করেছিলেন, তবুও এতে নবী করিম (صلى الله عليه وسلم) থেকে অনুমোদন প্রমাণিত নয়। ইহা ছিল তাঁর নিজের ইজতিহাদ।

আর তাই দেখা যায়, জনৈক ব্যক্তি নবী করিম (صلى الله عليه وسلم)-এর নিকট মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم)-এর বিলম্বে আসা এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে ইমামতি করার অভিযোগ করলে নবী করিম (صلى الله عليه وسلم)- বলেন-

যা মুখাদ্দনের জন্য নামায় পড়া হয় না।

(سجع الزوائد ج2 ص72)

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! তুমি ফিতনা সৃষ্টিকারী হয়ে না। হযরত আমার সাথে নামায় পড়বে, আর্থায় তোমার কওমকে সংক্ষেপে নামায় পড়বে।

(৩) আলমাতা আনোয়ার শাহ কাশীরী (রহ) বলেন, তিনি নবী করিম (صلى الله عليه وسلم)-এর পিছনে মাগরিবের নামায় পড়তেন আর কওমকে পড়তেন এশার নামায়। অতএব নফল আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর প্রশ্নই আসে না।

(معرفي السنن ج5 ص102)

যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে-

عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسل الله صلى الله عليه وسلم المغريب ثم يرجع إلى قومه قبصهم (تلوي)

অর্থাৎ, ... হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। হযরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) রসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)-এর সাথে মাগরিবের নামায় আদায়ের পর স্বীয় গোষ্ঠী ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের এশার নামায়ে ইমামতি করতেন।
(৪) ইমাম তাহবী (রহ.) বলেন, এটা তখনকার ঘটনা যখন একই ফরম নামায একাধিকবার পড়া জাতে ছিল। অতঃপর তা নবী করিম (সাও)-এর হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

(মহারি: ১ সাবুজ ১৩৩) নবী করিম (সাও) ইরশাদ করেন -

লা تَصَلُّوا صَلَوَةٍ فَيَوْمِ مَرْتَعٍ - (ابো দাওদ জ ১ সাবুজ ১৩৫-২১) বাব এদা চ্ছিলেই জমায ত্ব ঈশ্বর

(মহারি: ১৩৮) সিখত চলো শামিয, দার ফেন জ ১ সাবুজ ১৩১)

অর্থাৎ, তোমরা একই (ফরম) নামায একই দিনে দু-বার আদায় করা না।

باب في تحرير الصلاة وتحليلها ص 91

নামাযের হারামকারী (সুচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জনিসের বর্ণনা

... عيّن عليّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الصلاة الطهور

وتحريمهما التكرير وتحليلها التسليم - (تومদি: ১ চৌন ৩৫৫) باب تحريم الصلاة وتحليلها, ابن

ماد্দা: ১২৪)

অনুবাদঃ হরমত আলির (রাও) হতে বর্ষণ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাও) বলেছেন, পরিবর্তন নামাযের চাবি সর্বপ্র। তাকবীর হল তার (নামাযের) জন্য অন্যান্য বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হল তার জন্য অন্যান্য বিষয়কে হারামকারী।

وتحريمهما التكرير (নামায বহির্ভূত কাজ হরাম করার মাধ্যম হল তাকবীর)

নামাযে তাকবীরে তাহরীম-এর উচ্চারণভঙ্গি এবং হুকোম কি, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* হরমত সাঈদ ইবনুল মুসায়িব ও হাসান বসরী (রহ)-এর মতে, নামায শুধু করার জন্য তাকবীর বা অন্য কোন যিনিরজরী নয়; বরং শুধু নিয়ত দ্বারা নামায শুধু করায়।

* জমহুরের মতে, শুধু নিয়ত দ্বারা শুধু হতে পারে না, বরং যিনির (তাকবীর উচ্চারণ করা) জরুরী।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসটি প্রথম মায়াহারের পরিপ্রেক্ষী জমহুরের প্রমাণ।
আহকামুল হাদিস

১৮৩

নামায অধ্যায়

* উল্লেখ যে, ইমাম মালিক, শাফেকি, আহমদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, নামাযে তাকবীর (اللهُ أُكْبِرُ) বলা ফরয়। তাদের মতে, সৃষ্টিকর্তার তাজিয় সংক্রান্ত অন্য কোন শব্দ এর ছলাভিত্তিক হতে পারে না।

* অতঃপর তাকবীরের শব্দ নিদিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

(ক) ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, তাকবীরের শব্দ গুহু আল্লাহু আকবার (اللهُ أُكْبِر).

(খ) ইমাম শাফেকি (রহ.) এতে আল্লাহু আকবার করেন।

(গ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এ দুটোর সাথে আল্লাহু আকবার।

ফীম আফিল এবং উভয়টিই বরাবর।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস (اللَّهُ أُلَلَ " তাহীমা তাকবীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তাহীমা তাকবীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে। এটি উল্লিখিত ইমামগণ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরয় সাব্যস্ত করার প্রবন্ধ।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, আল্লাহু তাআলার মাহাত্ম্য বুঝায় এরপ যে কোন যিকির দ্বারা তাহীমার ফরয় আদায় হয়ে যাবে। যেমন-

الرَّحْمَنُ -اللَّهُ أَعْلَمْ -اللَّهُ أَجْل

ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে তার নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে খবরে ওয়াহিদ দ্বারায় যেহেতু তাকবীরের (اللهُ أُكْبِر) বর্ণনা এসেছে। এজন্যই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, আল্লাহু আকবার ব্যাখ্যাত অন্য শব্দ ব্যবহার করলে নামায দোহোরাও ওয়াজিব হবে।

দলীল (১)ঃ আল্লাহু তাআলার বাণী - ওয়াজিব আর্থাৎ, সে তার পালনকর্তার নাম উচ্চারণ করেছে, অতঃপর নামায আদায় করেছে। (আল-আলাঞ্জু ১৫)

উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে আল্লাহু তাআলার নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাকবীরের শব্দের কোন খাস নেই।

দলীল (২)ঃ তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন, বড়ুড়ু মহাত্ম্য ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পুরোপুরি আহনাফের অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।
জবাবঃ (১) তিন ইমাম সিমােবন্ধার কথা যে উল্লেখ করেছেন, এর জবাব হল, এখানে সিমােবন্ধার দ্বারা আপেক্ষিক সিমােবন্ধার (ছসর একায়ন) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এমন শেতের উপর সিমােবন্ধ করা যে সকল শেতে আলাহ তাআলার মাহাত্মের নিদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।
(২) হাদিসটি খবর ওয়াহিদ আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ফরম হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা দলীল (প্রমাণ) চার প্রকার। যথা�ঃ
(১) কাতারে ফরম প্রমাণিত (অকাটা অর্থ অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। যেমনঃ কোন আয়াতের আয়াতে মুহাম্মদ এবং হাদিসে মুতাওয়াতির- যার দ্বারা ফরম এবং হাসাম প্রমাণিত হয়।
(২) মুতাওয়াতির দলীল ও যায়িন্য (ধারামূলক অর্থ ধারামূলকভাবে প্রমাণিত)। যার অর্থ ও ভাব অনুমানিত ও সম্পর্কিত, এ সকল দলীল দ্বারা মাক্রহ তাহরীমি ও মুসাহাব প্রমাণিত হয়।
(৩) তাহরীম দলীল (অকাটা অর্থ ধারামূলকভাবে প্রমাণিত)। যেমন, ইহা আখরাব আহ্মদ। যার অর্থ ও ভাব সুনিদিষ্ট ও সম্পৃক্ত কিন্তু খবরে ওয়াহিদ হওয়ার কারণে তা সম্পৃক্তের উদ্দেশ্য নয়।
(৪) তাহরীম দলীল (ধারামূলক অর্থ অকাট্যভাবে প্রমাণিত)। যেমন- কুরআনের আয়াত মুতাওয়াল (ব্যাখ্যামূলক আয়াত) যেহেতু কুরআনের আয়াত, তাই তা অকাট্য। আর এগোলা যেহেতু মুতাওয়াল সে কারণে ধারামূলক। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার দলীল দ্বারা ওয়াজিব, মুসন্দে মুথাকাতাহ এবং মাক্রহ তাহরীমি প্রমাণিত হয়। আর উক্ত হাদিসে তাহরীম ও যায়িন্য তথা তৃতীয় চতুর্থ প্রকার দলীলের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর দ্বারা ফরম প্রমাণিত হবে না, বরং ওয়াজিব প্রমাণিত হবে। তাই আনভাগণ তাহবীরে তাহরীম বা আলাহু আকাবর বলাকে ফরম না বলে ওয়াজিব বলে থাকেন।

* মূলত এই এখতিলফটি একটি মোলিক মতানৈকের উপর নির্ভরশীল। তা হচ্ছে তিন ইমামের মতে ফরম ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং ফরম- মুসন্দের মধ্যে আদিশ বিষয়ের অপে কোন ভেতর নেই। এজন্য তারা খবরে ওয়াহিদ দ্বারাও ফরম সাব্যস্ত করার প্রবন্ধ। কিন্তু হাতন্তীয়ের নিকট ফরম ও মুসন্দের মাঝে আরো ভেতর হল ওয়াজিব। এই মোলিক এখতিলফের সাথে এটাও সুরুণ রাখা উচিত যে, এই মতপার্থক্য চিহ্নিত হয়। আমলীভাবে উভয় মাহাত্মে সম্প কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাহবীর (আল্লাহ আব্দুল লখ) হচ্ছে দিলে উভয় দলের মতেই নামায দোহারানো
ওয়াজিব। পার্শ্বক্যে শুধু এতেকুকু যে, তিন ইমামের মতে এমতাবল্লাহ ফরয়ুই আদায় হবে না। অতএব, তাদের মতে এরূপ ব্যক্তিকে যে তারাবীরের শঙ্কের সাথে নামায না দেহারাবে তাকে নামায তরকারার বলা যাবে। পক্ষান্তরে, হানাফীদের মতে এরূপ ব্যক্তিকে ওয়াজিব তরকারার বা গোনাহগার বলবে, কিন্তু আমানন্দ নামায তরকারার বলা যাবে না।

দ্বিতীয় বাক্য- “وَتَحْيَيْنِهَا السَّلَّمُ” (নামাযে নিষিদ্ধ এমন কাজ হালাল করার মাধ্যম হল সালাম)

সালামের ব্যাপারেও ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-
* তিন ইমাম ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, নামায থেকে বের হওয়ার জন্য সালামের শঙ্ক তথা \( \text{السَّلَّمُ عَلَيْكُمُ} \) বলা ফরয়। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সালাম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে নামায শেষ করে তবে তার নামায ছন্ড হবে না।

দলীলঃ নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ হাদিস- “وَتَحْيَيْنِهَا السَّلَّمُ”

এখানেও এর দ্বারা খবরকে সীমাবদ্ধতার সাথে আনা হয়েছে। যার সারনির্দেশ হল, নামায থেকে হালাল হওয়া তাসলিম শঙ্কের সাথে বিশেষত। তাহাড়া উপরের প্রকিষ্ঠ তিন ইমামই খবর ওয়াজিব দ্বারা ফরয প্রমাণিত হওয়ার প্রবন্ধ।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ফরয হচ্ছে মুসলমান যেকোন কর্ম দ্বারায় নামায থেকে বের হওয়া। বস্তুত সালামের শঙ্ক বলার ব্যাপারে হানাফী মাশায়েদের দুই ধরনের উক্তি রয়েছে:

(ক) ইমাম তাহরিব (রহ.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহা সুম্বত।
(খ) আলাবাম ইবনে হুমাম বলেন, ইহা ওয়াজিব। দ্বিতীয় উক্তিটি ইসলামিক আগ্রাহার্য হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাসলিম পরিমাণ বসার পর সালামের শঙ্ক ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে নামায থেকে বের হয়ে যায়, তার ফরয আদায় হবে, কিন্তু দেহারাবে ওয়াজিব।

দলীলঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রা)-এর সেই ঘটনা, যাতে নবী করীম (সাঃ) তাকে তাসলিমের তালিম দিয়ে তাকে বলেছেন-

... ইফতারের এই ও কাফিনের এই ফরয ফলে ফিলিফে চলে যাবে যাতে তা হয় কে ওনে সালাম হতে চলে যাবে বের হয়।

(এবং সদৃশ)
বাবের মায়ে পৌরুষ প্রকাশ করেন এবং আবার আনুমানিক নয়। তাই আদেশ করেন তার দৃষ্টিক্রমে ফরয প্রমাণিত হয় না। এই প্রস্তাবনাটিকে তার বলে ওয়াজির বলে ধারণা করেন।

(প্রফেসর জ/চ ১৯৫২-২০০৪)

পাপ মা যে করার চেষ্টা অন্য নই হয়

কিন্তু আপনার দৃষ্টিকোণে যাও বললেন যে মসজিদের চাকরি করে তারা আমার নামায় যেই যেই অন্য নয় হয় না, যখন তার সামনে উচ্চারিত হয় হাওরা পিচন ভাগের কাঠের মত কিছু না থাকে (অর্থাৎ সত্যনা না থাকে) এবং তার সামনে দিয়ে গাদা, কাল কুকুর এবং কুকুর তালু গান করে। রাখু বললেন, আমি বললাম, কালো কুকুরের কী বিশেষতার আছে? যদি লাল, হলুদ ও সাদা রংদের হয় তবে কি হবে? তিনি বললেন, হে আমার ভাদ্রপূজীক তুমি বেরপ আমাকে শশ্র করলে, আমি তৃতীয় রাসুলুল্লাহ (সা) ১কে মিজাফে করেছিলাম। তিনি বললেন, কাল কুকুর হল শয়তান।

বিশ্লেষণ নামায়র সামনে দিয়ে কুকুর, গাদা এবং মহিলা গমন করলে নামায় নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে:

* আহলে যাহিনি, হাসান বসরী ও আবুল আহ্বান রা মহলীদের সামনে দিয়ে কুকুর, গাদা এবং মহিলা গমন করার কারণে নামায় নষ্ট হয়ে যাবে।
* তিরিমিয় (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক এবং আহমদ ইবন হাবুল (রহ.)-এর মতে, কেবল কাল কুকুর সামনে দিয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

(মুসাফির ঈসা জ ৩:৫৯)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২):

... উন আব্বাস গা঳ যাত্রা বিপুলী মীরাজ হিবুল হামিদ ও বক্তা। (১:৪)

দারু জ ১:২০, নোরাজ জ ১:১২

অর্থাৎ, ... হযরত ইবন আকবার (সাং) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্তুষ্টী মহিলা এবং কুকুর নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়।

উল্লেখ যে, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) এই হাদিস দ্বারাই দলীল পেশ করেন।

তবে মাহিলাদের ব্যাপারে হযরত আতিশ (সাং) কর্তৃক এবং গাধার ব্যাপারে হযরত ইবন আকবার (সাং) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা নামায ভঙ্গের (যার বর্ণনা জমকরের দলীলে আসে) কারণ সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারে কেন শিখিত হাদিস নেই।

(দরস মস্কোর জ ২:৫৭)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেই (রহ.)-এর মতে, নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর, মহিলা ও গাধা তথা কেন জিনিসই অতিক্রম করার কারণে নামায নষ্ট হবে না।

(মুসাফির ঈসা জ ৩:৫৯, দরস তুরভির জ ২:১১)

দলীল (৫):

... উন আবু হানিফা গাল রসূল সান্নী ঐলাহা চলি ঐলাহা ও সলম লা যাত্রা (৫)

(দারু জ ১:২০, নোরাজ জ ২:১২)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু সাইদ (সাং) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাং) ইরশাদ করেন, কেন কিছু নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযের কেন ক্রম হয় না, তবে তোমরা সাধারণমাত্রী এরপ করতে বাধা দেবে। কেননা (নামাযী সামনে দিয়ে) গমনকারী একটা শয্যাতান।

উক্ত হাদিসে লক্ষ্যী বিষয় হল, শেহুদের কেন কিছু (শেহুদের কেন কিছু) শব্দটি নক্ষত্র তথা অনিদিষ্টভাবে না-সূচক বাক্যের অধীনে (নথিত নথিত) নেয়া হয়েছে, যা উমূম নফি-এর ফায়েদা দেয়। অর্থাৎ কেন কিছুই নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করলে নামায নষ্ট হবে না।
দলীল (৩) অনুযায়ী শায়াতান দেখে তা না প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, রাসূল হামাদ (সা) রায় নামায আদায়কালে তিনি (আরিশা) তাঁর বিচারান্তর নবী করিম (সা) ও কিবার মধ্যবর্তী স্থানে মুহম্মদের অন্যতম সহকারী। অতঃপর তিনি যখন বিতরের নামায পড়তে মনস্ত করতেন, তখন তাঁকে (আরিশা) জাগ্রত করেন তিনি বিতরের নামায পড়তেন।

দলীল (৪) অনুযায়ী বলে যে, তিনি প্রথমে আহলে মোহাম্মদ নামায পড়তে মনস্ত করতেন। তখন তাঁকে (আরিশা) জাগ্রত করেন তিনি বিতরের নামায পড়তেন।

দলীল (৫) অনুযায়ী বলে যে, তিনি প্রথমে আহলে মোহাম্মদ নামায পড়তে মনস্ত করতেন। তখন তাঁকে (আরিশা) জাগ্রত করেন তিনি বিতরের নামায পড়তেন।

দলীল (৬) অনুযায়ী বলে যে, তিনি প্রথমে আহলে মোহাম্মদ নামায পড়তে মনস্ত করতেন। তখন তাঁকে (আরিশা) জাগ্রত করেন তিনি বিতরের নামায পড়তেন।
কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি। আমি আমার গাণ্ডীকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নামায়ের কাতারে শামিল হই। এ সময় কেউই আমাকে এ কাজের জন্য নিষেধ করেনি।

দলিল

(৫) উন্নতির প্রতি বাধ্য করি আনাক রসূল শায়কে দুর্বল মুহম্মদ।

অর্থাৎ, ... হযরত আল-ফাদল ইবন আকাশ রহ। হযরত আল-ফাদল ইবন আকাশ রহ। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাহিব (সাহ।) আমাদের নিকট আসেন। আমরা তখন আমাদের খেলামাঠ ছিলাম। হযরত আকাশ রহ। তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি ঐ খেলার মাঠ সুতরাবিশিষ্ট অবস্থায় নামায়ের পাড়েন যখন তাঁর সামনে আমাদের গাঢ় ও কুকুরের দৌড়ানো দৌড়ি ছিল। কিন্তু এটাকে তিনি আপনিই গলে দিয়েছিলেন।

উপরোক্তিতে হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামায়ের সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু গমন করলে নামায়ের নিট হয় না।

জবাবঃ (১) হাদিসের বর্ণিত ফুটুল দ্বারা নামায়ের ফাসেদ হয়ে যায় এবং অদেশ নয়; বরং এর দ্বারা উদেশ্য হল বান্দা এবং তার রূপের সম্পর্কের মাঝখানে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা বান্দা অর্থে সম্পর্ক ছিলকরণ নয়।

(২) এর দ্বারা উদেশ্য হল নামায়ের খুদ-খুদ বা একপ্রকার নিট করে দেয়।

(৩) ইমাম তাহবি (রহ।) বলেন, যে সকল হাদিস সমূহে কুকুর, গাঢ় ও মহিলার দ্বারা নামায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে, ঐ সকল হাদিস রহিত হয়ে গেছে।

(দসের মশকুমা ২ সর ৮৮ তৎসম জ ১ সর ২০১)

কেননা হযরত ইবন আকাস রহ। নিজেই ব্যবহারী হাদিসের সত্যতা বর্ণনা করেছিলেন।

* যেহেতুই বটে প্রশ্ন জানে যে, কোন কিছুই অতিক্রম করলে যেহেতু নামায়ের নং হয় না, তথাপি এ তিনটি জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কি?

এর উত্তর হল, এই তিনটি জিনিসের মাঝে শয়তানী প্রভাবের দক্ষ রয়েছে। যথা -

(১) কালো কুকুরের অনুসেষ্ঠ শুনতেই ইরাশদ হয়েছে -

(২) মহিলার মহিলাদের সম্পর্কে ইরাশদ রয়েছে -

(৩) ইরাশদ দ্বারা হাদিস নারী হল শয়তানের ফাঁদ।
বাবু রফু আলী সি চৌদ্দীর রাকেল ইয়াদীন বা নামায়ে হজন উত্তোলন

রাকেল ইয়াদীন বা নামায়ে হজন উত্তোলন এক সময় এবং কিরু হতে মাঠে উঠানার পরে তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। কিন্তু তিনি দুই সিজ্জদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না।

বিশ্লেষণঃ রকুতে যাওয়ার সময় এবং কিরু হতে মাঠে উঠানার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানাকে রাকেল ইয়াদীন বা হজন উত্তোলন বলা হয়। আর এখানে ইমামদের মধ্যে মদনেবায় রয়েছে। আল্লাহ যে, চার ইমামের মাঝে এই মতবিরোধ ওক্তদিয়া উত্তম ও অনুতমের; বৈধতা-বৈধতার নয়। উভয় দলের নিকট বিনা মাকরহ উভয় পদ্ধতি জায়ন। আর তাই না শাফিখীরদের মাঝামাঝি মতে হাত উত্তোলন না করা নামায়ে ফাসেদ হওয়ার কারণ, না হানাফিরদের মতে হাত উঠান মাকরহ।

সুতরাং এই সাধারণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করে মূল্যবান সময় নষ্ট করা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া কোনোতেই বাংলায় নয়। যদিও ইমাম আওয়াঈ, ইমাম হুমায়ুন এবং ইমাম ইবন খুয়ায়াম (রহ) হজন উত্তোলনকে ওয়াজিব বলতেন।

কিন্তু ইহা বিতর্কের খাতিমে তাদের পক্ষ থেকে বাড়া-বাড়ি বিধায় জমানুরগণ তাঁদের মতকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(ফতুহ আলী র ২৫ সি)
দলীল (১): ইমাম শাফেকি ও হামলীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দলীল হল—

... বাইরে বন অব্দর কান রসূল রাসূল মুসলি হওয়া কর্তৃক সেই আমাদের কর্তৃক উচ্চারণ করা হয়।

অর্থাৎ, ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) নামায় দাওয়াদের সময় নিজের দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে। তিনি তাকবীর বলো রক্ষুতে যেতেন এবং দুই হাত উপরে তুলতেন। রক্ষুতে উঠার সময় ও বীর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে “সামিআলাহু লিমান হামিদাহ” বলতেন। তিনি সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না এবং প্রতি রক্ষুত জন্য তাকবীর বলার সময় তিনি হাত উঠাতেন এবং এইরূপে নামায উচ্চারণ করতেন। (পূর্ববর্তী হাদিদের সূত্র হোটাব্য)

দলীল (২): বিরূপরা নিয়ে বলেন যে রসূল রাসূল মুসলি হওয়া কর্তৃক উচ্চারণ করা হয়।

অর্থাৎ, ... হযরত আলী ইবনে অবু তালিব (রাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) যখন ফরয় নামায দাওয়াদের নিজের তাকবীর বলে বীর হয়ে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে এবং ফিরে আইতে শেষ করার পর রক্ষুতে গল্প করালে এবং রক্ষুতে উঠার সময় অনুরূপ করতেন। তিনি বসে নামায পড়ালালে এরূপ হাত
দলীল ৪: অনুছেদের ঘূতে বর্ণিত হাদিস। এছাড়া এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

সুতরাং উপরোক্তিত হাদিসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাফিউল ইয়াদাইন সুন্নত। যা নবী করিম (সা) থেকে প্রমাণিত।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখেই, আলকামায়, যুফার (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর ছাত্র মসাফুয়ারী রাফিউল ইয়াদাইন শুধু তাকুবরে তাহরীমার সময় সুন্নত। আর রুকুর সময় যদিও জায়েখ তবে এমনটি না করাই উত্তম।

(নন্দর জ ৩৯২) ।

দলীল ৫: অনুরূপতা স্পষ্ট প্রমাণ করে। ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখেই, আলকামায়, যুফার (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর ছাত্র মসাফুয়ারী রাফিউল ইয়াদাইন শুধু তাকুবরে তাহরীমার সময় সুন্নত। আর রুকুর সময় যদিও জায়েখ তবে এমনটি না করাই উত্তম।

(নন্দর ক ৩৯২)।
হযরত বারান্দ (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আবর্তনের সময় রাসুলুল্লাহ (সাম) কেবলমাত্র একবার কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এরপরে তিনি আর হাত উঠাতেন না।

দলীল (৩) হযরত আবদুর্রহাম ইবন উমর (রাজ) তথায় বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সাম) আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিকে উঠিয়েছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (সাম) বলেন, আমি এটা কি দেখতেছি? মনে হয়, যেন তোমরা তোমাদের হতন্ত্রে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিভাঙ্গনের জন্য আদেশিত করছ। তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে।

দলীল (৪) হযরত আবদুর্রহাম ইবন উমর (রাজ) যিনি রাফতান ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদিসের রাবি। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে -

ক্ষেমা হযরত আবদুর্রহাম ইবন উমর (রাজ) যিনি রাফতান ইয়াদাইন সংক্রান্ত হাদিসের রাবি।

দলীল (৫) হযরত আবদুর্রহাম ইবন আব্বাস (রাজ) হতে বর্ণিত হাদিস-

ক্ষেমা হযরত আবদুর্রহাম ইবন আব্বাস (রাজ) হতে বর্ণিত হাদিস-
ঝাঁপ (1) শাফেকী ও হায়ালীগণ রাফুল ইয়াদাইনের সুমিত বা উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীলের সাথে সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য যে দলীলটি পেশ করেন, তাহলে হয়তো উমর (রাশি)-এর হাদিস। অসলে এ হাদিসটি যদি রাজবং বিপরীত ধর্মীয় আমলের কারণে তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, ইবন উমর (রাশি)-এর একসময় শাফেকী মুজাহিদ বলেন, আমি দশ বছর যাত্রা ইবন উমর (রাশি)-এর পিছনে নামায় পড়েছি, কিন্তু তিনি তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য কোথাও রাফুল ইয়াদাইন করতেন না। (2) যদিও উক্ত হাদিসটির সনদ বিদ্যমান তবে সেই সব বিশেষতা উদিত হয় যা এ হাদিসটিকে হানাফীগণ এজন্য প্রমাণ দেন না যে, হত উত্তরের ব্যাপারে ইবন উমর (রাশি)-এর রেওয়ায়েত একটাই পরস্পরবিরোধী যে, এগুলোর মধ্যে তাকে কোন একটিকে প্রাথমিক দেয়া যেতে হবে জটিল। কেননা, এ ব্যাপারে ছয় ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। যথাঃ-
1. কোনটিতে শ্রুত তাকবীরে তাহরিমার সময়।
2. কোনটিতে শ্রুত তাকবীরে তাহরিমার ও রুকু হতে উঠার সময়।
3. কোনটিতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময়।
4. কোনটিতে তাকবীরে তাহরিমা, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়।
5. কোনটিতে উল্লিখিত চারটি সময় ও সিজদায় যাওয়ার সময়।
6. এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রয়োজন রুকু, কিয়াম, বৈঠক, সিজদায়, দুই সিজদায় মাঝখানে রাফুল ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

(শর্ম মুনাফির আলিজম ১৫ সোম, মুত্তা ইমাম মালকে সো. বখার জিন ১৫, শর্ম মুনাফির অমির সোন জিন ২৬৪)
করে কোন এক পদ্ধতি গ্রহণ করে, তবে শুধু তাদের উপরই প্রশ্ন কেন? অথচ, হানাফীদের নিকট প্রথম রোয়ায়েটটি অবলম্বন করার যৌথিক কারণও আছে, যদবা অন্য রোয়ায়েটগুলোর ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে নামায়ের আমলগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নামায়ের আহকাম নড়ালুচড়া থেকে স্থিরতার দিকে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। যেমন, প্রথম নামায়ে কথাবার্তা বলা জানে ছিল, অতঃপর তা রহিত হয়ে যায়। প্রথমে আমলে কাদের নামায় ভঙ্গের কারণ ছিল না, অতঃপর ইহুদে নামায় ভঙ্গের কারণ সাবান্ত করা হয়। প্রথমে এদিক-সেদিক তাকানো জানে ছিল, অতঃপর এটাকে রোক করে দেয়া হয়, এতে বোধ যায় যে, প্রথম দিকে প্রচুর পরিমাণ হত উলোচন হত এবং প্রতিটি অবস্থানকল্প তা বৈধ ছিল। অতঃপর তা ব্রহ্ম করা হয় এবং শুধু পাঁচটি স্থান বিধিবদ্ধ থেকে যায়। এরপর আরো ব্রহ্ম করা হয় এবং চারটি স্থানে বিধিবদ্ধ থেকে যায়। এমনিতে ব্রহ্ম করতে করতে শুধুমাত্র প্রথম তাকবিরের সময় হত উঠানোর বিধান অবশিষ্ট থেকে যায়।

হানাফীগণ যেহেতু হত তোলার বিষয়টিকে প্রামাণিত বলে বীর করেন, সেহেতু তারা হত তোলার রোয়ায়েটগুলোর কোন সমালোচনা করেন না। অতএব, হত তোলার ব্যাপারে হানাফীদের পক্ষ থেকে আলোচনার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যায় যে, হত তোলা নাজারেয়, অথবা এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। বর্তমান হল, শুধু এতটুকু প্রমাণ করা যে, হত না তোলার বিষয়টিও কুরআন, হাদিস, আহার দ্বারা প্রমাণিত এবং এই পদ্ধতিটিই প্রধান ও উত্তম। যেমন-

(১) আল্লাহ তাআলার বাণী- র্ফুমানের রানী অর্থাৎ, আর আলাহর সামনে তোমরা একাকী আনুগত্যের সাথে (নামায়ে) দুর্দ্বার হও। (বকারাঃ ২৩৮)

এই আয়াতের দাবী হল, নামায়ে নড়ালুচড়া যেন সবচেয়ে কম হয়। অতএব, যেসব হাদিসে নড়ালুচড়া নূতন কম হয় ও উলোচন রয়েছে, সেগুলো এ আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(২) হযরত ইবন মাসউদ (রা) এর রোয়ায়েতে কোন একেলাফ নেই এবং এতে প্রশ্নাপন করারও সুযোগ নেই। কেননা, তার আমল ও বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।

(৩) হযরত ইবন মাসউদ (রা) এর রোয়ায়েতের সমস্ত রাবি ফকীহ। স্বয়ং ইবন মাসউদ (রা) হত উলোচন সংক্রান্ত সমস্ত রাবীদের তুলনায় বড় ফকীহ। আর হাদিসে মুসালালাল বিল ফুকাহা অন্যান্য হাদিসের তুলনায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

(৪) সর্বোপরি বলা যায় যে, হাদিসগুলোতে পার্সিয়ান বিরোধের সময় সাহিত্যে কিরামের আমল খুঁই ওড়তুকুহ। তাই হানাফীগণ বলেন, আমরা যখন এ দিকটি লক্ষ্য করি তখন হযরত উমর, আলী ও ইবন মাসউদ (রা) এর আমল দেখি হত
৪৭৯

বাব মনে লম্য যে বাবার পিতৃবিন্দু পিতৃ-লোক রহমণ র্হিম- চ ১৪

উচ্চরে বিসিমিল্লাহ না বলা

জন আইন নাল লীতি স্নাতি লোক এলাহে স্নাতি ওম বাবা বুকর ওম তাবাম কানন কানন

যাতে তোমার গুলি প্রেম মধ্যে লোক রহমণ র্হিম

(খানি সি সি ১০৫ বাব হজর বলিয়া তোমার, তোমার সি সি ১০৫ বাব হজর বলিয়া তোমার)

অনুবাদঃ আমার (রাই) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাহ), আরু বকর (রাই), উমর (রাই) ও উমর (রাই) "আলহামদুলিল্লাহি রাকিব আলামান" হতে কেরাত পাঠ গ্রহ করতেন।

বিশেষণঃ এখানে যে দুটি বিষয় এক সাথে আলোচনা করা হবে, তাহলে-বিসিমিল্লাহি রাহমানির রাহীম কুরআনের অংশ কিনা এবং উচ্চরে কেরাত বিশিষ্ট নামায় উচ্চরে পড়তে হবে, না কি আক্তে এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতামন্দে রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সূরা নামক ৩০ নং আয়াতে হযরত সুলায়মান (আহ)-এর চিঠিতে যে বিসিমিল্লাহ এসেছে তা কুরআন মাজীদের অংশ।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, দুসূরার মাঝখানে যে বিসিমিল্লাহ রয়েছে, তা কুরআনের অংশ নয়; বরং ইহা দুসূরাকে পৃথক করার জন্য নামিল হয়েছে। অন্যান্য মিকিরের নাম ইহাও একটি মিকির। কতক হাল্লির অভিযোগ তাই। সুতরাং ইমাম মালিক (রহ.) যেহেতু ইহাকে কুরআনের অংশ হিসেবে বীরীর করেন না, তাই
নামায় অধ্যায়

নামায়ের মধ্যেও ইহা পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তা আসে হেক অথবা জোরে হেক। তবে নফলে পড়ার অনুমতি রয়েছে।

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। এখানে বিসিমল্লাহ পড়ার উল্লেখ নেই। এতে রুবা যায় যে, বিসিমল্লাহ কুরআনের অংশ নয় এবং নামায়েও তা পড়তে হবে না।

দলীল (২) আশুলাহ ইবন মুগাফাফাল (রাহ) এর হাদিস। তিনি তাঁর ছেলেকে নামায় বিসিমল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে বিদ্যমান সাবান করে বলেছেন-

গুন্ধ সুন্না মুহাম্মাদ প্রসন্ন বলেছেন যে, বিসিমল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং এটাকে বিদ্যমান সাবান করে বলেছেন-

* ইমাম শাফেঈ (রহ) এর মতে, বিসিমল্লাহ কুরআন মাজীদের অংশ। এমনকি তাঁর মতে, বিসিমল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ এবং প্রতিকে সূরার অংশ। তাই জোরে কেরাত বিষিষ্ট নামায় বিসিমল্লাহ উচ্চতরে পড়া এবং আত্ম কিরাজ বিষিষ্ট নামায় বিসিমল্লাহ আত্ম পড়া সুন্ত্রত।

দলীল (১) হযরত নুরীম আল-মুজমির-এর রেওয়ায়েত। তিনি বলেন-

{লুন্না বোল্লা ইবন হুরাবরান রাহ কুল দেহ একাতুন রহমান রহমান দেহ একাতুন দেহ একাতুন দেহ (নসাল)।

* ১৪৪৪ এর হযরত নুরীম সমীক্ষার রাহ কুল দেহ একাতুন রহমান রহমান দেহ একাতুন দেহ (নসাল)।

অর্থাৎ, অমাই আকাস মুহাম্মাদ এর পিছনে নামায় পড়েছি। তিনি পড়েছেন বিসিমল্লাহের রায়মনির রায়ম। অভ্যন্তর তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

দলীল (২) মুহাম্মাদ হযরত নুরীম আকাস (রাহ) থেকে বর্ণিত। নরী করীম (সাহ) বিসিমল্লাহের রায়মনির রায় যারা তাঁর নামায় আরম্ভ করতেন।
দলীল (৩)। অর্থাৎ, আনাস ইবনে মালিক (রাঘ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঘ) বলেন, আল্লাহু আল্লামাহ৷ অগ্রিমে কাউকে নিয়ে যে বজ্জি আল্লাহ৷ পরামর্শ দিতেন প্রমাণ না হলে হয়তো ইমুম আল্লাহ৷ কাউকে নিয়ে যে বজ্জি আল্লাহ৷ পরামর্শ দিতেন প্রমাণ না হলে হয়তো ইমুম

দলীল (৪)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঘ)-এর রেওয়ায়েত-

কান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্হৗ তাহাল উল্লাহ৷ সাল্লাল্হ৬ তেছার। বিশ্বাসীর রহম্মেত বিশ্বাসীর রহমত - (নষ্ট রাবণ ১ চ ২২৫)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঘ) বিসিমিলাহের রাহমানির চূর্ণকে পড়তেন।

সুতরাং উল্লিখিত হাদিসের মূল কারণ যায় যে, বিসিমিলাহ সুরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ এবং জোর করিতে নামায়ে বিসিমিলাহ উচ্চারণ এবং আত্ম করিতে নামায়ে বিসিমিলাহ আত্ম পড়া সম্প্রতি।

* ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হামলত কুরআনের অংশ, তবে এটি কোনো বিশেষ সূরার অংশ নয়।

বিশ্বাস প্রতিক্রিয়া নামায়ে “বিসিমিলাহ” আত্ম পড়া উত্তীর্ণ। জোরে করিতে নামায়ে হোক অথবা আত্মে করিতে নামায়ে হোক।

দলীল (১)। অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২)। অর্থাৎ, হযরত আহিশা (রাঘ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঘ) তাকবিরে তাহিমা বলে নামায় আরম্ভ করতেন এবং আলহামদুল্লাহ৷ লিখিত রাকিবল আলামীন বলে করোত শুরু করতেন।
দলীল (৩) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

"Chaira nita rasool Allah chale Allah ublie walsam qalam yusmaya qaraye yaseen Allah raho men"

রহমতীর রহমতীর যা বোঁ বোঁ উমর ও সুমান (রাঃ)-এর সাথে নামায় পড়েছি। তাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়তে তুলনি। নাসারী রেওয়ায়েতে আছে, উচ্চবর্ধ পড়তে পারনি।

দলীল (৪) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

"Chaira nita rasool Allah chale Allah ublie walsam qalam yusmaya qaraye yaseen Allah raho men"

রহমতীর রহমতীর যা বোঁ বোঁ উমর ও সুমান (রাঃ)-এর সাথে নামায় পড়েছি। তাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আমাদের অধিন পড়েছি। এমনিভাবে আবু বকর ও তুলনি (রাঃ) আমাদের উচ্চবর্ধ পড়তে দেখানি।

দলীল (৫) হযরত আবু হুরায়ার (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত-

"Chaira nita rasool Allah chale Allah ublie walsam qalam yusmaya qaraye yaseen Allah raho men"

রহমতীর রহমতীর যা বোঁ বোঁ উমর ও সুমান (রাঃ)-এর সাথে নামায় পড়েছি। তাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আমাদের অধিন পড়েছি। এমনিভাবে আবু বকর ও তুলনি (রাঃ) আমাদের উচ্চবর্ধ পড়তে দেখানি।

দলীল (৬) পবিত্র কুরআনের অর্থাত-

"Chaira nita rasool Allah chale Allah ublie walsam qalam yusmaya qaraye yaseen Allah raho men"

রহমতীর রহমতীর যা বোঁ বোঁ উমর ও সুমান (রাঃ)-এর সাথে নামায় পড়েছি। তাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আমাদের অধিন পড়েছি। (হিরজঃ ৮৭)

হিজরত মুহাম্মাদের মতে 'সাবই মাসানী' হারা সুরা ফাতিহা উদ্ধেশ্য।

(আবু দাউদ জঃ ১৩ সং ২০৫ পাপ ফাতিহা কাবার)
কারণ এটি এরূপ সাতটি আয়াত দ্বারা গঠিত যেখানে নামায় বারবার তিলাওয়াত করা হয়। অতএব, সূরা ফাতিহার সাত আয়াত তখনই হয়, যখন বিসিমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ ধরা না হয়। নতুন আটটি আয়াত হয়ে যাবে।

অতএব, উপরোক্ত হাদিসের মূলোক্তি ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিসিমিল্লাহ কুরআনের অংশ তবে তা সর্ববল্প্য আশে পড়াই উক্তম।

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাব-

উল্লেখিত হাদিসে ফেরাত দ্বারা বিসিমিল্লাহ না পড়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এখানে কেবল প্রথম উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। আর ইহা তো জানা যায় যে, বিসিমিল্লাহ কেবল অন্যদের অভিজ্ঞতা নয়। সুতরাং এর দ্বারা বিসিমিল্লাহ না পড়ার দলীল প্রদান করা স্থিত নয়। তবে তা জোরে না পড়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আদুল্লাহ ইবন্ন মুগাফ্ফাল (রাও)-এর হাদিসটি সংক্ষিপ্ত। এটি বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আসলে হাদিসটিতে জোরে পড়তে বারণ করা হয়েছে, কিন্তু বিসিমিল্লাহ পড়া নিষেধ করা হয়নি। আর তাই জোরে পড়তে আদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল কী পুরুষকে বিদায় বলেছেন। কেননা খোদ হাদিসেই এর প্রমাণ রয়েছে-এর জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমাম শাফেেহি (রহ.)

অর্থাৎ, ‘আমার পিতা আমাকে নামায় বিসিমিল্লাহের রাহমানির রাইহি বলতে অনিশ্চিত। ... আমি তাদের কাউকে বিসিমিল্লাহের রাহমানির রাইহি বলতে শুনি না।’

সুতরাং হাদিসটি দ্বারা যাচাই করা হয় যে তাঁর জোরে পড়তেন না। অতএব, হাদিসের পরের অংশ বর্ণিত তথা তুমি তা বলা না- এর অর্থ হচ্ছে ফাই জেনাইবায়া তথা তুমি তা জোরে বলা না।

ইমাম শাফেেহি (রহ.)-এর দলীলকৃত জবাবঃ ইমাম শাফেেহি (রহ.) থেকে যতগলো রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, মুহাদ্রসণের দৃষ্টিতে সবগলো রেওয়ায়েত যৌথ, অস্পষ্ট এবং বিশ্লেষণের দাবী রাখে। সুতরাং এগুলো হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহীহ রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় দলীলের জরায় হল, নবী করিম (সাও) সূরা কাওসারে বিসিমিল্লাহ পড়েছিলেন মূলত সূরার অংশ হিসেবে নয়; বরং তিনি বিসিমিল্লাহ বলেছিলেন তিলাওয়াত ঘুর করার জন্য।

আর চতুর্থ দলীল হিসেবে তিনি হযরত ইবন আকবাস (রাও)-এর বর্ণনা দিয়ে যে দলীলটি পেশ করেছেন, তাও প্রচলিত নয়। কেননা, সবাই ইবন আকবাস (রাও) ইরশাদ করেন

প্রকৃতির প্রমাণ নিয়ে বিসিমিল্লাহের অনুজ্ঞানীর প্রতি সমর্পিত।
বাবা মনে তৃক করিয়া তাহা স্বীয় স্থলে রাখিলেন।

কোন ব্যক্তি নামায় সূরা ফাতিহা অধ্যয়ন করিলে এই চিহ্নিত পাঠ ত্যাগ করিলেন।

... তিনি নিজের স্বামীর স্বর্গ হিসাবে, নিজের দেরিতে ইসলামের সাধনায় সুস্থ হয়ে থাকেন।

কিন্তু তাঁর বাবার জন্য তিনি নিজের প্রথম পাঠের সংগ্রামে নিজের আগ্রহ ছিলো।

নামায় তিনি তাঁর বাবার সমক্ষে পাঠের প্রথম পাঠের প্রস্তাব করেন।

তিনি নিজের বাবা সূরা ফাতিহা বাচ্চা অন্য কিছু পড়বে না।

কেননা, তিনি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায় হবে না।

বিশেষণঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যথা-

(ক) ইমামের পিছনে করাত পড়া (খ) নামায় সূরা ফাতিহার হকুম।

প্রথম আলোচনাঃ উল্লেখ যে, ইমামের পিছনে করাত পড়ার বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে বড় ধরনের মতভেদ রয়েছে। আর বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিধায় অনেক ফকীহ এ সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে যান। কারণ, ইমামগণের মাঝে যে হাজারা
মতবিরোধ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম জোট ও কোন বিষয়।
ইমামগণের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই হল সম্মত, মুসাহাব, মুবাহ, উত্তম-অনুতম, অথবা মাকরহ তান্যেনী পর্যায়ের। সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা হয়ত অনেকের জীবনে একবারও সম্মুখীন হতে হয় না বা সম্মুখীন হলেও তা হয়ত জীবনে দু'একবারের জন্য। কিন্তু ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিষয়টি হল নামায নিয়ে- যা বালেগ হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটি সুষ্ঠ-সবল মুসলিম পুরুষকে দৈনিক পাঁচবার আদায় করতে বাধ্য। তাছাড়া নবী করীম (সা) জামাতের যে তাগিদ দিয়েছেন তাতে একজন খাঁটি মুমিন কখনো ইমামের পিছনে জামাত ছাড়া একাকী নামায আদায় করে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর ইমাম আহমদ ইবন হানুল (রহ.)-এর অভিমত তো এই যে, জামাতে নামায আদায় করা ফরয়ে আইন।
যেহেতু নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত কেরাত তরক করা কারো মতে যেন ফরয় তরক করা, তেমনিভাবে কেরাত পড়াও কারো কারো মতে হারাম। বস্তুত ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কেরাত পড়ার মত প্রাতিহার ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইমামগণের এমন বৈপরীত্যপূর্ণ মতামত খুবই দুঃখজনক।
সহীহ বখায়রীর ভাষ্যকার আল্লামা কুটলানী (রহ.) বলেন, “আমি জীবনে কখনো মুক্তাদী হয়ে নামায পড়িনি। কেননা যদি কেরাত পড়ি, তাহলে এক ইমামের মতে আমি হারাম সম্পাদনকারী হিসেবে গণ্য হব। পক্ষান্তরে যদি কেরাত না পড়ি তাহলে অন্য ইমামের দৃষ্টিতে ফরয় তরককারী হিসেবে গণ্য হব।” (drs মশকো ৭২-৭৩)

যাই হোক, যুগে যুগে এ বিষয়ের উপর উভয় পক্ষ থেকে এত গ্রুহু রচিত হয়েছে যে, যা একত্র করলে একটি পূর্ণ গ্র্হুগার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন প্রমিদ কয়েকটি কিছুব হল ইমাম বখায়রী (রহ.) রচিত “জুয়ুবল কেরাত খলফাল ইমাম”, বায়হাকী রচিত “কিতাবুল কেরাত”, আল্লামা আব্দুল হাই লখনী রচিত “ইমামুল কালাম ফিল কিরাআতি খলফাল ইমাম”, আল্লামা কাসিম নারুতধি রচিত “আদ-দালীলুল মুহাকাম ফী তরকিল কিরাআতি লিল মুতাম”, আল্লামা বর্দী আহমদ গাছুই রচিত “হিদায়াতুল মুতাদী ফী কিরাআতিল মুক্তাদী” আল্লামা কাশিবীর (রহ.) রচিত “ফসলুল থিতার ফী মাসআলাতি উমুল কিতাব”, আল্লামা সরফরাজ খান সফরাজ রচিত “আহসানুল কালাম ফী তরকিল কিরাআতি খলফাল ইমাম” ইত্যাদি।

(درس توميمي 72-71)

মাযহাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

* ইমাম মালিক ও আহমদ ইবন হানুল (রহ.)-এর মতে, জোরে কেরাত বিষিষ্ট নামাযগুলোতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। তবে তাঁদের কোন কোন রেওয়ায়েতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরহ, কোনটিতে জায়েফ
নামায অধ্যায়

বাংলা উক্তি মুসা হাদিস

বাস্তবতাতে মুসাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার আপনি কোনো বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যথা-

(১) ওয়াজিব,
(২) মুসাহাব, (৩) মুহাব বা অনুমোদিত।

(গল্প মাজাহ) ১ ১০৬

... আল্লাহ এক নিশ্চিত পাশাপাশি করে তাদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

(অর্থাৎ)

বাংলা উক্তি মুসা হাদিস

বাস্তবতাতে মুসাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার আপনি কোনো বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

(গল্প মাজাহ) ১ ১০৬

... আল্লাহ এক নিশ্চিত পাশাপাশি করে তাদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

(অর্থাৎ)

বাংলা উক্তি মুসা হাদিস

বাস্তবতাতে মুসাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার আপনি কোনো বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

(গল্প মাজাহ) ১ ১০৬

... আল্লাহ এক নিশ্চিত পাশাপাশি করে তাদের থেকে তিনটি রেওয়ায়েত রয়েছে।

(অর্থাৎ)
অর্থাৎ, ... আরু হুরায়ারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাহেব (সাঃ) ইহাদ করেন, যে ব্যক্তি নামায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায় একটিপূর্ণ, তার নামায় একটিপূর্ণ, তার নামায় একটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। রাবী বলেন, পরবৃত্তকলালে আমি আরু হুরায়ারা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাতু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসিই! তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে।

দলীল (৩) 

... عِنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ق* ইমাম আরু হানিফা, সাহেরাইন ও জমখুর সাহাবাগণের মায়হাব হল, মুকতাদী কোন নামায়ই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন কিরআত পাঠ না, উচ্ছবে কেরাত বিশিষ্ট নামায হোক বা হোক, এমন বিশিষ্ট নামায হোক। ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ সর্বসম্প্রতি মারকক তাহরিমী।

(*) ফতুহ মুলিম বি.১৩ (২) লুলির আলাঈল বৈণ্ণ-

* ওয়াদা ফুআরুল কুরান ফাস্টেম্পুরুর হে অন্তুম্মুরুল ম্যাক্রুমুন।

অর্থাৎ, আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন কৌমর তা মনোযোগের সাথে শোন এবং তোমরা নিশ্চিত থাক। তাদের তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (আল-আরাফঃ ২০৪)

সুতরাং উক্ত আরাতে দুটি হুকুম দেয়া হয়েছে। একটি কুরআন শোনার, অপরটি নিরবতায়। সুতরাং যখন কেরাত বিশিষ্ট নামায় কুরআন শুনে করবে এবং আরে কেরাত বিশিষ্ট নামায় মুকতাদী নিরব থাকবে। আর সূরা ফাতিহা যে কুরআন এটি সর্বসম্মত বিষয়। অতএব, এর দ্বারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ নিষিদ্ধ বুঝা যায়।
* কেউ কেউ উক্ত আযাতে প্রশ্ন উত্তর করেন যে, এই আযাতটি নামায় সম্পর্কে নয়; বরং জুমুআর খুতবা সম্পর্কে নামিল হয়েছে। অর্থাৎ, যখন ঈমাম খুতবা পাঠ করেন, যাতে কুরআনের আযাতও বিদ্যমান থাকে, তখন তোমরা নীরব থাক। কিন্তু এই প্রশ্ন উত্তর যথাযথ নয়। কেননা, (১) ঈমাম বায়হাবী হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম (সাং) এর যামানায় কোন কোন সাহাবী ঈমামের পিছনে কেরাত পড়তেন। তখন উক্ত আযাত নামিল হয়। (কৃতির প্রবন্ধ ৮৭)।

(২) উক্ত আযাতটি মক্কা, আর জুমুআর নামায়ের প্রবর্তন হয় মদিনায়।

(৩) আযাতে কুরআন তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ খুতবা সম্পূর্ণ কুরআনের আযাত হয় না। পক্ষে নামায়ের কেরাত সম্পূর্ণ কুরআন।

সুতরাং, অবশেষে আল্লাহ ইবন জারিয়ার ও সুম্যতী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের একত্র রয়েছে যে, এ আযাতের অর্থে নামায় অন্তর্ভুক্ত।

(দ্রস তৃতীয় ৪ সং ৪২, সুষম মাত্র ৫ সং ১০, আলা দল ৪ সং ৪২)

অতএব, হানাফীদের দলীলের জন্য একটি আযাতই যথেষ্ট। এর মুখবিলায় যত হাদিস পেশ করা হবে সবগুলোকে এই আযাতের আওতায় ব্যাখ্যা করা হবে।

দলীল (২)৪ আল্লাহ তাআলার বাকী-

যোম যে কে তৃভূমি ও মলাইকান চন্দ্র জন্য তোমরা না পয়লাবো না আনে হজর্তের নেই চন্দ্রভি ও মলাইকান ।

অর্থাৎ, যেদিন রহ ও ফেরোফতগণ সারিমুহের দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য কথা বলবে।

(নামায় ৩৮)

উক্ত আযাতে লক্ষ্যীয় বিষয় হল, আমাদের নামায়ের সাইরিমুহের আল্লাহর নিকট ফেরোফতগণের সারিমুহের সাথে তুলনা দেয়া যায়। যেভাবে ফেরোফতগণের সারিমুহের মধ্য থেকে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্য কেউ কোন কিছু বলতে পারবে না। অনুরূপভাবে, নামায়ের আল্লাহর সাথে কিছু বলার অনুমতি নেই, ঐ বাকি ব্যতীত আল্লাহ তাআলার যাকে অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনি হলেন ঈমাম।

সুতরাং কেরাত একমাত্র ঈমামেরই হক। অন্য কারো নয়। (দ্রস মধুকর ৪ সং ৫৭)

দলীল (৩)৪ আল্লাহ কাশরীর (রহ.) বলেন, পরিত্ত কুরআনে আযাত এসেছে-

যোম যে কে তৃভূমি ও মলাইকান চন্দ্র হজর্তের নেই চন্দ্রভি ও মলাইকান।

অর্থাৎ, এর পূর্বে মূসার কিছু ছিল পফ্র প্রদর্শক ও রহমতবর্তী। (আহকাফ় ১২)
উক্ত আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর কিতাবকে ইমাম বলা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য ইমাম হবে পবিত্র কুরআনুল কাফিরা। আর প্রকৃত সামঞ্জস্য তো এই যে, ইমাম (কুরআন)-কে ইমামের নিকটই রাখা চাই। (দূর্লভ ৩৪:২)

দলীল (৪): হযরত আরু মূসা আস্ফালার (রাঃ) সুরে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ রেখাযাতে উল্লেখ আছে

...যেন আয়াত হযয়ে হযরত মুসা আদর করেন যেন রসূল লাল্লাতে অল্লামা ইসা মাসিরের হযরত মুসা। 

িরায়েরি কুরআনের বিচার করা হয়েছে, যেন তার পাচার করা হয়।

অতএব, ইমাম যখন তাকবিবীর বলে, তখন তেমনও তাকবিবীর বলে। আর ইমাম যখন কেরাত পড়ে, তখন তেমনও চুপ থাকে।

উক্ত হাদিসে ইমামের কেরাতের সময় শতীকান্তীতে নীরবতা অবলম্বনের নিদর্শন দেয়া হয়েছে। যা সুরা ফাতিহা ও অন্য কেরাত উদ্ধন্তের জন্য ব্যাপক। এই দুটির মাঝে পার্থক্য করা কেন করে? অর্থাৎ যার নাম কেন? কেননা, উক্ত হাদিসে নবী করিম (সাহ) এক একটি আলম খুলে খুলে বাতলে দিয়েছেন। যদি ফাতিহা ও সুরা পাটের হকুমে কেন পার্থক্য হত, তাহলে তিনি অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন।

দলীল (৫): ইমাম মালিকের পক্ষে দলীল হিসেবে পূর্বে বর্ষিত হাদিসে।

উক্ত হাদিসে একটি গতীতের চিন্তা করলে একটা বুদ্ধি যায় যে, উক্ত হাদিসে এমন কিছু দলীল ও ইজিত পাওয়া যায় যদরূপ ইমামের পিছে কিরাতে না পড়া কথা প্রমাণিত হয়। যেমন-

(১) যখন নাম্যান্তে নবী করিম (সাহ) জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের মধ্যে কি কেউ কেরাত পড়েছে?” এতে বুঝা যায় যে, নবী করিম (সাহ)-এর পক্ষ থেকে ইমামের পিছে কেরাত পড়ার হকুম ছিল না, নতুনা তিনি (সাহ) এরপ প্রশ্ন করতেন না।

(২) যদি ইমামের পিছে কেরাত পড়ার হকুম থাকত, তাহলে তা সবই বলতেন যে, জি হজরা। আমারা কেরাত পড়েছি, শুধু এক ব্যক্তি বলতেন না।

(৩) নবী করিম (সাহ) তাঁর পিছের কেরাত পড়াকে বাদানুবাদ (মানুষাত্মক) সাব্যস্ত করেছেন। আর বাদানুবাদ হয় যখন অনন্তর হক অংশ নেয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কেরাত ইমামেরই হক, মুক্তাদীর হক নয়।

(৪) কিছু সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁরা এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত ইমামের পিছে কেরাত পড়তেন। এই ঘটনার পর আর কেউ ইমামের পিছে কেরাত পড়তেন না। যা উক্ত
হাদীসের শেষে হযরত আবু হুরায়রা (রা) উল্লেখ করেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়া জায়ে নয়।

দলীল

কান লেন: "এই ফযরােয়া ইসলামের লেন।" (আবু মাজাহ চ. ১৩১, ১৩২, ১৩৩ মুহম্মদের মুক্তির বিষয়ে, চ. ১২, ১৩, ১৪)

অর্থাৎ, হযরত জাবিরের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ص) ইরশাদ করেছেন, তার ইমাম আছে, ইমামের কেরাতী তার কেরাত।

আলিমারা আকবরী (রহ) বলেন, বিশ্বদেশে এ হাদীসটি মরফু। (রহ মাজাহ ৫. ৩) সুতরাং ইসলামের পিছনে হাদীসকের অভিমতের জন্য একটি স্পষ্ট দলীল। কেননা, এখানে একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের কেরাত মুজাদীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অতএব, মুজাদীর কেরাতের প্রয়োজন নেই। অতঃপর এই হাদীসে ব্যাপক কেরাতের হুকুম বর্তমা করা হয়েছে, যা সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

দলীল

... "হুরায়রা আবু তাবুললাহ আলামের হস্তে এই ফযরােয়া ইসলামের রীতি অনুসরণ করলেন যে এটি বাঝানো যাবে।" (আবু জাদ ১. ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬ পাইর তামাম আলাম, মুহাম্মদের মুক্তির বিষয়ে, চ. ১৪, ১৫, ১৮)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ص) ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমিয়ন বলবে, তখন তাদের আমিয়ন বলবে। কেননা, যে বাক্তির আমিয়ন শব্দের বাক্তির আমিয়নের মধ্যে বিভিন্ন তাদের সূর্য্যধারার মধ্যে মিল থাকেতে তার পূর্ব জীবনের সম্মত গোনাহ মজিহ হয়ে।

হাফিজের ইবনে আবদুল্লাহ (রহ) ইমামের পিছনে মুক্তির কেরাত না পড়ার দলীল উভয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের মধ্যে মুক্তির কেরাত না পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুক্তির দলীলের ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর অপেক্ষাকৃতি হবে চুপ থেকে শ্রবণীকৃত।

* আলিমারা আনৌয়ার শাহ কাশীরী (রহ) এই হাদীস দ্বারা এভাবে দলীল শেষ করেছেন যে, যদি কোন মুক্তির ফাতিহার মাধ্যমে এসে জামাইতে শর্করি হয়, এমততাবলে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা শেষ করবে তখন তো সে ব্যক্তি বীরয়
ফাতিহার মাঝখানে আমীন বলতে হবে। যা কখনো যুক্তিসঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে, ঐ ব্যক্তি যদি নিজের ফাতিহা শেষ করে আমীন বলে, তাহলে তা হবে উল্লিখিত হাদিসের বিপরীত। কেননা তথায় ইমামের আমীনের সাথে আমীন বলার কথা বলা হয়েছে।

(درس مشکوْةج ۷۵ص) সুতরাং, উপরায় লিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা রুখা গেল যে, মুক্তাদীর ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়া জায়েন নয়।

তাহলে ইমামের পিছনে কেরাত না পড়ার ব্যাপারে অনেক সাহাবীর অভিমত ও রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। আল্লামা আইনী (রহ.), উমদাতুল কারীতে ইমামের পিছনে কেরাত পরিহারের মাধ্যমে ৮০ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অনেক সাহাবীতে এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। খোলাফায়ের রাশিদীনও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

(مصنف عبد الرزاق ج ۷۵ص) ইবন মাসউদ (রাও) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, ইমামের পিছনে কেরাত পড়তে হবে, এমন ব্যক্তির মুখে মাটি নিকেল করা উচিত।

(مجمع الزوايد ج ۶۸-۱۱۱ص) হযরত আলী (রা) বলেন, এমন ব্যক্তি ফিতরতের উপর নেই।

(سورة ري) হযরত সাদীক ইবন আব্বু ওয়াকাক (রা) বলেন, এমন ব্যক্তির মুখে আগুনের টুকরো দেলে দেয়া উচিত।

(مؤتنا امام محمد ص ۱۱۰-۱۱۲ص) হযরত ইবন উমর (رال) বলেন, এমন ব্যক্তি বেওকুফ।

এছাড়া যায়েদ ইবন সাবির, জাবির ইবন আব্বুল্লাহ, আব্বুল্লাহ ইবন আব্বাস (رال) প্রমুখ সাহাবীগণও ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার বিপক্ষে অভিমত পোষণ করতেন।

(شرح معاني الأنوار ج ۱۰۸ص, مؤتنا امام مالك ص ۶۶) আক্বাস তো এই যে, ইমাম কবরের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি।

মুক্তাদীগণের পক্ষ থেকে মহান রাকুল আলামীনর দরবারে দরখান্ত পেশ করবেন।

কিন্তু রকু ও সিজদা এর বিপরীত। কেননা এগুলো হল নামায়ের আদবসমূহ।

এগুলোর উদেশ্য হল আল্লাহ তাআলার তাজিম করা, যা সবাই আদায় করা উচিত। আর কেরাত হল দরখান্ত। যা সবার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি সেজে আল্লাহর নিকট পেশ করবেন। আর তিনি হলেন ইমাম। যদি সবাই একই কথা একই সাথে বলে, তাহলে স্টো হবে বেয়াদবী।

তাই কিয়াসেরও দাবী হল এই যে, কেরাত তুমি ইমাম পড়বেন, আর মুক্তাদী তা মনোঘোষ সহকারে শুনবে বা চুপ থাকবে।

(درس مشکوْةج ۷۵ص, تنظیم ج ۳۲۳ص، فتح العلم ج ۲۲۴ص)
হানাফীদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেইঈ (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবঃ  
(1) যদিও শাফেইঈদের নিকট উক্ত হাদিসটি নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী, কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসটিকে সনদ ও মতনের দিক দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ (ইয়তিরাব) বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবন হাব্বান, হাফেজ ইবন আলুল বার, ইবন তাইমিয়াহ উক্ত হাদিসটিকে মালুক বা ক্রটিমুক্ত বলেছেন।

(فتاوى ابن تيمية ج 2 ص 178، معارف السنّة 3 ص 202-205)
কেননা, উক্ত হাদিসের কোন কোন সনদ এভাবেও বর্ণিত হয়েছে-

(عَن مَكْحُولٍ عَن عِبَادَةَ إِبْنِ الصَّامِتِ (دَارَ قَطْلِيّ ج 1 ص 191)
আর মাককুল সর্বসম্মতিক্রমে উবাদা (রা.) থেকে প্রবণ করেননি।
কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে-

(عَن مَكْحُولٍ عَن نَافِعِ بن مُحمَودِ بن الريْبَعِ عَن عِبَادَة (ابِن دَوْدْ ج 1 ص 119)
কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে-

(مَكْحُولٍ عَن مُحمَودِ ابنِ نَعْيمِ ابنِهِ سَمِعَ عِبَادَة- (دَارَ قَطْلِيّ ج 1 ص 191)
এই নিমিন্তে সনদের অসঙ্গতির সাথে মাককুল থেকে বিভিন্ন কিতাবে আটটি প্রকার বর্ণিত আছে। সুতরাং এতো অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও হাদিসটি কিভাবে দলীলযোগ্য হতে পারে? তাই অনেকেই মনে করেন, মাককুল দু’টিনটি রেওয়ায়েত মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র রেওয়ায়েত বানিয়ে ফেলেছেন। অথবা, রেওয়ায়েতে তাঁর ভুল হয়ে গেছে।

(فتاوى ابن تيمية ج 2 ص 178)

(2) যদি এ হাদিসটিকে সহীহুও মেনে নেওয়া হয়, তবুও এর দ্বারা শাফেইঈদের প্রমাণ যথার্থ হতে পারে না। কারণ, হাদিসে সূরা ফাতিহা ও কীরত ছাড়া নামায় শুধু না হওয়ার যে হুকুম এসেছে, তা মূলত ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর (مفرد) ক্ষেত্রে প্রয়োজা হবে, মুক্তাদীর ক্ষেত্রে নয়। বং ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর উত্তাদ সুফিয়ান (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন- ... لَمْ يَنْصَرِّ بِهَا وَحْدَهَا - (ابِن دَوْدْ ص 119)
অর্থাৎ, এই নির্দেশ কেবলমাত্র একাকী নামায আদায়কারীর বেলায় প্রয়োজা।

(3) হতে পারে যে, হাদিসে কীরতের দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক। প্রকৃতভাবেও হতে পারে (যেমন ইমাম ও মুনফার্দের কীরত) বা হুকুমের দিক দিয়েও হতে পারে।
আর উক্ত হাদিসের ক্ষেত্রে আমরা (হানাফীগণ) মুক্তাদীকে পাঠকারী বলে গণ্য করতে পারি।
যেমন হযরত জাবির (রা.)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-
ছুলে গেলে আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দেন কৃত্রিম আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দেন।

(৪) উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হতেই বর্ণিত। অন্য একটি হাদিসে উল্লেখ আছে-

... কাফতি কোন আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দেন কৃত্রিম আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দেন।

ফসাদ (ابو دাউদ ১ص ১১৯, بخاري ১ص ১০৪) সিয়াই ১ص ১২৮)

অর্থাৎ, ... নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, যে বাকি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অভিলক্ষ্য আয়াত পাঠ না করবে, তার নামায পূর্বাভাস হবে না।

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, সূরা ফাতিহার মুহাদিনিতে এই হকুম। অথচ ইমাম শাফেক (রহ.) মুহাদিনীর জন্য সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর প্রবন্ধ নন। তাই আমরা (আহমাফগন) বলব, সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে আপনাদের যে উত্তর, সূরা ফাতিহা পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের সেই একই জবাব।

(فتح العلمج ٢ص ٢٠، تعلق الصحيحج ١ص ٣٦)

(৫) হযরত উবাদা (রা) থেকে এভাবেও হাদিস বর্ণিত আছে-

... কাফতি কোন আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দেন কৃত্রিম আল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দেন।

অর্থাৎ, ... নবী করিম (সা) বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না।

আব্দাল মারীয়া আহমদ গাফুর (রহ.) বললেন, উক্ত হাদিসে নাই (নিষেধ) থেকে ইস্তিসনা (বাণিজ্যের কর্মী) করা হয়েছে। আর যখন নাই থেকে ইস্তিসনা করা হয়, তখন মুসলমানর যা বাণিজ্য করা হয়েছে বৈধতা প্রমাণিত হয়, আবশ্যকতা বা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না।

(درب ترميدج ٢ص ٧٨)

তাই অন্তত হাদিসের পর কিছু সন্ধ্যক সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়তেন। পরে যখন নবী করিম (সা) একে বাদানুবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এরপর থেকে সাহাবিগণ তা আর করতেন না।

বিদ্যম্য দলীলের জবাব (১) হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদিসের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায অসম্পূর্ণ। উক্ত হকুমটি অন্যন্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ইহা ইমাম এবং একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রমাণ।

আর দ্বিতীয় অংশে যে মনে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে, প্রথমত তো এটা আবু হুরায়রা (রা)-এর নিজের ইতিহাস। যা মাগফুর হাদিসের বিপরীতে প্রমাণযোগ্য
তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) উক্ত হাদিসের সনদে জাফর ইবন মায়মুন নামে একজন রাও রয়েছেন। যিনি সমালোচনার উদ্ধে নন। ইমাম নাসাইয়ি (রহ.) তাঁর ব্যাপারে বলেন- আর তিনি আহ্মদাবাজান ব্যতির নন।

(২) উক্ত হাদিসে নামায় সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানের কথাতঃ বলা হয়েছে। শাফেকিগণ স্থুল ফাতিহার কথা বলে থাকেন, অন্য সূরা মিলানের কথা বলেন। অথচ একই হাদিসের নিজেদের মনমত একটি অংশ গ্রহণ করা এবং অন্য অংশ নিজেদের মনমত না হলে বাদ দেয়া যুক্তিসংগত নয়।

(৩) মূলতঃ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইমাম ও একজন নামায় আদা বা ইমামের পিছনে মুক্তাদের সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, ইহা বুখানোর জন্য হয়।

(নিয়মের আদেশাত ১ সংখ্যক ২২7-২৩৮)
ব্যতিরেকে আলোচনা নামায় সূরা ফাতিহা চুক্তির কারণে।

নামায় সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানীক্ষ রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক নামায় সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। ইহা তরক করলে নামায সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের মতে, সূরা মিলানো মাসনূুন বা মুত্তাহাব।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের চরুতে বরিষ্ঠ হাদিস।

উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, ফাতিহা না পড়লে নামায ব্যাপক হবে না। সুতরাং বুঝা গেল ইহা ফরয। (এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস ইতিপূর্বে বিশেষিত বরিষ্ঠ হয়েছে।)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়; বরং ওয়াজিব।

আর ফরয হল সাধারণ কেরাত পাঠ করা। উল্লেখ্য যে, ফাতিহা সাধে সূরা মিলানো ওয়াজিব; সুন্নত বা মুত্তাহাব নয়। অতএব, সূরা ফাতিহা বা সূরা মিলানো এগুলোর মধ্যে থেকে যেকোন একটি তরক করলে কেরাতের ফরযধিক্য আদায় হলেও ওয়াজিব তরক করার কারণে নামায দোহরানো ওয়াজিব হবে।

দলীল (১) আলাহ তাআলার বাণী- ফাতিহা মা ত্যস্ত তু তুরান। (অর্থাৎ, কুরআনের যতটুকু তথ্যের জন্য সহজ, তেমন ততটুকু পাঠ কর।) মুত্তাহাব: ২০

উক্ত আয়াতে যদি ততটুকু সহজ হয়, ততটুকু পড়া ফরয সাব্য করা হয়েছে। নিউয়ে যেকোন সূরাকে সাব্য করা হয়নি। অর মুত্তাহাব খবরে ওয়াজি দ্বারা শুরুরিএ হতে পারে না।

দলীল (২) ৩৫ আলাহ তাআলার বাণী- সূরা ফাতিহা মা ত্যস্ত তু তুরান। (অর্থাৎ, কুরআনের মূল নামায সব সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু এ ওয়াজিবের কারণ থেকে যাবে।

(উক্ত হাদিসটি প্রথম আলোচনায় শাফেকেদের প্রথম দলীল হিসেবে বরিষ্ঠ হয়েছে।)

এই হাদিসে সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায্যের অসম্পূর্ণ বলা হয়েছে, কিন্তু আসলেই নামায হবে না একথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত মূল নামায সব সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু এর জুরালের কারণ থেকে যাবে।

জববঃ (১) শায়খ ইবন হুমায়ুল বলেন, শাফেকেদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত হাদিসটি খবরে ওয়াজি। এর দ্বারা কিতাবুলাহর উপর অতিরিক্ত সংবাদ হতে পারে না। অতএব, আমরা (হানাবীগণ) সাধারণ কেরাতের ফরয বলেছি; কিন্তু সূরা ফাতিহাকে ওয়াজির সাব্য করেছি।
(2) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাম্রী (রহ.) বলেন, আলোচনা হাদিসে ১ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেরাত না পড়া অবস্থায় নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায় একথানো। এখানে কেরাত দ্বারা শুধু ফাতিহা পড়া নয়; বরং সাধারণ কেরাত উদ্দেশ্য। যা অন্যান্য হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লামা আনোয়ার শাহ কাম্রী (রহ.) এ ব্যাপারে আরেকটি সুখ্স ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন - قرأ أقرأ قراءة الكتاب (متحفة) সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে সকর্মক ক্রিয়া (متحفة) হয়। যেমন - قرأ بالكتاب (فعل) প্রত্যক্ষভাবে সকর্মক হয় সেগুলোকে কখনো কখনো (বহস) এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী (সকর্মক) করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থাতে অর্থগত পার্থক্য হয়। এ কারণে যখন বে-এর মাধ্যম থাকে না তখন অর্থ হয়, কৃত বিষয়ের (متحفة) সাথে অন্য কিছু অংশীদার নেই। আর যখন বে-এর মাধ্যম হয় তখন অর্থ হয় মাফউলে বিহী (متحفة) যে মাফউলের অংশ। মাফউলিয়াতে অন্য কোন কিছুও তার সাথে শরীক থাকে।

এজন্য قرأ! কে যখন প্রত্যক্ষভাবে মুতাআদ্দী করা হয়, তখন এর মাফউলে বিহী পরিপূর্ণ বিষয় পঠিত হবে। আর অর্থ হবে শুধু এটাকেই পড়া হয়েছে, অন্য কোন জিনিস পড়া হয়নি। আর যখন বে-এর সাথে মুতাআদ্দী করা হবে তখন মাফউলে বিহী হবে পঠিত বিষয়ের কোন অংশ। অর্থ এই হবে যে, মাফউলে বিহীও পড়া হয়েছে এবং এর সাথে আরো কিছুও। আর আলোচনা হাদিসে قرأ موتآذير্দীর সাথে  প্রবিষ্ট হয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়া উদ্দেশ্য।

(درس ترمدي ج 1 ص 5, 508, 510-12, درس مشكورة ج 2 ص 576-77)
ছোড়ে তাঁকে তাঁর এক খোঁজা মুর্তি ও তাঁকে তাঁর এক খোঁজা মুর্তি ও
লিক ইবনুল কুওয়ারিচ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আরু তৃতীয় রাকাতে সিজনা থেকে ফারেগ হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে
গৃহীত িরশাের বৈঠক (জালিসে অস্ত্রাহত) সুমূত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের
মধ্যে মতামত রয়েছে। যথা-
* ইমাম শাফেকী (রহ)-এর মতে, িরশাের বৈঠক সুমূত।

দলীল (১) অনুপ্রেরণের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২) অনুপ্রেরণের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

অর্থাৎ, ... মালিক ইবনুল কুওয়ারিচ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) কে
“বিতর নামায়ের” মধ্যে দ্বিতীয় সিজনা আদায়ের পর একটু বসে অতঃপর দাঁড়াতে
দেখেছেন।

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাঽওরী, আওয়াঈ, ইসহাক (রহ)-এর মতে
এবং আহমদ (রহ)-এরও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হল, িরশাের বৈঠক মাসূন নয়; বরং
এর পরিবর্তে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম।

* টিকাকঃ এখানে “বিতর” শব্দের অর্থ- প্রথম রাকাত ও চার রাকাতবিশিষ্ট নামায়ের তৃতীয় রাকাত
এবং তিন রাকাত বিশিষ্ট নামায়ের প্রথম রাকাত।
দলীল (২) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (ص) হযরত খলিফা ইবনে রাফি (রা) কে নামায়ের সহীহ পত্তি শিক্ষা দিতে গিয়ে সিজ্দা শিক্ষা দেয়ার পর বলেছেন—

নিম্নের অন্তর্ভুক্ত পাতায় তার কালের প্রমাণিত হয়েছে, যে বিশ্বামের বৈতক না করায় উদ্ভাবন।

জবাবঃ (১) হযরত মালিক ইবনে হুওয়ায়রিচ (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি জায়েব বর্ণনা করার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু মতান্ডে তা কেবল উদ্ভাবন নয়।

(১) অথবা, অবস্থাতার কারণে রাসূলবুল্লাহ সালেহ (ص) এর দেহ মোহারক শেষ বয়সে একটি ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাহলে বিশ্বামের বৈতক যদি সুন্নতই হত, তাহলে সাহাবাগণ এই আলমকে ছেড়ে দিতেন না। (নসন্ন: ২০২-২০২০)

২১৫ নামায অধ্যায়

পাপ পাপের প্রতি তার সজ্জনতাতে চান নি ।

দুই সিজ্দার মধ্যবর্তী উপন্যাস পত্তি

... পিতা আফতাব আলি রশীদি আলি সাহীল তার বাবা, আলী খান তার বাবা এবং উমায়ামে সাহেব তার বাবা।
অনুবাদঃ ... ইবন জুরাজেজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যুবারের তাউস হতে শ্রবণ করে আমাকে বলেছেন, আমরা হযরত ইবন আব্বাস (রা)কে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে ইকআ (গোডালির উপর নিজস্ব রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, তা সুন্নত। অতঃপর আমরা বলি যে, এটাকে আমরা তো পায়ের উপর যুলুম মনে করি। জবাবে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এটা তোমার নবী (সাভ) এর সুন্নত।

বিশেষণঃ ইকআ (আগে)-এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথাঃ

(১) হযরত তাহরী (রহ.)-এর ব্যাখ্যাল্ল) নিত্যক্রে জমিনের সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করে বসা যে, উভয় রান খাড়া করে রাখবে এবং উভয় হাটেকে বুকের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় হাতে জমিনের মধ্যে রাখবে আর এ ধরনের ইকআ মাকরহ তাহরীর হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(২) ইমাম কারখী (রহ.) হতে ইকআ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, উপয় পা-কে খাড়া করে উভয় গোডালির উপর নিত্যক্র রেখে বসা। (নৃত্যের আকাত ১ চ ১৮৯)

আর এই দ্বিতীয় প্রকার নিয়েই ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে যে, ইহা সুন্নত কিনা।

* ইমাম শাফেইঈ (রহ.)-এর মতে, দুই সিজদার মাঝখানে উভয় ইকআ সুন্নত।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইকআ ও সুন্নত।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, দুই সিজদার মাঝখানে ইকআ অবস্থায় বসা মাকরহ তানযীহ।

দলীল:

১. **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ... وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبَةِ الشَّيْطَانَ**

* عَلَهِ (ابো দাউদ ১ স৪১) বাবার মনে নিয়ে জেল বেশী আল ইলাহ মুসলিম ১৯৫ এভাবে যেমন প্রমাণে শরীম ১৬ (২)

**الْخَ (السَّلَة) الماجে ১৬ (২)**

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রা) বলেন, ... তিনি (সাভ) শায়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গোডালির উপর নিত্যক্র রেখে বসতে নিষেধ করতেন।

দলীল:

২. **عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لَيْ يَسْرُّ وَايْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا عَلِيُّ**

... لَا تَقْصِعُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ (টোমসি ১ স৪৪) ২৩ এভাবে যেমন প্রমাণে শরীম ১৬ (২)

**الْخَ (السَّلَة) الماجে ১৬ (২)**

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল-বাহাদুর (সাভ) আমাকে বলেছেন, হে আলী! ... তুমি দুই সিজদার মাঝে ইকআ করে বসো না।
আহকামুল হাদীস

২১৭

নামায় অধ্যায়

জবাবঃ (১) আল্লামা খাতাবী (রহ.) এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে মানসূখ বলেছেন। যেমন- মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে মুফিরা ইবন হাকাম থেকে বর্ণিত আছে-

রায়ত আব্বাস মুহাম্মদ সূর্যা গুজরান রাজা ইবন হামাদ প্রতি প্রতি যার সন্তান চাইল তার দায়িত্ব করার কারণে ফার্সোনের মুন্যাত ইবন উক্ত হয়েছে।

সেই কথার মুন্যাতের জন্য এটাকে বহুল বলেছেন। ফলে এ বিষয়টি তার নিকট আলোচনা করতে তিনি বলেছেন, এটা কেবল তখন থেকে করেছি যখন থেকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

এতে বুঝা যায় যে, এ আমলটি আসলে সম্ভবতঃ খেলাফ। কিন্তু ইবন উমর (রাঙ) ওয়ার কারণে এমনটি করেছেন।

(২) অস্ত্বি, ইবন নাবী করীম (সাং) জায়েত বর্ণনা করতে হয় কখনো এমনটি করেছেন। কেননা জায়েত বিষয়টি বর্ণনা করাও নবিদের দায়িত্ব।

(৩) সাহাবায়ে কিরমের মধ্যে থেকে হযরত আকাস রাঙ ছাড়া আর কেউ ইকাস- এর প্রবন্ধ নন। তাছাড়া একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত ইবন উমর রাঙ হযরত ইবন আকাস রাঙ অপেক্ষা সম্ভবতঃ অধিক সচক্রণকারী ছিলেন। তাছাড়া ইবন আকাসের উক্তিতে এই ব্যাখ্যা থেকে রায়ত যে, সম্ভব দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ওয়ার অবস্থায় সম্ভব।

(দৌর তরমী) জোস ৩৪-৫৪

باب تشبیه الّلاطیس في الصّلّوۃ ص134

نامায়রত অবস্থায় হাইচির জবাব দেয়া (নামায় কথা বলার অভ্যস্ত)

... عن معاوية بن الحكم السلمي قالت صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عليه رجل من القوم فقلت يا رحمك الله فرماني القوم يا بضاعتهم فقلت واتكل أمه ما شئت تنظروا إلي قال فجعلوا يضربون بيدينهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصفتون قال عثمان فلما رأيتهم يسكنون ليكني سكت ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربيني ولا كبرني ولا سني ثم قال إن هذه الصلوة لا يحل به فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير.
বিশ্বেশ্বর ব্যবহার করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বর্তমানে ইহুদী নামায় কথা বলে, তাহলে তার নামায় ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে।

(২) ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামায় ইহুদীরা, কথা বা বেশি কথা বলা জায়গুলো ছিল, কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

অতঃপর অনুচ্ছেদে যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে তাহল, নামায় কথা বলে, নামায় ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা। এ নিয়ে ইসমাইলের মাধ্যমে মতান্তর রয়েছে।

* ইমাম আওযঃঈ (র.)-এর মতে এবং মালিক (র.)-এরও এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, কথা যদি নামায় সংশোধনের জন্য হয় তাহলে নামায় নষ্ট হবে না, যদিও তা ইহুদীর হয়ে থাকে। (তন্তু আশাহ ১ ৪২৮)

* ইমাম শাফেক, মালিক, আবু সাওয়ের, হাসান বনরী ও আতা (র.)-এর মতে, কথার ব্যাখ্যা যদি স্বল্প করার কারণে অথবা বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে হয়ে থাকে (অর্থাৎ, নামায় কথা বললে যে নামায় নষ্ট হয়ে যায় সে ব্যাপারে যদি অবহিত না থাকে) এবং কথা যদি অত্য হয়, তাহলে নামায় নষ্ট হবে না। (ফয়হ মলুম ২ ৪২)

* ইমাম আহমদ ইবন হায়ল (র.) থেকে এ ব্যাপারে চারটি মত পাওয়া যায়।

(ক) ইমাম আওযঃঈ (র.)-এর অনুরূপ।
(খ) ইমাম শাফেকী (রহ.)-এর অনুরূপ।
(গ) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুরূপ।
(ঘ) যদি এই ধরণের উপর ভিত্তি করে কথা বলে যে, নামায শেষ হয়ে গেছে কিন্তু পরববীতে সে জানতে পারল যে, এখনও তার নামায পূর্ব হয়নি, তাহলে এরূপ কথাবার্তার দ্বারা তার নামায ফাসেদ হবে না। কিন্তু যদি সে বুঝতে পারে যে, নামায এখনো শেষ হয়নি, তাহলে কথা বলার কারণে নামায ফাসেদ হবে।
(শ্র তৃতীয় পাতা ১৭ সংখ্যা ৫)

উপরোক্তি সকল ইমাম (হানাফী ব্যতীত) দলীল হিসেবে নিয়েছেন হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

"যোগ্য হুমায়ুন কাল চলিয়া যাতে রসূল নামায উল্লেখ তাকে নেই এবং সে একে রক্ষার জন্য কোন কাজ করেন নি। তার দিকে সে একে মুক্ত করেন নি। তার দিকে সে এক করেন নি। তার দিকে সে এক করেন নি। তার দিকে সে এক করেন নি। তার দিকে সে এক করেন নি। তার দিকে সে এক করেন নি।"
আহকামুল হাদিস

তাঁর সাথে আলোচনা করতে ভর পাছিলেন। ঐ সময় নবী করিম (সাহ) কর্তৃক যুল-ইযাদাইন (লয়া বালুবিশিষ্ট) উপাধিপ্রাপ্ত জনেক সাহাবী (ফিরোজক) দাড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলালাহ! আপনি কি ভুল করেছেন, নাকি নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে? জবাবে তিনি (সাহ) বলেনঃ না, আমি ভুল করিনি এবং নামায কসরও করা হয়নি। তখন ঐ সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলালাহ! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলালাহ (সাহ) সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেনঃ আচ্ছা, যুল-ইযাদাইন কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহারাগণ এশারায় বলেনঃ জি-হি। তখন রাসূলালাহ (সাহ) স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান।

উক্ত হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেক (রহ.) বলেন, যুল ইযাদাইনের এই কথাবার্তা হুকুম সমর্পণে অত্যাচার করে৷ হয়েছিল। আর নবী করিম (সাহ)-এর এই কথাবার্তা হয়েছিল বিস্তৃতির ভিত্তিতে।

ইমাম মালিক ও আওয়াদী (রহ.) বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিল নামায সংস্থাধনের জন্য। আর ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, এই কথাবার্তা হয়েছিল নামায পূর্ণ হয়েছে মনে করে। নবী করিম (সাহ) তো ইহা মনে করেই কথাবার্তা বলেছেন যে, চার রাকাত নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যুল ইযাদাইন (রহ) ইহা মনে করেই কথাবার্তা বলেছিলেন যে, হয়ত নামাযের রাকাতের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। সুতরাং নামায পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এ সকল কারণেই কথাবার্তা সত্যেও নবী করিম (সাহ) নামাযকে পুনরায় নতুন করে না পড়ে উক্ত নামাযের উপর ভিত্তি করেই বাকি নামায শেষ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থাভেদে নামায কথা বলা নামায ফাসেদের কারণ নয়।

(দ্রসঃ তরিমী) ২ (১০১)

কিয়াসী দলীলঃ যারা বলেন, ভুলে কথাবার্তা বললে নামায নষ্ট হবে না, তারা মুক্তি দেখান, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রমযান মাসে দিনে রোয়া রাখার পর ভুলে খেয়ে ফেললে রোয়া ভঙ্গ হয় না। অনুরূপভাবে ভুলে নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বললেও নামায নষ্ট হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা ও শফিয়ান সাওরী (রহ.-) এর মতে এবং ইমাম মালিক (রহ)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ও আহমদ ইবন হামল (রহ.-) এর প্রসিদ্ধ মতানুসারী, নামাযে কথা বলার যে প্রচলন ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বিধান সমর্পকে অন্ধতাবণ্ট বা জেনে হোক, কম হোক বা বেশি হোক, সর্বাবস্থায় নামাযে কথা বললে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

(দ্রসঃ মশকুম) ২ (১০১), তন্তুম (১) ৪২৫ (৪)।
দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-‘রওমা’ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বন্দা হিসেবে (নামায়ে) দণ্ডায়মান হও। (বাকরাঁ ২৩৮)

উক্ত আযাতের পর এর অর্থ নীরবতা। বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, এ আযাতটি নামায়ে কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার জন্য নামিল হয়েছে। এতে কোন বায়ারা-বিশ্লেষণ নেই। সুতরাং এর আলোকে সব ধরনের কথাবার্তাই নিষিদ্ধ হবে।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের পর তের বর্ষ হাদিস। উক্ত হাদিসের শেষাংশে উল্লেখ আছে-

কিন্তু এই শেষের ভাষা এর অর্থ নামায়ে না ব্যবহার করা। যা ব্যাখ্যাত অর্থ প্রদান করে। সুতরাং নামায়ের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা জায়েয় নয়।

দলীল (৩) অর্থাৎ, ... যায়েদ ইবন আরকাম (রায়) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইসলামের সূচনাকালে) আমারা নামায়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতাম। এ সময় আল-কুরআনের এই আযাত নামিল হয়, “তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বন্দা হিসেবে (নামায়ে) দণ্ডায়মান হও।” এ সময় আমাদেরকে নামায়ে নীরবতা পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

দলীল (৪) অর্থাৎ, ... যায়েদ ইবন মসুদ বলেন, কারণ নামায়ে চুলতে খাওয়া বাণী প্রচার করান। এই সত্ত্বেও তারা নামায়ের মতানুসারে কথা বলতে হয়।
অর্থাৎ, ... হযরত আব্দুলরাছ ইবনে মাসুদ (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা বলতাম। পরবর্তীকালে আমি হযরতে হতে প্রত্যাশিত নরের পর একাদা তাঁকে নামাযরের মধ্যে সালাম দিলে তিনি এর উত্তর দেননি। ফলে আমার মনে পুরণত ও নষ্টত কথা সুরণ হয় এবং সালামের জরায় না পাওয়ায় আমি শাক্তিত হয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলের (সা) নামায শেষে আমাকে বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, তখন তাঁই নিদেশ প্রদান করেন।” এখন আল্লাহ নামাযরের মধ্যে কথা না বলার নিদেশ জারী করেছেন।” একথা বলার পর তিনি আমার সালামের জরায় দেন।

অতএব, উপরান্তিত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযরের মধ্যে কোন প্রকার কথা বলা জায়েন নয়, বরং হারাম। এতে নামায নষ্ঠ হয়ে যায়।

জবাবঃ ইমাম শাফেই (রহ) সহ অন্যান্য ইমামগণ যুল ইয়াদাইনের হাদিস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন এর বিস্তরিত জবাব হল -

(১) যুল-ইয়াদাইনের হাদিসটি হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের হাদিস দ্বারা মানসূক। কেননা, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ছিল নামাযরের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আর নামাযরে কথা বলা নিষিদ্ধ হয় মদ্দিনাতে বদর যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে। আর যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে হারাম হন। সুতরাং এ ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল।

(২) যুল-ইয়াদাইনের হাদিসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। উক্ত হাদিসটির রায় হলেন হযরত আবু হুরায়ারা (রাও)। আর এ সময় হযরত আবু হুরায়ারা (রাও) তথ্য উপস্থিত ছিলেন না। কেননা, হযরত আবু হুরায়ারা (রাও) ৭ম হিজরিরতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং হাদিসটি মুরসাল। আর উল্লিখিত তিন ইমামের মতেই মুরসাল হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করা অমুল নয়। তাই প্রশ্ন থেকে যায় যে, দলীল হিসেবে তাঁরা এ হাদিসটি কিভাবে উল্লেখ করলেন?

(৩) যুল-ইয়াদাইনের হাদিসে লক্ষ্য করলে অনেক বিষয়ই দৃষ্টিগোচর হয়, যা আমলে কাসীর হওয়ার কারণে ইমাম শাফেই (রহ)-এর নিকটে নামায ভঙ্গের কারণ। যেমন- নামাযরের স্থান থেকে সরে গিয়ে মিশ্রের উপর আরোহণ করা, কবারার দিকে চলে যাওয়া, মসজিদ থেকে বের হওয়া, কোন কোন রেওয়াজের অনুযায়ী হজররায় গমন করা ইত্যাদি। (ابو داود, ১৩৪) এতে প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনাটি ঐ সময়ের, যখন নামায আমলে কাসীরসহ অনেক কিছুই জায়েন ছিল।

(৪) যুল-ইয়াদাইনের হাদিসের মধ্যে পাঁচটি অসন্ত্য (اضطراب) রয়েছে। যথাঃ প্রথমত, কোন ওয়াজের নামায ছিল তা নিয়ে অসন্ত্য। কোন কোন রেওয়াজের এটি যুদ্ধের ঘটনা। (مسلم ج ১৩৬: ২১৪ বাবে সহোদরী দ্বারা আওয়ালুয়া)
কোন রেওয়ায়েতে আছে এটি আসরের ঘটনা।
(স্লম জি ১ সং ২১১)
কোন কোন রেওয়ায়েতে মাগরিব ও এর পর কোন একটি নামায়ের কথা উল্লেখ
যরেছে।
(বখারি জি ১ সং ১৬৫, স্লম জি ১ সং ২১১)

dিতিয়ত, রাকাত নিদিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে অসঙ্গতি। আবু হুরায়রা (রা) এর
rেওয়ায়েতে আছে, নবী করিম (সা) দুই রাকাত নামায় আদায়ের পর সালাম ফিরান।
ইমরান ইবন হুসাইন (রা) এর রেওয়ায়েতে আছে, নবী করিম (সা) তিন রাকাত
নামায় আদায়ের পর সালাম ফিরান।
(স্লম জি ১ সং ২১৪)

tৃতীয়ত, সিজিদা সাহুর ব্যাপারে অসঙ্গতি। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ধিত আছে যে,
তিনি (সা) সিজিদা সাহু করেছেন।
(বখারি জি ১ সং ১৬৪, স্লম জি ১ সং ২১২)
আবু লাহার কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সিজিদা সাহু করেছিলেন।
(স্লম জি ১ সং ১৬৪, নাসাইহ জি ১ সং ১৮৬)

dুতুর্কত, সিজিদা সাহুর ধরন ও প্রকৃতির ব্যাপারে অসঙ্গতি। কোন রেওয়ায়েতে বর্ধিত
আছে, নবী করিম (সা) সাহার পূর্বে সিজিদা সাহু আদায় করেছেন। আবার কোন
cোন রেওয়ায়েতে বর্ধিত আছে, সিজিদা সাহু সাহমের পর আদায় করেছেন।
(স্লম জি ১ সং ১৬৪, আবু দাওর জি ১ সং ১৪৫)

dকর্ম, অবস্থানের জার্নোট সম্পর্কে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর রেওয়ায়েতে
আছে, তিনি মসজিদে অবস্থিত কাঠ পূর্বে তাম্বুরীক নিয়ে গিয়েছিলেন।
(বখারি জি ১ সং ১৬৪, আবু দাওর জি ১ সং ১৪৫)

dিতরাঙ্গ হাদিসের মধ্যে এই অসঙ্গতি রয়েছে, যেগুলোর মাঝে কোন ক্রীম সামজ্জ্ব সন্দের
নয়, এমন হাদিসের দ্বারা দলিল পেশ করা মোটেই ঠিক নয়।
(মুহাবদ্দল লাল জি ৩ সং ৫৩৭, ফক্ত মফিব জি ১ সং ২২৫)

dুর্বীলী দালীসের জবাবে নামায়কে রোহার সাথে কিয়াস করা আদৌ সমীচীন নয়।
কেননা, রোহায় পুনরাস্ত্র করার কোন সুযোগ নেই। সেজন্য রোহায়রা ভুল হওয়ায়
একপ্রকার ওয়র। পরিস্থিতে, নামায় ভুল হয়ে সেলে তাতে পুনরায় আদায় করার
যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অথবা, এখানে ভুল হওয়ায় কোন ওয়র নয়।
(দ্রস মিস্কো জি ১ সং ১১২)

উল্লেখ যে, ইমাম শাফেঈ (রহ) আবু হুরায়রা (রা) এর হাদিসটি সইহ প্রমাণ
করতে গিয়ে বলেন, যুক্তিযুক্ত িদায়ের ঘটনটি কথারর হুকুম রহিত হওয়ায়
পরবর্তীকালের। অথবা, এটি উপরিস্থ হাদিস সমূহ দ্বারা রহিত হতে পারে না।
কেননা, উপাধিগ্রাহের দুই ব্যক্তি আলাদা আলাদা। একজন যুল-ইয়াদাইন এবং অপরজন হলেন যুশ-শিমালাইন। বসর যুবে যিনি শহীদ হয়েছেন, তিনি যুল-ইয়াদাইন নন, বরং যুশ-শিমালাইন। যুল-ইয়াদাইনের নাম হল ধিরাবক ইবন আমর, যিনি বনু সুলাইম গোত্রের। আর যুশ-শিমালাইনের নাম হল উবায়দুল্লাহ ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু খুয়াআ গোত্রের। হযরত যুল-ইয়াদাইন উসমান (রা।) এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর এ ঘটনাটি হযরত আবু হুরায়রা (রা।) এর ইসলাম গ্রহণ করার পর ঘটেছিল। আর নামায় কথাবার্তা বলা রহিত হয়েছে এর অনেক পূর্বে। সুতরাং যুল-ইয়াদাইনের হাদিসকে মানসূহ বলা ঠিক নয়। (মুহাফ সন ৩ ২২)

জবাবঃ যুল-ইয়াদাইন এবং যুশ-শিমালাইন মূলত একই ব্যক্তির দুটি উপাধি। বাস্তব ঘটনা হল, তাঁর আসল নাম হল উবায়দ ইবন আমর। জাহেদী যুগে তাঁর উপাধি ছিল ধিরাবক। ইসলাম যুগে তিনি যুল-ইয়াদাইন ও যুশ-শিমালাইন দুটি উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বনু সুলাইম যেহেতু বনু খুয়াআর একটি শাখা, এজন্য তাকে উভয় গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর হাত খুব লম্বা ছিল, সেহেতু ইসলামের শুরুর দিকে তাঁর উপাধি হয়েছিল যুশ-শিমালাইন। অতঃপর নবী করিম (ص) ইহা প্রতিষ্ঠা করে যুল-ইয়াদাইন রাখেন। (দুর তেজি ১ ১৫০)

তাই হাদিসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, আবু হুরায়রা (রা।) একই রেওয়ায়তে দুটি উপাধি একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

فِقَالَ ذُو الْخَتَمِينَ بَنٍ عَمْروٍ أَنَّى قَسِّتُ الرَّسُولُ ﷺ نَسْبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُقْوَلُ ذُو الْيَدِينِ الْخَ– (نسائي ج ১৬৮, মসন্দ ইবি শাইবা ২৭)

অর্থাৎ, ... তখন যুশ-শিমালাইন ইবন আমর বললেন, নামায় কি ত্রসা করা হয়েছে, নাকি আপনি তুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ص) বললেন, যুল-ইয়াদাইন কি বলছে?

উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট রুখা যায় যে, একই ব্যক্তির দুটি উপাধি।

এবার প্রশ্ন থেকে যায়, যদি যুল-ইয়াদাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে থাকেন, তবে হযরত আবু হুরায়রা (রা।) যুল-ইয়াদাইনের ঘটনায় কিভাবে বললেন-

صَلِّي يَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (ص) আমাদের নিয়ে নামায় পড়েছেন।

এবং অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত আছে-

آَنَّا أَصْلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— (صلع ১ ১৪)
অর্থাৎ, আমি রাসূল (সাঁ) এর সাথে নামায় পড়ি। অথচ তিনি তো ৭ম হিজরীতে ইসলাম প্রচার করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ৭ম হিজরীর পরে ঘটেছিল।

জবাবঃ যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি নিশ্চিত বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তবে এই সকল হাদিসসমূহের জবাব হল, ঐ সকল হাদিসসমূহ মুরসাল। এর দ্বারা হযরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) তাদের সাথে শরীক থাকার কথা প্রমাণিত হয় না। কেননা, কুরআন-হাদিসে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, কোন এক গৌত্র কোন এক কাজ করেছে বা কোন এক গৌত্রের সাথে কোন ঘটনা সম্পৃক্ত; অথচ ইহা একক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে—

َوَذَ قَالَ لَهُمْ تَعَلَّمُوا قُوَّةَ الْحَجَّةِ، فَيَّهَبُوا لَهَا َحُكْمًا

অর্থাৎ, "যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে।" (বাকরাঃ ৭২)

উল্লেখ যে, উক্ত আয়াতে হত্যাকারী এবং উক্তকারী নবী করিম (সাঁ)-এর সময়ের ইহুদী ছিল না। বরং হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ের ইহুদী ছিল। কিন্তু এরপরেও নবী করিম (সাঁ)-এর সময়কালের ইহুদীদের প্রতি তা আরোপিত হয়েছে, যার উদেশ্য হল এই বলা যে, তোমাদের গৌত্র হত্যা করেছে।

* হাদিসসমূহেও এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেগুলোতে বর্ণনাকারী স্বয়ং উপস্থিত থাকেন না, তা সত্ত্বেও উত্তম পূর্ণ বহুচন (جمع متكلم)-এর শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন- ইমাম তাহারী (রহমা) বর্ণনা করেন, তাওস (রহমা) বলেন—

قَيْمَ عَلَيْنَا

মুঘলের বিশেষ অর্থাৎ, আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জাবাল (রাঃ) আসলেন। অথচ হযরত মুহাম্মদ (রাঃ) যখন ইয়ামনে আগমন করেছেন, তখন তাউস (রহমা) জমলাদার করেলানি। অতএব, কী তখন আমাদের কওমে আগমন করেছেন।

(شرح معايي الامام 1 ص ٢١٨)

তাহাঁ আর হাদিসে বর্ণিত আছে—

... عِنْ أَبيهَ هِرْبَةَ أَنَّهُ قَالَ بِيَتَمَا نَحْنَ فِي الْمسْجِدِ إِذْ خَرجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انتَطَلْبُوا إِلَى يَهُودٍ فَخَرَجُوا مَعَهُ حَتَّى جَنَّٰهُمَّ الخَ (ابو داود ج ٢ ص ٤٢٣ باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়ারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে উপরিভ্র ছিলাম। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঁ) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন,
আহ্মদের সাথে মোকাবিলার জন্য বের হও। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে বের হয়ে আহ্মদের নিকট পৌঁছাই।

এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। উক্ত হাদিসের রাবি হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। অথচ তিনি ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বাণী-স্রষ্টি যারা-স্রষ্টি যারা আসলে নবী করিম (সাঃ) মুসলমানদের জামাত নিয়ে নামায পড়েছেন বা আমাদের কেওমের সাথে নামায পড়েছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে- আনা ওলিয়া মাহদুল্লাহ ফিরুজ চৌধুরী

এখানে স্পষ্ট না বা 'আমি' শব্দ উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং উক্ত ঘটনায় শরীক ছিলেন। এখানে তা আমার কোন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না।

এর উৎস ফিলিস্তান আলী ব্রাহ্মণ শাহ (রহ.) বলেন, উত্তম পুরুষ একবন্দের (রাঃ) পুস্তকের অধিকাংশ শব্দ ও শায়বানের একক বিবরণ। সুতরাং এমন রেওয়ায়েত করার মূল কারণ হল, রাবি যখন অন্যান্য হাদিসে এখানে মুহাজি নেন বা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) স্বয়ং উক্ত ঘটনায় ছিলেন। আর এ প্রথা তিনি নাবী নৌকা দ্বারা নতুন রেওয়ায়েত করে দিলেন। যা ছিল বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ (নচ্ছিন)। যেমন সহীহ সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

তখন উল্লেখ নাবীর বাণী হয়েছে স্রষ্টি যারা-স্রষ্টি যারা আসলে নবী করিম (সাঃ)-এর কন্যা রুকাইয়াহ (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম।

অথচ হযরত রুকাইয়াহ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ৫ বছর পূর্বে ইতিকাল করেছেন। অতএব, আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর নিকট যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এর বাণী হল, আসলে হাদিসে ছিল, “মুসলমানগণ প্রবেশ করেছেন।” রাবি তাতে হস্তক্ষেপ করে “আমি প্রবেশ করেছি” (তখন তখন) (বলেছেন)

(সূত্র-সনদ ২১৭ সে)
ইমামের পিছনে আমিন বলা

"যখন তোমাদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের দায়িত্বে থাকে না তখন তোমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাক।" ইমাম মারুঁক (রহ.) বলেন।

ইমাম তোমাদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের দায়িত্বে থাকে না তখন তোমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাক।

আনুবাদঃ ... ওয়াইল ইবন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) “ওয়ালাদাললীন” পাঠ করার পর জোরে “আমিন” বলতেন।

"যখন তোমাদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের দায়িত্বে থাকে না তখন তোমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাক।" ইমাম তোমাদের নিয়ন্ত্রণ আমাদের দায়িত্বে থাকে না তখন তোমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাক।

(বিশেষ উদাহরণের জন্য দেখুন ইমামের বিষয়ে সম্পর্কিত আলোচনা)

(1) আমিন কে বলবে, (২) আমিন জোরে বলবে, না আক।

প্রথম আলোচনায় ফেরকায় ইমামীয়দের মত, নামায়ে সূরা ফরতিহার পর আমিন উচ্চারণ করলে নামায় নষ্ট হয়ে যাবে।

দলীং আমিন কুরআনের কোন অংশ নয়। এবং বিশেষ কোন দোয়ায় মানুষের অন্তর্ভুক্ত নয়।

* ইবন হুজর-এর মত, আমিন বলা শুধু মুরাদাদীর উপর ওয়াজিব।
* আহলে যাহিরের মত, আমিন বলা ইমাম এবং মুরাদাদী উভয়ের উপর ওয়াজিব।

দলীং অনুষ্ঠিত হুয়তে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিস। এতে নবী করিম (সা) বলেন- "ইমাম \\
* জমাত ইমামদের মত, ইমাম ও মুরাদাদী উভয়কে আমিন বলতে হবে। আমিন বলা উভয়ের জন্য সুন্নত। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও একটি রেওয়ায়ত অনুরূপ।
* জমাত ইমামদের মত, ইমাম ও মুরাদাদী উভয়কে আমিন বলতে হবে। আমিন বলা উভয়ের জন্য সুন্নত। ইমাম মালিক (রহ.)-এরও একটি রেওয়ায়ত অনুরূপ।

দলীং অনুষ্ঠিত হুয়তে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিস।
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, আমীন বলা শুধু মুক্তাদীর কর্তব্য, ইমামের নয়। এবং আন্তে কেরাত বিশিষ্ট নামায় ইমাম, মুক্তাদী কাউকেই আমীন বলতে হবে না।

দলীলঃ

... উন্মাদের হৃদয়ের অন্ত ছায়া সাক্ষাৎ হয়ে উচ্চারণ ও স্বীকার না করা আমাদের অবস্থান উদ্দেশ্য।

(নসাই জ. 147, সংখ্যা 1)

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়ার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ইরাসে করেছেন, যখন ইমাম “গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদাদারীন” বলবে, তখন তোমরা আমীন বল।

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে কর্ম বন্ধন করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ইমামের কাজ হল বলা, আর মুক্তাদীর কাজ হল আমীন বলা।

(জনরাত: 132, সংখ্যা 1)

জবাবঃ (১) ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাব হলুদ হাদিসে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে কর্ম বন্ধন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে আমীন বলার নিদর্শ জায়গা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন ওয়ালাদাদারীন বললে অবসর হবে তখন মুক্তাদী তৎক্ষণাৎ আমীন বলবে, যাতে উভয়ের আমীন এক সাথে বলা হয়। কারণ ইমামও তখন আমীন বলবে।

(২) আহলে খাইরের দলীলের জবাব উক্ত হাদিসে আমরের যে সীঘা বর্ণনা করা হয়েছে তা ওয়াজিবের জন্য নয়, বরং এখানে আমরের দ্বারা মুক্তাদীর বুদ্ধানো হয়েছে।

(৩) আর ইমামিয়াদের কিয়াসা সম্পূর্ণ পরিতাজ্য। কারণ ইহা সহীহ রেওয়ায়েতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আমীন জোরে এবং আন্তে উভয় পাপায়ই বলা জানে। কিন্তু মতনীক্ষণ হচ্ছে শুধু উভয় পাপের নির্ধারণের ব্যাপারে।

* ইমাম শাফেকী, আহমদ ইবন হামল, ইসহাক ও দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে, আমীন জোরে বলা উত্তম। তবে ইমাম শাফেকী (রহ.)-এর নতুন অভিমত হল ইমাম আন্তে আমীন বলবে, কিন্তু তাঁদের ফাতভাবা হচ্ছে প্রথম অভিমতের উপর।

(তুলনার সবুজ জ. 327, সংখ্যা 1)

দলীলঃ (১) মুফিয়ান সাগেরী সূত্রে বর্ণিত-

... বলে বন হজর্বাত সামান্ত লীলা ছিলা লীলা উচ্চারণ ও স্বীকার না করা আমাদের অবস্থান উদ্দেশ্য।

(তুলনার বদলি জ. ৪, সংখ্যা ৫০ পাপে জানান)
অর্থাৎ, ... ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শনেহি নবী করিম (সা) “গাইরিল মাগদুবি আলাহিরাম ওয়ালাদলালীন” পাঠ করলেন এবং আমীন বললেন। এই আমীন তিনি টেনে পড়েছেন।

দলীল (২): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদিস। উক্ত হাদিসে ইমামের আমীনের সাথে মুক্তাদীকে আমীন বলার অনুরোধ দেয়া হয়েছে। আর ইমামের আমীন জোরে বলা বাতীত বুঝা যাবে না। তাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম জোরে আমীন বলবে আর মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে জোরে আমীন বলবে।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে এবং ইমাম মালিকের (রহ.) প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী- ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য “আমীন” অল্পে বলা উচিত।

(ফতেহ আলীর জৈমস ২ সং ১৬, ডেস ১৩৮৬ রমদান জৈমস ১/৬)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী-

অর্থাৎ, কিছু তোমাদের দোআ করুন করা হয়েছে। (ইউনুস ৪ ৮৯)

অর্থ হারুন (আঃ) দোআ করেননি, বরং মূসা (আঃ) দোআ করেছেন আর হারুন (আঃ) শুধু “আমীন” বলেছেন। এর পরেও তার পক্ষ থেকে দোআ করুন হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, “আমীন” ও এক প্রকার দোআ, আর দোআ চূপে চূপে পড়াই উচিত।

যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- আর তোমরা তোমাদের প্রতি কৃতবিদ্ধ, মিতিতি করে ও সংগোপন। (আরফাহ ৫৫)

দলীল (২): হযরত তবা সূত্রে বর্ণিত হাদিস-

... উন্নয়নে বন ও আলেল উপরে আলেলই মুসলমান তুলি ইসলামের সাথে আলেল।

অর্থাৎ, আলকামাইবন ওয়াইল তার পিতা ওয়াইল (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহের (সা) গভীর গৃহ গৃহের গৃহের গৃহের গৃহ গৃহের গৃহের পাঠের পর আলেল আমীন বলেছেন।

দলীল (৩): উন্তু আর বিভূত তাকল ইসলামের সাথে আলেল।

... উন্তু আর বিভূত তাকল ইসলামের সাথে আলেল।
অর্থাৎ, ... আবু দুরায়ারা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ইন্দির করেছেন, যখন ইমাম “গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদাল্লাহীন” বলবে, তখন তোমরা “আমান” বলবে। কেননা যার “আমান” শব্দটি ফেরেশতার উচ্চারিত আমান শব্দের সাথে মিলবে, তার অতীতের যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

উক্ত হাদিসের আলোকে আমরা (হানাফীয়) বলতে পারি যে, নবী করিম (সা) শরিফবরূপ বলেছেন যে, ইমাম যখন “ولا الضالين” বলবে, মুক্তাদী তখন আমান বলবে। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম আমান আন্তে পড়বে। যদি জোরে আমান বলা বুঝানো উদ্দেশ্য হত, তবে নবী করিম (সা) এভাবে বলতেন -

“إذا قَالَ الْإِمَامُ أَيْمَنٌ فَوْلُوا أَيْمَنٌ”

অর্থাৎ, ইমাম যখন আমান বলে, তখন তোমরা আমান বল।

তাছাড়া ইমাম শাফেঈ (রহ.) “إِذَا أَمْتَ الْإِمَامُ فَأَلْقُوا” হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, আমান জোরে পড়া উচিত। কেননা উক্ত হাদিসে ইমামের আমানের সাথে মুক্তাদীর আমান বলার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর ইমামের আমান জোরে বলা ব্যতীত শোনা যাবে না। তাই ইমাম জোরে আমান বলবে, আর মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে জোরে আমান বলবে। অথচ উক্ত হাদিসেই বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা) বলেন -

من وافق تأييذه تأيييذه السالمة. عفرن له ما تقدم من ذنب

এ হাদিস থেকেও বুঝা যায় যে, আমান আন্তে বলাই উচিত। কেননা উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের আমানের সাথে মুক্তাদীর আমান মিলে যায়। আর ফেরেশতাদের আমান তো জোরে হয় না, বরং আন্তে হয়। একথা তো সবই থেকার করবে যে, আমরা ফেরেশতাদের আমান বলার শুধু জোরে পাই না। তাই আমাদেরও আন্তে পড়াই উচিত।

দলিল (৪)তাছাড়া সাহাবা, তাবীঈন এমনকি চার খলিফাদের পক্ষ থেকেও জোরে আমান বলার কোন দলিল পাওয়া যায় না। বরং সৌন্দর্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত আছে -

নামে কানো না যে হয়, (রোহাত আলসনাহান) অর্থাৎ, তারা জোরে আমান বলতেন না।

জবাবঃ প্রথম দলিলের জবাবঃ ওয়াহিল ইবন হুজরের হাদিসটি দুর্নীতি বর্ণিত- হযরত রুফিয়ান সাত্তারী সূত্রে যার শব্দগুলো নিম্নরূপ উপস্থাপিত হয় ।

হযরত শোরা থেকে বর্ণিত- 

외후히 쌍타수도 -
শাফেকী ও হস্ত্রী সুফিয়ানের রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়ে শুরুর রেওয়ায়েত বর্জন করেন এবং শুরুর রেওয়ায়েতের উপর একাধিক প্রশ্নও উত্তর করেছেন। যার সত্বার্থ জবাব উমাদাতুল করিতে বর্জিত আছে। আর হানাফী ও মালিকী গণ আবু সুফিয়ানের রেওয়ায়েতের চেয়ে শুরুর রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা—
(1) হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর কর্মপদ্ধতি হযরত শুরুর তরীকা অনুযায়ী।
কেন্দ্র, সুফিয়ান (রহ.)-এর মতে আমীন আতে পড়া উত্তম। এতে বুঝা যায় যে,
ম-এর অর্থ তাঁর নিকট তা নয়, যা ইমাম শাফেকী (রহ.) ধারণা করেছেন।
(2) শুরুর আমীন বলার পদ্ধতি কুরআন অনুযায়ী। যেমন- কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে—
দেওয়া রিক তপ্রু ও খুব আর আমীনও একনিতক দুআ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।
(3) ম-এর অর্থ উচ্চতর যা জোরে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে আমীনের আলফ ও ইয়াকে একটি টেনে ও লয়া (মদ) করে পড়া।
(4) যদিও ম-এর অর্থ উচ্চতর বুঝানো মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা তালীম উদ্দেশ্য ছিল। যেমন- আবু বিশ্র আল দুলাবী (রহ.) “কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা”তে উল্লেখ করেছেন যে, ষষ্ঠ ওয়াইল ইবন হুজর হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন—
মা আরো এই ব্যাপারে অর্থ আমার ধারণা, তিনি কেবলমাত্র আমাদের তালীমের জন্য জোরে আমীন পড়েছেন।
(5) তাছাড়া মু’জামে তিবরানীতে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (সাঃ) তিনবার আমীন বলেছেন। অথচ তিনবার আমীন বলা কারো নিকট সুখ্ত নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে জোরে আমীন বলা ছিল শিক্ষা প্রদানের জন্য।
(6) সুফিয়ান সাওরী সুমহান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তিনি তাদলীস করতেন। পক্ষীতে শুরু এটাকে যিনা অপেক্ষাও জন্য মনে করতেন। তিনি আরো বলেন— “তাদলীস করার চেয়ে আমামা থেকে পড়ে যায়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।”
(দৃষ্টি তর্মিজি জ ১৩ (২১) ১)
(7) মুক্তিকরা চাহিদা এই যে, আমীন আতে হওয়াই উচিত। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে আমীন শর্তটি পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নয়। সুতরাং “আউমুবিল্লাহ” এবং “সুবহানাকালাল্লাহ্মা”-এর মত ইহাও আতে হওয়া উত্তম। “বিসমিল্লাহ” কুরআনের অংশ হওয়া সত্ত্বেও যখন ইহা আতে ও জোরে বলা নিয়ে অনেকে মতভেদ রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমীন তো নিঃসনদেহ কুরআনের অংশ নয়। ফলে তা আতে হওয়াই অধিক উত্তম ও মুক্তিসঙ্গীত।
(৮) সর্বোপরি বলা যায়, রেনযায়েতের ক্ষেত্রে পর্যন্ত বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমল (কর্ম) একটি ব্যাপক সীমা পর্যন্ত সিদ্ধান্তকরী হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রেও স্বর্গীয় সাহাবীগণের আমল দ্বারাও সমর্থিত। যেমন, ইমাম তাহাবি (রহ.) আবু ওয়াইলের হাদিস বর্ণনা করেন-

ছালান কানা ওয়ার্দ উল্লীয় লা জিুলৌ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ

(শ্রুতি সুননুল আল্লাহ ১৬ সিঙ্গুড়ে হামিদ সিদ্দিক মেহের)।

অর্থাং, তিনি বলেছেন, উমর ও আলী (রাী) বিসমিল্লাহ, আউমিল্লাহ এবং আমীন কোনটিই জোরে পড়তেন না।

তাহাবা ইবন মাসুদ (রাী)-এর নায় আরো অনেক ফুকাহায়ে কিরাম থেকেও আমীন আমীন পড়ার প্রমাণ রয়েছে।

(কেলান আল্লাহ ৪ সি.৪৫৩, মুফতি আল্লাহ ২ সি.১০৮, মুজম্মে আলমুহাম্মদ ২ সি.৪১৯)

(২) এটাও সত্য যে, আসল রেনযায়েত মিশ্রিত। অতঃপর সুন্নিয়ানের কোন শিখন এটাকে জোরে পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন ধরে অর্থগতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

(৩) অর্থাৎ, আমীন জোরে পড়াও যে জায়েদ, তা বর্ণনার জন্যই নবী করিম (সাআ) কথনা আমীন জোরে পড়েছেন। কেননা, জায়েদ বর্ণনা করে দেয়া ও বোর্নীদের দায়িত্ত্ব। তাই বলে ইহু উত্তম নয়।

(দেয়ার তোমাই জ ১ সি.২২)

: বাবু ফি সুলতা আলাদা করা

১৩৭ সি: বল নামায আদায় করা

 Guinness মানে বন চুম্বিত অন্য সাল্ট ল্যাভ শ্রেষ্ঠি হেল অনু শ্রেন উন সুলতা রজাল

 قاعدًا فقاّل صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدًا وصلاته قاعدًا على النصف من
صلاته قائمًا وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا (بخاري ج ১ সি.১৫০) ১৫০ সি: সুলতা কনাই, نسিয়া জ ১ সি.২৫২) ২৫০ সি: ফلা সুলতা কনাই, ماجهيد ৩৪৫ (৫)
আহকামুল হাদিস  

অনুবাদঃ ইমরান ইবন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)কে বসে নামায় আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন, বসে নামায় আদায় করার চাইতে দাঁড়িয়ে নামায় আদায় করা উত্তম এবং বসে নামায় আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্থের সওয়াব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, শুয়ে নামায় আদায় করলে বসে নামায় আদায়ের অর্থের সওয়াব পাওয়া যাবে।

বিশেষণঃ উক্ত হাদিসের আলাপকে চারটি অবস্থা খেয়াল রাখলে বিষয়টি পরিকর হবে— (১) সুসংহত, (২) অসুসংহত, (৩) ফরম নামায়, (৪) নকল নামায়।

এই হাদিসের উপর প্রশ্ন জাগে যে, এটি ফরম নামায় আদায়কারী সম্পর্কে, নাকি নকল আদায়কারী সম্পর্কে? যদি ফরম আদায়কারী সংক্রান্ত হয়, তাহলে এর দুটি অবস্থা- হয়ত নামায়ী সুসংহত থাকবে অথবা অসুসংহত। যদি সুসংহত হয় তাহলে হাদিসের প্রথম অংশ সহীহ আছে—"صلاته قائمًا أفضل"

কিন্তু হাদিসের অন্তিম দুই অংশ সহীহ নয়। কেননা, ওয়ার ব্যতিত ফরম নামায় বসে তুলতে আদায় করা স্বচ্ছ হবে না, অর্থের সওয়াবের তো প্রায়ই ওঠে না। অথচ হাদিসে অর্থের সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি ফরম আদায়কারী ব্যক্তি অসুসংহত হয়, তবুও হাদিসের ভাবার্থ সহীহ হবে না।

কেননা, অসুসংহতর কারণে কেউ বসে অথবা শুয়ে নামায় আদায় করলে সে তো ওয়ারের কারণে পুরো সওয়াব পাবে। অথচ হাদিসে অর্থের সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, এর দ্বারা যদি নকল আদায়কারী উদ্দেশ্য হয় এবং নামায়ী অসুসংহত হয়, এমতাবস্থায় যদি বসে অথবা থুম নামায় আদায় করে, তাহলে তো পুরো সওয়াব পাওয়া যাবে।

কিন্তু নামায়ী যদি সুসংহত হয় এবং এ নামায়টি যদি নকল হয়, তাহলে হাদিসের প্রথম দুই অংশ সহীহ আছে। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে নকল নামায় পড়া উত্তম (পুরো সওয়াব পাবে) এবং বসে পড়লে অর্থের সওয়াব পাবে।

কিন্তু হাদিসের তৃতীয় অংশ সহীহ নয়। কেননা, ওয়ার ব্যতিত নকল নামায় ও হয়ত হাসান বসরীর রহ, ব্যতিত অনেক কারো নিকট) থুম আদায় করা জায়ে নেই। অথচ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, শায়তিব্যক্তির নামায়ের সওয়াব বসে আদায়কারীর সওয়াবের অর্থে।

তাই এ জটিলতাকে দূর করার জন্য কতিপয় উলামা বলেছেন যে, হাদিসে "صلاته نائما" বাক্যাংশটি হয়ত ইমরান ইবন হুসাইন (রা) কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন, যা মূল হাদিসের অংশ নয়। অতএব হাদিসের প্রথম দুই অংশ সহীহ। আর তখন
হাদিসটির উদেশ্য হবে সুষ্ঠ ব্যক্তির নফল নামায় আদায় করা। ফলে অর্থের কোন সমস্যা হবে না। যদিও ব্যাপিত নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করলে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে, আর বসে আদায় করলে অর্থের সওয়াব পাওয়া যাবে।

কিন্তু এই সমাধান সঠিক নয়। কেননা, "صالح نافا" শব্দটি যে রাবি কর্তৃক অতিরিক্ত সংযোজন, এর কোন স্পষ্ট দলিল নেই। তাই সর্বোত্তম সমাধান হল এই, যা আল্লামা খাতাবী ও ইবন হজার (রহ.) প্রদান করেছেন। আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) ও ইহা খুব পছন্দ করেছেন। বক্তঃ মাযুর দুই প্রকারে- (১) একেবারেই দাঁড়াতে বা বসতে পারে না, (২) অথবা খুব কষ্ট করে দাঁড়াতে বা বসতে পারে।

অতএব, যে মাযুরকে শরীয়ত বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, এমন ব্যক্তি যদি কষ্ট ব্যাক্তির করে একমাত্রা আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তখন বীর নামাযের হিসেব অনুযায়ী এই ব্যক্তি অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এমন ব্যক্তি যখন বসে নামায পড়বে তখন বীর নামাযের হিসাব অনুযায়ী অর্থের সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্থের সুস্থিতের পূর্ণ সওয়াবের সমান হবে।

একমেবারেই যদি কোন মাযুর ব্যাক্তি যাকে শরীয়ত শুনে নামায পড়লার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু কষ্ট ধরে না তখন সে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে, তাহলে সে অর্থের সওয়াব পাবে। আর এমন ব্যক্তি যখন শুনে নামায পড়বে, তখন বীর নামাযের হিসেব অনুযায়ী অর্থের সওয়াব পাবে। যদিও এই অর্থের সুস্থিতের পূর্ণ সওয়াবের সমান হবে।

দৃষ্ট সমাধানটির সমর্থন পাওয়া যায় মুহাম্মদ ইসমাইল মালিকে বর্ণিত হয় মুহাম্মদ ইবন আমর ইবনুল আস (রাও) এবং মুসনাদে আহমেদ বর্ণিত হয় মুহাম্মদ আনাস (রাও)-এর এরেওয়ায়েত দ্বারা। যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদিসটি নবী করিম (সাত) তখন এরশাদ করেছিলেন, যখন তিনি সাহাবায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জরুর আক্রান্ত অবস্থায় বসে নামায আদায় করতে দেখেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ অনুস্মরণের হাদিসটির প্রয়োগ ক্ষেত্র ওয়র বিশিষ্ট লোকজন।

(মূলত জামা মালক চূ. ১১২, মুক্ত সমুদ্র চূ. ১৪১-১৪২)
রসূল সালাম উল্লেখ করেন আল্লাহ উল্লেখ করেন যে, এমন কোনো সময়ে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়। কিন্তু এই অজ্ঞাত কথাটির জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা নয়।

নামায অধ্যায়

অনুবাদঃ ... হযরত আবুদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসুল সালাম (সা)-এর সাথে নামায় রত থাকা অবস্থায় তাশাহহুদরর মধ্যে “ওয়া আলা ইবাদিহীস-সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান”-এর পূর্বে “আস্লালামু আলাল্লাহি” বলতাম। রাসুল সালাম (সা) বললেন তোমরা “আস্লালামু আলাল্লাহি” বললে না; কেননা আল্লাহ তাশালা নিজেই ‘সালাম’ বা শান্তি বর্ষণকারী। আর তোমরা যখন তাশাহহুদরর সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে, “আজাহাইয়াতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু উয়াততায়িয়াতু আস-সালামু আলাইকা আয়হান নাবিকু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস-সালামু আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবাদিহীস সালিহীন’। তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন এর সাথে আসমান-যমীন এবং এতদবর্ণের মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত নেক বাদ্য রয়েছে তাদের উপর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি (সা) “আশহাদু আল-লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবুদুহু ওয়া রাসুলুহু” পাঠ করতে বলেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের পছন্দনিয়া উত্তম দু’আ বেছে নিয়ে তা পাঠ করবে।

বিশেষণঃ হাদীসসমূহ অধ্যায় করলে দেখা যায় যে, নামাযে তাশাহহুদ পড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের তাশাহহুদ উল্লেখ রয়েছে। যেমন- ইবন মাসুদ, ইবন আকাস, উমর, ইবন উমর, আরিশা এবং ইবন যুবাইর (রা)-এর তাশাহহুদ সহ ২৪ জন সাহারা থেকে তাশাহহুদরর বিভিন্ন প্রকারের শপথরজি বর্ণিত হয়েছে। (সুন্নি) ১৭৬ সূত্রাং সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোন একটি (যা সহীহ রেখেছে) ধরণ পড়েছে যথেষ্ট হবে মতানৈকা যদি শ্রেষ্ঠত্রের ব্যাপারে। যথা-
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, হয়রাত উমর (রা)-এর তাশহারুদ পড়া উত্তম।
আর তা হল—

التحيَّاتُ للهِ والزاويةاتِ للهِ وَالصلواتُ للهِ السلامُ عَلَيْهِمَا النبِيُّ ﷺ (مُؤَا أمام)
(বাকিতুকু ইবন মাসউদ রাণ-এর তাশহারুদের মত)
(مalker ص 74)

হয়রাত উমর (রা) লক্ষের প্রথমে এই তাশহারুদ শিখিলেন এবং কারো পক্ষ থেকে দেহে এর উপর কোন প্রকার আপত্তি উপস্থিত হয়নি, সুতরাং বুঝা যায় যে, ইহাই উত্তম। (তন্মত্তম ১ চ ৩৩)

* ইমাম শাফেকিয় রহ.-এর মতে, আবদুল্লাহ ইবন আবোসারের তাশহারুদ উত্তম।
আর তা হল—

عن ابن عباس أنَّهَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُنَا التَّشَهَّدُ
كَمَا يَعْلَمُنَا التَّزَكَّيْنُ، وَكَانَ يَقُولُ التَّحَيَّاتُ المَبَارَكَاتُ ِ الصُّلَاةُ الطَّيِّبَاتُ للهِ السَّلَامُ
عليُّهُ الخ (ابو داود ج ১ ১৪৪, ترمذي ج ১ ৪৫, نسائي ج ১ ৭৫ নং অন্য অংশ তহেহ, ১৫)

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক এবং ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, হয়রাত ইবন মাসউদ (রহ.)-এর তাশহারুদ উত্তম।
যা অনুভূত দের গুরুত্ব বর্ধিত হয়েছে। ইবন মাসউদ (রা)-এর তাশহারুদ প্রাধান্য লাভের কিছু কারণ নিয়ে দেওয়া হল—

ক. ইমাম তিরমিয় (রহ.)-এর সুস্পষ্ট বিরোধ মুতাবিক হয়রাত ইবন মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েটটি এ প্রসঙ্গে বিশ্বাস হল। (টমীয় ১ ৬৫)
খ. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন—

كَانَ ابن مَسْعُود يَكُرُّهَ أَنْ يُزَاد* فيْهُ حَرَفٌ أَو يَنْقَصُ مَنْهُ حَرَفٍ (مُؤَا أمام محمد ص ১১১)
অর্থাৎ, ইবন মাসউদ রাও তাশাহুদে কোন হরফ বাড়ানো বা কমানোকে অপছন্দ করতেন। এতে বুঝা যায় এবং প্রমাণিত হয় যে, এই তাশাহুদ উওয়ার ব্যাপারে কতক্ষু সর্বক্ষেপের দাবিদার।

গ. হযরত ইবন মাসউদের (রাও) তাশাহুদ সিহাই সিভাই বর্ণিত আছে।

(অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রদত্ত হাদিসের সূত্র দ্রষ্টব্য)

বিশেষভাবে লক্ষ্য যে, এই তাশাহুদের মন্দাবলীতে কোথাও কোন এখতেলাফ নেই। অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত তাশাহুদের মন্দাবলীতে ব্যাপ্ত এখতেলাফ রয়েছে।

ঘ. আলামাবায়র রহ(রহ) বলেন, এই তাশাহুদ বিশজন রহাবা (রাও) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ঝ. ইবন মাসউদ (রাও)-এর তাশাহুদ নির্দেশাসূচক শব্দ দ্বারা সাবধান। এজন্য হাদিসগুলোতে কুম্বল” ফৌলুন” ফৌলুন” শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

(আবু দাওদ জ ১৩৯, নসাইলি জ ১৩২)

কিন্তু এছাড়া অন্যজো শুধুমাত্র বিবেক হয়েছে।

চ. উক্ত তাশাহুদের ফাোো হরফ অতিরিক্ত রয়েছে, যা নতুন বাক্যের জন্য প্রত্যেকটি শব্দের স্বতন্ত্র সাহ সৃষ্টি করে। যেমন, কেউ এভাবে কমস করলো—

’’ও ও লো ও ও দুরহমের রহমের’’ কখন শুধু একটি কমস হবে। কিন্তু কেউ যদি ফোোেো—এর সাথে এভাবে বলে ফোোেো— তখন তিনটি কমস হবে।

ছ. হযরত ইবন মাসউদ (রাও) সপ্ত ভাষায় বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাদ) আমাকে এই তাশাহুদের তালিম দিয়েছেন আমার হাত ধরে। (মসন ১৩৪) এটি বিষয়টির গুরুত্ব বহন করে। আর এই রেখায়েতটি হস্তক্ষেপ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ

(সালেল বাক্য যখন)

(নসাইলি জ ১৩২)

জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ)-এর দলীলের জবাবঃ এই হাদিসটি হযরত উমর (রাও)-এর উপর মাওকুফ। সুতরাং এই হাদিসটি মারফু-এর মুকাবলী দলীলযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেক (রহ)-এর দলীলের জবাবঃ অতিরিক্ত শব্দ হওয়াই যদি প্রাধান্য লাভেল কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তা হযরত জাবির (রাও)-এর তাশাহুদ শব্দের সবগে প্রাধান্য লাভের দাবিদার। কারণ, তাঁর তাশাহুদের সবচেয়ে বেশি শব্দ রয়েছে।

যেমন, তাতে “বিসিমলাহির রাহমানির রহমান” অতিরিক্ত শব্দও রয়েছে।

(নসাইলি জ ১৩২)

(নসাইলি জ ১৩১)
বাবু ইবাদাত কার্যকর করা

তা হাদুরের মধ্যে আম্বুল দ্বারাই ইশারা করা

... ইবাদাত ইবনে আব্দুর রহমান আল-মুহাম্মদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা হযরত আসুলাহ ইবনে উমর (রাঃ) আমাকে নামায়ের মধ্যে কঠিন নিয়ে অন্ধকার খেলতে দেখেন। তিনি নামায় শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূল সাহাবা (সাঃ) যেরূপে নামায় আদায় করতেন, তদৃপ করবে।

তখন আমি তাকে রাসূল সাহাবা (সাঃ)-এর নামায় পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেনঃ তিনি (সাঃ) যখন নামায়ের মধ্যে বসতেন, তখন দান হাতের তালুকে দান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তাঁর সমস্ত আংগুলগুলো (শাহাদাত আম্বুল ব্যতীত) বক্ষ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন।

বিশেষতঃ তাহাদুরের সময় শাহাদাত আংগুল (তরজ্জী) দ্বারা ইশারা করা নিয়ে ইসলামী চিন্তাভাবনার মাঝে মতান্তর রয়েছে।

* খুলসানাবাসী, ইরাকবাসী এবং পরবর্তী কতক ভারতীয় উলামার মতে, তাহাদুরের সময় তরজ্জী আংগুল দ্বারা ইশারা করা কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর বলেনঃ (১) ইহা একটি অতিরিক্ত বিষয়। ফলে ইহা সুন্নত হতে পারে না। বরং তা পরিভাষা করাই উত্তম। (২) এটি একটি রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের প্রতীক। এজন্য তাদের সাদ্ধারণ থেকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে তা না করাই উত্তম। (৩) তা ছাড়া
দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘ইন্দ্রিয় রসূল ফখরুদ্দীনে।’ অর্থাৎ, রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ কর। (হাশরঃ ৭)

* যে লোক রাসূলের অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল। (নিসাবঃ ৮০)

তাই ইমাম মুহাম্মদ (রহ) যুদ্ধে শহীদ আল্লাহ দ্বারা ইস্লাম সংগ্রহ একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাং)-এর আমলই আমরা গ্রহণ করি। আর এটাই ইমাম আবু হানিফার মাযহাব।”

দলীল (২): অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস।

* হাদিস দলীল- ‘হে বনু মাদিনা! আমি আল্লাহ কুরআনের ভেজদা।’ (৩)

* সালাহের অর্থাৎ, আমের ইবনে ইবনুল্লাহ ইবনুজুয়াবার (রাছ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাং) ... শহীদ আল্লাহ দ্বারা ইস্লাম করতেন।

তাহাড়া কতক মুহাম্মদের শাহীদের তজনী আল্লাহ দ্বারা ইস্লাম করার হাদিসকে মুতাওযাতির বলে গণ্য করেন। এমনকি এর উপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈস এবং সালামে সালেহেরদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বাপারে আল্লাহ বার বলেন-

* অর্থাৎ, এতে কেনও মতানৈক্যে নেই।

জবাবঃ যারা বলেন, ইস্লাম করার একটি অতিরিক্ত আমোলা, তাদের দায়ি প্রহাণযোগ্য নয়। কেননা, এটি যদি ছেড়ে দেয়াই উত্তম হত, তাহলে নবী করীম (সাং) এমনটি করতেন না।
* যারা তাশাহুদে তজ্জনী ইশারাকে রাফেজী সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য মনে করে বীরীভূত দেন না, তাদের জবাবে বলা যায়, নিঃসুর্য সাদৃশ্য নাজাজীয় নয়। বরং ঐ সমস্ত কর্মসূচীর সাদৃশ্য নাজাজীয়ের বেগুলোকে তারা নিজেরা মনোভাবে প্রচলিত করেছে এবং তা তাদের প্রতীক হয়ে গেছে। আর তাশাহুদে ইশারা করা তাদের পক্ষ থেকে নতুন কান আবিষ্কৃত বিষয় নয়, বরং তা হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং ইশারা রাফেজী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন প্রতীক নয়, ইহা ইসলামের প্রতীক।

* তাছাড়া আরেকটি যে অভিযোগ দেয়া হয়, রানের উপর হাত রাখা সুমুহ, যা ইশারা করার দরা তরক হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং হাত তো রানের উপরই থাকে। শুধুমাত্র আশ্রয় উঠানো হচ্ছে। এতে সুন্দর তরক হল কিভাবে? বরং এক সমতলের সাথে আরেকটি সুন্দর আদায় হচ্ছে। অথবা বলা যায়, সেক্ষেত্রে হাতের তলু একটি উপরে উঠলেও এক সমতলের তরক করে অন্য সমতলের উপর আমল করা হচ্ছে। যা সহীহ হাদীস দ্বারা বীরীভূত হয়।

* মুজাদ্দি আলফে সানী (রহ) যে ইদতিরাব (আস্তিত্ব)-এর কথা উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে আমরা হাদীসের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই যে, খোদ ইশারার ব্যাপারে কোন ইদতিরাব নেই; বরং ইশারার পদ্ধতির মধ্যে হাদীসের বিভিন্ন ধরন পাওয়া যায়। যাকে তিনি ইদতিরাব বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং যে “ইশারা” অক্টো দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। (যস মোকতোত, ৩২,সমাল খ ৩, সংস্করণ ২০০৫-১০)

* উল্লেখ যে, ইশারার ধরনের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের হাদীস পাওয়া যায়। মূলত ইহা সময় ও অবস্থানের হয়েছে। কখনো প্রিয় নবী (সংঘ) ইশারা একঘাত করেছেন, আবার কখনো অন্যভাবে। তাই তদন্তে প্রত্যেকটির উপর আমল করা জায়ে। যেমন, ইবন উমর (রাখ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, কবিতা, অনামিকা ও মধ্যযুগ আফসালাকে বঙ্গ করে বৃদ্ধাগণিতে শাহাদাত আশ্রয় রেখে তজ্জনী আফসাল দ্বারা ইশারা করে।

* আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (রাখ)-এর হাদীসে এসেছে, উল্লিখিত তিন আফসালকে বঙ্গ করে বৃদ্ধাগণিতে মধ্যযুগ আফসালের উপর রেখে ইশারা করে।

* ওয়ায়েল ইবন মুহাম্মদ (রাখ)-এর হাদীসে এসেছে, কবিতা এবং অনামিকা আফসালকে বঙ্গ করে মধ্যযুগ এবং বৃদ্ধাগণিতে শাহাদাত আফসাল দ্বারা ইশারা করে। আহ্মদের নিকট এই পদ্ধতিটি উল্লেখ। (নুসরা ৫.২.৪৫)

অতঃপর বৃদ্ধ বা বদন করার সময় নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম শাফেই (রহ.)-এর মতে, তাশাহহুদের শুরু থেকেই বন্ধন করবে, এবং “আশহাদু” বলার সময় আঞ্জল উঠাবে এবং “লা ইলাহা” বলার সময় নিচে নামিয়ে ফেলবে।

* অতঃপর কতক রেওয়ায়েতে এসেছে, উপর-নিচে নাড়াবে। এবং কতক রেওয়ায়েতে এসেছে, ডানে-বামে নাড়াবে। এবং কতক রেওয়ায়েতে স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, আঞ্জলসমূহ তাশাহহুদের প্রথম থেকেই খোলা রাখবে এবং লা দেবি নাম বলার সময় বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঞ্জল উঠাবে এবং লা দেবি বলার সময় আঞ্জল নামিয়ে ফেলবে।

(ফতেহ ইলেমেরা ১ চ ২২১, মদাকি সন ১৩০৫, তত্ত্বে জ ১, বর্দ্য মশকুম ২ ২৩)
দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেষী, আহসান, সুফিয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইহ্সাক (রহ.)-এর মতে, নামায় ইমাম-মুকাদ্রী ও মুমনফিরাদ (একাকী নামায় আদায়করী) সবার উপর দু’দুটি সালাম ওয়াজিব। একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে।

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।
বাবের মো কাল যাচ্ছি শাল্কে চণ্ডী

যে ব্যাক্তি নামায়ের মধ্যে সম্প্রিভাষ হয়েছে

... উন্নত হয়েন ইবন আসলাম (রা) রাবি মলিকের সন্দেহ বর্জন করেছেন।

তিনি বলেন, বনী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন যাইহু যে তুমাদের কেউ নামায়ের

মধ্যে সন্দেহ পরিত হয় এবং তার দৃঢ়তায় মনে হয় যে, সে চার রাকাতের ছবি

তিন রাকাত আদায় করেছে, তখন সে যেন ছতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে তা সিজদা
দলীলঃ

২৪৪

নামায অধ্যায়

সহকারে আদায় করে। অতঃপর তাশহুদ পাঠের নিমিত্তে বসবে। তাশহুদ পাঠের
পর বসা অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজ্জাদা দেবে এবং সবশেষ পুনরায় সালাম
ফিরাবে।

বিশ্লেষণঃ যদি কারো নামায়ের মধ্যে এই সম্পূর্ণ হয় যে, সে কত রাকাত নামায
পড়েছে, বেশি পড়েছে নাকি কম পড়েছে, তখন নামায়ী কি করবে, এ ব্যাপারে
ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম আওয়াস ও শাবিবুল মুসবিয়া (রহ.)-এর মতে, মুসল্লী যদি নামায়ের রাকাত সংখ্যায়
সন্ধিহার হয় তাহলে সর্ববৃহত্তম নামায দোহ্রানো ওয়াজির। ব্যাপ্তিক শুধু তখন
খন রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ইমামকীন হয়ে যায়।

বন অবম আরম্ল নাস-লিদি না মুহুর্ত না চলাচল না বায়ু যে যে যে যে
(মস্ফ আবি শিবাবিয়া জ ২৮ জান ১/১/১)

অর্থাৎ, ইমাম উমর (র।) যে মুসল্লী তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে তা
সে জানে না এলিয়া মুসল্লী সম্পর্কে বলেছে, সে নামায দোহরিয়ে নিবে। যতক্ষণ না
নিশ্চিতভাবে মনে আসে।

* হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, সর্ববৃহত্তম সিজ্জাদা সাহু ওয়াজির। কমের
উপর ভিত্তি করবে অথবা বেশির উপর ভিত্তি করবে।

দলীলঃ

... অন্য হযরত হারুন, বাহুল্যের নামায উদ্দেশে, উদ্দেশে রোমিয়া না আহ্মদ ভাবে
করেছে, কোন উমরের কেল্লা নামায দোহ্রায়, তখন শরীত তার নিকট এসে
তাকে দেখিয়া দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে যে, সে কন রাকাত নামায
আদায় করেছে, তা সুর্য করতে পারে না তা তার কারো যখন এমন অবস্থা
হবে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজ্জাদা দেয়।

উক্ত হাদিসে কম বা বেশির কথা উল্লেখ নেই, বরং ব্যাপকভাবে দুটি সাহু সিজ্জাদা
দেয়ার কথা বলা হয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেই, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, এমন সন্ধিহান অবস্থায় কমের উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব। এবং এরপর প্রতিটি রাকাত বসা ওয়াজিব যাতে সন্তাবনা থাকে যে, ইহা শেষ রাকাত হতে পারে এবং সিজদায়ে সাহু দেওয়াও ওয়াজিব।

দলীলঃ

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এ মসাইলালিতে বিশ্লেষণ রয়েছে-

(১) যদি মুসলিম এই সন্দেহ জীবনে প্রথমবার হয়, তাহলে নামায দোহারের পড়া ওয়াজিব। (২) আর যদি সন্দেহ বারবার হয়, তাহলে নামায পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব যায়, বরং সে চিন্তা-ফিকির করবে। চিন্তা-ফিকির পরে যেদিকে তার প্রবল ধারণা জমিয়ে তার উপর আমল করবে। (৩) আর এই চিন্তা-ফিকিরের পরে যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না জমে তাহলে কমের উপর ভিত্তি করবে এবং শেষ সিজদায়ে সাহু করবে। উল্লেখ্য যে, কমের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে যেহেতু রাকাত সর্বশেষ রাকাত হওয়ার সন্তাবনা থাকে, সেগুলোতে বসাও জরুরী।

দলীল

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এ মসাইলালিতে বিশ্লেষণ রয়েছে-

(১) যদি মুসলিম এই সন্দেহ জীবনে প্রথমবার হয়, তাহলে নামায দোহারের পড়া ওয়াজিব। (২) আর যদি সন্দেহ বারবার হয়, তাহলে নামায পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজিব যায়, বরং সে চিন্তা-ফিকির করবে। চিন্তা-ফিকির পরে যেদিকে তার প্রবল ধারণা জমিয়ে তার উপর আমল করবে। (৩) আর এই চিন্তা-ফিকিরের পরে যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না জমে তাহলে কমের উপর ভিত্তি করবে এবং শেষ সিজদায়ে সাহু করবে। উল্লেখ্য যে, কমের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে যেহেতু রাকাত সর্বশেষ রাকাত হওয়ার সন্তাবনা থাকে, সেগুলোতে বসাও জরুরী।
দলীল (২): এই হাদীস, যা ইমাম আওয়াঈ (রহ.) দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (উল্লিখিত দলীল দুটি নামায পুনরায় পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজা)

"عَنْ عَبْدِ الْلَّهِ عِنْدَ مَسْؤُودٍ ... إِذَا شَكْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةِ قَلِبُهُ" (٣)

الصِّوَابُ قَلِبُهُمْ عَلَىٰهُمْ لَا يُسَاجِدُ سِجَدَةَ جَنَّةٍ - (سُلَيْمَانِ ج ١٢:١٢ বাবে সুমসুরি ইল্লাতুল)

السحود، বখারি ج ١:٨৮ বাবে তরজে নিব এল ইস্লাম, নাসাই জ ١:৮৪ বাবে মজহুর (৮)

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবু মসুযদ (রা) হতে বর্ণিত। ... নবী করিম (সা) বলেন, তোমাদের কারা যদি নামাযে সন্দেহ হয়, তবে তোমাদেরি করে খুব সঠিক মনে হবে, তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে নিব। অর্থাৎ দুটি সিজদা করবে। (এই দলীলটি চিন্তা-ফিকির করার ক্ষেত্রে প্রয়োজা)

দলীল (৪): এই হাদীস যা তিন ইমাম দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (উক্ত হাদীসটি কমরের উপর ভিত্তি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজা)

হানাকী মাহাবারের প্রাধান্যের কারণ: উপরিভাগ আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই মাসআলায ব্যাপক এখতেলাফ হওয়ার মূল কারণ হল, এখতেলাফপূর্ব রেওয়ায়েত। কেননা কতক রেওয়ায়েতে নামায আবার পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে চিন্তা-ফিকির করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে কমরের উপর ভিত্তি করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আবার কতক রেওয়ায়েতে সিজদায়ে সাহুর হুকুম দেয়া হয়েছে।

* তিন ইমাম এসব হাদীসসমূহ থেকে কমরের উপর ভিত্তি করার হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে রয়েছে সিজদায়ে সাহুর হাদীস।
* আর ইমাম আওয়াঈ ও শাবী (রহ.) নতুনভাবে নামায পড়ার হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন, আর বাকীগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন।
* আর হাসান বস্তী (রহ.) শুধু সিজদায়ে সাহুর হাদীস গ্রহণ করেছেন।
* কিন্তু যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামতের দিকে বিচক্ষণতার সাথে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যায়, তিনি এ সবগুলো হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করে সবগুলো হাদীসের মাঝে এক অপূর্ব ও সর্বোচ্চ সামঞ্জস্যা বিধান করেছেন।
* যে সকল হাদীসে নামায পুনরায় পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজা হবে, যার জীবনে প্রথমবার নামাযে সন্দেহ হয়।
* আর যে সকল হাদীসে চিন্তা-ফিকিরের হুকুম রয়েছে, সে সকল হাদীস ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজা হবে, যার নামাযে প্রায়ই সন্দেহ হয়ে থাকে।
বব্ব জমিয়াতে ফি তাবীল সোটে সোটে
গ্রামে জমিয়াতের নামায়ের বিধান

... অনন্ত উল্লাস- নামায় জমিয়াত ফি ইসলাম বদয় জমিয়াত ফি
মসজিদ রসূল অ. ইলাহ সোটে ইলাহ বাখি ইলাহ বাখি ইলাহ বাখি
মসজিদ বাখি জমিয়াত জমিয়াত জমিয়াত জমিয়াত জমিয়াত
বাখি বাখি বাখি বাখি বাখি
বাখি বাখি বাখি বাখি বাখি
নোবিন বাখি নোবিন নোবিন নোবিন নোবিন
নোবিন বাখি নোবিন নোবিন নোবিন নোবিন
(বাখির জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো)
(নোবিন জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো)
(বাখির জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো)
(নোবিন জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো জায়গো)

বিমোচনঃ এখানে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে-
(ক) যারা গ্রামে বা শহর থেকে দূরে, তাদের উপর কত দূর থেকে জমিয়াত নামায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
(খ) গ্রামে জমিয়াত আদায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিমোচন।

প্রথম আলোচনাঃ ইমাম শাফেকী (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি শহর থেকে এতকক্ষ দূরে অবস্থান করে যে, শহরের জমিয়াত নামায়ের জন্য এদের সুরক্ষা ও পূর্বেই নিজ
বাড়িতে দুর্বলতা পাচ্ছে, এমন ব্যক্তির জন্য জমিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর
যে ব্যক্তি এর থেকে দূরে থাকে তার জন্য জমিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
কোন কোন হামারী এলিমের অভিমতও অনুরূপ। ইমাম আবু ইব্সুফ (রহ.)-
এর একটি মত সেই।

দলীল হয়তো আবু হুসায়ন (রহ.)-এর রেওয়ায়তে-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (জমিয়াত আদায় করে) তার পরিবার এসে রাত্রি যাপন
করতে পারে, তার উপর জমিয়াত আবশ্যক।
* ইমাম আহমদ ইবন হামল ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জুমআ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিয়া, যে শহর থেকে এতটুকু দূরে অবস্থান করে যেখানে সে আযানের অওয়ায় থাকতে পায়। অতএব, যে শহর থেকে এত দূরে থাকে যার ফলে আযানের অওয়ায় থাকতে পায় না, তার উপর জুমআ ওয়াজিয়া নয়। ইমাম শাফেই (রহ.)-এর একটি মতও তাই। (মুয়াফ সুন্ন 7, পৃ: ৪৫)

... عن عبد الله بن عمرو بن適合ي صلى الله عليه وسلم قال الجهات
على كل من سمع اللذة - (ابو داود ج 1 ک 151 باب من تجب عليه الجماعة)

অর্থাৎ, আব্দুর্রাহ ইবন আমর (رā) নবী করিম (サ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জুমআর নামাজ ওয়াজিয়া, যে আযান থাকতে পায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জুমআ ঐ ব্যক্তির জন্য ফরয় যে শহর বা শহরতলীতে বসবাস করে। (التعليقات الصحيح ج 2 ص128)

দলীলঃ দ্বিতীয় আলোচনায় কুরআন ও হাদীস দ্বারা হাদীসীদের প্রদত্ত দলীলের মূহ দ্বিতীয় আলোচনায় কুরআন ও হাদীস দ্বারা হাদীসীদের প্রদত্ত দলীলের মূহ দ্বিতীয় আলোচনায় কুরআন ও হাদীস দ্বারা হাদীসীদের প্রদত্ত দলীলের মূহ দ্বিতীয় আলোচনায় কুরআন ও হাদীস দ্বারা হাদীসীদের প্রদত্ত দলীলের মূহ

ব্যাখ্যা: ইমাম শাফেই (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

(1) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, একদল মুহাদ্দিস এই হাদীসটি সুফিয়ান থেকে আব্দুর্রাহ ইবন আমর (রā)-এর উপর মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছে। সুতরাং হাদীসটি মারফূ নয়।

(2) তাছাড়া, যে ব্যক্তি খুব বড় শহরে অবস্থান করে, কোন কোন সময় সে হয়ত আযান নাও থাকতে পারে। সুতরাং আযান শোনার উপর জুমআর নামায় ভিত্তি করা মোটেই সম্ভব নয়। (তন্মেষ ج 1 ص: 400-405)

দ্বিতীয় আলোচনায় গ্রামে জুমআ আদায় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিশেষ্যে গ্রামে জুমআর নামায় আদায় করা যায় কিনা; এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, গ্রাম হোক কিংবা শহর হোক, সর্বত্রই জমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, গ্রামে জমুআ আদায়ে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে এজন্য সেখানে মসজিদ বা বাজার থাকা শর্ত।
* ইমাম শাফেকী ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, জমুআর জন্য শহর হওয়া শর্ত নয়, বরং প্রত্যেক ঐ গ্রামে জমুআ আদায় করা ওয়াজিব সেখানে কমপক্ষে এমন চলিতশজন পুরুষ রয়েছে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন, বলেগে, মুক্ত ও স্বাধীন।

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-

```
إذا تؤدي للصلاة من يوم الجمعة فاسمو إلى ذكر الله وذرو الباء
```

অর্থাৎ, জমুআর দিনে যখন নামায়র জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর সুরেণ দৌড়াও (তুরা কর) এবং বোধকেনা বন্ধ কর। (জমুআ ৯)

উক্ত আয়াতে "فَاسموٰ" (দৌড়াও) শব্দটি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে শহর কিংবা গ্রাম উল্লেখ করা হয়নি।

দলীল (২) অনুভূত হয়ে কর্তন হাদিস। উক্ত হাদিসে “জোওয়াছাহ”কে গ্রাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে বুদ্ধি যায় যে, গ্রামেও জমুআ হতে পারে।

দলীল (৩) অনুভূত হয়ে কর্তন হাদিস। উক্ত হাদিসে “নিহারা”কে গ্রাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে বুদ্ধি যায় যে, গ্রামেও জমুআ হতে পারে।

```
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قايل أباه بلغ ما ذهب بصره.
عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع البناء يوم الجمعة ترحمل لاسعد بن زرارة
فقلت له ما لك إذا سمعت البناء ترحملت لاسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع
يبن في هزوم القيت من حراء بني يثناي في نقيع يقال له
```

নিহারা হাদিসের কথা কি আমি যৌথে Kolkata হাদিসের অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করব? এবং এ হাদিসের আদম সামনের বোধ হয় "নুরু বায়াদার হাদররাত" অবস্তত এবং কি "নুরু আল-খাদামাত" হিসেবে প্রসিদ্ধ। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, সে সময়ে সংখ্যায় উপন্যাস কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চলিতশজন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, চলিতশজন ব্যক্তির এলাকাতে জমুআ পড়া যায়।
দলীল (৪): এ কথার উপর সকল রাবী একমত যে, নবি করিম (সা) সর্বপ্রথম জুমআ কুবা থেকে মদিনায় আসার পথে বনূ সালিম মহম্মদ আদায় করেছিলেন। আর এটি একটি ছোট গ্রাম ছিল। (আয়াত আল সালা ৩২)

দলীল (৫): হযরত আবু যহুদা রা (রা) এর রেবোয়ায়েত- অনেকে কিন্তু ওসমানের সহযোগিতায় জুমআ নবী করিম বিশ্বাস করেন যে সে সময় নবী করিম (সা) বলেন- (সন্দেহ)

অর্থাৎ, তারা উমর (রা) এর নিকট জুমআর ব্যাপার জানতে চেয়ে দিলে পাঠালো। উমর (রা) তাদের উত্তরে লিখেন, তামরা যেখানে থাক না কেন জুমআ আদায় কর।

হযরত উমর (রা) শরহন্দের প্রতিক জায়গায় জুমআ কায়ম করার হকুম দিয়েছেন। তিনি শহর কিভাবে গ্রাম নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং বুধ্বা গেল জুমআর জন্য শহর শর্ত নয়, বরং গ্রামেও জুমআ আদায় করা শুধু হবে।

* ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে, জুমআ শুধু হওয়ার জন্য শহর বা শহরতলী হওয়া শর্ত। যেখানে কমপক্ষে চার হাজার লোক বাস করে। তাঁর মতে, গ্রামে জুমআ জায়ে নয়।

* এখানে উল্লেখ যে, শহরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হানাফী মাসাইয়েদের ভিড ভিডি উভি পাওয়া যায়।

* কেউ কেউ শহরের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, “এমন এলাকাকে শহর হিসেবে গণ্য করা হবে, যেখানে সরকার বা রাজপ্রধান অথবা তাঁর প্রতিনিধি বিদ্যমান।”

* কেউ কেউ বলেন, “সহর ঐ এলাকাকে বলা হবে, যেখানের সরকার যাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে ঐ এলাকার সকল মানুষের সাহায্য সংক্রান্ত হয় না।”

* আশ্রয় আলী থানবী রহ. বলেন, যে এলাকায় বাজার আছে, অধিকাংশ লোকের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আছে, যেখানে চার হাজার পুরুষ লোক বসবাস করে, তাকেই শহর বলে। আর যেখানে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক দূর থেতে হয়, তাই গ্রাম। (الكوكب الدري ج ১ সাল ১৯৯)

মূল কথা হল, শহরের নির্দিষ্ট কোন সমন্বিত এ যথার্থ সংজ্ঞা দেয়া মুশকিল। বরং ইহা প্রচলিত ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে। কেননা, সরকার ও তঞ্চদুনের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক সময়ের প্রচলিত ঐতিহ্য পরিবর্তন হয়। অন্তত, যে সময়ে প্রচলিত ঐতিহ্য যাকে শহর বলে, তাই শহর।

তবে বর্তমানে শহর বলা হবে সাধারণত ঐ সমস্ত জায়গায়, যেখানে ডাকঘর, যানবাহন, টেলিফোন, পুলিশ স্টেশন, বাজার, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি থাকবে এবং যেখানে সাধারণত সবধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়।
দলীল (২) পরিষেবা ব্যতীত অন্য মসজিদও ছিল, 
কিন্তু জুমাহ শুধু মসজিদে নববীতেই অনুষ্ঠিত হত, না মসজিদে কুবাতে, না অন্য 
কোন মসজিদে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জুমাহ শর্ত হওয়া শার্ত। ছোট প্রাম 
বা বিলম্বিত জুমাহ জায়ে নয়।

দলীল (৩) হযরত আল্লাহ (রাজ)-এর আহার-

লা ْجِمْعَةَ وَلَا تَشْرِيقۚ إِلاَّ فِي مَيْسِرٍ جِامِعٍ- (মন্ফন ইন্দি শিবা জি ١٠١)
অর্থাৎ, জুমাহ ও তাকবীরে তাশরীক বড় শহর ছাড়া অন্যত্র (জায়ে) নেই।
যদিও কেউ কেউ উক্ত আহারটিকে মাওকুফ বলে থাকেন, কিন্তু হাদিসের 
কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে একথা বলা যায় যে, এর সনদ বিলকুল সুন্দর। তাই 
হাফিজ ইবন হাজার (রহ.) মুসানিকে আলমুর রায়াবাক সূত্র এই আহারটি বর্ণনা 
করার পর লিখেছেন- (এটিকে প্রহরিত ইহা হাদাবা হাদাবা হাদাবা ١٢২)
অর্থাৎ, এর সনদ সুন্দর।

দলীল (৪) সহীহ রেওয়াযেতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিদায় হজে আরাফাতে 
অবস্থান হয়েছিল জুমাহ দিনে। (বখারি জি ১ স ১১ বাবু বাবুর যুমিয়া উত্তমে প্রতিবাদ)
এ ব্যাপারেও রেওয়াজের আছে যে, নবী করিম (সাঁ) আরাফায় জুমআর নামায আদায় করেননি, বরং তিনি যুহরের নামায আদায় করেছেন।

(সিরাজের প্রথম পর্ব পর্যায়ক্রমে)

এর কারণ এতদ্বার্তাতি অন্য কিছু নয় যে, জুমআর জন্য শহর হওয়া শুরু। কিন্তু আরাফা শহর নয়।

যদিও কতক শাখাগুলো মতাবলম্বী জুমআর না পড়ার কারণ এই বরনা করেছেন যে, 

নবী করিম (সাঁ) মুসাফির ছিলেন। কিন্তু এ দলে ঠিক নয়। কারণ, নবী করিম

(সাঁ)-এর সাথে বিরাট একটি জামায়াত ছিল মুকুমদের। মক্কার সবাই তা

মুকুম ছিলেন। তাঁদের উপর জুমআ ওয়াজিব ছিল। অতএব, প্রশ্ন হয় যে, নবী করিম

(সাঁ) তাঁদের জন্য জুমআর ব্যবস্থা কেন করেননি। যদিও জুমআর নামায মুসাফিরের উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু নাজারের নয়। সুতরাং নবী করিম (সাঁ) যদি তথ্য জুমআর নামায পড়তেন, তাহলে তাঁর নামায আদায় হয়ে যেত, পাশাপাশি

মুকুমদেরও নামায আদায় হত। তা সত্ত্বেও তিনি যে শুধু নিজেই জুমআর নামায

পড়েননি তা নয়; বরং মুকুমদেরকেও পড়ার নির্দেশ দেননি। এমনকি তথ্য নবী

করিম (সাঁ)-এর কথায় দেওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। অতএব, তাঁর জুমআ না 

পড়ার ব্যাখ্যা শুধু এটাই হতে পারে যে, তা শহর না হওয়ার কারণে যেখানে জুমআ 

জায়ে ছিল না।

দলীল (৫) আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِذًا نُؤْرِي إلى الصُّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَاسْتَغْلِي إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذُوْ نَبِيعٍ (الجمعة)

উক্ত আয়াতে বেচা-কেনা ছড়া, আল্লাহর সুরের দিকে ছুটে আসার কথা বলা হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জুমআ বাণিজ্যিক এলাকার জন্য নির্ধারিত। আর শহরই হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। সুতরাং সেখানে ছাড়া অন্য জুমআ ওয়াজিব নয়।

(দ্রু মশোকের প্রথম ২/১৩৪)

জবাবঃ আহামাফদের পক্ষ থেকে শাখাগুলোর প্রথম দলীলের জবাবঃ উল্লিখিত

আয়াতে জুমআর দিকে দৌড়ে যাওয়াকে আয়াতের উপর মাওকুফ বা নির্দিষ্ট করা

হয়েছে। আর উক্ত আয়াতে ইহা বর্ণনা করা হয়নি যে, আয়াত কোথায় হওয়া উচিত,

আর কোথায় না হওয়া উচিত। সুতরাং প্রামে যেহেতু জুমআর আয়াত (নদ) হবে না,

সেহেতু জুমআর জন্য ত্রুটি যাওয়াও ওয়াজিব হবে না।

আল্লামা কাসিম নানুতজী (রহ.) এই আয়াতের দ্বারা হানাফীদের অভিমত প্রমাণ

করেছেন। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতে জুমআর জন্য সার্য (ত্রুটি যাওয়া)-এর হুকুম
দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হল দৌঁড়ে যাওয়া, দৃত চলা। এটার সুযোগ সেখানেই আসে যেখানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। আর গ্রামগুলো এমনটা সত্যন নয়।

er নির্দেশ দেয়া হয়েছে- 'বৃত্ত ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাও। এতে বুঝা যায় যে, জুমআর হুকুম এমন স্থানের জন্যে যেখানে কোন বড়ো বাজার রয়েছে। আর লোকজন সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে। আর গ্রামে এরূপ ব্যস্ততাপূর্ণ বাজার থাকে না।

er বলা হয়েছে-

বিচ্ছিন্ন শূল দাও।

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুপ্রের তথা আয়-রোজগার আমদানীর উপকরণ তালাশ কর। (জুমআঃ ১০)

এতেও বুঝা যায় যে, যেখানে জুমআ আদায় করা হবে সেখানে এ ধরনের ব্যাপক ব্যস্ততা থাকা চাই।

(মাহেলা ব্লাই জুঃ ১২ শমরে চূর মুফতি ১৪০২ খ্রিস্টাব্দ কি তিনি খুদে)


dিলের জবাবঃ (ক্রাইম) শহীদ আরবী বাগডারায় অনেক সময় শহরের জন্যাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন পরিকল্পনা করান বেরিঁ এ-বাই

"ওয়ালাও লোক এই কৃত্তিকারে রজির মনগৃহীত কলের দেহে হয়ে থাকি" অর্থাৎ, তারা বলে, করুন ক্ষেত্র দুই জনপদের কোন প্রথম ব্যক্তির উপর অবতীর্থ হল না? (যুখকফঃ ৩১)

উক্ত আয়াতের ক্রিয়া (দুটি গ্রাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হল মক্কা এবং তাৈয়েকে বুঝানো।

অর্থাৎ মক্কা এবং তাৈয়েকে কোন বড়ো শহর। (রহ এমনানী জুঃ ১৩ চূর ৬৮)

এমনীতে আসাদে জোওয়াহার বলে যে গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মূলত গ্রাম নয়, বরং শহর। কেননা এই একটি বিরত বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। যেখানে চার হাজারেরও বেশি বাসিন্দা ছিল। অর্থাৎ তৎকালীন যুগে গ্রাম অনুরূপ ছিল না।

(রহ এমনানী জুঃ ২৩)

জোওয়াহার সম্পর্কে ইমাম জাওহার রহ) বিষয়-এ এবং আল্লামা যমক্ষশারী

'বিপুল ব্যস্ততায়' লিখেন- "আমরা এই বিশিষ্ট নাম ইব্বেল তালিবেকে বলেছি।"।

অর্থাৎ, জোওয়াহার হল, বাহরাইনে অবস্থিত আরুল কাসাই পৌরের একটি দূর্গের নাম। (আর দূর্গের নাম এই এলাকার নাম হয়ে গেছে জোওয়াহার) আর দূর্গ ছোট গ্রাম থাকে না বরং বড়ো শহর থাকে। আর বিষয়টিতে তাই, জোওয়াহার এক বড়ো শহর ছিল।

(মাহেলা ব্লাই জুঃ ১২ শমরে চূর মুফতি ১৪০২ খ্রিস্টাব্দ কি তিনি খুদে)
আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইমরুল কায়েমও তার এক কবিতায় ‘জোওয়াহার’ শব্দটি উল্লেখ করেন। যা বিশেষণ করলে এটি শহরই প্রমাণিত হয়।

(عَمَّدَةُ الْفَارِي جُدّةٍ صِ) ১৮৭

আল্লামা আনোয়ারের শাহ কাশ্কাশী (রহ.) লিখেন যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়ে হযরত আলা ইবন হায়রামিকে জোওয়াহার গভর্নর বানানো হয়েছিল এবং আলা (রা) সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গভর্নর হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। যদি তা শহরই না হত তাহলে তাতে গভর্নর নিয়োগের প্রয়োজন হত না।

সুতরাং উক্ত হাদিসটি আমাদের (হাফিজদের) বিপরীত নয়, বরং এ রেওয়ায়েটটি স্বয়ং হাফিজদের দলীল।

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ “قَلْتُ کَمْ آنُمْ یَوْبُعْدًا؟ قَالَ آَرِمَعُوْنَ” এই জুমা সাহাবারে কিরাম নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে পড়েছিলেন। অথচ তখন পর্যন্ত জুমা ফরয হয়নি এবং এর আহকামও নামিল হয়নি। যার প্রমাণ মেলে মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত একটি সূরীদীর্ঘ রেওয়ায়েট থেকে। সুতরাং এ ঘটনাটি দলীলমূল্য নয়।

(مَصْلِفُ ابن عبد الرزاق ج ٣ ص ١٠٣-١٠٤)

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ বনু সালিম মহর্মা মূলতঃ মদীনা তায়িবার এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেখানে জুমা পড়া মদীনা তায়িবার জুমা পড়ার হকুম।

(النار السدن ص ٢٢)

পঞ্চম দলীলের জবাবঃ “جمعوا حيث كنتم” আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, “حيث، كنتم” বলে এর অর্থ হচ্ছে “جمعوا حيث كنتم” অর্থাৎ, তোমরা যেকোন শহরেই থাক না কেন। সুতরাং, এখানে হচ্ছে “حيث” শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োজন নয়। কেননা এটি যদি ব্যাপকের অর্থ দেয়, তাহলে জনবসতিহীন ময়দানেও জুমার নামাজ জায়েব হওয়া উচিত। অথচ ময়দানে জুমা জায়েব না হওয়ার উপর উমরের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহাড়া ইমম শাফেই (রহ.) যদিও জুমা-এর ব্যাখ্যায় বলেন, জুমা বিষয়ে কতকটা প্রশ্নটি এর অর্থাং যেকোন গ্রামেই থাক না কেন তোমরা জুমা আদায় কর। অথচ তার নিকটও প্রত্যেক গ্রামে জুমা জায়েব নয়। কেননা তিনিও শর্ত দেন যে, ঐ গ্রামে জুমা জায়েব যেখানে কমপক্ষে চল্লিশজন পুরুষ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, চল্লিশটি পরিবার হওয়া শর্ত। অতএব, এর দ্বারা স্বীকৃতী বক্তব্য প্রমাণিত হয়।
জুমআর নামায়ের সময়

১৫৫

... বাব ও জমৃত্ত জমূমে সা. বাব ও জমূমে সা.

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর জুমআর নামায আদায় করতেন।

বিশ্লেষণঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর্বে জুমআর নামায আদায় করা জায়ে কিনা- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, আহলে যাহির এবং শাওকানির (রহ.) মতে, জুমআর নামায সূর্য হেলার পূর্বেও আদায় করা জায়ে আছে। (নাটর সুন সা. ৪২৪)

দলীল

... বাব ও জমূমে সা. বাব ও জমূমে সা.

(১) বেরাদ, বাব ও জমুমে সা. বাব ও জমূমে সা. (১৪১)

বাব ও জমূমে সা. বাব ও জমূমে সা.

(২) বেরাদ, বাব ও জমূমে সা. বাব ও জমূমে সা. (১৪১)

(৩) বেরাদ, বাব ও জমূমে সা. বাব ও জমূমে সা. (১৪১)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন সাদ (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমআর নামায আদায়ের পরে দিনের প্রথমান্তরের খানা থেকে কায়লুলা’ (দুপুরের বিশ্বাস) করতাম।
উক্ত হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হল, আরবী ভাষায় "غلاء" এই খাদ্যকে বলা হয়, যা সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে খাওয়া হয়। আর কায়লুলা বলা হয় দুপুরের শোয়াকে। তাই সাহাবাবা কিরামগণ যেহেতু এই উভয় কাজটি জুমআর পরে করতেন, সুতরাং বুঝা যায় যে, তাঁরা জুমআ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করতেন।

দলীল (২) কোন কোন হাদিসে জুমআকে ঈদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর ঈদের নামায়ের সময় হল সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়ার পূর্বে। সুতরাং জুমআর নামায়েও ঐ সময় আদায় করা জারীয় আছে।

* ইমাম আবু হানিফা, শাফিকী, মালিক (রহ.) ও জমসুরের মতে- জুমআর সময় হল যুহূরের নামায়ের সময়। অর্থাৎ, যুহূরের নামায় যেমন সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা জারীয় হয়, তেমনিতে জুমআর নামায়েও জারীয় হয়।

(درس مشروط ج ۲ص۲۰)

দলীল (১) অনুমানের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) হযরত সালিম ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন-

کُلٰا نَحْجِمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ ۖ اذَا زَالَتْ الشَّمْسُ (صل‌الله علیه وآله وسلم)

অর্থাৎ, সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে যেত, তখন আমরা নবী করিম (ص‌) এর সাথে জুমআ আদায় করতাম।

জবাবঃ প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) সাহাবাবার কিরাম (রা) যেহেতু খুব সকলেই মসজিদে চালে যেতেন, তাই তাঁরা নাক্সা এবং কায়লুলা করার সময় ও সুরোয়ে পেতেন না। তাই তাঁরা জুমআ পরে এ দুইটি কাজের আগাম দিতেন। সুতরাং নাক্সা এবং কায়লুলাকে প্রথম সময় থেকে দেরী করার অর্থ এই নয় যে, জুমআ সূর্য চলে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করতেন। কেননা যদি তা মেনে নেয়া হয়, তাহলে অন্যান্য অনেক হাদিসের সাথে বদ্ধ সৃষ্টি হয়।

(২) যদিও "غلاء" শব্দটি আরবী ভাষা সে খানাকে বলে, যা সূরোয়ের পরে এবং সূর্য হেলার আগে আগে খাওয়া হয়, কিন্তু কেউ যদি দুপুরের খানা সূর্য হেলার পরে খায়, তারপর একে রাপকারে "غلاء" বলা হবে। হাদিসেও এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, নবী করিম (ص‌) সেহীরের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-
জুমুআকে ঈদ বলা”-এর ব্যাখ্যা হল, কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে তুলনা দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সকল দিক থেকে তার অনুরূপ হতে হবে; বরং অল্প কোন সামগ্রিকের ভিত্তিতেও তুলনা দেয়া যেতে পারে। যেমন, সাদী বাহরের মত। এর অর্থ এই নয় যে, সাদীর বাহরের মত চারটি পা একটি লেজ এবং সাদী শরীরের নাটকটা দাগ থাকতে হবে। বরং এর দৈবা উদ্দেশ্য হল, বাহরের গায়ে যেমন প্রচুর শক্তি আছে, তত্ত্বনিবেশ সাদীর পায়েও বেশ শক্তি আছে।

সুতরাং জুমুআর দিনেও যেহেতু ঈদের মত সবই একত্রিত হয় এবং ইসলামের আমেজ সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তাই জুমুআকে ঈদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। তথ্যগত যদি সকল হুকুমের দিক থেকেই এক হওয়া অপরিহার্য হত, তাহলে ঈদের দের মত জুমুআর দিনও রোষা রাখা হারাম হত এবং জুমুআর হুকুম নামায়ের পরে হত এবং ঈদগাহে জুমুআর আগে ও পরে নফল পড়া মাকরহ হত। অথচ এই সকল আহকার জুমুআতে নেই। এতে বুখা গেল যে, জুমুআ ও ঈদ এক নয়। এবং এ দুইয়ের সময়ও ভিন্ন।

(দরে মন্দাকে জ ৩৫)
অনুবাদঃ ... জাবির (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) এর খুত্বা দানকালে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি (সা) তাঁকে বলেন, হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি বলেন, তুমি দাঁড়ায়ে নামায আদায় করে না।

বিশেষণঃ জুমআর দিন ইমামের খুত্বা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাকাত (তাহিয়াতুল মসজিদ) নামায পড়বে, নাকি চুপচাপ বসে যাবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেকি, আহমদ ইবন হামুল ও ইসহাক (রহ.) এর মতে, জুমআর খুত্বা চলাকালে আগপুক ব্যক্তির জন্য তাহিয়াতুল মসজিদের দু'রাকাত নামায পড়ে নেয়া মুন্তাহব।

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) ... গুন আবু হুরায়ার (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ লাসলুললাহ (সা) এর খুত্বা দানকালে সেখানে সুলাইক আল-গাতফানী (রাজ নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেনঃ তুমি কি কিছু (নামায) পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি সংকীর্ণভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে না। (সূত্র ঐ)

দলীল (৩) হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাজ)-এর একটি বাচনিক (কাওলী) হাদিস-

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এর মতে, জুমআর খুত্বা চলাকালে কেন প্রকার কথাবার্তা বলা বা নামায পড়া জায়ে নয়। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেদের মতাদর্শে এটাই। (শর মসলেম চ ২৮৭, লাসলুললাহ ১৬৫)
দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী -

(১)যদি কোনো মুহাম্মদ নামে নিয়োগ পাতেন তাহলে তারা কারণ লিখিতে শান এবং নিশ্চিত থাক। (আরাফঃ ২০৪)

এ সম্পর্কে ইচ্ছে করিতে বিশ্বাসিত আলোচনা হয়েছে।

শাফেকীগণ তা এই আয়াতটিকে শুধু জুমআর খুতবার সাথে নির্ণিত করে থাকেন।

অবশ্য হানাফীগণ প্রমাণ করেছিল যে, এ আয়াতটি নামিল হয়েছিল নামায় সম্পর্কে, কিন্তু এর ব্যাপকতায় খুতবার অনেকটা শারিফ। কেননা, খুতবাতে কুরআনের অনেক আয়াত পাঠ করা হয়। অতএব, বলা যায় যে, যেখানে খুতবা শোনা ওয়াজিব এবং তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া মুন্তাহাব, সেক্ষেত্রে একটি মুন্তাহাব আদায়ের জন্য ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া কিভাবে জারেখ হতে পারে?

দলীল (২)

... যদি আপনি হীরের আনন্দকধিক আল্লাহ তাআলা প্রশংসা করেন, তাহলে এটি গুণে। (কোরআন: সোমখ ৬৮)

দলীল (৩) মুসনাদে আহমদ বলেন যে, খুতবা মরক্কোর সংক্রান্তি কাজ করার নিষেধ করেছেন। এটি সংকট কাজের আদেশ করার ফল। আর তাহিয়াতুল মসজিদ মুন্তাহাব।

সুতরাং, এ সময় তাহিয়াতুল মসজিদ অকালভাবে নিষিদ্ধ হবে।

দলীল (৪) আল্লাহ তাআলা বলেন -

(৪) আল্লাহ তাআলা বলেন - যে, বাণী শুনুন এবং প্রশংসা করুন। (কোরআন: সোমখ ৬৮)

দলীল (৫) মুসনাদ আহমদ বলেন -

(৫) মুসনাদে আহমদ বলেন - যে, এই বাণী শুনুন এবং প্রশংসা করুন। (কোরআন: সোমখ ৬৮)
দলীল (৫) সুলাইক ইবন হুদবা আল-গাতফানী (রাঃ)-এর ঘটনা ব্যতীত নবী করীম (সাঃ) থেকে আর কোথাও এ বিষয়টি প্রমাণিত নেই যে, তিনি খুবতাবর মাঝখানে আগত ব্যক্তিকে নামায় পড়ার হকুম দিয়েছেন।

আরো দেখা যায় যে, এক বেদুইন দুর্ভিক্ষের অভিযোগ নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এসেছিল। অতঃপর এক সপ্তাহ পরে আবার প্রবল বৃষ্টির অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। আর এই দুই ঘটনাতে লোকটি খুবতাবর মাঝখানে এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাকে নামায়ের নির্দেশ দেননি।

(খায়ি ১৩৭ চ বাবে পাক যদি),

তাছাড়া আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর খুবতাবর মাঝখানে হযরত উসমান (রাঃ) তাশরিফ আনলে, উমর (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে মসজিদে বিলম্বে পৌঁছানো ও গোসল না করার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু নামায়ের নির্দেশ দেননি।

(সলেম ১৩৭ চ বাবে পাক যদি)

সুতরাং এই সমস্ত হাদিসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, খুবতাবর মাঝখানে কোন নামায় পড়া জায়গা নয়।

জবাবঃ হাদাইদের পক্ষ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হযরত সুলাইক ইবন হুদবা আল-গাতফানী (রাঃ)-এর বিষয়টি ছিল খাস। এ বিষয়ে ঘটনাটিকে ব্যাপক মূলনীতির বিপরীতে পেশ করা যায় না। যার বিপরীত বিবরণ হল- একবার নবী করীম (সাঃ) খুতবা দেয়ার জন্য মিস্রে আরোহণ করলেন। কিন্তু তখন খুতবা শুরু করেননি। এমতাবশ্তে সুলাইক ইবন হুদবা নামক এক সাহাবী খুবই জীবান্তের পুরোনো সোশাক পরিধান করে মসজিদে প্রবেশ করেন।

(তুল্মি ১৩৭, নৈতি ১৩ চ)

তাঁর এই দুর্বল অন্যন্য সাহাবীদেরকে দেখানোর জন্য নবী করীম (সাঃ) তাকে দাঁড়িয়ে নামায় পড়ার হকুম দিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নামায়ে ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) নিরূপ ছিলেন, খুতবা আরম্ভ করেননি। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে-
আহকামুল হাদিস

খাভারে আল্লাহ বলেন, "সুরার উচ্চতম স্তরে উপস্থিত হবেন আল্লাহ, এই উপাসনায় যাতে তোমাদের মিল করে। ধর্মের প্রতি তোমরা একত্রিত হবে।" (মসনদ জ. ৭৮)

(১) শাহীদ খান বলেন, "তোমরা সর্বদা জুমুহে উপস্থিত থাকতে হবে। তখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আসে।" (তুমি দাঁড়াও, অতঃপর নামায় পড়।)

(২) চেয়ারাত বলেন, "হাদিসটি আছে যে, হযরত সুলাইক (রাঃ) মসজিদে এসে বসে পড়েছিলেন। নতুন তিনি (সাঃ) তাকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেন না। তাহাত সহিত মুসলিম তো এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

(৩) হাদিসে লিখিত আছে, "ठुम दाँड़ाओ, अतःपर नामाय पड़ो।" (तूम दाँड़ाओ, अतःपर नामाय पड़ो।)

(৪) হাদিসে লিখিত আছে, "ফলত সুলাইকে যিছে আল্লাহ।" (তুমি দাঁড়াও, অতঃপর নামায় পড়ো)

(৫) শাহীদ খান বলেন, "তোমরা সর্বদা জুমুহে উপস্থিত থাকতে হবে। তখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আসে।" (তুমি দাঁড়াও, অতঃপর নামায় পড়ো)
(ইমাম খুলনা দেয়ার জন্য মন্দ করেন) অথবা
(ইমাম যখন খুলনা দেয়ার নির্দেশ হন)

তাছাড়া আরো বেশ কিছু কারণে হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার
রেওয়ায়েতসমূহ প্রাধান্য পাবে। যেমন-
ক. শাফেক্তের হাদিস দ্বারা নামায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্ত্রে হানাফীদের
কুরআন ও হাদিস দ্বারা নামায় পড়া হারাম সাব্যস্ত হয়। আর নিয়ম হল, হারাম ও
বৈধতার মধ্যে বৈধতার দেখা গেলে হারাম প্রাধান্য পাবে।
খ. নিষেধাজ্ঞার রেওয়ায়েতসগুলো কুরআন কর্তৃক সমর্থিত।
গ. এগুলো সাহাবা ও তাবেঙ্গির আমল দ্বারা সমর্থিত।

(মসলম 13 সৈ 168 মোলকের ইসলাম অধ্যায় 1381-181)

সর্বশেষ বলা যায় যে, আহানফের বর্ষ অভিমতে সতর্কতা বেশি। কেননা
তাহিয়াতুল মসজিদ কারা মতেই ওয়াজিজ নয়। সুতরাং তা ছেড়ে দেয়াতে কারো
মতেই ওনাহের আশংকা নেই। পক্ষান্ত্রে নামায় পড়া ও কথা বলা নিষেধের
হাদিসগুলো পরিহার করলে ওনাহের আশংকা রয়েছে।

বাবু মন অদ্রক মন জমানের মূল্য রক্তকা সো

de ব্যক্তি জুমার নামায়ের এক রাকাত পায়

... উন আয়ি হোরায়া কাল কাল সালো প্রাচলে প্রাচলে প্রাচলে প্রাচলে প্রাচলে

(খাফার জ 133 বাবু মন অদ্রক মন জমানের মূল্য রক্তকা জ 133)

জ 133 বাবু মন অদ্রক মন জমানের মূল্য রক্তকা জ 133

অনুবাদঃ ... আরু হুরায়ারা (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাও) ইব্রাহি

করেন, তে ব্যক্তি নামায়ের এক রাকাত পেল, সে যেন সম্পূর্ণ নামায়ে পেল।

বিশ্লেষণঃ ইমাম মালিক, শাফেক্তে, আহমদ, লাইস (রহ.)-এর মত এবং ইমাম

সুফিমান্দ (রহ.)-এর এক মত অনুসারে, যদি কোন ব্যক্তি জুমার পুরো এক রাকাত

ইমামের সাথে না পায় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তুলনা রাকাতের রক্তকা পরে এসে

নামায়ে শরীক হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর যুহরের চার রাকাত নামায় আদায় করা

ওয়াজিজ। (নুমম 132 ৪২৫)

দালীল (১৪) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। অতএব, উক্ত হাদিসের আলোকে

বলা যায়, যে ব্যক্তি এক রাকাতও পায়নি, সে যেন নামায়ে পেল না।
দলীল (২)ঋবি করীম (সাহ) ইরশাদ করেন-

মন আদর্ক মন স্বল্পে জমেয়া রক্ষাতে ফেজ আদর্ক নসাই ১ সো।

অর্থাৎ, যে জমুআ নামায়ের এক রাকাত পেল সে জমুআ পেল।

উত্ত হাদিসে সরাসরি জমুআর কথা উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, ইবরাহিম নাকি, দাউদ যাহেরি (রহ.)-এর মত এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী, যদি কোন ব্যক্তি সালামের পূর্ব মুহূর্তেও ইমামের সাথে শরীক হয়, তবুও ঐ ব্যক্তি জমুআ দুই রাকাত নামায়ই আদায় করবে। যুহুরের চার রাকাত আদায় করবে না।

(যাদুল চন্দন ক্ষীণ ১৬৭) পাদটীকা পাতা ১২৪ পাদ (মশাই জল্লুন)

দলীল (১)ঋবি হরুর আবু হুরায়ার (রাও) হতে বর্ণিত মারফু হাদিস। ঋবি করীম (সাহ) ইরশাদ করেন-

ইফা আদর্ক রক্ষাতে ফেজ আদর্ক নামায়ের বিশেষ নিয়ে।

অর্থাৎ, তোমরা যখন নামায়ে উপপৃত হও তখন অবশ্যই ধীরেগত অবলম্বন কর।

যতক্ষণ পায় তা আদায় কর, আর যতক্ষণ বাদ পড়েছে এ পূর্ণ কর।

দলীল (৩)ঋবি আবু বায়ো কিভাবে ইমান মাসুদ (রাও) হতে বর্ণিত-

মন আদর্ক নামায়ে ফেজ আদর্ক স্বল্পে।

অর্থাৎ, যে তাশাহুদ পেল, সে নামায়ে পেল।

উপরালিখিত হাদিস দুইতে জমুআ অথবা অন্য কোন নামায়ের বিশেষণ নেই।

এতে বুঝা যায় যে, সালামের পূর্বেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারলে না পাওয়া দুই রাকাত জমুআ নামায় আদায় করলে জমুআ আদায় হয়ে যাবে। চার রাকাত যুহুর পড়তে হবে না।

দলীল (৪)ঋবি হরুর মুআয় ইমান জাভাল (রাও) হতে বর্ণিত-

ি ফেজ আদর্ক রক্ষাতে ফেজ আদর্ক স্বল্পে।

অর্থাৎ, যদি কেউ জমুআ নামায়ে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় শামিল হয়, তাহলে সে জমুআ পেয়ে পেল। (সৃষ্ট এই)

উত্ত হাদিসে স্পষ্টভাবে জমুআর কথা উল্লেখ রয়েছে।

জবাবঃ আহ্মদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবঃ
(1) হানাফীগণ বলেন, তিন ইমাম যে দলিল পেশ করেছেন, তা আমাদের বিপরীত নয়। কেননা আমাদেরও বলি, যে ব্যক্তি এক রাকাত পেল, সে জুমআ পেয়ে যাবে। বাকী কথা হল, এর চেয়ে কম পেলে জুমআ পাওয়া যাবে কিনা, এ ব্যাপারে উক্ত হাদীসে কিছু বলা হয়নি। আর অন্যান্য হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারটি পরিকার হয়ে যায় যে, সালামের পূর্বে ইমামের সাথে শরীক হলো জুমআ পাওয়া যাবে।

(2) এখানে মৃত্যুগত মুহাম্মদ তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর হানাফীদের নিকট ইহা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বাহিক অবস্থার উপর কেউই আমল করে না। কারণ, হাদীসটির বাহিক অর্থ এ কথাই প্রমাণ করে যে, গুরু এক রাকাত নামায় যে পাবে, পূর্ণ নামায় সে পেয়ে যাবে। যার দাবি হল এই যে, দ্বিতীয় রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই। অর্থ এর উপর কেউ আমল করে না।

সুতরাং হাদীসে বর্ণিত ফেরেক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নামায়ের ফরীদত পেয়ে যাবে।

(দুরন্ত তমুদ স ৩:০২-৩ ২০১)

১২১ । দুই ঈদের নামায

বাবু চলো বুলিদিনের সন।

... বলেন তিনি, ঈদের নামায় যে দলিল করেছেন তারা যে তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন তারা যে তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন তারা যে তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন তারা যে তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন

অনুবাদঃ ... আনাস (রাখা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা০ মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, তারা তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন তারা যে তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন दलील के पे श ने तारा ये तादेर उलूम एवं दलिल अनुसारे नामाय रा रे दलिल अनुसारे नामाय পাচ্ছেন তারা যে তাদের উলুম এবং দলিল অনুসারে নামায় পাচ্ছেন

বিশ্লেষণঃ ঈদের নামায সুনাম, মুসলমান নাকি ওয়াজিব- এ নিয়ে ইমামের মাঝে মাতানো রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক, শাফেকী, আহমদ (রহ.) ও সাহেবাইনের মতে, ঈদের নামায সুমতে মুক্তকাদাহ। আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি অভিমতও তাই। (যুক্তির বিষয় জে ১:১৫৯)।

দলীলঃ বেদুঈনদের প্রসিদ্ধ হাদীস -

* ফুল তুলিন লোকের আর কান্নার মুসলিম যে সকল ভুদুরে স্বল্প পাই।

অর্থাং, ... রাসূলুল্লাহ (সাঁ) ইরশাদ করেন, দিবায়িত যেমন পাঁচ ওয়াকি নামায আচার করা ফরয়। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তাছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করিম (সাঁ) বলেনঃ না, তবে যদি তুমি ঐতিহ্যুক্ত (নফল) কিছু আচার কর।

সুতরাং বুধ গেল পাঁচ ওয়াকি নামায ব্যাক্তি সকল নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল (২): ঈদের নামায যেহেতু আচার এবং ইকামত নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈহা ওয়াজিব নয়, বরং সুমত।

* ইমাম আহমদ ইবন হাবল (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামায, জানায়ার নামায়ের মত ফরয় কিফায়াহ।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বানী- ফুল তুলে নয় অর্থাং, অত্যন্ত আপনার পালনকর্তার উদেশ্য নামায পড়ে এবং কুববানী করন। (কাওসারী ২)

উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা ওয়াজিব (ফরয়) প্রমাণিত হয়। আর বেদুঈনদের প্রসিদ্ধ হাদীসটির দ্বারা নফল প্রমাণিত হয়। সুতরাং দুই অবস্থার মাঝখানে ফরয় কিফায়াহ বিধান নির্ধারণ করাই সমীচীন। (তনুজ ১:৩২ (৪৭৩)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, ঈদের নামায ওয়াজিব এবং এর উপরই ফাতওয়া। (সুফতে তুলিন ২:৪২ (৪২৩)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বানী- ফুল তুলে নয় অর্থাং অপনি ঈদের নামায আচার।

(যুক্তির বিষয় জে ১:৩৬, হোর ইমাম ৩:২৮৪)

সুতরাং উক্ত আয়াতে যেহেতু ঈদের নামায়ের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই ঈহা ওয়াজিব।

দলীল (২): মুক্তাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হে, নবী করিম (সাঁ) ঈদের নামায নিরবচিন্তিত স্বপ্নে সম্পন্ন করেছেন, কখনো তরক করেননি। যেমন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত-
দু মস্তিসল ফিতরে ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে বেরিয়ে আসতেন, সেখানে লোকজনদের নিয়ে নামায় পড়তেন।

দলীল (৩) বাবাজিয়া কিরামের যুগ থেকে আজ অবধি এর উপর আমল অব্যাহত থাকাও ঈদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল।

দলীল (৪) আল্লাহ তাআলার বাবী - ও রাসূল ঈদুল ফিতর, তোমাদের হেদায়ত দান করার কারণে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। (বাকারাঁ ১৮৫) কবিয়া আলেম বলেন, উক্ত আয়াতটি ঈদুল ফিতরের নামায়ের প্রত্যাশায় করে।

কেননা, এই আয়াতটি রোযার আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। আর আযায়ে যেহেতু নির্দেশের (আমর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামায় ওয়াজিব। সূরা হজ্জে ৩৬ অং আযাতেও এর ইঙ্গিত রয়েছে যে ধরায় ঈদুল আযহার নামায় ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ মেলে। (দৃস তৌরের জে ২০০) জবাবঃ বেদুঈনের হাদিসের জবাবে আহানাফেন বলেন-

(১) উক্ত হাদিসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যখন ঈদের হুকুম নামিল হয়নি।
(২) অথবা, হাদিসে ওয়াহাইতু সুনের্দিষ্ট পাঁচ ওয়াহাই ফরমসুমূহ বর্ণনা করাই উদেশ্য ছিল। আর ঈদের নামায় তা ফরম নয়; বরং ওয়াজিব।
(৩) অথবা, কেন বিষয় অনুশোচনের দ্বারা ঈদ ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয না।
(৪) বেদুঈনের উপর তা ঈদের নামায় ওয়াজিব নয়, তাই তা উল্লেখ করা হয়নি।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আযান এবং ইকামত ঘুষ ফরম ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর দুই ঈদের নামায় ফরম নয়, বরং ওয়াজিব।

ঈমাম আহমদ (রহ)-এর দলীলের জবাবঃ তাঁর প্রদত্ত নিজের অভিমত বিলক্ষণ অগ্রহুযগ্য। কারণ, ঈদ প্রাক্তান্ত দলীলের বিপরীত। কেননা, যে বিষয়টি দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, তা কিভাবে ফরমে কিফায়াত সাব্যস্ত হতে পারে? (তন্মম ২০৭)
বাবু তাকিবির ফি ইহুদীন ইসলাম এর নামায় অধ্যায় ২৬৭

২৬৭ নামায় অধ্যায় ।

বাবু তাকিবির ফি ইহুদীন ইসলাম এর নামায় অধ্যায় ২৬৭

বিশ্লেষণ: উভয় ইদে অতিরিক্ত তাকিবার কয়টি বলা হবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক রয়েছে।

* ইমাম মালিক, আহমদ ইবন হামিল (রহ.)-এর মতে, উভয় ইদেই অতিরিক্ত তাকিবার হল ১১টি। ৬ তাকিবার প্রথম রাকাতে। (তাকিবারে তাহরিমা ব্যতীত) অপর ৫টি তাকিবার দ্বিতীয় রাকাতে।

* ইমাম শাফেইছ (রহ.)-এর মতে, উভয় ইদেই অতিরিক্ত তাকিবার হচ্ছে ১২টি। ৭টি প্রথম রাকাতে (তাকিবারে তাহরিমা ব্যতীত) আর ৫টি দ্বিতীয় রাকাতে।

তবে মালিকী এবং শাফেইছগণ এ কথার উপর একমত যে, উভয় রাকাতেই তাকিবারগুলো হবে কেরাতের পূর্বে। উভয় ইমামদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শাফেইছগণ তাকিবারে তাহরিমা ব্যতীতই সাতটি তাকিবারের দাবিদার। আর মালিকীগণ তাকিবারে তাহরিমাসহ সাতটি তাকিবারের দাবিদার।

উমর ইবন আবদুল আরিয়া, যুহরী (রহ.), আশিরা, আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবন সাবেত, আবু আইউব ও আলী (রাছ.)-এর অভিমতও তাই। (বদল মহদুদ ২০৫ সং ১২)

দলীল (১): অন্ত্রের শরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২): সালে বলা নিশ্চিত নন, আল্লাহ তার সুবিধায় জুমেরি নক্সি হয়ে হাদিস।

পৃষ্ঠ নং ১৬০/১}
দলীল

... উন্নত হইলে নিঃসন্দেহই নিঃসন্দেহই নিঃসন্দেহই নিঃসন্দেহই নিঃসন্দেহই।

ওয়ালিমাল করেন যিনি ইবনে তেহরানী যিনি ইবনে তেহরানী যিনি ইবনে তেহরানী যিনি ইবনে তেহরানী।

অর্থাৎ, ... সাইদ ইব্নুল আস রাও হতে বর্ণিত। তিনি আবু মুসা আল আশায়ি (রাও) কে এবং হওয়াকান ইব্নুল ইয়ামান (রাও) কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযাহর তাকুবীর করতে আদায় করতেন? আবু মুসা (রাও) বলেন, তিনি জানায় নামায়ন যায় চার তাকুবীর আদায় করতেন।

(অর্থাৎ তিনি জানায় নামায়ন অনুরূপ ঈদের নামায়নেও প্রতিস্থাপিত রাকাতে চারটি তাকুবীর বলতেন এবং তা তাহরীমা ও রূকরু তাকুবীর সহ)। হওয়াকান (রাও) বলেন, আবু মুসা আল-আশায়ি (রাও) সত্য বললেন। তিনি বললেন, আমি সরাসরি আমির থাকাকালে এইরূপ তাকুবীর দিয়েছি।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের অতিরিক্ত তাকুবীর ছয়টি। তিনটি তাকুবীর প্রথম রাকাতে করার পূর্বে এবং অপর তিনটি তাকুবীর দ্বিতীয় রাকাতে করার পরে। আর উপরন্তু ইব্নুল আস রাও-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মুসা (রাও)-এর কথাকে সত্যায়নের উল্লেখ রয়েছে।
দলীল (২) তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে–

"দেখি, আপনারা যেমন অস্থির, তেমনি আমার অস্থির, যদি কেউ আমার উপর আক্রমণ করেন, তবে আমি আমার উপর আক্রমণ করব। অতএব আমি আসছি আস্তানা থেকে আমার উপর আক্রমণ করব। আমি অস্থির হবো।"

ওপরের ব্যাখ্যা নিলে, কিস্মি ইবন আস্তান রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা)–এর কতক সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ঈদের নাম্বার পড়তেন, তাতে তিনি চার চারটি করে তাকাবীর বললেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা যে না (ঈদের নাম্বারের তাকাবীর হল) জানায় তাকাবীরের নয়। (এই বলে) তিনি তাঁর আস্তানের দ্বারা ঈশ্বরা বললেন এবং বৃদ্ধি হয়ে নিলেন।

২৬৯ হাদিসে নবী করিম (সা) কথা ও কর্মের দ্বারা ঈশ্বরা বললেন যে, ঈদের তাকাবীর তাকাবীরে তাহরিয়াম এবং রুকুর তাকাবীর সহ প্রতি রাখাতে চারটি করে। সুতরাং অতিরিক্ত তাকাবীর হল মোট ৬টি।

দলীল (৩) হযরত উমর (রা)–এর সময় দুই ঈদে অতিরিক্ত ৬টি করে তাকাবীর হওয়ার ব্যাপারে ঈমাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (শরহ মুনাফি আনার ১ সংখ্যা ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

জবাব (১) শাফেকে ও অন্যান্য মন্ত্রিবৃদ্ধ তাঁদের পক্ষে যেসব হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সেগুলো যাচাই করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এগুলোকে যসীফ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এগুলোতে কতক রেওয়াজ ও রাবী এমন রয়েছে যারা খুবই যসীফ। যেমন সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম হাদিসে ইবন লাহীআ, দ্বিতীয় হাদিসে আশুল্লাহ ইবন আস্তান রহমান এবং তৃতীয় হাদিসে কাসির ইবন আশুল্লাহ নামক রাবী রয়েছে। যাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ অভাবনীয় নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। যেমন তাদের করার সম্পর্কে ব্যাখ্যা ইমাম শাফেক (রহ) বলেন, “মিথ্যার একটি স্তুপ”। আবূ দাউদ (রহ) বলেন, “বড় মিথ্যাকুল”। নাসায়ি ও দারা কুতিনী (রহ) বলেন, “তার (কাসির ইবন আশুল্লাহ) হাদিস বজ্ঞানী। আহমদ (রহ) বলেন, “তার হাদিস মুনকার।” ইবন মাশীখ (রহ) বলেন, “তিনি (আশুল্লাহ ইবন আস্তান রহমান) যসীফ। নাসায়ি (রহ) বলেন, “তিনি মজবুত রাবী নন”। এমনিভাবে ইবন লাহীআ–এ সম্পর্কে এরূপ অনেক নেতিবাচক মন্তব্য রয়েছে। তাই এসকল হাদিস দলীলযোগ্য নয়।

(সন্দেহের উল্লেখ জুন বারেশ জুন ২৮৫, মুহাররফ সুলতান ৪ জুন, মুসা মসনিদ ৪ জুন)
(২) হযরত উমর (রাজ)-এর সময় এর বিপরীত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘোর এ সকল হাদীস রহিত হয়ে যায়। প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লামা ইবন রুশ্দ ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’–এ লিখেছেন যে, ঈদের তাকবীর সংখ্যার ব্যাপারে কোন মারফত হাদীস বিশেষকরে প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে তিনি ইমাম আহমদ ইবন হামদ (রহ.)-এর উক্তিটি বর্ণনা করেছেন।

লিস যা রোই যখন নাবিক সুলিয়াল উল্লেখ এবং সূরা ইলিশেন হাদিসের সময়ের ধারার চৌহাঁ (২:১১৭–২:১১৮)

অর্থাং, নবী করিম (সাহ) থেকে দুই ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কোন সীহী হাদীস বর্ণিত নেই।

যার ফলে বিভিন্ন সাহাবাদের বিভিন্ন আলমের কারণে এরকম মতান্তোকা দেখা

যাওয়া যে, নামায সরবরাহ আদায় হবে যায়। কেননা, এই

মতান্তোকটি উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে। তাই ফুকাহায়ে কিয়াম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, যদি

ইমাম ৬-১৩ পর্যন্ত তাকবীর বলেন, তাহলে তা অনুসরণ করা মুক্তানীর উপর

আবশ্যক হবে। বরং কারা কারে মতে ১৬ তাকবীর পর্যন্ত অনুসরণের অবকাশ

রয়েছে। তবে এর বেশি অনুসরণ করা যাবে না। (ফতুহ আর্জর ১:৫৮) (৪)

প্পব্ব উলসলুয়া যব্ব উলসলুয়া উল মুখিদ উল মুখিদ উল মুখিদ উল মুখিদ উল মুখিদ

ঈদের নামায়ের পর অন্য নামায

... উনেন ইবন ইব্বাস কৌল জরিয় রসূল উলসলুয়া উল মুখিদ উল মুখিদ উল মুখিদ উল মুখিদ

ক্রমে তিনি দুটি পরবর্তী ও পরবর্তী ও পরবর্তী ও পরবর্তী ও পরবর্তী

ফাজিলের মুহা তোলী হঝুত হস্ত প্রিয় হানাহ হানাহ হানাহ হানাহ (খাইর জ ১:১৩ বাব উলসলুয়া বল উল

এবং ইসলাম, সলাম জ ১:৩৯ ফলে উলসলুয়া বল উল

ঈদের নামায ও বাব উলসলুয়া বল উল

অনুযায়: ... ইবন ইব্বাস (রাজ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল রহ (সাহ) ঈদুল

ফিতরের নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়ে দুই রাকত ঈদের নামায আদায়

করেছে। তিনি তার আগে বা পরে কোন নামায আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি

বিকাদ (রাজ)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদের কে দান-খযরতের

নিদেশ দেন। মহিলাগণ তাদের কানের দুল ও গলার হার দান-খযরত করেন।
বিশেষণঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, উভয় নামায়ের পূর্বে ও পরে কোন সুন্নত নামায নেই। তবে ঈদের পূর্বে এবং পরে নফল নামায পড়া জারি কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যা সাহাবায়ে ফিরামের যুগ থেকে চলে আসছে:

* ইমাম আহমদ, যুহরী ও ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরে নফল নামায পড়া সাধারণত মার্করহ। (مَعَارِفُ الْسَنَّةِ ج٤ ص٤٤)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের সুরুতে বর্ণিত হদীস।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরে ঈদগাহে নফল নামায পড়া সাধারণভাবে মার্করহ।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, ঈদের পূর্বে ও পরেও নফল নামায পড়া সাধারণভাবে জারে। অবশ্য তিনি ইমামের ক্ষেত্রে মার্করহ হওয়ার প্রবন্ধ।

(مَعَارِفُ الْسَنَّةِ ج٤ ص٤٤)

* হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, ঈদের নামাযের পরে মার্করহ, কিন্তু পূর্বে নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওয়াঈ (রহ.) ও অন্যান্য
কুফারাজীর মতে, ঈদের পূর্বে মার্করহ, পরে নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)
এক্ষেত্রে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেন, ঈদের পরে নিজ গৃহে মার্করহ নয়, ঈদগাহে
মার্করহ। (قَفْحُ الْعَلَّمِ ج٢ ص٤٣٣, বদলা অি মোহম্মদ জ২ ص٨١)

দলীল (١) হযরত ইবু সাইদ খুদীর (রাও)-এর রেওয়ায়েত,

কান রসোলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم لا يُصْلِيُ قِبْلَ الْعَيْبِ شَيْءًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى

مزْلِه صلى الله عليه وسلم- (ابن ماجه ص١٦٢)

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (সাহ) ঈদের পূর্বে কোন নামায আদায় করতেন না। তবে ঘরে
প্রত্যাবর্তনের পর দুর্রাকাত নামায আদায় করতেন।

দলীল (٢) হযরত ইবন মাসউদ (রাও)-এর আমল বর্ণিত আছে:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ اِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعَيْبِ صلى الله عليه وسلم- (مَصْنُوف ابن ابي شيبة ج٢ ص١٧٠)

অর্থাৎ, আবুপুল্লাহ যখন ঈদের দিন প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তাঁর ঘরে চার রাকাত
আদায় করতেন।

দলীল (٣) আবু মাসউদ (রাও)-এর আহার-

ليس من السَّلِّةِ الصلأة قبَلَ خَروجِ الَّامامِ يَوْمَ الْعَيْبِ – (مَجْمَعُ الزِّكَائَةِ ج٢ ص٢٠২)

অর্থাৎ, ঈদের দিন ইমামের বের হওয়ার পূর্বে কোন সুন্নত নেই।
জবাবঃ যে সকল রেওয়ায়েতে ঈদের পূর্বে নামায় পড়া নিষেধ বর্তিত আছে, সেগুলো তো হানাফী ও অন্যান্যদের বিপরীত নয়। কেননা তাঁরাও বলেন যে, ঈদের নামায়ের পূর্বে নামায় নিষেধ। কিন্তু যে সকল রেওয়ায়েতে ঈদের পরে নামায় পড়তে নিষেধ করা হয়েছে তার বায়খা হল, ঈদের পরে ঈদগাহে যেন নামায় না পড়ে। আর এটাই হানাফীদের আভিযুক্ত।

* আর শাফেইঈ ও হাসান বসরী (রহ.) কিয়াস ও মাওকুফ হাদিসের উপর ভিত্তি করে যে মত দিয়েছেন তা মারফু হাদিসের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

(মুরভ আল-সুনন ৪ সুন ৪৪৪, তন্তম জ ১ সং ৪৭৩)

বাব মতে হয়েছে মসাফর সং ১৭০

মসাফির কখন নামায় কসর পড়বে

কিন্তু ন মল্লাতী বলেছি তালিকাও গলিত সালতী ও নামায় সালতী প্রস্তুত উল্লেখ করাতো অন্যদের সালতী তো নামায় উল্লেখ করা।

অনুবাদঃ ... ইয়াহেয়া ইবন ইয়াহিয়া আল-হানানী (রহ.) হতে বর্তিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রাঃ) কে সফরের সময় নামায় কসর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ তিনি মাইল অথচ তিন কাফবায় দূৰত অতিক্রম করেন, তখন তিনি চার রাকাত ফরয নামায়ের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়তেন।

বাব মতে হয়েছে মসাফর সং ১৭০

কিন্তু ন মল্লাতী বলেছি তালিকাও গলিত সালতী ও নামায় সালতী প্রস্তুত উল্লেখ করাতো অন্যদের সালতী তো নামায় উল্লেখ করা।

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্তিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে (সফরে রওয়ানা হয়ে) মদীনাতে চার রাকাত যুহরের নামায আদায় করেছি এবং যুহ-খুল্লানাফাতে গিয়ে আসের নামায দুই রাকাত আদায় করি।

বিশেষত কত্তুকু রাখা অতিক্রম করলে কসর (চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত) পড়া জায়েছে হবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্যর রয়েছে।
* কতক আহলে যাহিরের মতে, সফরের জন্য নিদিষ্ট কোন দূরত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন নেই, বরং সাধারণ সফরের কর করা জায়ে। তবে, ইবন হাযিম সাধারণ সফরকে এক মাইল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (মানকে সন 4:47)
* কোন কোন আহলে যাহিরের মতে, কসর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ওহু তিন মাইল পরিমাণ পথ অতিক্রম করাই যথেষ্ট। (ফতুহ বায়েজিদ 2:477)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত উভয় হাদিস। উল্লেখ যে, দ্বিতীয় হাদিসের মদ্দা ও যুল-হুলায়ফার কথা বর্ণিত আছে। আর যুল-হুলায়ফা মদ্দা থেকে তিন মাইলের বায়ধান।

সুতরাং উভয় হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিন মাইলের দূরত্বের ব্যবধানে কসর করা যাবে। (নব্বার মহোদ 2:31)

* ইমাম মালিক, শাফেইঈ ও আহমদ ইবন হায়বল (রহ.)-এর মতে, ১৬ ফরসখের ব্যবধানে নামায় কসর করা যাবে। উল্লেখ যে, এক ফরসখ=৩মাইল। সুতরাং ১৬ ফরসখ=৩৮১৬=৪৮ মাইল। মোট কথা হল, শরী ৪৮ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে নামায় কসর করা হবে। (মানকে সন 4:139)
* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, কমপক্ষে তিন মনদিলের সফর কসর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হয়। আর একদিন একরাতের দূরত্বকে এক মনদিল বলে। আর একদিন একরাতে সাধারণভাবে চলে ১৬ মাইল অতিক্রম করা যায়। এ হিসেবে ৩ দিনে (৩১৬=) ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে তার উপর কসর ওয়াজিব হবে। আর এরই ভিত্তিতে বলা যায় যে, চার ইমামের মাঝে এক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা ওহু শব্দগত, দূরত্ব নির্দেশের ক্ষেত্রে নয়। (ফতুহ বায়েজিদ 2:478)

চার ইমামের দলীলঃ

* উন্নত সাহিদ কাল রসূল আল্লাহ ৰচন লেখান হয় (১)
* জুলুম না যিহী না তোমাতে তোমাদের নামায় বলে ইব্বিয়ুম আল্লাহ বালী বঅসাকার ফুক তৰ এয়াম ফজাদদ ।
* না ঘোরা ও তুহো ও যুঁ বালিনু ও বালিনু ও জচির বালিনু ও বালিনু ও জচির বালিনু ও (তুরবু পুরাট ১:৪৪)

পাপ বিস্মৃতিতে ভীর মুখ, ফরাশী জে ১৪৭, (১) পাপ বিস্মৃতিতে ভীর মুখ, ফরাশী জে ১৪৭, (১) বালীনু ও বালীনু ও জচির বালীনু ও বালীনু ও জচির বালীনু ও বালীনু ও (তুরবু পুরাট ১:৪৪)

অর্থাৎ, ... আবু সাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাসা) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আল্লাহর দিনের প্রতি ইমাম রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বিধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মুহরিম ব্যক্তি না থাকে।
বাবু জম্মু বিন আলুতোতিন স ১৭ ০

dুই ওয়াকেরের নামায় একত্র করা

... বন্ধু মায়ের আহবানে তিনি মূল ফরসফর করার ইচ্ছায় বের হন। আর পাঠাজুড়ে যুল-হুলাফ ফুল ফরসফরের শেষ মন্থন ছিল না, বরং তা ছিল ফরসফরের পাঠাজুড়ে অবস্থিত একটি হুলাবির কর্তৃপক্ষ এই জুরী নয় যে, ফরসফর দূরবর্তী হল তিন মাইল। কারণ বিশ্বায় আবাসানু থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই কোন শুধু হয়ে যায়। যদিও তা এক মাইল হোক না কেন। সুতরাং উক্ত হাদিসটি দ্বারা দলিল দেয়া সহিহ নয়।
নামায অধ্যায়

দখল তুম হ্রদ্ধ ফসিলি মুছ বিশেষ গুণ বৈষ্ণবে আছে [سَبِّلِي ۱ ص ٣٤٦ باب جواز الجمع بين
صلواتين في السفر، ترمذي ج ۱ ص ۱۲۴ باب الجمع بين الصلاتين، ابن ماجه ص ۶۷]

অনুবাদঃ ... মুয়াতী ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুরের যুদ্ধের
সময় তারা রাসূলুল্লাহ (ص.fast) এর সাথে সফরে বের হলে তিনি তখন যুহুর ও
আসরের নামায একত্রে এবং মার্গরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।
একদিন তিনি যুহুরের নামায বিলুপ্ত করে যুহুর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন।
অতঃপর তিনি মার্গরিব ও এশাএকত্রে আদায় করেন।

বিশেষণঃ দুই ওয়াকের নামায একত্রে পড়া জায়ে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের
মাঝে মতানৈকে রয়েছে। উল্লেখ যে, একত্র করা দুই প্রকার।

(বাক্তকে একত্র করা)

(বাহিক অর্থে একত্র করা)

(জীব হল, দুই নামাযকে একে ওয়াকে আদায় করা। যেমন, যুহুর ও
আসরকে অথবা মার্গরিব ও এশাকে কোন এক ওয়াকে একসাথে আদায় করা।

(জীব হল, দুই নামাযের মধ্য থেকে একটিকে তার শেষ সময়ে এবং
দ্বিতীয়টিকে তার প্রথম সময়ে আদায় করা। যেমন, যুহুরকে দেরি করে একবারে
যুহুরের শেষ সময়ে আদায় করা এবং আসরকে একবারে আওয়াল ওয়াকে আদায়
করা। এমনিভাবে মার্গরিবকে দেরি করে একবারে শেষ ওয়াকে আদায় করা এবং
এশাকে আওয়াল ওয়াকে আদায় করা।

(নৃতম জ ۱ ص ٤٤۷)

এই দুই প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার তথা জীব সরবসমাতিক্রমে জায়ে
আছে। কেননা, এমতাবস্থায় প্রত্যেক নামায নিজ নিজ সময়ে আদায় হচ্ছে, যদিও
একটু পূর্বাপর করা হচ্ছে। কিন্তু প্রথম প্রকার তথা জীব জায়ে কিনা, এ
নিয়ে তিন ইমামের মাঝে মতানৈকে রয়েছে।

* ইমামমণির মতে, ওয়র অবস্থায় জীব জায়ে আছে। তবে ওয়রের
ব্যাখ্যা তাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাহফেঝ (রহ.)-এর
নিকট সফর এবং বৃদ্ধিপত্ত ওয়র। ইমাম আহমদ ইবন হায়ল (রহ.)-এর নিকট
অসুস্থতাও একটি ওয়র।

দলীল (۱) অনুবাদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস।

دلال (۲) عَنِ ابن عَبَّاس قَالَ جَعَفَر رَسُول اللّهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِيَّنَ ۸
দলীল (৪) অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে-

... হতো গাভ শফেক এবং তিনি নিদ্রাতে নাশু নাশু লোকের মুখে শুনে তিনি জীবন উদ্দেশ্যে বের হলে যুহুরের নামায় আর বাহিন্য সকলে স্বর্ণ পথ কামকালে চলে পড়ার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে যুহুরের নামায আদেশের পর বাহনে সওয়ার হতেন।

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-

إن السلمة كانت على المؤمنين كناباً موثوقًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয় করা হয়েছে নিদ্িষ্ট সময়ের মধ্যে।

নিসাই ১০৪

নামায শুরু করার সময় যেমন নির্দিষ্ট রয়েছে, ঠিক তেমনি এর শেষ সময়ও নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং নামায সময়ের আগেও অবাধ করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের
পরেও পড়া যাবে না। সময় যেহেতু নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাই সুনির্দিষ্ট সময়ই তা আদায় করতে হবে।

দলীল (২) পবিত্র কুরআনের আযাত -

অর্থাৎ, অতএব দুর্লভ সেসব নামায়র, যারা তাদের নামায় সমুচ্ছে বেছেন। (মাওনঃ ৪, ৫) যদিও উক্ত আযাতবাদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু যারা নামারের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং নামারকে যারা যথাসময়ে আদায় করে না, তারাও উক্ত আযাতের অন্তর্ভুক্ত।

দলীল (৩) আল্লাহ তাআলার বাণী -

অর্থাৎ, সমস্ত নামারের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামারের ব্যাপারে।

(বাকারাঃ ২৩৮) উক্ত আযাতে সুনির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

দলীল (৪) যাহত আল্লাহ ইবন মসুদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন -

মাত্র রাসূল সালাম অন্য সালাম নেই এই সালাম, এই সালাম থেকে আমাদের দেশ বাস্তবিক।

(১) ঐ সকল রেওয়ায়েত যেখানে নবী করিম (সাহ) থেকে দুই ওয়াজকের নামায একত্রে আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা সকল গুম উদ্দেশ্য নয় বরং জুম হলো উদ্দেশ্য। এর বিভিন্ন দলীলও রয়েছে।

জেনান -

... আল্লাহ তাআলার দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে, যারা নামায় সময় সুনির্দিষ্ট। সুতরাং সময়ের বাইরে নামায শরীয়তসম্মত নয়।

জেবাহঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলসমূহের জ্যাবুরা হামাছীগণ বলেন,

(১) ঐ সকলের বেছেন নবী করিম (সাহ) থেকে দুই ওয়াজকের নামায একত্রে আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা সকল গুম উদ্দেশ্য নয় বরং জুম হলো উদ্দেশ্য। এর বিভিন্ন দলীলও রয়েছে।

...
আহমদুল হাদিস

অর্থাৎ, ... আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াকিদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন উমর (রাঃ)-এর মুখায়িন নামাযের সময় আস-সালাত (নামায) শহর উচ্চারণ পূর্বক তাঁকে ডাকলে তিনি বললেন, চল, চল। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্তন বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এপরে সামায় অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি এশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন জমানী কাজে বন্ধ থাকলে এক্ষণে করতেন, যেমন আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিনি দিনের রাতে অতিক্রম করেন। (অর্থাৎ, তিনি তড়িষড়ি পথ অতিক্রম করেন)

উক্ত হাদিস দ্বারা জুম চরো প্রমাণিত হয়। আর এমন উদাহরণ হাদিসের কিতাবসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

(২) জুম হফিক (র)

জুম চরো অর্থ নিলে অনেক হাদিসকেই পরিত্যাগ করতে হয়। আর জুম চরো অর্থ নিলে সকল হাদিসের উপর আমল করা সম্ভব হয়।

(৩) যে সকল হাদিসে দুই ওয়াকের নামায একচে পড়া উল্লেখ রয়েছে, যে সকল প্রতিক হাদিসেই যুহরের সাথে আসরের কিংবা মাগরিবের সাথে এশার কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, একটি দ্বারা জুম চরো ই-উদেশ্য। কেননা অন্যান্য ওয়াকে একটি করা সম্ভব নয়।

(৪) হানাফীদের যে সকল দলীল রয়েছে, তা সবই পরিত কুরআনের আয়াত ও মারফু হাদিস। খরবে ওয়াহিদের দ্বারা এগুলোর মুকাবলা করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ উল্লেখ যে, উক্ত হাদিসে 'শাফাক' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর 'শাফাক'-এর দুটি অর্থ রয়েছে-

- উক্ত হাদিসের লালিমা।
- পশ্চিমাকাশের লালিমা।

এই অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পুনর্বাহ দুর্দশতা। আর হযরত উমর (রাঃ) জুম চরো করতে গিয়ে মাগরিবের নামায লালিমা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শুভ পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। আর হানাফীদের মতে, শুভ পর্যন্ত মাগরিবের শেষ ওয়াকে থাকে। সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা জুম হফিক (র) উদাহরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর হানাফীদের এই অভিমতটির পুরোপুরি সামগ্রিক পাওয়া যায় ইতিপূর্বে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবন ওয়াকিদের বর্ণিত হাদিসে।

(নীমত ১:৪৯৫)
ব্যাখ্যাতাহের আয়োজন ও নফল নামায়

সফরে সুন্নত ও নফল নামায়

... অনেক ব্যক্তির মুখ সাধিত হয়েছিল অনেক উমরের বয়সের কাছ থেকে প্রেম থাকে যাহা রক্তক্রিয়া দেয় তারা প্রতিভার মনে বলেন আর কেমন স্থলে সুন্নত রূপে মুক্ত করা হলে তারা মুক্ত হয় এবং সুন্নত নামায় মুক্ত হয়।

(বখারী ১ সংখ্যা ১৪৯ পাট যেমন নেই এই প্রবন্ধ এখানে উল্লেখ করা হয় নি)
পড়ে নিবে, যদি সুযোগ না হয় তাহলে পড়া জরুরী নয়। তবে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। কেননা স্বয়ং নবী করিম (সা) এর পক্ষ থেকে সফর অবস্থায়ও ফজরের সুন্নত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

* আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। এ ব্যাপারে নবী করিম (সা) বলেন-

"লা تَذْعَوْهُمَا وَأَنْ تَرَدَّنَّكُمْ الْخَيْلَ"—(আবু দাউদ জ. ১৩৯ বাব। ১৭৯ পাঠে।)

অর্থাৎ, ফজরের সুন্নত তাকে করবে না, যদিও তোমারকে যোগ্য হিসেবে নিক।

উল্লেখ যে, যোগ্য হিসেবে অধিকাংশ সময় সফরে হয়ে থাকে, অন্যান্য নয়।

আল্লামা নবী (রহ) বলেন, “উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, সফর অবস্থায় সাধারণ নফল তথা ইশরাক, চাষত, আওয়াবীন এবং তাহাজুদের অন্যান্য নফল নামায পড়া জরুরী। কিন্তু সুন্নতে মুহাকাদার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবন উমর (রা) প্রমুখ এর সুন্নতে মুহাকাদা ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতী। আর ইমাম শাফেইত (রহ) এবং জমহুরের অভিমত হল, সুন্নতে মুহাকাদা আদায় করা যুক্তাহবায।

আর এ ব্যাপারে হানাফীগণ বলেন, যদি সুযোগ হয় তাহলে সুন্নতে মুহাকাদা আদায় করার মধ্যে ফরিদত রয়েছে। তবে তরক করা তাকে অসুবিধা নেই। কারণ সফর অবস্থায় এগুলোর তাকিদ আনেকখানি কমে যায়।

(ালুআল সন ৬৭ ২৮৯ পাঠে।)

ব্যাপারে মতী যিনি মসাফর হন ১৭২

মসাফির কখন পুরো নামায আদায় করবে?

... উন্নত বন্ধ মালক রাখতে নাপুন সূলার সুলার নামায উপলব্ধি ও নাপুন মনে মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ফেলান। যিনি স্থানীয় রূপে রূপান্তর করতেন। তিনি তাদের দুইন হিসেবে চলে গেলেন আর তাদের ছাড়া দুইন হিসেবে চলে গেলেন।

(ব্যারাজ J ১৪৭ পাঠে, ফরমাডে J ১৩২ পাঠে।)
সার্দ ইবন যুবাইর (রাঃ) বলেন, তুমি যখন তোমার পা অন্য কোন কোনো জমিতে রাখ, তখন নামায পূর্ণ কর। (م kaufen السن ج ۴ ص ۲۴۷)

* ইমাম আওয়াসি (রহ.-)এর মতে, ১২ দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (مصفف عبد العزيز ج ۴ ص ۲۳۲)

* ইমাম ইসহাক (রহ.-)এর মতে, ১৯ দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (ترمذي ج ۱ ص ۱۲۳)

* হযরত হাসান বসরী (রহ.-)এর মতে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ব্যক্তি ওয়াতের আসলী তথা মূল আবাসস্থল ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি কসর করতে পারবে। চাই অন্যান্য জায়গায় যত দীর্ঘ সময়ই অবস্থান করক না কেন। (طحاوي ج ۱ ص ۲۴۰)

* ইমাম আহমদ ও ডাঊদ যাহেরী (রহ.-)এর মতে, চার দিনের অতিরিক্ত অবস্থানের নিয়ত করার দ্বারা কসর বাতিল হয়ে যাবে। (فتح العلم ج ۴ ص ۲۴۴)

দলীলঃ নবী করিম (সা) যেহেতু মকায় চারগুলি পর্যন্ত সফর অবস্থায় হজ্জ পালন করেছেন, এতে বুঝা যায় যে, চারগুলি (২০ ওয়াজু নামায) পর্যন্ত কসর করা যায়। এর অধিক নয়।

* ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রহ.-)এর মতে এবং আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.-)এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার দিনের অবস্থানের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। (م kaufen السن ج ۴ ص ۲۴۷)
দলীলঃ সাইদ ইবন মুসায়িবের আহার। তিনি বলেন—

ইদা قَامَ أَرْبَعَ صَلَّى أَرْبَعًا— (ترمذي ج 142-123)

অর্থাৎ যখন চারদিন অবস্থান করবে, তখন (কসর না করে) চার রাকত নামায পড়বে।

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাউদী (রহ.)-এর মতে, পনের দিন ইকামতের নিয়ত করলে কসর বাতিল হয়ে যাবে। আর ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করলে কসর আদায় করবে।

(بديل المجهر ج 2 ص 242)

দলীলঃ আব্দুল্লাহ ইবন উমর (رَاح) এর আহার। তিনি বলেন—

إِذَا كُنْتُ مُسَافِرًا فَوَظَنْتُ نَفْسِي عَلَىٰ إِقَامَةٍ خَمسَةِ عُشْرَةِ يُومًا فَآتِمْ الْصَّلْوَةِ وَإِنْ

কন্তে না ত্যাগ করে ঝাঁপ দিয়ে অর্থাৎ, যখন তুমি মুসাফির হও এবং ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত কর, তাহলে নামায পূর্বাংক আদায় কর। আর যদি এ সম্পর্কে তোমার জানা না থাকে তাহলে নামায কসর কর।

জবাবঃ ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ প্রদত্ত দলীলটি খুবই দুর্বল।

কেননা, উক্ত দলীলে শুধু চারদিনের অবস্থা জানা যায়। যেহেতু তিনি চারদিন ছিলেন। কিন্তু চারদিনের বেশি অবস্থান করলে এর হুকুম কি হবে, তা জানা যায়নি।

অথচ অন্য হাদিসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

শাফেই ও মালিকিগণের দলীলের জবাবঃ সাইদ ইবন মুসায়িব (রহ.)-এর পক্ষ থেকেই হানাফীদের অনুকূলে আছার বর্ণিত আছে। তিনি বলেন—

إِذَا قُدِّمْتُ بَلَدًا فَآتِمْتُ خَمْسَةِ عُشْرَةِ يُومًا فَآتِمْ الْصَّلْوَةِ— (آثار السن 407)

অর্থাৎ, যখন তুমি কোন শহরে এসে সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করবে, তখন তুমি নামায পূর্বাংক আদায় করবে।

সুতরাং সাইদ ইবন মুসায়িব-এর আহারদৈর্ঘ্যে অসামঞ্জস্য (নির্ভঙ্গ) দেখা যাচ্ছে। আর নিয়ম হল, অর্থাৎ যখন দুই রোয়ায়েত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন উভয়টি পরিত্যাজ্য হবে। আর এই ভিত্তিতে যদি উভয়টি পরিত্যাজ্য হয়, তবে আব্দুল্লাহ ইবন উমর (رَاح) এর আহারের দ্বারা হানাফীদের অভিমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ যে, হাদিসের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন রোয়ায়েতের ১৭ দিনের কথা, কোনটিতে ১৮ দিনের, কোনটিতে ১৯ দিনের,
কনোটিতে ২০ দিনের এবং কনোটিতে ১৫ দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। একেবারে হানাফী গণ অধিক সতর্কতাবর্ধন সরবরাহে কম ১৫ দিনকে সাব্যস্ত করেছেন।

(নতুনশালা পাত্র ১২৪ পৃ.

ইসহাক (রহ.)-এর অভিমতের জবাবে যত রেওয়াযতে ১৫ দিনের চেয়ে বেশি সময়ের কথা উল্লেখ রয়েছে, এগুলো ঐ অবস্থার হিসেবে বিবেচিত হবে, যখন নিদর্শ সময়ের জন্য বসবাসের নিমিত্তেই অবস্থানের নিয়ত করা হয়নি। যার প্রভূত হানাফীগণও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনার কসরের নামায আমিরদ (আব্দিক), নাকি রূকসত (এছুকি)
এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সফরের দরুন দুই ও তিন রাকত (ফজর, মাগরিব)
বিশিষ্ট নামাযে (এবং সুধু নামাযে) কোন কসর নেই এবং এ ব্যাপারেও সবাই
একমত যে, সফরের কারণে চার রাকত বিশিষ্ট নামায় কসর অবস্থায় দুই রাকত
পড়তে হয়। কিন্তু এই কসর আমিরদ (আব্দিক), নাকি রূকসত (এছুকি), এ নিয়ে
ইমামগণের মাঝে মতানৈকা রয়েছে।

* ইমাম শফেকৌ ও আহমদ (রহ.)-এর মত এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক
মত অনুযায়ী, কসর করা রূদত তথা এর অবকাশ রয়েছে এবং সম্পূর্ণ আদায় করা
শুধু জায়েরেই নয়, বরং উত্তম। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি
যদি চার রাকত নামায় পড়ে এবং এতে যদি প্রথম বেঁধে না ও বসে, তবুও তার
নামায আদায় হয়ে যাবে।

(শ্রেয় মহল ১২৪ পৃ., দৃশ মেহরা ২১৪ পৃ)

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-

"বোঝাই প্রতিপদের, জরীপে প্রতিপদ নির্দেশ করুনো মোজ্বর পর্যন্ত আনন্দ করুন না নিপ্পেল মোজ্বর পর্যন্ত আনন্দ করুন না নিপ্পেল মোজ্বর পর্যন্ত আনন্দ করুন না নিপ্পেল মোজ্বর পর্যন্ত আনন্দ করুন না নিপ্পেল \\
অর্থাৎ, তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর কর, তখন তোমাদের নামায় কসর করাতে
কোন দোষ নেই। (নিম্নঃ ১০১)

উত্তর আয়াতে "রূকসত জনাল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হল, তোমাদের
kোন দোষ নেই। এই শব্দটি মুবাহ বা বৈধ (রূকসত) হওয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়,
ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।

দলীল (২) হযরত আযিসা (রাখ)-এর হাদীস-

যেনা প্রতিপদের মোজ্বরের থেকে অশুভ ও প্রতিপদের থেকে আস্তান্ন হয়ে যান। যেনা প্রতিপদের মোজ্বরের থেকে অশুভ ও প্রতিপদের থেকে আস্তান্ন হয়ে যান। যেনা প্রতিপদের মোজ্বরের থেকে অশুভ ও প্রতিপদের থেকে আস্তান্ন হয়ে যান।
অন্যতম, তিনি (আরো বলা হয় রাসূলুল্লাহ (সাহা))—এর সাথে মদিনা থেকে মক্কায় এসে উমরা করেন। মক্কায় আসার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরাবন হোক। আপনি তো কসর করেছেন, আর আমি পূর্ণ নামায় পড়িলাম। আপনি রোধা রাখেননি। আর আমি রোধা রেখেছি। উত্তরে তিনি (সাহা) বললেন, হে আরোহি! বেশ তো ভালই করেছ। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।

উক্ত হাদিস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সফরে নামায় পূর্ণ করা জায়গায়, তদুপরি উক্তম।

দলীল (৩) হযরত আরোহি (রাহ) থেকে অপর একটি হাদিস-

"আন্ত লাবী স্ন্য আল্লাহ উল্লাহ স্ন্য কান গ্য ফি স্ন্য লি লি ও নিফ্ত্য স্ন্য চোম্ম্।"  

(দার قطفي ج ২ সচ ১৮৯)

অর্থাৎ, এই করে হনীম (সাহা) সফরে কসর করতেন এবং পূর্ণতা আদায় করতেন। রোধা রাখতেন, আবার কখনো কখনো ছোঁড়ে দিতেন।

দলীল (৪) হযরত উসমান (রাহ)-এর আমল। তিনি মক্কা মুকাররমায় পূর্ণ নামায আদায় করতেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনেই এই আমল করেছেন। অথচ কেউই এতে বাধা দেননি। যদি ইহা জায়গায় না হত, তাহলে তিনি ইহা কিভাবে করতেন? (বখারি ج ১ সচ ১৪৭)

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, হাসান বসরী, হাম্মাদ (রহ.)-এর মত এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, কসর আয়ীমত তথা ওয়াজিব। অতএব, ইহা ছেড়ে পূর্ণ নামায আদায় করা জায়গায় নয়। তাই হানাফীদের মতে, মুসাফির অবস্থায় যদি চার রাকত ফরয় নামায পড়ে এবং এতে যদি প্রথম বৈঠক না করে, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তার উপর দুই রাকতে বসা ফরয় ছিল, কিন্তু সে তা তরক করেছে।

(বিধ মেহুব জ ২ সচ ২২৯, তুলিকা মদিনা জ ২ সচ ১২১, দর মশকুমা জ ২ সচ ১২১)

দলীল (৫) হযরত আরোহি (রাহ) থেকে আলাদা বিষয়ের বর্ণনা—

"ন্য উসমান ফরয় বৃট সমু দুরন্ত মী র্তলস মী সীফ ফাইর্ত।" (বখারি ج ১ সচ ১৪৮)

(বখারি ج ১ সচ ১৪৮ বাবা ইহা ফরয় এমন ক্ষেত্রে, লস্ম জ ১ সচ ২৪১, নসাইন জ ১ সচ ৭৯ বাবা কিভাবে ফরয় বলে)

(দলীল (৫) হযরত আরোহি (রাহ) থেকে আলাদা বিষয়ের বর্ণনা)
ধলীল (২) হযরত ইবন আবাস (রা) হতে বর্ণিত হাদিস:

"কাল ইন ইল্লাহ উরুজ ওজল ফর্ড স্লো উল্লাইন নীকম সাল্লাহ উল্লাইন ও সাল্লাহ বি ইল্লাহ আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে আহসান লে।" (নাসাইন গি ১ চল ২২ কৃত তঃ ফর্ড সলো উল্লাইন)

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবী করিম (সা)-এর ভাষায় মুকুম অবস্থায় চার রাকাত নামায় ফজত করছেন। আর সফর অবস্থায় দুই রাকাত রাকাত।

ধলীল (৩) হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিস:

"সুলাহা জাম্মিয়া রকম্মান, লুক্স রকম্মান এবং পৌঁছান সে সুলাহা বর্ণিত হাদিস।" (নাসাইন গি ১ চল ১২১)

অর্থাৎ, জুমআর নামায় দুই রাকাত, ঐদুল ফিতরের নামায় দুই রাকাত, কুরবানীর নামায় দুই রাকাত, সফরের নামায় দুই রাকাত।

ধলীল (৪) মুহাম্মদিন থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন-

"সালত ঈবন উমর উন সুলাহা বিস সুলাহা বি আহসান লে আহসান লে।" (মজীব জিনাইন গি ১ চল ১৫৫, ১৫৫, ১৫৫, ১৫৫, ১৫৫)

অর্থাৎ, আমি ইবন উমর (রা)-কে সফরের নামায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তরে তিনি বলেন, দুই রাকাত করে (চার রাকাত ফজতের ক্ষেত্রে)। যে সুন্নতের (নিয়মের) বিরোধিতা করল সে কুফ্রী করল।

এ সকল রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, সফর অবস্থায় কসর আধিকত, রক্ষত নয়।

জবাব আহ্মদের পক্ষ থেকে শাফেক ও হামেদের ধরে জবাবঃ

(১) শুনুন আবারুস সুলোহ আহসান লে চার রাকাত করে ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় না। জবাবকারী যে মিসিরাম সাফা এবং মারওয়াহের ব্যাপারে না গর্নাহ হবে না) শব্দ ব্যবহার করা ষেতো ইমাম শাফেক (রহ) সহ সবার মতে, সাফামারওয়াহার সাঙ্গী করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তাআলা বাংলা-
ফয়ত হয় তাহোন এতেতাতেতে হয় তাহোন এতেতাতেতে হয় তাহোন এতেতাতে।

অর্থাৎ, কেউ যদি বায়তুল্লাহ হজ্জ অথবা উমরা করে, তাহলে তার জন্য সাফামারওয়াহেত (পাহাড়শহর) তাহায় করতে কোন দোষ নেই। (বাকরাঃ ১৫৮)

* এ ব্যাপারে আশ্রয় আলী খানবী (রহ.) বলেন, কসর ওয়াজিব। আর কুরআনে যে এভাবে বলা হয়েছে, তোমাদের কোন গৌহ হবে না। যদিও সদেশ হয়, কসর না করাও জায়েঃ। এর প্রকৃত কারণ এই যে, সাহাবায়ে কিমাম (রাঃ) সর্বদা পূর্ণ নামায আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই তাঁরা সফর অবস্থায় কসর করাকে বাহ্য গৃহের ওয়াসওয়াসা হত। তাই তাঁদের সদেশ দূর করার জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) বলতুঃ এই আযাতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়, বরং সালাতুল খায়াামাত অথবা শংকার নামায সংক্রান্ত। কেননা উক্ত আযাতেই উল্লেখ আছে যে-

"তোমরা আশঙ্কা কর যে, কফেরায় তোমাদেরকে উদ্যুক্ত করবে। সুতরাং উক্ত আযাত দ্বারা কসর না করা যে জায়েঃ আছে, এর দলীল দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, এ আযাতে শংকাকালীন নামাযে কসর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ধরনের ক্ষেত্রে কসর, পরিমাণের ক্ষেত্রে কসর নয়। (মুরাফফ আল মুহাম্মদ আল ইক্বাল)" (২১৬, মুহাম্মদ আল ইক্বাল)

বিতৃতি দলীলের জবাবঃ (১) প্রথমত হাফিজ যালাইল (রহ.) এই হাদিসটির মূল পাঠকে (মতন) মুনক্র সাব্যস্ত করেছেন। কারণ কারণো মতে হাদিসটি মুখ্যতারি।

(নিঃসরণ করা জ সন ১৩১৩, ইব্লিস জ ২০৩)

তাহাড়া আনাস (রাঃ)-এর রোপিয়াতে উল্লেখ আছে-

"হয় নবী নৌমায় নৌমায় নৌমায় নৌমায় নৌমায় নৌমায় নৌমায় নৌমায় নৌমায়। অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) একবার হজ্জ করেছেন। আর উমরা করেছেন চারবার। সবগুলোই বিলক্স মাসে। অথবা হজ্জের সাথে কৃত উমরা ছাড়া।

উক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) রময়ার কথেনো উমরা করেননি।

অথচ হযরত আলিশাহ (রাঃ)-এর হাদিসে রময়ারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে কোন কোন শাফেই বলেন, এটি মক্কা বিজয়ের ঘটনা। আর মক্কা বিজয় H হয়েছিল রময়ার। তদুপরি তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মক্কা বিজয়ের সফরে আলিশাহ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন না। (ফতেহ বাদার জ ৩৭৪, ৩৭৪)
বরং এই সকলে নবী করিম (সাং)-এর সাথে ছিলেন হযরত উমামা সালমা (রাং)
এবং হযরত যসরব (রাং) অথবা হযরত মায়মূনা (রাং)।

* অগত্যা যদি এই হাদিসটিকে বিশ্লেষণ সীকৃতি দিয়ে ইহার মেনে নেয়া হয় যে, মক্কা
বিজয়ের সময় হযরত আরিশা (রাং) ও নবী করিম (সাং)-এর সাথে ছিলেন,
তাহলেও এর উত্তরে বলা হবে যে, এই সকলে নবী করিম (সাং) পনের দিন অথবা
এর চেয়ে বেশি দিন মক্কায় মুক্তিম ছিলেন।

কিন্তু এ সময় নবী করিম (সাং) অবস্থানের নিয়ত করেননি। কেননা তিনি (সাং)
হুনাইন যাওয়ার কথা তাকে। আর এদিকে হযরত আরিশা (রাং) মনে করলেন
যে, নবী করিম (সাং) হযরত দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন। এর ভিত্তিতে হযরত
আরিশা (রাং) নামায পূর্ণ আদায় করলেন এবং রোধ ও রাখতে লাগলেন। ফলে
নবী করিম (সাং) হযরত আরিশা (রাং)-এর কাজ ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য
করেছেন।

কতক সাহিত্যিক তো একথাও বলেন যে, নবী করিম (সাং) ছিলেন সমস্ত গুণের
অধিকারী। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও রহমতের নবী ছিলেন। তাই তিনি কাউকে
কেন বিষয়ে সরাসরি কষ্টপ্রাপ্ত কথা বলতেন না। বরং হেকমের মাধ্যমে কাজ
হাসিল করে নিতেন। এমনিতে উত্ত হাদিসে নবী করিম (সাং) হযরত আরিশা
(রাং)-কে আহ্সনত (তুমি ভাল করেছ) বলে সূক্ষ্ম পছন্দ তাঁর আমলের অসম্ভবতি
জাপন করতেন। নবী করিম (সাং) আহ্সনত বলে বুখাতে চাচ্ছেন যে, আমি হলাম
অনুসৃত (মনোযোগ) আর তুমি হলে অনুসারী (নাম)। তুমি আমার কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে
নিজে নিজেই ইজতিহাদ করে আমল করা শুরু করে দিয়েছ। বাহা! বেশো! ভালই
করেছে।

আসলে প্রত্যেকটি ভাষাতেই এমন প্রচলন রয়েছে যে, শাব্দিক অর্থে যদিও
ইতিমাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হল নেতিবাচক বুঝানো। উত্ত
হাদিসেও তাই ঘটেছে।

তৃতীয় দলীলের জবাবে উল্লাস হাদিসের উদ্দেশ্য হল এই যে, নবী করিম (সাং) যখন
সংক্ষিপ্ত সফর তথা ৪৮ মাইল থেকে কম দূরত্বের ব্যবধান সফর করতেন। তখন
তিনি (সাং) পূর্ন নামায আদায় করতেন। আর তিনি যখন ৪৮ মাইল বা এর চেয়ে
বেশি দূরত্বের সফর করতেন, তখন তিনি কসর করতেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত
আরিশা (রাং)-এর নিকটও এ ব্যাপারে কোন মারফু হাদিস নেই। বরং সবই ছিল
তাঁর ইজতিহাদ। আর তাই ইমাম যুহরিয়া যখন উরওয়াকে প্রশ্ন করলেন-
ফর্ম বাল গায়েশ্বর নাম্য উদাহরণ (১৪৮ পাতা ২৭, অধ্যায়)

অর্থাৎ, আরিশা (রাশি)-এর কি হলে, তিনি নামায় পূর্ণ পড়েছেন?

উত্তরে উরূহায় বলেন- অর্থাৎ, যে ব্যাখ্যার দ্বারা হযরত উসমান (রাশি) মকায় পূর্ণ নামায় পড়তেন, এমন ধরনের কোন ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আরিশা (রাশি) ও নামায় পূর্ণ করতেন। এতে বুঝা যায় যে, হযরত আরিশা (রাশি)-এর নিকট কোন মারফু হাদীস নেই। নতুন উরূহায় এমন কথা বলতেন না। তবে সরাসরি হাদীস বলতেন।

চতুর্থ দলীলের জবাব (১) হযরত উসমান (রাশি) মক্কা মুকররামায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। আর তাঁর ইতিহাস ছিল, যে শহরে মানুষ ঘর তৈরি করে নিয়ে, তাতে পরিপূর্ণ নামায় পড়া ওয়াজিব। (তাবু বাবু জি ১৪৮ পাতা ২৭, বাব মদে বিমা ভিত্তি)

(২) কতক মুহাদিস বলেন, হযরত উসমান (রাশি) মকায় অবস্থানের নিয়ত করেছিলেন।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমান (রাশি) মুসাফিকই ছিলেন। কিন্তু হজ উপলক্ষে মকায় সুনামের সমাবেশ হত। এমতাবস্থায় যদি তিনি কন্ড করতেন, তাহলে সুনামের হযরত মনে করে বসত যে, পূর্ণ নামায় কোন রাকাত। তাই তাদেরকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইকামত বা অবস্থানের নিয়ত করে পূর্ণ নামায় আদায় করা সম্ভব মনে করেছিলেন। (তাবু বাবু জি ২৭, পাতা ২৭)।

বাব যদি আত্র পাকাম ম্ল চর্চ ক্ষীর ত্যা ক্ষীর এ সংখ্যায় পূর্ণতা একান্ত মাধ্যমে কলাম ক্ষীর পূর্ণতা একান্ত মাধ্যমে

ফজরের সূচন পড়ার পূর্বেই ইমাম জামা আলেতে দা ডিনিয়ে গেলে

... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... (তাবু বাবু জি ২৬, পাতা ২৭, কাল যদি একান্ত মাধ্যমে কলা ফজরের সূচন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... (তাবু বাবু জি ২৬, পাতা ২৭, কাল যদি একান্ত মাধ্যমে কলা ফজরের সূচন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... (তাবু বাবু জি ২৬, পাতা ২৭, কাল যদি একান্ত মাধ্যমে কলা ফজরের সূচন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... (তাবু বাবু জি ২৬, পাতা ২৭, কাল যদি একান্ত মাধ্যমে কলা ফজরের সূচন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... (তাবু বাবু জি ২৬, পাতা ২৭, কাল যদি একান্ত মাধ্যমে কলা ফজরের সূচন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... হেন সে হেন হেন হেন কাল কাল... (তাবু বাবু জি ২৬, পাতা ২৭, কাল যদি একান্ত মাধ্যমে কলা ফজরের সূচন কাল কাল... 

অমুল বাদঃ ... আরু হুরায়া (রাশি) হতে বিশ্বাস। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাহী) ইরশাদ করেন, ফরর নামায় ইকামত হয় যাওয়ার পর ফরর বাতিত। আর কোন নামায় পড়া দুর্বল নয়।

বিশ্লেষণ ফরর নামায় জামা আতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সুন্নত আদায় করা যাবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
তবে যুহর, আসর ও এশা এই তিন ওয়াজের নামায়ের ব্যাপারে সকল ইমামের অভিমত এই যে, জামাত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর স্মৃত পড়া নাজায়েশ। কিন্তু ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেই, আহমদ, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ফজরেও এই রকমে যে, জামাত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ফজরের স্মৃত পড়া জায়েশ নয়।

দলীলঃ পূর্ববর্তিণ হাদিস।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, জামাত দাঁড়িয়ে গেলেও শর্তসাপেক্ষে ফজরের স্মৃত আদায় করা জায়েশ আছে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্ত- (১) সুন্ন মসজিদের বাইরে পড়তে হবে, মসজিদ ছোট হোক কিংবা বড় হোক। (২) সুন্নতের পর যদি উভয় রাকাত জামাতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট দুটি শর্ত- (১) কমপক্ষে এক রাকাত জামাতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (যদিও দ্বিতীয় রাকাতের রক্তু হোক না কেন) (২) মসজিদ হয় ছোট হয় তাহলে জামাতে গুরু হয়ে গেলে স্মৃত বাইরে পড়তে। আর মসজিদ বড় হলে সুন্নত মসজিদের কোন এক কোণে বা বারান্দায় আদায় করে নেবে। যাতে কাঁটার সাথে মিলে না যায়।

দলীলঃ ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) দলীল হিসেবে ঐ সমস্ত রেওয়ায়েত পেশ করেন, যাতে ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। যেমন-

... উন্ন আবু হানিফা আলা কোলার রসূল নিঃসৃতি লোহি উসমান শুলায় না তদুক্ত মীরা জামাত করেন... বুদুই মখান হিয়াল (আবু দাউদ জুলি ১৭২ বাবি নিয়ম)।

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়ারা (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাং (রাও) ইরশাদ করেছেন, তোমরা কোন সময় ঐ দুই রাকাত নামায় ফজরের সুন্নত তাগ করবে না, যদিও তোমাদেরকে খোদা ইমামের নেয়।

হযরত আরিয়া (রাও)-এর হাদিস-... উন্ন আবু হানিফা আলা কোলার রসূল নিঃসৃতি লোহি উসমান শুলায় না তদুক্ত মীরা জামাত করেন... বুদুই মখান হিয়াল (আবু দাউদ জুলি ১৭২ বাবি নিয়ম)।
অর্থাৎ, ... আরিশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের নামায়ের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে যে কতার নিয়মানুসারিতা পালন করেছেন তা অন্য কোন নামায়ের (সূম্যতা বা নাকল) ব্যাপারে পালন করেননি।

... উন্নয়নের প্রচলিত কান্দি বুঝালি ঈন্দ্রিয় উল্লেখ ও অপ্রাপ্ত রক্ষণাত্মক পর্যালোচনা তোলা ফজর হতে ইতিহাসের লেখক করা কর্তা পার্থে পার্থে নামায (إبولا دارو) ص. ১৭৮, سلم-ج ২০০।

অর্থাৎ, ... আরিশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামায়ের পূর্বে দুই রাকাত নামায এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি ধারণা করতাম, তিনি কি তাতে কেবলমাত্র সূত্র ফাতিহা পাঠ করতেন?

আরিশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

রক্ষণাত্মক ফজর খারি ২৫ নঞ্চিজা ও মালান বিগ্র্হান—(সেলম-ج ১, ২৫১ অংশ চ ২০ বাব রক্ষণাত্মক ফজর তাষ্ট নসান জ ১, ২৩ মুহাফজা উপরের রক্ষণাত্মক ফজর)

অর্থাৎ, ফজরের দুরাকাত (সূম্যত) দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

এছাড়া আরো ফকহী সাহাবা (রাঃ) থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা ফজরের সূম্যত আদায় করতেন। যেমন-

(১) হযরত নাকি বলেন-

ইয়াকুতে ঈবন উমর (রাঃ)-কে ফজরের নামায়ের জন্য জাগিয়ে দিলাম। তখন নামায়ের ইকামত হয়ে গেছে। এতদসময়ে তিনি দাঁড়িয়ে দুরাকাত (সূম্যত) নামায পাড়লেন।

(২) আবু উসমান আনসারি বলেন-

বাদু ঈবুদ্দল্লাহ ঈবন আকবাস (রাঃ) এমন সময় এলেন, যখন ঈবাস ফজরের নামায গুরু করে দিয়েছেন। অথচ ঈবাস আকবাস (রাঃ) দুরাকাত (সূম্যত) আদায় করেননি। তখন ঈবুদ্দল্লাহ ঈবন আকবাস ঈবাসের (থেকে একটু) পিছনে (গিয়ে) দুরাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাদের সাথে নামাযে শামিল হলেন।
বাবুর মৃত্যুর পর তিনি যেতেন সুপ্রসিদ্ধির সাথে নামিয়ে যান (7)

(1) উল্লিখিত হাদিসটির উপর পরিপূর্ণ প্রক্ষেপ শাক্ষাৎ গড়ে আমল করেন। কারণ যদি কেউ জামাতের দাড়ানোর পর বীর ঘরে সুন্নত পড়ে রওযানা দেয়, তাহলে এটি ইমাম শাফেকে (রহ.)-এর মতেও জায়েন। আর সাধারণভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের হুকুমে এটিও অন্তরুক্ত। এতে ঘরে এবং মসজিদের কোন পার্থক্য নেই।
(2) এক্ষেত্রে হাদিসটির উদ্দেশ্য হল, ফরয় নামায়ের তালিদ প্রদান। যাতে ফরয় নামায়ের পূর্বেই সুন্নতসমূহ সময় থাকতে আদায় করে নেয়, যাতে জামাতের সময় তাড়াতাড়ি করতে না হয়। (2)

বাবুর মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ১৮১৫
বাবু প্রতিষ্ঠাতা মন্ত্রে যোগে প্রতিষ্ঠিত ১৫১৫

বেলুচ রাজা নিকাহ পড়ে তবে সে যা কখন পড়বে?

(টরমেডি চীর ২ এর মাঝারি চীর ২)
বিশেষণঃ যদি কোন ব্যক্তি জামাআতের পূর্বে ফজরের সম্প্রতি না পড়ে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি তা কথন আদায় করবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

* ইমাম শাফেকী ও আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, যদি কোন ব্যক্তি ফজরের ফরমে দুই রাকাত সম্প্রতি আদায় না করে থাকে, তাহলে ফরমের পর সূর্য উঠার পূর্বেই আদায় করতে পারবে।

দলীল (১): উপরিউক্ত হাদিস।

দলীল (২): কায়েস (রা.) বলেন—

০১. যার র্সোল ঢাকে নি তাকে একক করা আল্লাহ।

পরিভাষা এর "ফালা ইদেন।" বলে ইমাম শাফেকী ও আহমদ।

অর্থাৎ, যদি হাদিসের কথা মেনে তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, ফজরের ফরমের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে সুন্নত পড়া জারী নয়। বরং তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করবে। (তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কোন কোন কার্যকর বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, উভূ সুন্নতের কোন কার্যে নেই। ইহঁ, যদি ফরমের সাথে সুন্নত কার্য হয়, তাহলে কার্য করতে পারে। তাঁর এ রেওয়ায়েতটির প্রাথমিক নাই করেছে।)

দলীল (১): অন্য ইমাম হামিদের ধারণা ফরমেলার তাকে একক করা আল্লাহ।

পরিভাষা এর "ফালা ইদেন।" বলে ইমাম শাফেকী ও আহমদ।

অর্থাৎ, আবু হামাদির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়া না, সে বেন অবশেষ এ দূররাকাত সূর্যোদয়ের পর আদায় করা নেয়।

দলীল (২): আল্লাহ কর্তৃক তারুণ্য দেওয়া হলো যদি ফরমেলার তাকে একক করা হয়।

পরিভাষা এর "ফালা ইদেন।" বলে ইমাম শাফেকী ও আহমদ।

অর্থাৎ, আবু হামাদির (রা.) হতে বার্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়া না, সে বেন অবশেষ এ দূররাকাত সূর্যোদয়ের পর আদায় করা নেয়।
পাবে ফিরে চৈতন্য সঙ্গে রমত ছাড়ি চাঁদ । ১৯৫

রমত মালের রাত্রিকালীন ইবাদত

... উঠে এক হৃদেরা বললে কেন রসূল নিঃসুর স্তরে লোকে উপনীত স্থান যে বিষ্ণুর রমত।
রমত ও ছাড়ি খুলি যাঁর আহর প্রবন্ধিত তাকে নিঃসুর স্তরে লোকে উপনীত স্থান যে বিষ্ণুর
লোকে উপনীত স্থান যে বিষ্ণুর রমত।
রমত ও ছাড়ি খুলি যাঁর আহর প্রবন্ধিত তাকে নিঃসুর স্তরে লোকে উপনীত স্থান যে বিষ্ণুর
নামায অধ্যায়

(বখারি জোহাঁ সং 269 বাব ফজল মসিমান; মসলমান জোহাঁ 162 বাব ফজল মসিমান শরিফ নামায অধ্যায় ও তুরাওয়িহ রূপে ব্যবহার করেন।)

অনুবাদঃ ... আবু হুসেন রাশীদ (রা) হতে সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, রাশীদ সাহাবীদের মর্যাদা মাসের (রাজত) নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; তবে তিনি (সাহ) তার আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরমাওয়ার্ডির ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (সাহ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রম্যান মাস ইমামের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দাতায় হতে তারাবিহ নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সময় (সপুরা) গুনাহ মাফ করে দেন। রাশীদ সাহ (সাহ)-এর ইক্তিকালের পরেও এই নামাযের (তারাবিহ) বিধান একই স্তর থাকে। অতঃপর আবুবকর (রা)-এর খিলাফতকালেও এরোপ থাকে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও রূপ ছিল।

বিশ্লেষণঃ ইসমাইল নবী (রহ.) বলেন, কিয়ামে রম্যান দ্বারা তারাবিহর নামায বুঝানো উদেশ্য।

আল্লাহ কিরমানী (রহ.) ইজমা নকল করে বলেন-

إِنَّفَاضُوا عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ يَقِيمُ رَمْضَانَ صِلْوَةُ الْفَرَ醺ُةِ (فَتْحِ الْبারِيِّ ج 217)

অর্থাৎ, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, কিয়ামে রম্যান দ্বারা উদেশ্য সালাত তারাবিহ।

এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের এককতা হচ্ছে, তারাবির নামায সুমিতে মুহাম্মাদ এবং পুর্বদের মসজিদে জামাআতে আদায় করা উক্ত।

(১২ বিষয়ক মাস ২২, সাফুর আলাউদ্দিন জ ২২, ফত্তাহ্বা বারি ২১৯)

* তারাবির নামায রাকাত সংখ্যা কত, এ নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবেদন রয়েছে

* আহলে মাহির, ইবন তুতিয়ার এবং ইবন তাহিমার (রহ.) মতে, তারাবির নামায মাত্র আট রাকাত এবং তা মুক্তাহাব।

(নতুনেরহোদী জ ২২-২৬, ফত্তাহ্বা বারি ২৩৪, তোফাইল কোই লাইন নিষ্ঠা জ ১৭৬)

দলীলঃ ... উন্নতি সম্পন্ন আল্লাহ সালাত প্রসন্ন তারাবির তুলনায় সালাত, এ যে স্থল সালাত ও তুলনায় সালাত লাগে না কিন্তু তারাবির তুলনায় সালাত লাগে না।

(তথ্যা চিরদিনের জ ১)
রক্ষকের অ্যাল্ফা (আবু দাউল জ) ১৮৯ বাবা শ্রোণ্টের লিখ, বহুকারিজ ১ ১৫৪, মস্তল ১ ২৫৪ বাবা শ্রোণ্টের 
লিখ, তমুদি ১ ১৫৪ বাবা শ্রোণ্টের লিখ নিঃসার ১ ১৪২, বাবা কিফ আলিয়া ১ ২৫৪ বাবা শ্রোণ্টের লিখ।

অর্থাৎ, ... আবু সালামা হতে বর্ধিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাহ) এর দীর্ঘ হয়র খার আয়িশা (রাই) কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) রম্যান মাসে কি রূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) রম্যান মাস ও অন্যান্য সময়ের 
রূপে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন ... 
তাঁর বলেন, এই এগার রাকাতের মধ্যে তিনি রাকাত হল বিভিন্ন। আর বাকী চার 
রাকাত করে মোট আট রাকাত হল তারাহীর নামায।

দলীল (২) হয়র আবু যার (রাই) হতে বর্ধিত।

... অ্যাল্ফা দীর্ঘ রাজ মুতাহার ণের নামায। নামায আদায় করেন। অতঃপর উক্ত মাসের 
মাত্র শ্রোণ্টের অন্তর্গত থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে (তারাহীর) নামায আদায় করেন। 
এভাবে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি (সাহ) যরুথ রাতে 
(অর্থাৎ পরের বাত) আমাদের সাথে (তারাহীর) নামায আদায় করেন। পরে পঞ্চম 
রাতে তিনি আমাদের সাথে নামায আদায়কালে রাতের অর্ধঃ অতিবাহিত করেন।

... অতঃপর তৃতীয় রাতে তিনি তাঁর শ্রী ও পরিবার-পরিজনকে এবং অন্যান্য 
লোককেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে (তারাহীর) নামায আদায় করেন।

... অতঃপর তিনি উক্ত মাসের বাকি দিনগুলোতে (২৯ ও ৩০) আমাদের সাথে 
জামাআতে আর তারাহীর আদায় করেন।

উপরোক্তিহিত হুদিস দ্বারা বুদ্ধ যায় যে, নবি করীম (সাহ) মাত্র তিন দিন তারাহীর 
পড়েছেন। যদিও তারাহীর মুতাহার বুদ্ধ যায়, সুন্দর মুসলমান প্রমাণিত হয় না।
* চার ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবীহ নামায় বিশ্ব রাকাত। এবং ইহা সুমাতে মুহাকাদা।

(ব্যপার রােক) ফির ২১, মুফসর সেন ২, ফির পারিজ ৪, ২১৯ (২১১)
কেউ কেউ হযৎ বলতে পারে, ইমাম মালিক (রহ.) থেকে তাো ৩৬ এবং ৪১ রাকাতেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত প্রশ্নের নিরসন হল এই যে, ৪১ রাকাতবিশিষ্ট রেওয়ায়েতে ৩ রাকাত বিতরি এবং বিতরির পরে ২ রাকাত নফল নামায় শামিল রয়েছে। অর্থাৎ ৩ রাকাত বিতরি এবং ২ রাকাত নফল মোট ৫ রাকাত নামায় ৪১ রাকাত নামায় থেকে বাদ দিলে ৩৬ রাকাত নামায় থাকে। সুতরাং তাঁর থেকে মোট রেওয়ায়েত পাওয়া যায় দুটি- (১) ২০ রাকাত এবং (২) ৩৬ রাকাত।

আর ৩৬ রাকাতের মূল ঘটনা হল এই, মদীনা এবং মক্কাবাসীরা ২০ রাকাত তারাবীহ নামায়ের উপরই আমল করত। কিন্তু মক্কাবাসীরা প্রত্যেক ৪ রাকাত অন্তর তওয়াফ করত। কিন্তু মদীনাবাসীরা যেহেতু তওয়াফ করার কোন সংশোধন পেয়ে না, তাই তারা সূরাহের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তওয়াফের পরিবর্তে ৪ রাকাত নামায় নফল হিসেবে অতিরিক্ত আদায় করত। এভাবে মদীনাবাসীরা মক্কাবাসীদের মোকাবেলায় ১৬ রাকাত নামায় অতিরিক্ত আদায় করত। ফলে তাদের সর্বমোট (২০+১৬)=৩৬ রাকাত হত। সুতরাং এতে স্পষ্ট রূপ যায় যে, প্রক্রিয়াগত তারাবীহ নামায় বিশ্ব রাকাতই ছিল।

(বাদতে খাগুমই এবং বিভিন্ন মান্ডলে মুরকি ২, ১৭, রকীত ২০-২১)
চার ইমামের দলিলঃ (১) হযরত ইবন আক্বাস (রাঃ)-এর মারফু হাদিদ, যা ইবন হুমাইদ সুতে বর্ণিত।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانِ عَشِيرِينَ رَكْعَةٌ وَالْوَتَّرُ

(মালাতে মান্ডলে ১, ১৪)
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রময়ে ২০ রাকাত নামায় পড়তেন আবার বিতরও পড়তেন।
এ হাদিসটি যদিও সনদগতভাবে দুর্বল, কিন্তু ইজমা ও এর উপর ব্যাপক আমলের প্রার্থনার দ্বারা এটি শক্তি সংকরিত হয়।

(২) ইয়াযিদ ইবন রামান থেকে বর্ণিত।

قَالَ كَانَ الْئَالَّسِ يُقَومُونَ فِي زَمَانٍ عَمَّرَ بَن

الْهَخَطَابِ فِي رَمَضَانِ عِشْرَيْنِ رَكْعَةٌ

(মোটা মালক মান্ডলে ৯৮)
অর্থাৎ, তিনি বলেন, ইমাম ইবন খাদাব (রাঃ)-এর মহান লোকজন রময়ে ২৩ রাকাত নামায় পড়ত (২০ রাকাত তারাবীহ এবং ৩ রাকাত বিতরি)

(৩) আল্লামা ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) এক জায়গায় বীরী ফাতওয়ায় লিখেন-
(4) বিষ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে হযরত উমর ইবনে খাতাব (রাঃ)-এর সময়ে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি বলেন যে, নবী করিম (সাঃ) মাত্র তিন রাত জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি এক সময় বীরী গৃহে অধিক নফল নামায তথা তারাবীহ আদায় করতেন। যার প্রমাণ অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে অন্যান্য মাসের রাতের ইবাদতের তুলনায় বেশি ইবাদত করতেন। কিন্তু নবী করিম (সাঃ) তারাবীর প্রতি অধিক গৌরব না দেয়ার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই বলেন-

"... তারাবীহ নামায আদায়র গান্তে অনেক সময়ে তারাবীহর নামায আদায় করতেন। কিন্তু তিনি এক সময় বীরী গৃহে অধিক নফল নামায তথা তারাবীহ আদায় করতেন। যার প্রমাণ অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে অন্যান্য মাসের রাতের ইবাদতের তুলনায় বেশি ইবাদত করতেন। কিন্তু নবী করিম (সাঃ) তারাবীর প্রতি অধিক গৌরব না দেয়ার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই বলেন..." (আবু দাউদ ১:১৫-১৬৫, বখারি ১:৩২৫, সেলিম ২:৮৫, নাসাই জ:০৩ সী।)

(আবু দাউদ জ:০৩)
মসুরী করাম সাহেব-এর ইতিকাল হলে গেল যে, তারাবীর কোন নিয়মিত জামাইত কাজে করেননি। অতঃপর আরু বকার সিদ্দীক রায়ের যুগ আসল।
তিনিও এ ব্যাপারে কোন অনুভূতি করেননি। কেননা তাঁর উপর তখন মুসলিম খিলাফত চিন্তিয় রাখার এক সুন্দরদায়িত্ত্ব ছিল। একদিকে উসামা রায়ের বাহিনী প্রেরণ করা, অন্য দিকে মুরতাদরের বিরুদ্ধে অঞ্চল ধারণ করা, অপরদিকে নবোদয়ের দাবিদারদের প্রতিহত করা এবং ধাইতে অধীকারকারীদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করা- এমনো সবই ছিল নিঃসন্দেহে তারাবীর চেয়েও অধিক ঘূর্ণপূর্ণ বিষয়।
সর্বোপরি তাঁর খেলাফতকাল ছিল খুবই সম্প সময়ের। যার ফলে তিনি তারাবীর সুন্দরতায় কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।
অতঃপর এল হযরত উমর রায়ের খিলাফতের যুগ। তাঁর প্রাথমিক অবস্থা এমনিভাবেই চলতে লাগল। অবশেষে যখন রাষ্ট্রের বিশ্ব খুলো কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আসল, তখন তিনি খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে এদিকে মনোযোগ দিলেন। একান্ত তিনি মসজিদে গিয়ে দেখেন যে, লোকেরা বিচ্ছন্ন হয়ে একাকী তারাবীর নামায আদায় করছে। তখন তিনি আফসোস করে বললেন-

(১২) আরু রায়ের সময় হযরত উমর রায়ের খিলাফতের যুগে জুড়ে সহকারে তারাবীর বিশ রাকাত নামায নিদিষ্ট হয়ে যায়। যা সাহাবায়ে কিরাম রায়ে থেকে শুরু করে তাবিঙ্গন ও সকল হুকুমালে আলিম এর উপর আমল করে আসছেন।

সুতরাং এর দ্বারা রূখা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের এক বড় জামাইত জীবিত থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এর উপর আমল করতে অস্বীকার করেননি, তাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারাবীর নামায বিশ রাকাতের উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৬) সর্বোপরি বলা যায় যে, যদিও মেনে নেয়া হয় যে, নবী করাম সাহেব-এর পক্ষ থেকে তারাবীর বিশ রাকাতের ব্যাপারে কোন কিছুই বর্ণিত এবং প্রমাণিত নেই।
তবুও হযরত উমর রায়ের নিজের পক্ষ থেকে প্রদান রায় অনুযায়ী সম্ভব হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননার নবী করাম (সা) ইরশাদ করেন-

"ফিরে দিতে প্রিয় ও নীতিতে হলুদ দিয়ে মেহেদিন দেখিয়ে।"
অর্থাৎ, তোমরা আমার সুন্দর এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফারে রাশিদিনের সুন্দর আঁকড়ে ধর।

* হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَقْتَدَوْاٛ بِالْذَّينِ مِنْ بَعْدِي أَبَيْ بَكْرِ وَعَمْرٍ-

(سন তুর্মিদি ২২৯ স।)

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (সাং) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার পরে আবুবকর ও উমর (রা) -এর অনুসরণ কর।

জবাবঃ (১) হযরত আরিশা (রা) -এর এগার রাকাত হাদিসের জবাবে বলা যায় যে, হযরত আরিশা (রা) থেকেই তের রাকাত নামায়ের রেওয়ায়েত সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে -

... উন্ন আচারের আসল কথা রসূল ল্লাহ চালী ল্লাহ প্রসুই ও স্নে যাচাইর িলান িলান িলান -

১০ র্কাু তুরি দুুরি মুখে যাত্রা অব্ধ - (আবু দাউল জ ১১৮, বখারি ১৫, ১১ সালের শুরু তুরম্য)

অর্থাৎ, ... আরিশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাং) রাকাতে বিতর সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে -

... উন্ন আচারের আসল কথা রসূল ল্লাহ চালী ল্লাহ প্রসুই ও স্নে যাচাইর িলান িলান িলান -

১০ র্কাু তুরি দুুরি মুখে যাত্রা অব্ধ - (আবু দাউল জ ১১১)

অর্থাৎ, ... হযরত আরিশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাং) রাকাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তিনি (সাং) নবম রাকাতে বিতরের পাঠ শেষ করতেন।

এই সকল একাধিক বিপরীত রেওয়ায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন যে, আহলে যাহিরের আট রাকাতের মধ্যে তারাবীহে সীমাবদ্ধ করার দাবি বাতিল হয়ে যায়।

তাহাতা আদির রহমান মোবারকপুরী আহলে যাহিরের এক বড় ইমাম হওয়া সত্যের তার থেকেই তের রাকাতের রেওয়ায়েত প্রমাণিত। সুতরাং রূপা যায় যে, তারাবীহ আট রাকাত নয়।

(২) যে হাদিসের দ্বারা আহলে যাহিরের তারাবীহ চার চার রাকাত করে মোট আট রাকাত আদায় করা এবং এক সালামে তিনি রাকাত বিতর আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাও আহলে যাহিরের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আহলে যাহিরয়া
বিরতির এক রাকাত আদায় করে থাকে অথবা তিন রাকাতই আদায় করে, তবে দুই সালামে এবং তারাবীর নামায়ও দুই দুই রাকাত করে আদায় করে থাকে। সুতরাং উক্ত হাদিস তাদের দলীল হতে পারে না।

(৩) মুহাদ্ধসেগুন হযরত আরিশা (রাও)-এর এগার, তের প্রভূতি বর্ণিত হাদিসসমূহকে তাহাজুজের নামায হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া একটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুহাদ্ধসেগুন হযরত আরিশা (রাও)-এর বর্ণিত এগার রাকাতের হাদিসটিকে তারাবীর অনুমোদন উল্লেখ না করে তাহাজুজের অনুমোদন উল্লেখ করেছেন।

যদিও আহলে যাহিনিতে বলেন যে, তারাবীর এবং তাহাজুজুর উভয়টি একই বিষয়, কিন্তু তাদের দাবি সম্পূর্ণ ভুল। কোন নবী করীম (সাও) কথনো আনুষ্ঠানিকতার সাথে জামাআতে তাহাজুজুর নামায আদায় করেননি। অথচ আবু যার (রাও)-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাও) আনুষ্ঠানিকতার সাথে জামাআতে তারাবীর নামায আদায় করেছেন।

* আবু যার (রাও)-এর হাদিস দ্বারা আরো জানা যায় যে, নবী করীম (সাও) তারাবীর জামাত অধিক রাত থাকে সেহেরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন-


فقأم بننا حتني خشيتننا أن يتمتنا الفلاح-

অর্থাৎ, তিনি আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় নামায পড়েন, আমাদের আশ্চর্য হচ্ছিল যে, হয় আমরা ফালাহ (সেহেরী খাওয়া)-এর সুযোগ হারিয়ে ফেলব।

কিন্তু তাহাজুজের ব্যাপারে হযরত আরিশা (রাও) বলেন-

لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يجمعا إلى الصباح-

(াব দাওজ ১৮ সং)

বাবি সাল্টলীল, সন দারিমি জ ১ সং (১৮৮)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাও) সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেননি।

অথচ আরিশা (রাও) থেকে অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, নবী করীম (সাও) রমযানে অনেক রাত পর্যন্ত ইবাদত করতেন এমনকি কোন কোন রাত বিছানায় যান করতেন না।

অতএব, হযরত আরিশা (রাও)-এর রেওয়ায়েত অনুমানী যদি রমযান এবং রমযান ব্যতীত অন্যান্য সকল মাসের রাতের নামায একই রকম হয় (এগার রাকাত), তাহলে রমযানে রাতে না ঘুমিয়ে এত বেশি চেষ্টা-পরিশ্রম এবং ইবাদত করার তাৎপর্য কি?

প্রকৃতপক্ষে হযরত আরিশা (রাও)-এর হাদিসের মূল লক্ষ্য হল এই যে, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও নবী করীম (সাও) তাহাজুজের নামায সব দিন আট
হযরত আবু যার (রাঃ)-এর হাদিস দ্বারা আহলে যাহিনের তারাবীর নামায় মুস্তাহাব প্রমাণ করার জন্যেও

নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেন-

কিন্তু আল্লাহ তালা তাঁদের উপর রময়নের রোহা ফরর করেছেন। আর আমি তাঁদের উপর সুন্নি করেছি এ তারাবীহ।

সুতরাং উক্ত হাদিসে যেখানে নবী করিম (সাঃ) কর্তৃক সরাসরি সুন্নতের কথা বিদায়, ইহাকে কিভাবে মুস্তাহাব বলা হবে? তাছাড়া ইতিপূর্বে তো আমরা জেনেছি, ইহা যাতে আমাদের উপর ফরর বা ওয়াজিব সাব্যস্ত না হয়, এজন্য তিনি জামাতে নিয়মিত শরীক হতেন না।

কিন্তু সজ্জায় বলা হয় না।

কুরআন মজীদে সিজাদায় তিলাওয়াত করার?

১৯৯

কুরআন মজীদে সিজাদায় তিলাওয়াত করার?

কি সজ্জায়? বলা হয় না।

... উন্মুক্ত বটে অল্প আল্লাহ তোর উন্মুক্ত বটে ও পাশে আল্লাহ তোর উন্মুক্ত বটে

ফির িলান মেনা তাংকা মিন মোসলে ও মোসলে অ্যান মেন সজ্জায়- (বনা মাজে সোহুরু)

অনুবাদঃ ... আমার ইবনুল অস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ)

তাঁক কুরআনের মধ্যে পনেরটি সজিজ আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া তিনটি

মুকামস্তালের মধ্যে (সুরা নাজম, ইনহিকাক ও আলাক), সুরা হজ্জের মধ্যে দুটি

(হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একটি)।

বিশেষতঃ উক্ত অনুচ্ছেদে দুটি বিষয় আলোচনা করা হবেঃ

(১) তেলাওয়াতের সজিজ সুন্নত না ওয়াজিব?

(২) পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াতের সজিজ করার?

প্রথম আলোচনাঃ তেলাওয়াতের সজিজ সুন্নত না ওয়াজিব এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে

মতান্তর রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেক, আহমদ, ইসহাক, আওয়ান ও দাউদ যাহেরী (রহ.-) এর

মতে, তেলাওয়াতের সজিজ সুন্নত, ওয়াজিব নয়। (বলত মজহুর ২১৪ সোহুরু)।
অহকামুল হাদীস

নামায অধ্যায়

দলীল

শ্রীম বন তাহির বলেন তার কোনো বক্তা বলে যে নামাযুল হাদীস উপলব্ধি হয়েছিল (-১)।

ওমর আল লিহম ফলে যেমন দেখান যে- (এবং নামাযুল হাদীস বিভাগে গল্প ১৮৬ পাওয়া যাবে।) বিভাগে ২১৬ পাওয়া যাবে বিভাগে ১১৯ পাওয়া যাবে। যে বিভাগে ১১৫ পাওয়া যাবে বিভাগে ১৩৭ পাওয়া যাবে।

আরেকটা, ... তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) সহকারে সূরা নাজম পাঠ করে। তিনি সূরা পাঠের পর তিনি সিজদা করেন।

নবী করিম (সা) যেহেতু সিজদা করেননি, এতে ভুল যায় যে ইহা ওয়াজিব নয়।

দলীল (-২) একটি হযরত দিরম (রাষ) মিন্নরের উপর একটি সিজদার আযাত তেলাওয়াত করেন। এরপর নেমে সিজদা করেন। তাই এ আযাতটি জীবনে তেলাওয়াত করেন। ফলে লোকজন সিজদার জন্য প্রত্যাহার করেন। তিনি বলেন—

ইহা লেন স্নাতকোপলিত এবং একটি নামাযুল হাদীস উপর নেমে সিজদা করলে।

রাজা আল হাম জলে, মির্দাদ (রাষ) একটি হযরত দিরম (রাষ) এর বাগী ও আমল থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন (রব) এর মতে, তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব নয়। আহমদ ইবন হাম তাহির (রব) এর এক রেখায় বর্ণিত আছে, যদি নামাযুল পাঠি হয়, তাহলে ওয়াজিব। আর নামাযুল বাইরে পাঠি হলে সম্ভব।

(মুহাদ্ধ তাহির ৫৫)

দলীল (-১) পরিব্রক্ত কুফিসনের সিজদার আযাত ফেলনোলতে নির্দেশসূচক শব্দ এসেছে। আর নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। যেমন-

কৃত্তিম্ব দেশে লেখাধি স্থানটি ওয়াজিব।

অর্থাৎ, কখনোই নয়, আপনি তার আলুপাত করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন। (আলাকঃ ১৯)

কতক আযাতে সিজদা না করার ক্ষেত্রে কারেনের অহিংস ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

এটি ফেলনোল করার কথা নয়, তবে সিজদা করে না।

(ইনশিকাকঃ ২১)
সুতরাং এমতাবস্থায় এর বিপরীতে একজন মুসলমানের উপর সিজদা ওয়াজিব হওয়ারই কথা।
কোন কোন আয়াতে পূর্ববর্তী নবীগণের সিজদার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণের হুকুম দেয়া হয়েছে। (সোয়াদি: ২৪, আনআম: ৯০)। সুতরাং যদি সিজদা করা হয়, তাহলে কাফেদের বিরোধিতা হয়। এবং আহ্মেত (আঃ)-এর অনুসরণও হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যার নির্দেশ রয়েছে। (ফতুহ আল কুরাইশ ১ সুরা ৩৮:২)

(دانيال)

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالتحجيج وسجد

(معة المستمون للخ (بخاري ج ١ ص ١٤٦ باب سجود المسلمين/ج ٢ ص ٧٢، مسلم ج ١ ص ٢١٥)

(باب سجود التلاوة، ترمذي ج ١ ص ١٧٧، نسائي ج ١ ص ١٥٦،(`السجود في النجم)

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) সূরা নজম পাঠান্তে সিজদা করেন এবং তাঁর সাথে মুসলমানগণও সিজদা করেন।

জবাবঃ আহ্মেতের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবী করিম (সা) সিজদা করেছেন। সুতরাং যায়েদ ইবন সাবিতের হাদীসে বর্ণিত ফালক-এর অর্থ হবে তিনি তাত্ত্বিকভাবে সিজদা করেননি। আর আহ্মেতের মতেও তাত্ত্বিক সিজদা করা ওয়াজিব নয়।

নবী করিম (সা)-এর তাত্ত্বিক সিজদা না করার আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, এই সময় তিনি অযুবহীন ছিলেন অথবা তাত্ত্বিক সিজদা না করায় যে জায়েত তা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল।

বিভিন্ন দলীলের জবাবঃ হযরত উমর (ر.ز)-এর আছারের উত্তর হল এই যে, মারফু হাদীসের মুকাবলায় সাহবীদের আছার দলীলগায় নয়। অথবা, তাত্ত্বিকভাবে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কথা তিনি অবৈকার করেছেন।

অথবা এর অর্থ হল, জামায়েতের সাথে সিজদা আমাদের উপর ফরয় করা হয়নি।

(دروز ترمذي ج ٢ ص ٣١)

বিভিন্ন আলোচনাঃ পরিব কুরআনে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও তাউস (ر.ز)-এর মতে, তিলাওয়াতের সিজদা এগারটি। তাদের মতে, হানাফীদের যে প্রসিদ্ধ চারটি সিজদা আছে, সেখান থেকে মুফসঝালের তিনটি সিজদা নেই। সূরা হুজুরাত থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত
দলীল

... আর আবু হানিফা ও শাফেই (র.হ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনের আলাদাভাবে হজ ধরার সিজাদা মোট চারটি ছিল। কিন্তু ইহা নিদিষ্টকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা মতানুক্রমে রয়েছে।

ইমাম শাফেই (র.হ.)-এর মতে, সুরা সোয়াদ (স.)-এ কোন সিজাদা নেই। আর সুরা হজে দুটি সিজাদা রয়েছে। আর আহমদের মতে, সুরা হজে শুধু একটি সিজাদা এবং সুরা সোয়াদ-এ একটি সিজাদা রয়েছে।

(নব্বিকাম্ব ১২ সুরা ৪০)
হানাফীদের দলীলঃ সূরা সোয়াদে সিজদাহ

... উন্ন আবী সাইদ হজ্জারি আহ যা কাল দ্বারা রবুল্লাহ ঈসার মূল হোক ইন ঘুলম্ব এবং আল সিজদাহ নামের খান লাইন ফুল সিজদাহ সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের সিজদাহ তার নামের 

এ সময় রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা সোয়াদে সিজদাহ রয়েছে।

সূরা হজ্জে এক সিজদা হওয়ার ব্যাপারে আহমদদের দলীলঃ

(২) হজ্জত ইবন আব্বাস (রাখ)-এর আহার

... অর্থাৎ, তিনি বলেছেন, সূরা হজ্জের প্রথম সিজদা হল আহ্মেত তথা আব্বাস, আর দ্বিতীয়টি হল সিজদাহ ফিকালেক।
কান অব উদ্দিস এই শুরুর খাজা আলী সংগঠিত হই এই সংগঠিত নাম প্রথম আরোপীয় প্রথম আরোপীয় (২)।

(মুঘল মোহাম্মদ সুলতান)

যতু, ইবনে আকবাস (রাহ) সূরা হজের চেয়ে প্রথম সিজদায় মত পোষণ করেন।

উপরোক্ত দলিল ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয় যে, সূরা হজে একটি সিজদা রয়েছে।

জবাবে আহলাদিদের পক্ষ থেকে মালিকীদের প্রথম দলিলের জবাবে যদিও ইবনে

আকবাস (রাহ)-এর রেওয়ায়াতে সিজদা না করার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ আবু

হুরায়ান (রাহ) হতে বর্ণিত আছে—

قال سجدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انcroft و إفرا

پا سپم ریک الہی خلق (ابو داود ج ১৯৯ সংখ্যা ১৯৯ বাবে সজ্জী না এভাবে সম্পূর্ণ, مسلم ج

۲۱۵, ترمذی ج ১২৭ সংখ্যা ১২৭ করে সম্পূর্ণ, نسائی ج ১৫২ সংখ্যা ১৫২ বাবে সজ্জী না

(سماع انcroft)

তাইতে... তিনি বলেন, আরাম সূরা ইযাস-সামাউন শাক্ত ও ইকুরা বিসমি

রক্ষাকালের খালাকা পাঠের পর সাউলুরাহ (সাহ)-এর সাথে সিজদা আদায় করেছি।

সূরা 'নজম'-এর ব্যাপারে ইবনে আকবাস (রাহ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতে—

إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالتجه وسجد عند المصممون... (بخاری ج

[অর্থ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে]

যাইহোক, ইবনে আকবাস (রাহ)-এর হাদিস দ্বারা সিজদা না করার কথা বুদ্ধি গেলেও

আবু হুরায়ান (রাহ) (মুসলিম শরিফে ইবনে মাসউদ)-এর হাদিস দ্বারা সিজদা করার

কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এক্ষেত্রে হযরত আবু হুরায়ান (রাহ)-এর হাদিসই

প্রাধান্য লাভ করে ব্যাকলাম। কেননা, হযরত আবু হুরায়ান (রাহ)-এর হাদিস দ্বারা

ইবনে আকবাসের হাদিস রহিত হয়ে গেছে।

* অথবা, হযরত ইবনে আকবাস (রাহ)-এর এ ব্যাপারে জানা ছিল না, তাই তিনি

ব্যাখ্যা নিয়ম অনুযায়ী 'না' বলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু হুরায়ান (রাহ)

ছিলেন এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী।

* ইবনে আকবাসের সনদে 'মাতারুল ওয়ারাক' নামক একজন রাজবং রয়েছে।

ইমাম আহমেদ ইবনে হামাল, ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন এবং আবু হাতেমের মতে তিনি

হলেন রহিত রাজবং। (بغل المجاهد ج ২১৬)
ইমাম মালিক (রহ.)-এর দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) যায়েদ ইবন নাবিত (রাঃ)-এর হাদিস দ্বারা একাধারেই সিজ্জা না করার কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। হতে পারে কোন ওয়র্বন্ত তাত্ত্বিকভাবে সিজ্জা আদায় করেননি, পরে আদায় করেছেন।
(২) অথবা, তখন ছিল মাকরাহ সময়। ফলে তিনি তাত্ত্বিকভাবে সিজ্জা আদায় করেননি। (তন্মুল ৩৭৫ স।)

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবঃ লক্ষ্যীয় যে, তিনি সূরা হজ্জের যে আয়াতটি দ্বারা দ্বিতীয় সিজ্জা প্রমাণ করতে চান সে আয়াতটিতে রকু এবং সিজ্জার হুকুম একই সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন- "যাইহে তুমি লোকের আরম্ভ ও সেম্যূরে।" (হজ্জঃ ৭৭)
অথবা, এ যুক্তিগণে, তোমরা রকু কর এবং সিজ্জা কর। (হজ্জঃ ৭৭)
অকাল পরিহার করান এখানে তেলাওয়াতে সিজ্জা রয়েছে, সেখানে শুধু সিজ্জা অথবা শুধু রকুর কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং যেখানে উভয়টি একজন করা হয়েছে, সেখানে সিজ্জায় তেলাওয়াত নেই।

যেমন-

"যা মুক্ত করব প্রথম ও সে রকু ক্রমে মুক্ত করব।"

অর্থাৎ, এ মারইয়াম। তোমার পালনকর্তার উপাধি কর এবং রকুকারীদের সাথে সিজ্জা ও রকু কর। (আল-ইমরানঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে যেমন সিজ্জায় তেলাওয়াত নেই, তেমনি ভাবে “সূরা হজ্জ”-এর ৭৭ নং আয়াতেও সিজ্জায় তেলাওয়াত নেই।
কে এস্তুক বলা যায় যে, বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে যেহেতু সিজ্জার কথা পাওয়া যায়, তাই ফাতেহুল মুলহিমের গ্রহিকারসহ হানাফী মায়হাবের অভিজ্ঞ আলিমদের অভিমত হল, সত্তরতামূলক সিজ্জা করে নেয়াই ভাল। (فتح المعلم ج2 ص167)

* হানাফী মুখ্য আলাশাফ আলি ধানবী (রহ.) বলেন, যদি তিলাওয়াতকারী নামায়ের বাইরে হয়, তাহলে তার হজ্জ দ্বিতীয় সিজ্জার আয়াতেও সিজ্জা করে নেয়া উচিত। যদি নামায়ের মধ্যে হয়, তাহলে এই আয়াতে রকু করে নেয়া উচিত এবং রকুতিমেই সিজ্জার নিয়ম করে নেবে, যাতে এর আমল সকল ইমামের অনুসারী হয়ে যায়। (المعرفة ج5 ص83)

* তাছাড়া তার প্রদত্ত প্রথম দলীলের জবাবে আফুল হক ও ইয়াহিয়া ইবন সাইদ বলেন, হাদীসটি যত্ন। কেননা এটি হারিস ইবন সাইদ এবং আমুলাহ ইবন মুকাইন দু’জন রাজি রয়েছেন যারা অজাত। (تقديم ج1 ص365)
দ্বিতীয় দলিলের জবাবঃ উক্ত ইবন আমের (রাঃ)-এর সনদেও ইবন লাহিদাহ এবং মুসাররিফ ইবন হাইজান নামক যে দুজন রাবি রয়েছে উভয়ই দুর্বল। তাই ইমাম তিরামিভি (রহ.) বলেন, হাদিসটি তেমন শক্তিশালী নয়। (بدر المجهود ج ۲ص ۳۱۵)

* ইমাম শাকেফি (রহ.)-এর দলিল হিসেবে প্রদত্ত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদিসের জবাব স্বয়ং ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক রেওয়ায়তে সূরা সোযাদে সিজাদার প্রমাণ মিলে। (এজন্য ইমাম আবু হানিফার প্রদত্ত দলিল দ্বিতীয়) সুতরাং স্বতন্ত্র রেওয়ায়ত দলিলযোগ্য নয়।

* আর সূরা হজে তিনি যে দুই সিজাদার দাবীদার এর জবাব তাই, যা আহমদ (রহ.)-এর অভিমতের জবাবে প্রদান করা হয়েছে।

২০০ বিতর্কের নামায় সুন্দর

عنّ عْلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرآنِ أَوْتِرْوَا فَأَنَّ اللهُ وَقَرَّرَ يُيَحِبُّ الْوُتْرَةَ (ابو داود ج ۱ص ۳۱۱۰, ترمدي ج ۱ص ۱۰۲۰) باب ان الوتر ليس بحتم,

نمساي ج ۱ص ۲۴۶۰ باب الامر بالوتر، اين ماجة ص ۳۸)

অনুবাদঃ ... আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (سা) ইবরিশাদ করেছেন, হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতর্কের নামায় আদায় কর। কেননা আল্লাহ তাআলা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতরপ) কে ভালবাসেন।

বিশ্লেষণঃ বিতর্কের নামায় ওয়াজেরিফ না সুন্দর- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাকেফি, আহমদ ও সাহেবাইনের মতে, বিতর্কের নামায় সুন্দর, ওয়াজেরিফ নয়। (هداية ج ۱ص ۱۴۴ج، تنظيم ج ۱ص ۴۱۹)

দলিল

قَالَ عَبْدَةُ سَمَعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَمَسُ (۵)

صلواتٌ كتبهنَّ اللهُ عَلَى الْيَبَّادٍ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعَ مِنْهُنَّ شَيْئًا إِسْتَحَفَّا

يَحْقِهِنَّ كَانَ لَهُ عَنْدَ اللَّهِ عَهَدَ أن يُدَخِّلَهُمَا الْجَهَّلَةَ الْخَ (ابو داود ج ۱ص ۳۱۱۰)

অর্থাৎ, ... উবীদা ইবনুস সামিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (سা)-কে বলতে জেনি, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়ার্ড নামায় ফরয় করেছেন।
দলীল (২) হযরত আনস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

'আল্লাহ তালালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তালালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তালালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে

অর্থাৎ, তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল এবং রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাতালা বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত নামায় ফরয় করেনেন?

আল্লাহ তাতালা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায় ফরয় করেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর পূর্বে বা পরে কোন কিছু আছে কি?

জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাতালা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায় ফরয় করেন।

অতএব, বিতরির যদি ওয়াজিব হত, তাহলে নামায়ের সংখ্যা হ্যাঁ হয়ে যেত ছু।

দলীল (৩)

... আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে

অর্থাৎ, ... আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে

আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে আল্লাহ তাতালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে

আকলী দলীলঃ বিতরির নামায়ে না আযান আছে, না ইকামত আছে এবং না ইহা আদায়ের জন্য আলাদা কোন সময় আছে। আর এসব হচ্ছে সুন্দরতের আলামত। তাই বিতরিরের নামায় সুন্দরত।

* ইমাম আবু হানিফা, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনুল মুসায়িব (রহ.)-এর মতে, বিতরিরের নামায় ওয়াজিব, সুন্দরত নয়। (হেদায়া জ ১ সো, ১৪৭, নুসরা জ ১৪০, ১১ ই মহা ৩)
দলীল (৩)ঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।
উক্ত হাদিসে বিতর আদায়ের ক্ষেত্রে আমর (নির্দেশ)-এর তীর্থা বর্ণিত হয়েছে। আর আমর ব্যবহৃত হয় ওয়াজিব বুদন্তোর জন্য। সুতরাং বিতরের নামায ওয়াজিব। (আইনী রহ. বলেন, যার একটি আয়াত মুখ্য আছে, সেও আহলে কুরআন। সুতরাং আহলে কুরআন বলতে শুধু হাফজেই নন)
নামায অধ্যায়

রাসূল ﷺ জিন্দিন, যে ব্যক্তি নিজে বা তাদের কারণ বিতরের নামায আদায় করেন, সে যেন তা সুরক্ষিত হওয়ার পরেই আদায় করে নেয়।

উক্ত হাদিসে বিতরের কায়া আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কায়ার হুকুম ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রমোজা, সুন্দরতের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, বিতর ওয়াজিব- সুন্দর নয়।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন, তাঁদের প্রদত্ত দলীলসমূহ দ্বারা এটিকে বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াজিব নামায ব্যতীত আর কোন ফরয নামায নেই। আর বিতরকে তো আমরাও পাঁচ ওয়াজিব নামাযের মত ফরয মনে করি না এবং এর অধীকারকারীকে কাফেরও বলি না। সুতরাং এর দ্বারা তো বিতরের নামায ওয়াজিব না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

* অন্য উক্ত হাদিসসমূহ বিতর ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের হাদিস।

আকলী দলীলের জবাবঃ আযান-ইকামত শুধু ফ্রেস বিশ্বাস সম্পন্ন পাঁচ ওয়াজিব নামাযের ক্ষেত্রেই প্রমোজা। বিতর যেহেতু ওয়াজিব এবং এরার নামাযের অধীন, তাই এরার আযান-ইকামতই এর জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এর দ্বারা বিতর ওয়াজিব না হওয়ার দলীল হতে পারে না। (তন্তুম জ চ ৩২, ওয়াজিব জ চ ১২)

বাস্তবতা হল, এই একতেলাফ কার্য শুধু শুঙ্ক পার্থক্যের পর্যায়ে। এর উদ্দেশ্য হল, তিন ইমামের মত সুন্দর এবং ফরযের মাঝে আদিক বিষয়ের কোন তর নেই।

তাই তাঁর এর জন্য সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেছেন। পক্ষাত্তে ইমাম অবু হানিফা (রহ.)-এর মত এ দুটির মাঝে ওয়াজিবের একটি তর রয়েছে। তাই তাঁর এর জন্য ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিন ইমামও বিতরকে সবচেয়ে সুন্দর পূর্ব সুন্দর মনে করেন। আর হাদিসের এর ফরযাহিয়াতের প্রবন্ধক নন। ফলে এতে অধীকারকারীকে তাঁরা কেউই কাফের বলার প্রবন্ধ নন। অতএব, উভয়ের মাঝে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। (তন্তুম জ চ ৩২)
বিতরের নামায়ের রাকাত সংখ্যা কত

... উন্ন এবং অব্যর্থ অনেক রক্ষা সহ তার নামায়ের রাকাত কত সংখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে।

(সমস্ত বিতরের নামায়ের রাকাত সংখ্যা 2০১)

বিশ্লেষণ:

বিতরের নামায় কয় রাকাত, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

* ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ ইবন হাশুল (রহ.)-এর মতে, বিতরের নামায় এক থেকে তের রাকাত পর্যন্ত পাড়া জাওয়া যায়।
* তবে তাদের সাধারণ নিয়ম হল এই যে, দুই সালামের দ্বারা তিন রাকাত পাড়া।
* প্রথম দুই রাকাত এক সালামে এবং অবশিষ্ট এক রাকাত এক সালামের দ্বারা।
* উল্লেখ নামায়ের রাকাত এক রাকাত হওয়ার উপর অধিক জ্ঞান দেন।

তাঁর নিকট বিতরের তাহজুদ নামায়ের অধিনে।

এছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) থেকে এক রাকাতের ব্যাপারে তেমন সমর্থন পাওয়া যায় না।

(মোহর্স সেন জ ২২ সং)


dালীল (২) অনুযায়ী এদের গুরুত্ব বর্জিত হাদিস।

(২) অনুমোদন করবেন না।
দলীল

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বররী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, বিতরের নামায় দুই বৈধকালে এক সালামের সাথে তিন রাকাত। ইহা তাহাজাতের অধীনে নয়, বরং একটি বজ্ব্বন নামায়। আর এক রাকাত বিশিষ্ট কোন নামায় নেই।

(তন্তুম অহসাস জ ১:২০, টরমিদি জ ২:১৬)

দলীল

... গুন আহ্বানে কবর কান রসূল আল্লাহ সালাম বৈধ ও সালাম মুজাহির প্রেম

(১) আশ্রম রুখে অতি তুলে স্বল্প যাহা আল্লাহ সালাম রুখে স্বল্প যোগ বস্তু

(৫) অর্থাৎ, ... ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বররী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, বিতরের নামায় দুই বৈধকালে এক সালামের সাথে তিন রাকাত। ইহা তাহাজাতের অধীনে নয়, বরং একটি বজ্ব্বন নামায়। আর এক রাকাত বিশিষ্ট কোন নামায় নেই।

(তন্তুম অহসাস জ ১:২০, টরমিদি জ ২:১৬)

দলীল

... গুন আহ্বানে কবর কান রসূল আল্লাহ সালাম বৈধ ও সালাম মুজাহির প্রেম

(৫) আশ্রম রুখে অতি তুলে স্বল্প যাহা আল্লাহ সালাম রুখে স্বল্প যোগ বস্তু

(১) অর্থাৎ, ... ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বররী ও ইবন মুবারক (রহ.)-এর মতে, বিতরের নামায় দুই বৈধকালে এক সালামের সাথে তিন রাকাত। ইহা তাহাজাতের অধীনে নয়, বরং একটি বজ্ব্বন নামায়। আর এক রাকাত বিশিষ্ট কোন নামায় নেই।

(তন্তুম অহসাস জ ১:২০, টরমিদি জ ২:১৬)
দলীল (২) অনুযায়ী, বাবার কথা বললেন যে, নিজের আত্মহিত্যা করেছেন তাদের শুল্ক। আদমের পর্যায়ে নিজের আত্মহিত্যা করেছেন। এই কথা বললেন তার পরে তিনি একে সাবধান হয়েছিলেন যে তাদের আত্মহিত্যা করেছেন।

দলীল (৩) অনুযায়ী, বাবার কথা বললেন যে, নিজের আত্মহিত্যা করেছেন। এই কথা বললেন তার পরে তিনি একে সাবধান হয়েছিলেন যে তাদের আত্মহিত্যা করেছেন।

দলীল (৪) অনুযায়ী, বাবার কথা বললেন যে, নিজের আত্মহিত্যা করেছেন। এই কথা বললেন তার পরে তিনি একে সাবধান হয়েছিলেন যে তাদের আত্মহিত্যা করেছেন।
অর্থাৎ, আমি আরিশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (ص) রাত্রিতে বিতরসাহ কত রাকাত নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, তিনি (ص) চার রাকাত ও তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন এবং কখনো ছয় রাকাত ও তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন এবং কখনো আট রাকাত ও তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন এবং (কোন কোনসময়) তিনি মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন।

এই হাদিস দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহাতুরের রাকাতের সংখ্যা পরিবর্তন হতো, কিন্তু বিতরের তিন রাকাতের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বরং বিতরের সবদাই তিন রাকাতেই নির্দিষ্ট আছে।

দলীল (৫) ইমাম আহমদ (রহ) নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

{عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلىصلاة نخل المئون
 ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ثم أوتي پثلاث لا يفصل

بيفتهن}- (آثار السن ص ১২)

অর্থাৎ, আরিশা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ص) যখন এশার নামায পড়তেন তখন ঘরে প্রবেশ করতেন। তারপর দু'রাকাত নামায পড়তেন। এরপর এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ আরো দু'রাকাত আদায় করতেন। তারপর একেবারে ব্যাখ্যা ব্যতীত তিন রাকাত বিতর পড়েছেন।

দলীল (৬) হযরত আরিশা (ر) বলেন-

{إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي اليوتـر}- (ساني ج ص ২৪৮)

পিতে কিছু বিতর তিনবার

অর্থাৎ, নবী করিম (ص) বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।

দলীল (৭) হযরত আরিশা (ر) বলেন-

{قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوتـر ثلاث كثلاث المغارب}- (مجمع الزواج ج ২) (ص ২৪২)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (ص) ইরাশাদ করেন, বিতরের মাগরিবের ন্যায় তিন রাকাত।

ইবন আল্বাস (ر) বলেন- {اليوتـر كصلوته المغارب}- (مطا مام محمد ص ১৪৬)

অর্থাৎ, বিতরের মাগরিবের নামাযের মত।

উক্ত হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, বিতরের তিন রাকাত নামাযকে মাগরিবের তিন রাকাত নামাযের ন্যায় এক সালামে আদায় করা হবে।
জোরাণে প্রথম দুই দলিলের জবাবে আহনাফুগণ বলেন যে, দুই রাকাতের সাথে আরেক এক রাকাত মিলিয়ে মোট তিন রাকাত আদায় করে নিবে। এ উদ্দেশ্যে নয় যে, পৃথকভাবে এক রাকাত পড়ে নিবে।

হানাফীদের অভিমতের সমর্থন এই কথার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) ও উক্ত হাদিসের রাবী। (مسلم ١:٣٧)

তিনি (রাঃ) বিতর্কের নামায এক সালামে তিনি রাকাত হওয়ার দাবিদার। কেননা, তিনি নবী করিম (صلى)**আর রাবীর নামায বর্ণনা করার পর বলেন-**

"তোমাদের রক্ষা মনে আর লিল" (রাঃ) দ্বারা এই কথার সস্ত্রনয়ন বলেন যে, হানাফীদের অভিমত গুরুত্ব করেছেন।

তাছাড়া শরিয়তে এক রাকাত বলতে সমান নামায নেই। (مؤقت محمد ص ١:٤٦)

বরং নবী করিম (صلى) এক রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবন আসুল বাবাহ্যতে আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

> "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَُهِي غَيْبَةً عَنَّ الْبَيْنِينَ؛ أَن يُصِبُّ الْرُّجَلُ رَكْعَةًِ

> وَاحِدةٍ تُوْتَأُرْ يَِبَاٍ - (نصب النواب ٢:٢٠)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (صلى) বুতায়র থেকে নিষেধ করেন। আর বুতায়র অর্থ হল, এক রাকাত বেঝাড় নামায পড়া।

সুতরাং এক রাকাত বিতর্কের নামায শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয় দলিলের জবাবে ইমাম তাহরী (রহ.র) বলেন, উক্ত হাদিসটি রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (شرح معاني الاداع ١:١٤٥)

এবং তিন রাকাত বিতর্কের নামাযের ইজমা হওয়ার ব্যাপারে হযরত হাসান বসরী (রহ.র) বলেন-

> "اجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلیَّ أَنَّ ٱلْوُتَأَرَ ثَلَاثَ لاَ يُسَلَّمُ إِلَّا فِيَ أَخْرِهِنَّ" - (مصنف ابن أبي شيبة)

অর্থাৎ, মুসলমানদের একাধারে একমাত্র হয়েছেন যে, বিতর্কের নামায তিন রাকাত এবং সালাম শুধু (একটি) তৃতীয় রাকাতের শেষে।

এখানে "اجمع المسلمون" বলতে সাহাবায় কিরাম তথা আবুবকর, ওমর, আলী, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, হুয়ায়ফা, আনাস, ইবন কাব, আরিশা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী ও তাবিক্তনদের বুঝানো হয়েছে।
তাহাতে একথা তো সহজেই বোধগম্য যে, একই নামায কখনো পাঁচ রাকাত, কখনো সাত রাকাত, কখনো তিন রাকাত, আবার কখনো এক রাকাত হওয়া কিভাবে সম্ভব?

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ হযরত আলুমাহার ইবন উমর (রাও)-এর আহারের ব্যাপারে মূল কথা হল, ইবন উমর (রাও) স্বয়ং নবী করিম (সাও)-কে এমনিভাবে নামায পড়তে দেখেননি এবং নবী করিম (সাও) থেকেও এই আমল শেখেননি। সুতরাং এটা ছিল তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ।

উক্ত হাদীসের প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, নবী (সাও) যখন তাশাহুদের মধ্যে যে সালাম রয়েছে，“ السلام عليك يا النبي” উচ্চারণ করলেন, এটাকে তিনি নামায ভঙ্গে সালাম মনে করেছেন।

* তিনি রাকাত বিতরে দুরাকাতে সালাম দিয়ে মাঝখানে পৃথককরণের হাদীস বর্ণনাকারী শুধু হযরত ইবন উমর (রাও)। পক্ষান্তরে, ইবন মাসউদ, উবাই ইবন কাব, আনাস (রাও) সহ বিশিষ্ট সাহাবীগণ এক সালামে তিন রাকাত বিতরে আদায়ের প্রবন্ধ। সর্বোপরি নবী করিম (সাও) এভাবেই আদায় করতেন।

তাছাড়া পৃথক করে যদি নামায পড়া হয়, তাহলে শেষের নামায হচ্ছে এক রাকাত, যা হাদীসে বুতায়রার (এক রাকাত নিষেধাজ্ঞার) বিপরীত। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়া উসূলে হাদীসের ফাযসালা হল, হাদীসে বুতায়রা হচ্ছে বাচনিক। আর ইবন উমর (রাও)-এর হাদীস হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ক্রিয়ামূলক হাদীসের উপর বাচনিক হাদীস প্রধান্যা লাভ করবে।

ইবন উমর (রাও)-এর হাদীস হচ্ছে হালাল সম্পর্কিত, আর হাদীসে বুতায়রা হচ্ছে হারাম সম্পর্কিত। আর যখন হালাল এবং হারামের মধ্যে দুটি দেখা দেয়, তখন হারাম সম্পর্কিত হাদীস প্রধান্যা লাভ করে। সুতরাং এ সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইবন উমরের রেওয়ায়েত দলীলযোগ্য নয়।

তাছাড়া বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় করলে বুঝা যায় যে, নবী করিম (সাও)-এর রাও’র নামায এবং বিশ্বের রেওয়ায়েতকারী সাহাবার অনেক। যাঁদের মধ্যে হযরত আরিশা (রাও), উবাই সালামা (রাও), হযরত ইবন উমর (রাও) এবং হযরত ইবন আক্সাস (রাও) প্রথম অন্যতম। এখন দেখতে হবে যে, তাঁদের মধ্যে কার রেওয়ায়েত অধিক গণিতীয় এবং ফাযসালা যোগ্য।

সুতরাং যিনি সর্বদা দলীলকে থেকে নবী করিম (সাও)-এর নামায সচেত্তে দেখেছেন, তাঁর রেওয়ায়েতই অধিক গণিতীয় যোগ্য হবে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হযরত আরিশা (রাও) নবী করিম (সাও)-এর বিতরের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। কেননা, তিনি দীর্ঘ সময় নবী করিম (সাও)-এর সাক্ষী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও
বিরনির্ণয়ের নামায় দুআ কুনুত

... প্রেরণ করার জন্য বিনোদনের উদ্দেশ্যে শরীফ মোহাম্মদ রশুদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ (র) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হল, হানাফী মায়াহাবাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

(দৃষ্টি মশকুজ ২৪ সংখ্যা ১১৬-১১৭)

বিশেষায়িত উক্ত অনুচ্ছেদে দুআ কুনুতের ব্যাপারে দুইটি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

(ক) বিশেষায়িত দুআ কুনুত সারা বছরের পাল্টে হবে নাকি রমজানের শেষ অর্ধেকে।

(খ) দুআ কুনুত কুনুত আর না হবে?

প্রথম আলোচনায় ইমাম মালিক (র.হ.) এর মতে, দুআ কুনুত সারা বছর নয়, বর্গ সুই রমজানের শেষ অর্ধেকে পড়া হবে। আর ইমাম মালিক (র.হ.) এর মতে, স্বামী পুরা রমজানে পড়া হবে।

(মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ (র.হ.) থেকে তাঁর কোন কোন বস্তুর সূচে বর্তিত, উত্তর ইবনে কাব (র) রমজানে তাদের ইমামতি করতেন এবং শেয়ার্ডে দুআ কুনুত পাঠ করতেন।

(দৃষ্টি মশকুজ ২৪ সংখ্যা ২৪২)
অহকামুল হাদিস

নামায অধ্যায়

দলীল (২) অর্থাৎ, হাসান বসরী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাজাব (রাঃ) লোকদেরকে উড়াই ইবন কাবের পিছনে তারবীর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ... এবং তিনি রময়নের বাকী শেষ দশদিন বিষয়ের নামায দু’আ কূন্ত পাঠ করতেন।

দলীল (৩) হযরত আলী (রাঃ)-এর আহার-

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাউরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বিষয়ের কূন্ত রময়নের সহ সারা বছরই পড়তে হবে।

(মুসলিম নামায ৪, ২৪।)

দলীল (১) অনুচ্ছেদের গুরতে বর্ণিত হাদিস।

উত্তর হাদিসে রময়ন বা রময়নের অর্থে সময় পড়া হবে এমন কোন সময় নিদিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং বিষয়ের কূন্ত সারা বছরই পড়তে হবে।

দলীল (২) হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রাঃ)-এর আহার-

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাউরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, বিষয়ের কূন্ত রময়নের সহ সারা বছরই পড়তে হবে।

(মুসলিম নামায ৪, ২৪।)

অর্থাৎ, তিনি সারা বছরই বিষয়ের রকুর পূর্বে দু’আ কূন্ত পড়তেন।

জবাবঃ আহানাকরের পক্ষ থেকে শাফেইদের প্রথম ও তৃতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত উড়াই ইবন কাব (রাঃ)-এর রময়নের কূন্ত দ্বারা বিষয়ের কূন্ত উদ্দেশ্য নয় বরং কূন্ত পাঠে দীর্ঘ কিয়াম বুঝানো উদ্দেশ্য। কেনাকে দীর্ঘ কিরাতকেও কূন্ত বলা হয়। এমনিতে তৃতীয় দলীল হযরত আলী (রাঃ)-এর উত্তরও তাই। অর্থাৎ, তারা রময়নের শেষের মধ্যে কূন্ত দীর্ঘ কিয়াম করতেন, সাধারণত অন্যান্য দিনে তা করতেন না।

তাহাতে প্রথম হাদিসের সনদে বলা হয়েছে, হাদিসটি “তাঁর কোন কোন বদ্ধ সূত্রে” বর্ণিত। আর ইহা একটি অজ্ঞাত ব্যাপার। সুতরাং ইসলামী সনদে যায়।

বিতৃত দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদিসটি মূলত বিচ্ছিন্ন (বিচ্ছিন্ন)। কেনাকে, হাদিসের সনদ হাসান দ্বারা হাসান বসরীকে বুঝানো হয়েছে। অতএব তাঁর সাথে উমর (রাঃ)-এর
* যেখানেই কুন্নুতের কথা উলেখ রয়েছে সেখানেই শব্দের উলেখ রয়েছে।

যা অব্যাহত চলমানের নিদর্শক। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, দুআ কুন্নুত নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন বা মাস হিসেবে পড়া হবে না। বরং সারা বছরই পড়তে হবে।

তাছাড়া কিয়াসের চাহিদাও এই যে, দুআ কুনুত সারা বছরই পড়া হেক। কেননা বিতির মেহেতু সারা বছর, তাই দুআ কুনুতও সারা বছর হওয়াই উচিত।

(নিয়ম ২ সং ১০২)

বিতীয় আলোচনায় দুআ কুনুত রকুর আগে না পরে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা-

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও ইবন সীরীন (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনুত পড়তে হবে রকুর পরে।

দলীল (১) দারা কুতুনীতে বর্ণিত। হযরত সুয়াইদ ইবন গাফলাহ বলেন-

সমুন্ন আবা বকর উমর উসমান ও আলী (রাও) কে বলতে শুনলো নবী করীম (সাও) বিতিরের শেষের দিকে দুআ কুনুত পাঠ করেছেন।

দলীল (২) হযরত আলী (রাও)-এর আহর-

২৫ প্রচুর বয়েজ রকাওদ- (রবিদি ১ চস ১০২)

অর্থাৎ, আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাও)-কে বলতে শেষের দিকে দুআ কুনুত পাঠ করেছেন।

দলীল (২) সুয়াইদ ইবন গাফলাহ-এর হাদিস-

২৫ প্রচুর বয়েজ রকাওদ- (রবিদি ১ চস ১০২)

অর্থাৎ, যে হযরত আলী (রাও) রকুর পরে দুআ কুনুত পড়তেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দুআ কুনুত রকুর পূর্বে পড়তে হবে। ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.) থেকে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

দলীল (১) উবাই ইবন কাব-এর হাদিস-

২৫ প্রচুর বয়েজ রকাওদ- (রবিদি ১ চস ১০২)

অর্থাৎ, নবী করীম (সাও) বিতিরের রকুর পূর্বে দুআ কুনুত পড়তেন।

দলীল (২) মুসামারাফ ইবন আবু শায়বাতে হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত আছে-
আহকামুল হাদিস

নামায অধ্যায়

۳٢١

েন আব্বন মসাুযো ও অস্হাক তুুিযো সুল্লাহ উল্লাহে ওসুল্লাহ কানুনোীযো পিয়াতুনোী ফি যাঁ ষোলো কীবল

রুকোও য়ু (৭৮ অফ সাুদ সংলত ৮৬)

অর্থাৎ, ইবন মাসউদ (রা) এবং নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য সাহাবীগণ বিতরের রুকুর পূর্বে দুুী কূযুত পড়তেন।

জবাবঃ আহানখণ্ড শাফেইদের প্রদর্শন প্রথম দলীলের জবাবে হেদায়া প্রণেতার ভাষা বলেন, বিতরের শেষের দিক বলতে রুকুর পরে হওয়া বুদ্ধানো আবশ্যক নয়। বরং এর দরা তৃতীয় রাকাট বুদ্ধানো উদেশ্য। কেননা, কেন জিনিসের অর্ধেকের বেশি হলেই তাকে আখ্যায় বা শেষ বলা যাবে। অতএব, রুকুর পূর্বে যদি কূযুত পড়া হয়, তবে একেও আখ্যায় বলা সহী হবে। আর হানাফীদের হাদিসে তাই বুদ্ধানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ রুকুর পরে কূযুত পড়া ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর নিজের ইজতিহাদ। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে শুধুমাত্র এক মাস কনুতে নাযিলা। (যা মুসলমানদের বিপদের সময় পড়া হয়) পড়তে দেখেছেন। আর এর উপরই তিনি (রাঃ) বিতরের কনুতকে কিয়াস করেছেন। যা হানাফীদের মারফু হাদিসের মুকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়। কনুতে নাযিলাতে আমরাও (আহানখণ্ড) রুকুর পরে কূযুত পড়ার প্রবন্ধ।

(দৃস তুমিদি জ ২৩:১০২-৬৭)
যাকাতের অভিধানিক অর্থে রকাতের শব্দটির তুর্কীয় অর্থ "রাকা"। এর মূল ধাতু হল তা যা বাংলা বা উর্দু নারু থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ হল- পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা।

* "লিসানুল আরব" গ্রন্থকারের মতে, যাকাত শরীরের অর্থ হল- (১) বৃদ্ধি পাওয়া, পরিমাণে বেশি হওয়া।

(২) পবিত্রতা। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত- অর্থে, যে নিজেকে শুরু (পবিত্র) করে, সেই সফলকম হয়। (আশ-শামসুং ৯)

(৩) বরং, প্রাচুর্য।

(৪) অর্থে গুণকীর্তিন বা প্রশংসা।

* আরু আলী বলেন, যাকাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, খাঁটি, নিষ্ণুত বা নিভীজল।

* কেউ বলেন, যাকাত শরীরের অর্থ হচ্ছে - অভিধানিক বা দান।

* কারো কারো নিকট এর অর্থ হচ্ছে সংকুচিত বা উত্তম বহুল!
যাকাতের পরিভাষিত সংজ্ঞাঃ

টেল্লোক জুরে মাল উপহার নিজের নিজের বাসতি নয় নিজের বাসতি নয় নিজের বাসতি নয় নিজের বাসতি নয়।

আর্থিক, শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী মালের এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলমান দরিদ্রকে নির্দিষ্টভাবে প্রদান করা যাতে কোন উপকারের আশা না থাকে। পরব লোকটি হামশেমি বা তাদের গোলাম হবে না।

* ইসুফ আল কারিমাবাদ বলেন-

الرَّكُوَّة تُنْطِلُ عَلَى الْحَصْصَةِ المُقَدْرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِيْ فَرَضَهَا اللَّهُ لِلسَّتَّاحِقِينَ

আর্থিক, প্রকৃত অধিকারীকে শরীয়ত নির্দিষ্ট সম্পদ দেয়াকে যাকাত বলে।

* আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন-

الرَّكُوَّة حَقُّ يَحْبِبُ فِي النَّمَالٍ

আর্থিক যাকাত এমন দায়িত্ব যা মালের উপর ওয়াজিব হয়।

* লুবব গুলকাব বলেন-

تَعْمَلُكُ جَزِّ مُخْصُوصٍ مِن مَالِ مُخْصُوصٍ لِشَخْصٍ

مَخْصُوصٍ لِلَّهِ تَعَالَى – (আল্লাহ জুনি) ১/১

আর্থিক, ক্ষমাহীন আল্লাহ তাআলার সন্তঃষ্ট উদ্দেশ্যে সুনিদিল ব্যক্তিকে সুনিদিলকারের একটি নির্দিষ্ট অংশের মালিক বানিয়ে দেয়।

* আল্লামা আইনী (রহ) বলেন, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার সম্পদ থেকে নির্ধারিত কিছু অংশ পরিবর্দ্ধন মধ্যে দিয়ে দেওয়া, তবে তা হতে হবে হামশেমি পরিবার ব্যতীত।

মূল কথা হল, কোন সাহেবে নিসাব মুসলমান নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বায় মিটানোর পর বছরের মধ্যে নির্নয় নতুন পক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তার সম্পরিমাণ আর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন-সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত আটটি থাকে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

* যাকাত কখন কোথায় ফরয় হয়ঃ যাকাত কখন, কোথায় ফরয় হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। যথা-

* ইবনে হুয়াইমা বলেন, 

إِنْ فَرِضْ الرَّكَاةَ كَانَ فَيْلَ اللَّهِ ﻟَعَلَى
অর্থাৎ যাকাত হিজরতের পূর্বেই (মক্কায়) ফরম হয়েছিল।

যাকাত অধ্যায়

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী—"তাদের সালাম প্রেরণা এবং বাজার দাও।" (মুয়ামিলঃ ২০)

আর সূরা মুয়ামিল ইসলামের শুরুর দিকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

দলীল (২) উম্মে সালামা (রাঘ) হতে সাহাবীদের আবিসিনিয়া হিজরতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হযরত জাফর ইবন আবু তালিব (রাঘ)

কর্তৃক নাজাশীরীর রাজদরবারে প্রদত্ত তাতে তিনি বলেছেন—

অর্থাৎ, নবী করিম (সাঘ) আমাদেরকে নামায় ও যাকাতের আদেশ করেন।

* জমুরসের মতে, হিজরতের পরে মদিনাতেই যাকাত ফরম হয়েছিল। তবে কত হিজরীতে যাকাতের বিধান প্রমাণ হয় তা নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রদান করেন। যেমন—

* কেউ কেউ ধারণা করেন, ১ম হিজরীতে যাকাত ফরম হয়।

* ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হিজরীর দ্বিতীয় সালে যাকাত ফরম হয়।

* আল্লামা ইবন আহীর (রহ.) বলেন, যাকাত নবম হিজরীতে ফরম হয়।

(ফজ বাহর জ ৩ সং)

দলীলঃ নবী করিম (সাঘ) জনৈক সাহাবীকে যাকাত সংগ্রহে পাঠালে সালাবা যাকাত প্রদানে অবৈকার করে। আর এ ঘটনা ঘটে নবম হিজরীতে। সুতরাং যাকাত নবম হিজরীতে ফরম হয়েছিল।

* হাফিজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, নবম হিজরীর পূর্বে তথা পঞ্চম হিজরীরও পূর্বে যাকাত ফরম হয়।

দলীলঃ ইমাম ইবন সালাবি (রাঘ)-এর হাদিস—

(খাতর জ ১৫ বাপ গবরের খোরুম)

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে নিদর্শ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের নিকট থেকে এই সদকা উসূল করে আমাদের ফকিরদের মাঝে তা বন্ধ করতে?

আর হযরত ইমাম ইবন সালাবি (রাঘ) মদিনা তায়িবায় এসেছিলেন পঞ্চম হিজরীতে। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায় করা এবং বন্ধনের বিধান পঞ্চম হিজরীর পূর্বেই হয়েছিল।
যাকাত কার্য উপর ফরয়?
যাকাতের বিধান সকলের উপর সমভাবে প্রয়োজ্য নয়। বিশেষ কিছু শারীরিক বিবেচনায় যাকাতের বিধান প্রয়োজ্য হবে। যাহঁঃ
(১) মুলমান হওয়া। কাফেরের উপর যাকাত ফরয়। কারণ, কাফের ইসলামের বিধি-বিধান পালনে বাধ্য নয়।
(২) স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া। সুতরাং কোন পরাধীন গোলামের উপর যাকাতের বিধান প্রয়োজ্য নয়।
(৩) বালেগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।
(৪) জানসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং কোন অজ্ঞান, মাতাল বা পাগলের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান প্রয়োজ্য নয়।
(৫) পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া। যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে যাকাত ওয়াজিব হবে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অর্থাৎ, যাবতীয় প্রায়োজন পূর্ণের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা সম্পদের মালিক হওয়া।
(৬) নিসাব এক বছর ঝারী হওয়া। নবী করিম (সা) ইব্রাহিম করেন-

লেস ফি মাল রকোতা হত্তি জই হোলা উল্লেহ ইন্হোল- (আবু দাবুল জ ২২১ বাব ফি রকোত

সাতমী, তুর্কেদি জ ১২৮ বাব লা রকোত উল্লেহ ইন্হোল)

অর্থাৎ, যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।
(৭) ঋণগ্রাহ না হওয়া। ঋণগ্রাহ্য ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয় নয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত:
স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবঃ ধর্মে শারীরিক বিবেচনা একাধারের উপর ঐকমত্যা পোষণ করেছেন যে, কাফের গৃহে যদি ২০ মিসকাল স্বর্ণ পুরোপুরি এক বৎসরের অতিবাহিত হয় তাহলে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ হিসেবে আধা মিসকাল যাকাত দিতে হবে। ২০ মিসকাল যার বর্তমান হিসাব
দলীল (২৪): অনুজ্ঞানের শুরুতে বর্তিত হাদিস। এছাড়াও এ ব্যাপারে অনেক মারফু হাদিস রয়েছে।

* নিসাবের অতিরিক্ত সর্ব ও রূপার যাকাত কারা নিকট যদি ২০ মিসকালের অতিরিক্ত সর্ব এবং ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত রৌপ্য থাকে, তবে এর যাকাতের বিধান কি হবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, ২০ মিসকালের অতিরিক্ত যদি এক মিসকালও থাকে এবং ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত এক দিরহামও থাকে, তাহলে সেই অতিরিক্ত প্রতি মিসকাল ও প্রতি দিরহামের জন্য হিসেবে মতে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। (তন্তুমুল অশনি ২ সং) (২৫)

দলীল৪ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হযরত আলী (রা)-এর হাদিস।

কেন হেক অথবা বেশি হেক।
লেস কিন্তু দুই আরু না মানাতে পারিস চলা 

লেস কিন্তু দুই আরু না মানাতে পারিস চলা

ফিন আরু লাক্ষিক কিন্তু কল আরু লাক্ষিক দেখিও

* এইমান আবু হানিফা, হাসান বসরী, আত, তাউস, যুহরী, আওয়াঈ, শাবী (রহ.)
* প্রমুখের মতে, ২০ দিনারের পর যদি অতিরিক্ত ৪ দিনার হয়, তাহলে প্রতি ৪
* দিনারের জন্য ১ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এমনিভাবে ২০০ দিরহামের অতিরিক্ত
* যদি ৪০ দিরহাম হয়, তাহলে প্রতি ৪০ দিরহামের জন্য ১ দিরহাম যাকাত দেয়া
* ওয়াজির। মূল কথা হল, নিসাবের অতিরিক্ত প্রতি এক পঞ্চমাংশে ঐ হিসাবেই
* (২.৫%) যাকাত দেয়া ওয়াজির।

ছলিল এক নবি করিম (সা) ইরিশাদ করেন

অর্থাৎ, কোন যাকাত হবে না চার মিসকালের কম স্বর্গে।

ছলিল এক মাকাহুল হতে বর্ণিত আছে

ফিন আরু লাক্ষিক কিন্তু কল আরু লাক্ষিক দেখিও

ছলিল এক নবি করিম (সা) ইরিশাদ করেন

অর্থাৎ, ২০০ দিরহামের উপর বেড়ে গেলে প্রতি ৪০ দিরহামের জন্য ১ দিরহাম
* পরিমাণ যাকাত প্রদান করতে হবে।

জবাবঃ (১) ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর প্রদত্ত হাদিসে আসেম ও হারেস
* দুটি রাবি রয়েছেন, যারা সমালোচনার উদ্দেশ্যে নন।

ছলিল এক নবি করিম (সা) ইরিশাদ করেন

ফিন আরু লাক্ষিক কিন্তু কল আরু লাক্ষিক দেখিও

* প্রসঙ্গী উল্লেখ যে, কারও নিকট স্বর্গ ও রৌপ্য উভয়টি থাকলে এবং এর কোন
* একটির পরিমাণ এককভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে তখন যাকাত আদায় করতে
* হবে কিনা, এ নিয়ে সানায় মতভেদ থাকলেও ইমাম আবু হানিফা, মালিক,
* আওয়াঈ, সুফিয়ান সাওরী, সাহেবাইন (রহ.) প্রমুখের মতে, এমতাবস্থায় স্বর্গ ও
* রৌপ্য উভয়টি মিলিয়েও যদি কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয়, তবু তাকে যাকাত
* দিতে হবে। তাঁদের কথা হল, স্বর্গ ও রৌপ্য উভয়ই একই জাতের ধাতু। আর
* উভয়টি মিলে নগদ অর্থের পরিণত হয়। সত্তরাং বর্তমানে যেহেতু রৌপ্যের নিসাব
* ধরলে একজন সহজেই সাহেবে নিসাব হয়ে যায়, তাই সারে বায়ান তোলা রৌপ্য
* বা এর সমপরিমাণ টাকা (অনুমানিক আট/দশ হাজার) যদি কারো নিকট বছরের
গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে, যদিও মাঝে কম-বেশি হয়, তাহলে উন্ন টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। মূল কথা হল, যে নিসাব (পরিমাণ) ধরলে গরিবদের বেশি উপকার হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেননা, যাকাতের মূল উদ্দেশ্যই হল গরিবদের সহায়তা করা।

(হেদায়েত ১ সং ১৫০)

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় হয় সকল মালের উপর যাকাতের বিধান ওয়াজিব নয়। প্রতোক সাহেবে নিসাবের উপর যাকাতের বিধান ফরম করা হয়েছে। এ বিধানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সমদ। মহান আল্লাহ রাখবুল আলামীন সকল সম্পদের উপরই মানুষের জন্য যাকাতের বিধান আরোপ করেননি। এক্ষেত্রে যে সকল মালের উপর যাকাতের বিধান প্রয়োজন নয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হল-  

১. আবাসিক গৃহম মানুষ বসবাসের জন্য এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যে গৃহ তৈরি করে তার উপর যাকাতের বিধান প্রয়োজন নয়। তা যতই মূল্যবান হয়ে না কেন।

২. পরিধেও পোশাকঃ যে সকল বস্ত্র মানুষ নিজের পরিধানের জন্য তৈরি বা ক্রয় করে, উহা যত মূল্যেরই হয়ে না কেন, আর যে পরিমাণই থাকুক না কেন, তার উপর যাকাত দিতে হবে না। যেমন- কোট, প্যান্ট, শাড়ি, শেরওয়ানী, মুকুট, চাদর, কশ্মীর, টুপি, জামা, জুতা ইত্যাদি।

৩. কৃষিপণ্যের যাকাতঃ কৃষিকাজে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জামদির (যেমন- গরু, মহিষ, উট, লাঙ্গল, কোদাল, কুড়ি, কাচি ইত্যাদি) উপর যাকাতের বিধান প্রয়োজন হবে না। কেননা, এগুলোর যাকাত তুমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসল হতেই উর্ধ্ব হিসেবে আদায় হয়ে যায়।

৪. ব্যবহৃত আসবাবপত্র নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্রের (যেমন- খাট, চেয়ার, টেবিল, আলানা, সোফা, সুকেস, আলমারী, সিপুক, ঘড়ি, কলম ইত্যাদি) উপর যাকাত ফরম নয়।

৫. শেয়ার বস্তুঃ কেউ যদি শেয়ার করে হারাজ বা পুকুরের মাছ পুছে অথবা শেয়ারের বাঁশ মুরগী বা পাখি পুছে তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

৬. বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশুঃ যে সকল পশু বাহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, (যেমন- গাড়ি, ঘোড়া, খচ্ছ ইত্যাদি) এ সকল পশুর উপরে যাকাত দিতে হবে না।

৭. হাঁস-মুরগীঃ কেউ যদি হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করে ডিম উৎপাদন এবং বিক্রির উদ্দেশ্যে, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। তবে ফার্মের উৎপাদিত বিক্রি করা ডিম বা মুরগীর উপর অ্যান্য ব্যবসায়ী মালের মতই যাকাত দিতে হবে।

৮. খ-ব্যবহৃত বাহনঃ খৈয়াম কাজে ব্যবহৃত খানবাহনের (যেমন- মোটর সাইকেল, কার, মাইক্রোবাস, টেক্স ইত্যাদি) উপর যাকাত দিতে হবে না।
৯. উৎপাদন মূল্যঃ উৎপাদন মূল্য বলতে বুঝায়, কলকারখানায় ব্যবহৃত মেশিন, যশ্রপাতি ইত্যাদি। এগুলোর নিরাপত্তার জন্য যাবতীয় উপকরণের (যেমন- দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি) উপর যাকাত দিতে হবে না।

১০. দুর্গা খামারঃ দেশে প্রচলিত যে সকল দুর্গা খামারগুলো রয়েছে, সে সকল খামারের দুধ উৎপাদনকারী পণ্যগুলো উৎপাদনের ইউকরণ মাত্র। তবে উৎপাদিত বস্ত্র উপর অবশ্যই যাকাত দিতে হবে।

১১. দুর্গাপ্রাপ্য বস্তুঃ যদি কোন ব্যক্তি মহামূল্যবান দুর্গাপ্রাপ্য কোন বস্তু খোঁজ দেয় সে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে তাহলে তা যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি তা দিয়ে ব্যবসা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

১২. বাজিগত প্রয়োজনের গৃহপালিত পণ্যঃ কেউ যদি বাজিগত প্রয়োজনে যেমন- দুধ পানের জন্য গাছি এবং ধানীগুলির কাজে ব্যবহার করার জন্য হাতী, যোড়া, উর্দ স্তুতিপালন করে তবে তার উপর যাকাত দিতে হবে না।

১৩. জিন্দাদের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামঃ যে সকল সরঞ্জাম যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য মজুর রাখা হয় (যেমন- যোড়া, অক্ত-শক্ত ইত্যাদি), যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামের তিথির লাভ সম্ভব, এ সকল বস্ত্র উপর যাকাত দিতে হবে না।

ফিকাহবিদগণ বলেন, উপরেরলিখিত সকল ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান প্রয়োজন হবে না, কেননা এ সকল সম্পদ নিতা ব্যবহারের ফলে পারিত পদ্ধতি নয়।

সুতরাং এদের উপর যাকাত নেই।

২১৮ ওপব উম্মো উস আর কান বল তিন জীতে হল ফিবিয়া মিন তাওকা সুহু বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

... এই প্রস্তাবে বুঝানো হয় যে হলো নিম্নলিখিত পাঠ বাসা উপরের যাকাত নিন্দে নেয়া চান।

যামুনা অন অন্যরাজ চিন্তাবাদ বলা হয় যে নিম্নলিখিত পাঠ বাসা উপরের যাকাত নিন্দে নেয়া চান।

অনুবাদঃ ... সামুরা ইবন জন্দুব (রা) থেকে বিষয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) আমাদের কে বাসা উপরের যাকাত নিন্দে নেয়া চান।

বাসা বাসায় যাকাতের বিধানের বাসা সম্পদের সমাজী ঘটায়। বাসা এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা বাসায় নিকট বিভিন্ন সম্পদের সমাজী ঘটায়। কেন কেন সম্পদ হাত অল্পসি সহায়ী হয়, আমার কেন কেন সম্পদ বহরের পর বহর বাসায় ভাড়াতে যায় থাকে। ইসলামী শরীয়ত বাসায় দের সকল সম্পদের
যাকাতের বিধান যুক্তি বিনিময় করা হয়েছে যাকাতের বিধান আরোপ করে। এ বিধান নগদ সম্পদের বিধানের অনুরূপ।

যাকাতের বিধান ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে সকল পুজি বিনিময় করা হয়েছে তাকে ইসলামের দুম্যক ক্ষেত্রে ব্যবসায় পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করে। কোন যুক্তি যদি ব্যবসায়ী পদ্ধতির মালিক হয় নিজের আয়তে ঐ সকল সম্পদ পূর্ণ এক বছর সংযো করে রাখে তবে যদি বহরাতে নগদ মূল্যে নিজের পরিমাণ হয় তাহলে ব্যবসায়ীর এ সকল সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী সম্পদে যাকাত ফরজ হওয়ার দুরুপযোগী ব্যবসায়ের সম্পদে যাকাত ফরজ হওয়ার বিধান পরিবর্তি করুন এবং সুমাহ দ্বারা প্রমাণিত। নিম্ন পরিবর্তি করুন এবং সুমাহ ভিত্তিক দুরুপযোগী উপস্থাপন করা হলো।

দলীল (১): যাকাতের বিধান জারি করে অল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

যাই তিনি তাদের অভিযাত্রী অগ্নিতে ও তাদের প্রতি অত্যন্ত অগ্নিগূলি মুক্তিতে তাদের যে তিনি নিঃসরণ করেছে তাতে জ্ঞাত হয়ে নিঃসরণ করেছে তাতে জ্ঞাত হয়ে নিঃসরণ করেছে তাতে জ্ঞাত হয়ে নিঃসরণ করেছে।

(মাসুদীর বকারায় ২৬৭)

দলীল (২): অল্লাহ তাআলার বাণী—

ওয়া আমাদের পানি হবে হলে সিসাল ও মুহলার। অবাধ, তাদের ধনের সম্পদে অধিকার রয়েছে অভিযুক্ত ও বিক্ষিপ্তের। (স্যারিয়াতুম ১৯)

এখানে সকল প্রকার সম্পদের উপরই যাকাত ফরজ করা হয়েছে।

দলীল (৩): অনুমতিটি গ্রহণ করতে বর্ণিত হাদিস।

ইজমার দ্বারা দলীলে পরিবর্তি করুন ও সুমাহ স্পষ্ট প্রমাণের পরও সাহায্য, তাবুজি এবং পূর্ববর্তী বিশেষনগণ একাধিক উপর একমতী পোষণ করেছেন যে, ব্যবসায়ের সম্পদের উপর যাকাতের বিধান প্রমাণ হবে।

ইবনুল মুনিফ বলেন, ব্যবসা লক্ষ সকল সম্পদের এক বছর পূর্ণ হলে তার উপর যাকাতের বিধান ফরজ। শরীয়তের সকল অভিজ্ঞনের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। ইবন আব্দুল্লাহ, ইবন উমর, ফিকরিবিদ হাসান, জাবিব ইবন যায়েদ, নাফিও, আওয়াঈ (রহ.) প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের স্পষ্টকে উদ্বিধিত আরাম এবং রাসূলের হাদিসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ব্যবসায়ীর মালে যাকাতের পদ্ধতি কোন ব্যবসায়ী যে দিন থেকে তার ব্যবসায়ীক কার্যক্রম শুরু করে ঠিক সেই দিন থেকেই ব্যবসায় যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তার জমাকৃত অর্থে মুদ্রা সম্পদের হিসাব বের করতে হবে, তারপর নগদ অর্থের ভিত্তিতে দেখে হবে নিসর্গ পরিমাণ হয় কিনা। যদি নিসর্গ পূর্ণ হয় তাহলে যাকাত
যাকাত অধ্যায়

দিতে হবে। আর যদি মজুদ সম্পদ এবং নগদ অর্থ উভয় মিলেও যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয়, কিন্তু পরবর্তীতে দাম বেড়ে গিয়ে নিসাবে উপনীত হয় তখন যে দিন দাম বেড়েছে সে দিন থেকেই যাকাতের পূর্ণ হিসাব করতে হবে।

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও কোন ব্যবসায় যদি একাধিক অংশীদার থাকে তাহলে সম্মিলিতভাবে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে প্রত্যেক অংশীদার তার অংশের উপর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ কোন ব্যবসায়ী যখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তখন তাকে ঐ সম্পদের উপর ২.৫% হিসেবে প্রতি ২০০ টাকায় ৫ টাকা যাকাত প্রদান করতে হবে।

উল্লেখ যে, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য পণ্য এ তিনটি মাধ্যমের সব কটিই যদি কোন ব্যবসায়ীর নিকট অবশিষ্ট থাকে অথচ এককভাবে কোনটাই যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সব কটিয়ে সার্বিক মূল্য একত্রে হিসেব করে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান করবে।

বাবু হলো মাহু হো রকুর হলী সৃজন হেদর এবং অলংকারের যাকাত

... গজিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত

(বর্মি চ ১৩৮, মাহু হো রকুর হলী, নাসিরী)
মেরোটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করিম (সাং)-এর সামনে রেখে দিয়ে বললঃ 
এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

বিশেষতঃ মহিলাদের ব্যবহার অলংকারের যাকাত প্রসঙ্গে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে অলংকার বানানো তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা- সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেই, আহমদ ইবন হামল, ইসহাক, আযিশা, জাবির ইবন আদিলুহাম (রাঃ) প্রমুখের মতে-

ব্যবহার্য অলংকারের মধ্যে কোন যাকাত নেই।

(মুহাম্মদ 3 সুরা 22)

দলীল (১) হযরত জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদিস। নবী করিম (সাং) ইরশাদ করেন-

"লুন্স ফি পিবিউলি রুকতুে- (নিয়ে আল্লাহের) অর্থ৷ অলংকারে কোন যাকাত নেই।"

দলীল (২) হযরত ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন-

"লুন্স ফি পিবিউলি রুকতুে- (নিয়ে আল্লাহের) অর্থ৷, অলংকারে কোন যাকাত নেই।"

কিয়াসী দলীলের পরিধেয় বর্ণে যাকাত নেই। অলংকারও অনেকটা পরিধেয় বস্তু। তাই অলংকার ও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, আতা, মুজাহিদ, মুহারর, আওয়াই (রহ.), উমর, ইবন মাসাউদ, ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের মতে, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়াম তোলা ওরৌপ্য যে অলংকারে থাকবে না কেন, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তা মুল, বিসিক্ট, লাকট, চেইন, কক্ষ, কাপড় চিট সূতা অথবা অন্যান্যভাবে তৈরি অলংকার হেক না কেন।

(মুহাম্মদ 3 সুরা 22, নিয়ে আল্লাহের ২২)

দলীল (১) অনুভূতের ভরতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) অনুভূতের ভরতে বর্ণিত হাদিস।

"আর স্লতানা সাতে কিন্তু লুন্স ও চোখে তাতে রুকতুে, তুচ্ছ রুকতুে।"

(ববুল্লাহ বুদ্ধ ১৮ সুরা ২২)

অর্থ৷, উপেক্ষা সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি স্বর্ণ লক্ষ্য ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূল লালাহ। আমার এই সকল অলংকার 
"কানোড" (যমুনের অভ্যন্তরে প্রাণিত সম্পদকে 'কানোড' বলে) হিসেবে গণ্য হবে কি? তিনি (সাং) বললেন, যে মালের পরিমাণ যাকাতের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখান থেকে যাকাত দিতে হবে। তার (ডুর্গের) গভীরত্ব ধন নয়।
লালীল (৩): একদা রাসূল (সাহ) হযরত আরিশা (রাহ)—এর হাতে ধরের তৈরি বড় অস্থির পরিহিত দেখে জানতে চাইলেন এটাকি? এতে আরিশা (রাহ) উভয়ের বললেন—

সত্যত্বেহু আতুরুল্লাহে কি যার রসূল লিখে তাঁদের কর্তারা কেন আসমান তাঁদের নগাদে রাকান না। আল্লামা—

অর্থাৎ, ... ইয়া রাসূলারা! আপনার উদ্দেশ্য রোপচর্চা করার জন্য তা গাঢ়ংশি হয়েছি।

তিনি (সাহ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি এর যাকাত পরিশেষ করে থাক? আমি বললাম, না আমি আল্লার পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি (সাহ) বলেন, দোয়েকে দোয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

লালীল (৪): ইমাম রায়ি (রহ.) বলেন, অল্পকারের মধ্যে যাকাত হওয়াটাই সঠিক।

কেননা আল্লার তাআলা বলেছেন—

ওয়াল্লাল্লাহু আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ লাহের আল্লামাঁ 

অর্থাৎ, আর যাদা পর্যায় না রূপান্তর করে রাখে, এবং তা আল্লার পথে ধরে করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন। (তাতাবাহং ৩৪)

তুলুক আয়াতে আমরা বলেছি যে স্থানে রূপের যাকাত প্রাদে কথা বলা হয়েছে। কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি।

কিয়াসী লালীলা: কিয়াসের চাহিদাও এই যে, অল্পকারে যাকাত ওয়াজিব হবে।

কেননা, এই অল্পকার যদি পর্যায়ের নিকট থাকে, তাহলে সবার মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং যখন মহিলার অধিকারে হবে, তখন যাকাত ওয়াজিব হওয়া চাই।

জবাবং আহানাকারণের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের লালীলের জবাবং—

১. কুরআনের আয়াতের বিপরীতে সাহাবাদের আপার প্রহরেও গোয়া নয়।

২. অল্পকারে যাকাত ওয়াজিব প্রমাণকারী হাদীসটি মাস্তান। অন্য হাদীসগুলো 
(যেমন- জাবিরের হাদীস) খবর ওয়াহিদ এবং যথা। সুতরাং মাস্তান হাদীস প্রাধান্য লাভ করার।

৩. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত—এর অর্থ স্বর্ণ নয়; বরং মুক্ত। যেমন, পত্রে 
কুরআনেও হাদীস দ্বারা মুক্ত রূপান্তর হয়েছে। আর মুসলমান কোন যাকাত নেই।

৪. অল্পকারের সাথে পরিধির বক্তুল তুলনা অযৌক্তিক। কারণ, পরিধির বক্তুল 
বর্ধনশীল নয়, বরং aYংসীল। আর অল্পকার বর্ধনশীল।

উপরিতুল্য আলোচনা থেকে প্রতিক্রীত হয় যে, স্বর্ণলংকার বা রূপালংকারে 
যাকাত ওয়াজিব। তাই অল্পকারে যাকাত দিতে হবে। (তন্মূল ৩২-৩২)
কৃষিজ ফসলের যাকাত

... প্রতি সেপ্টেম্বরের অ্যানেরার ও অ্যাস্টার এর মধ্যে যে দিন ফসল কৃষিক হয় সেই দিন যাকাত হয়।

০২৫ বছরের ব্যাপারে উত্তর-এর আভ্যন্তরীণ অর্থ

* অ্যানেরার শব্দটি আরবী। এটি উত্তর অর্থে ব্যবহার হয়।

উশর-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

* মুসলমানদের ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়।

* মুসলমানদের কর্ত্তি জমির ফসলের চেয়ে বেশি ভাগের এক অর্থ বিশ্বাস করা হয়।

* D. A. F. M. আবু বকর সিদ্দিক বলেন- কৃষিজ উৎপাদনের উপর যে যাকাত দিতে হয় তাকে আইনের পরিবার উই বলে। শাস্ত্রটির অর্থ এক দশমাংশ।
মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্র মুসলমানদের অধিকৃত ভূ-খণ্ডে প্রাকৃতিক জলসেচ উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ ভূমির আদায় করাকে উপর বলা হয়।

ভূমি হতে উৎপাদন ফসলের কোন কোন শস্যে এবং কি পরিমাণ শস্যে উশর ওয়াজিব হবে, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেক, আহমদ ইবন হাবল, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ভূমির উৎপাদন ফসল ও ফল যদি কাঁধামাল না হয় অর্থাৎ খাদ্য জাতীয় শস্য হয় যা ওদামজাত করে রাখা যায় এবং সহজে নষ্ট না হয় (যেমন- চাল, ডাল, গম ইত্যাদি) এবং এর পরিমাণ যদি কম পক্ষে ৫ ওয়াসাক (প্রায় ২৫ মণ) হয়, বছরের অধিকাংশ সময় চারী থাকে, তবে বৃষ্টির পানির ক্ষেত্রে এক দশমাংশ এবং কৃষিক উপায়ে সেচ করা হলে বিশ্বাসের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৫ ওয়াসাক থেকে কম হয় বা অস্থায়ী ফসল হয় (যেমন ফল-মূল, শাক-সবজি) তবে তাতে যাকাত বা উশর দিতে হবে না।

(নতুন আশতুত ৪২ স, ১০৫, দ্রাস মশরকে জল, ৩১০, দ্রাস তুর্মিরি জল ২৪৮)

দলীল (১): হরাত আবু সাইদ আল খুদরী (রাঘব)-এর বর্ণিত হাদিস-

... قَالَ الْبَيْيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ... لَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَثْلُ حَمْسَةٍ أَوْسُقَ صَدْقَةٍ (ابو)

দাওয়া: ১৭ বাব তফসিলে থাকে, খানারি ১০১ বাব লিস নয় হাম্সা ইত্যাদিতে তুর্মিরি

ج ১ বাব সচ্ছতা সম্প্রদায় এক, নসারি ২৩২, আর মারাত.

অর্থাৎ, ... ভূমি হতে উৎপাদন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে না।

দলীল (২): ... عَنْ مَعَاِجٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَالُهُ عَنِ

الْخَضْرَائِاتِ وَهْيَ الْبَقَولُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْئٌ (তুর্মিরি জ ১১৬, বাব আবেল)

অর্থাৎ, ... মুহাম্মদ (রাঘব) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সবজি সম্পর্কে নবী করিম (সাইয়ে)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পত্র লিখিলেন। এর উত্তরে তিনি ইরশাদ করেছিলেন যে, তাতে কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

উপরের লিখিত হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিদিষ্ট কিছু কৃষিক ফসলের উপর নিদিষ্ট পরিমাণ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। দালার-তার সকল ফসলের উপর ওয়াজিব নয়।

* ইমাম আবু হনিফা, উমর বিন আব্বুল আব্বি, মুজাহিদ, ইব্রাহিম নাখশী এবং

ইমাম যুহর্ত (রাঘব) প্রথম বলেন, ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম
হোক বা বেশি হোক, বছরের অধিকাংশ সময় স্থায়ী হোক বা না হোক, সর্ববহায় সকল ফসল ও ফলের উপর যাকাত বা উপর দিতে হবে।

(তন্ত্র জের ২ সং ১, দর্শন মাসকূলা ২ সং ১৭, দর্শন তৃণমূল জের ২ সং ৪৩৮)

দলীল (১) আব্বাস তাআলার বাণী-

"যাইহো আল্লাহঁর আদেশে, আমরা তার নির্দেশার অনুসারে করবার জন্য তার নির্দেশ করেছি, তা কেন উৎপন্ন হয়ে যায়।" (২৫৭) বাকারাঃ

দলীল (২) আব্বাস তাআলার বাণী-

"তাহো হয় তাই তাহার প্রদর্শন।" (১৪১) আনাামাঃ

উপরোক্ত উক্তিটি আয়াতের আমার অর্থে উপর দিতে বলা হয়েছে। এতে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ বা নির্দিষ্ট কোন পণ্যও নির্ধারিত করা হয়নি। অতএব, তুমিতে উৎপাদিত সকল প্রকার পণ্যের উপর, কম হোক আর বেশি হোক, উপর ওয়াজিব হবে।

দলীল (৩) ইবন উমর রাইহ থেকে বর্ণিত হাদিস। নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন-

"ফিলা সেক্কি সামান ও স্থানীয় এবং যারা উর্দু দেখে না অথবা অস্ত্র না করে।" (খায়র জের ২ সং ১, মস্ল জের ২ সং ৩১, তৃণমূল জের ১ সং ১৩৯)

অর্থাৎ, আসমার তথা কৃষ্টি এবং খালের পানি অথবা নিজে নিজে শিকড় দ্বারা পানি চুরি নেয়া গাছে এক দশমাংশ উশর। আর হাউজ থেকে কৃষিসম্পর্কে যা সিকন্দ্র করা হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ উশর।

দলীল (৪) নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন-

"মানুষের কোনো লোক ফিলা সেক্কি সামান।" (নস্ব দিরাই জের ২ সং ৪১২)

অর্থাৎ, জমিন যা উৎপন্ন করে তাতে রয়েছে উশর।

এই দুটি রেখেছিলেন মানুষ। এটি ব্যাপক যে সর্বপ্রকার উৎপন্ন করতে আমার জন্য বিশেষ সময়ের লক্ষ্য।

দলীল (৫) ইব্রাহীম নাভাত হরু থেকে বর্ণিত আছে-

"ফিল সেক্কি সামান এরো দিতে অতি হওয়া মানুষের অবকাশ দিয়ে।" (সমূদ অব মাযান জের ২ সং ১৩৯)

অর্থাৎ, জমিন ব্যাপক সময়ের লক্ষ্যে শেষ হয়েছে। এমনকি তোলনের দৈর্ঘ্যের
উপরোক্তিত হাদিসমূহ দ্বারা এক ধর্ম যায় যে, কম-বেশি সব উৎপাদন সামান্য শততালিকাবাদ উপর দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইমামাতিকি দলিলঃ সাহাবাবাদে কিরামের যুগে যদিও এই মাসআলাখাত কিছুটা মজা ছিল, কিন্তু হযরত উমর ইবনে আবদুল আরাকিয় (রহ.)-এর যুগে এর উপর তাহককর্নের ইমামা প্রতিদিন হয়েছে। কেননা, তিনি তাঁর খিলাফতের যুগে সকল আমলাদের নিকট শাহী ফরমান প্রেরণ করেন যে:

... উত্তর করা গুলা কোন কূট এর দুরূহতা আর যা আপনি মানের যাতে অন্ততঃ হয় না।

মির্দিয়া সো কর্নের উত্তর (مزيهد عبدالله السهابي – 4/211)

অর্থাৎ, .. ইবন ফজল (রহ.) থেকে বর্ধিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে আবদুল আরাকিয় (রহ.) চিঠি লিখেছেন যে, জমির উত্পন্ন ফসল কম বা বেশি হেক তা থেকে যেন উপর নেয়া হয়।

জবাবঃ আহন্দীদের পক্ষ থেকে প্রথম দলিলের জবাবঃ

(1) হাদিসে উল্লিখিত সদকা দ্বারা উপর বুখানো উদ্দেশ্য নয়। বরং বাণিগ্যক পণ্যের যাকাত বুখানো উদ্দেশ্য। আর তত্ত্বাবধানে এক ওয়াসাক পণ্য সাধারণত এক উক্তির তথা ৪০ দিনের বিক্রি করা হত। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য হয় ৫০৫০=২০০ দিনের। আর চার্দি বা রৌপ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রয়োজন ৫ ওয়াসাক বা ২০০ দিনের। এর কারণ যাকাত ওয়াজিব হবে না।

(2) হাদিসে বর্ধিত সদকা দ্বারা যদিও উপর মনে নেয়া হয়, তখন ৫ ওয়াসাকের কম হলে উপর দিতে হবে না- এর অর্থ হল, বায়তুল মালে না দেয়া। অর্থাৎ, এত কম মালের উপর বায়তুল মালে দেয়ার দরকার নেই। কেননা এতে বায়তুল মালেরি খরচ উত্তে না। বরং মালিক নিজেহ পরিবর্তনের দিয়ে দিয়ে। (درس مشكاة ج:2/171)

(3) হাদিসে বর্ধিত সদকা দ্বারা উপর বুখানো উদ্দেশ্য নয়। বরং বাণিগ্যক পণ্যের যাকাত বুখানো উদ্দেশ্য। আর তত্ত্বাবধানে এক ওয়াসাক পণ্য সাধারণত এক উক্তির তথা ৪০ দিনের বিক্রি করা হত। অতএব, পাঁচ ওয়াসাকের মূল্য হয় ৫০৫০=২০০ দিনের। আর চার্দি বা রৌপ্যের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য প্রয়োজন ৫ ওয়াসাক বা ২০০ দিনের। এর কারণ যাকাত ওয়াজিব হবে না।

বিতীয় দলিলের জবাবঃ উক্ত হাদিসে শাক-সবজির উপর বায়তুল মালে না দেয়ার কথা বুখানো হয়েছে। কেননা শাক-সবজি হল কাঁচা মাল। আর যাকাত আদায়কারীর অপেক্ষা করার দরখাস্ত মাল নয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এ সমস্ত মালের যাকাত মালিক নিজেই আদায় করে দিয়ে। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর জন্য অপেক্ষা করবে না।

* কিয়াসের দ্বারে ইমাম আবু হানিফার মাবহাব অগ্রাধিকারের মোগল।

(1) উপর কর বা খাজনার অনুরূপ। আর খাজনা সকল উৎপাদিত দ্বার থেকেই নেয়া না। তা কম হোক বা বেশি হোক, কাঁচা হোক বা পাকা হোক। সুতরাং উশরের খায়ের এমন হুকুমই হওয়া উচিত।
(২) তাহাদার ইমাম আবু হানিফা (র.হ.)-এর মায়াধ্যায অনুযায়ী আমল করলে গরীবদের অধিক উদ্ধব হয়। আর এটি হল সতর্কতামূলক বিধান।

(দ্রষ্ট তৃমহি ২৪১)

(৩) ইমাম তাহবী ও জাসসাইস (র.হ.) বলেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, উসরের মালের ক্ষেত্রে তথ্যা বছরপূর্বতা ধরত্বা নয়। সুতরাং গিছিত ও গনিমতের মালের ন্যায় নিদীষ্ট পরিমাণ থাকার প্রয়োজন নেই।

(সান্তর রিস ৫৮ ২০৮)

আর এ সকল কারণেই আলামা ইবন আরাবী মলিকী অনুসারী হওয়া সতেও ‘শরহে তিরমিয়ি’ তে লেখেন যে, উক্ত মাসআলায় কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ইমাম আবু হানিফা (র.হ.)-এর মেতের সমর্থন পাওয়া যায়।

আবু সাইদ খুদরী (র.হ.) ও ইবন উমর (র.হ.) হতে বর্ণিত হাদিসগ্রন্থে বদন্ত সমাধান
বা ইবন উমর (র.হ.)-এর হাদিসটি প্রাধান্য লাভের কারণ:

১. খুদরীর (র.হ.) হাদিসটি খাস। কারণ ঐ হাদিস নিদীষ্ট করার প্রকারের উৎপত্তি
ফসলের কথা বলা হয়েছে। আর ইবনের উমরের হাদিসটি আছে। খাস হাদিসের উপর
আম হাদিস অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং ইবনের উমরের হাদিসই আলমৌখ।

২. কুরআনের কয়েকটি আয়াতে ইবন উমরের হাদিসের ব্যাপকতাকে সমর্থন করা
হয়েছে। তাই খুদরীর হাদিসের উপর ইবন উমরের হাদিস প্রাধান্য পাবে।

৩. দুটি হাদিসের মাথে বৈপরীত্য দেখা দিলে বুখারি ও মেমিয়ের হাদিস প্রাধান্য
পায়। ইবন উমরের হাদিসটি দুজনেই বর্ণনা করেছেন।

৪. যাহাক বলেন, খুদরীর হাদিসটি পূর্বের, আর ইবন উমরের হাদিস পরের।
সুতরাং ইবন উমরের হাদিস নাসিক ও খুদরীর হাদিস মানসূখ।

৫. সচেতন সুদর্শন সমাধান এই যে, খুদরীর হাদিস ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের
কথা বলা হয়েছে। ৫ ওঠার পরিমাণ শব্দের যে মূল্য তা ব্যবসায়িক দ্বিতের
নিসাবের সমান। জমিতে উৎপত্তি শব্দের উপর বর্ণনা করা হয়নি।

৬. আবু সাইদ খুদরীর হাদিসে খবরে ওয়াহিদ আর ইবন উমরের হাদিস মানহুর।
সুতরাং ইবন উমরের হাদিস প্রাধান্য পাবে।

৭. আইনী বলেন, আবু সাইদ খুদরীর হাদিসে উশরের বর্ণনা দেয়া হয়নি। বরং
যাকাতের কথা বলা হয়েছে। আর ইবন উমরের হাদিসে উশরের কথা বলা হয়েছে।

(নতুন আশুতোষ ২০ ১১)

পরিশেষে বলা যায় হাদিস দুটির মাথে কোন বদ্ধ নেই। বাহিনীভাবে বদ্ধ
পরিলক্ষিত হলেও গভীর পর্যালোচনার পর তা দুরূহত হয়। খুদরীর হাদিস
যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ইবন উমরের হাদিস উশরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(দ্রষ্ট তৃমহি ২৪১)
* উল্লেখ যে, কোন ফসল যদি কিছুটা কৃত্রিম সেচ এবং কিছুটা বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন হয় তবে অনুমান করে দেখতে হবে কোনোটির পরিমাণ বেশি। যদি বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এক দশমাংশ উর্ধ্ব ওয়াজিব হবে। আর যদি সেচের পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ উর্ধ্ব ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা পরিক্ষার করার জন্য শ্রম খাটানো হলে চলিল ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

বলা হয়, যে, পাবলিক আল্লাহকে জিন্দাবাদ করা স্বীকার না করে, তার করে চলিয়ে গিও।

**বাবা শাহুল আখদী**

**স্বরূপ অধ্যায়**

মধুর যাকাত

মানুষ বলে, যদি একজন মানুষ গুলির পরম প্রকাশ করে তাহলে তার প্রতি প্রতিযোগিতা নেই।

অনুবাদঃ ... আমর ইবন আইবর (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতামান গোত্রের সদস্য হিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট তাঁর মধুর উষ্ণ নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (রা) নবী করিম (সা) এর নিকট সালাহাবাদ নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর উপত্যকা তাঁকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খালিদ (রা) যখন বলীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইবন ওয়াহব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমর (রা) তাঁকে লেখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মধুর উষ্ণ দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালাহাব উপত্যকায় তার জায়গীর বহুল রাখ। অন্যান্য তা বনের মৌমাছি হিসেবে গণ্য হবে এবং যেকোন ব্যক্তি তার মধু খেয়ে পারে।

বিশেষণঃ মধুতে উষ্ণ আছে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যথা-
দলীল (১) তাউস থেকে বর্ণিত-

آنّ معاذاً بِما أتى الْيَبِينُ أَتَى العَسْلُ وَأَوْقَاصُ الْعَفْنُ فَقالَ لَمْ أَوْمَرْ فِيهَا يَبِينُ

(مصنف ابن أبي شيبة ج 3 ص 142)

অর্থাৎ, মুআয়াহ (র) যখন ইয়ামানে এলেন, তখন তার নিকট মধু ও ঘাপলের অনেক পাল হাজির করা হল। তখন তিনি বললেন, আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই নিদেশ দেয়া হয়নি।

দলীল (২) হযরত নাফি বলেন-

سَأَلَّيْهِ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسْلِ أَفَفِيَهَا صَطْقٌ قَالَ لَمْ يَسْلَعْ عَسْلٌ

ولِكَ سَأَلَتُ السَّيْفَةُ بْنَ حَكْيَمَ عَنْهُ فَقالَ لَمْ يَسْلَعْ عَسْلٌ فِيهَا شِيْبٌ قَالَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

هو عذُر مأمون صدق – فكتب إلى الناس أن توضع عقيق عنهم (مصنف Ibn Abi Shiba ج 3 ص 142)

অর্থাৎ, উমর ইবন আবদুল আলিয় (র) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মধুতে কি যাকাত আছে? আমি বললাম, আমাদের এলাকায় তো মধু নেই। তবে আমি মুসলিমরা ইবন হাফিজের এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। এতদশ্রেষ্ঠ তিনি বললেন, তাতে কোন যাকাত নেই। উমর ইবন আবদুল আলিয় (র) বললেন, তিনি নির্যাতনযোগ্য, ক্রিমমুক্ত ও সত্য কথা বলেছেন। অতঃপর তিনি এর সদকা বাদ দিয়ে দেয়ার জন্য মানুষের নিকট পত্র লিখলেন।

কিয়াসী দলীলঃ মধু হচ্ছে দুধের মত তরল পদার্থ। যেহেতু দুধে যাকাত নেই, সেহেতু মধুর ক্ষেত্রেও একই হকুম প্রয়োজ্য হবে।

উপরের লিখিত হাদিসসমূহ ও যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় যে, মধুর ক্ষেত্রে কোন উচ্চ নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, আহমদ ইবন হামল, ইসহাক, যুহরী এবং আওয়াঈ (রহ) প্রমুখের মতে, মধুর উপর উচ্চ প্রদান করা ওয়াজিব।

(حاشية الكوكب الديري ج 1 ص 136، تنظيم ج 21)
দলীল (২) অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ধিত হাদিস।

দলীল (৩) আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের প্রথমে বলেন যে,

"আন্ন আল্লাহ ব্রম্ম আমার উপর আমি বাধ্য চলে ই আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব।"

অর্থাৎ, আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের প্রথমে বললেন যে, আমি আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি।

দলীল (৪) হযরত আবু সায়ারাহ মুসা (রা) এর সহায়তায়। তিনি বললেন।

"স্পষ্টত, আমি উচ্চায়ত্বের সুরথ সুরথ।" এর মুখোমুখি হলে আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব।

অর্থাৎ, আমি বললাম যে, আমি আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি।

দলীল (৫) হযরত আবু সায়ারাহ মুসা (রা) এর সহায়তায়। তিনি বললেন।

"কিন্তু আমি উমর (রা) হতে বর্ধিত। আমি আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি।

অর্থাৎ, আমি উমর (রা) হতে বর্ধিত। আমি আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি।

দলীল (৬) হযরত আবু হুরাইয়ার (রা) হতে বর্ধিত।

"আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি।"

অর্থাৎ, আবু হুরাইয়ার (রা) আল্লাহ তার প্রিয় সুরথের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি।

জবাবঃ হাদিসের পক্ষ থেকে মালিকী ও শাফেইদের দলীলের জবাব-

প্রথম দলীল অর্থাৎ তামাউমর এর জবাবে বলেন- (১) কোন বিষয়ে নির্দেশ না দিলে তাওয়াজিব না হওয়া সুন্নিত নয়। কেননা, অনেক হাদিস দ্বারা একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, আল্লাহ উমরের উচ্চ রয়েছে।

(২) হাদিসের প্রদত্ত দলীলের হাদিস সংখ্যা হাঁ-বোধক (মন্তব্য), পক্ষপাতে হযরত মুআয় (রা)-এর হাদিস না-বোধক (নিবদ্ধ)। আর পরস্পরবিরোধী (নিরোদ্ধ) এর ক্ষেত্রে না-বোধক হাদিসের উপর হাঁ-বোধক হাদিস অগ্রাহ্যকার লাভ করবে।
বিভিন্ন দলীলের জবাবঃ (১) উমর ইবন আবুদল আবীর্য হলেন তাবেস। তাই মারফু হাদিদের মোকাবেলায় তাঁর উত্তি দলীলময় নয়।
(২) তাছাড়া আলং মা ইবন কুদামা উমর ইবন আবুদল আবীয়ের এ মায়াব বর্ণ্য করেন যে, তিনি মদুহ হতে উসর নেয়ার প্রবণতা ছিল। (المغت ২:৬) কিয়ামী দলীলের জবাবঃ দুধ উৎপাদনের মূল উৎস হল গাভী। আর গাভীর উপর যাকাতের বিধান ফরম। কিন্তু মদুহ যে মূল উৎস তার কোন যাকাত নেই। সুতরাং মদু দুধের নায় তরল পদার্থ হলেও মদুহ উপর যাকাতের বিধান প্রয়োজ্য হতে কোন বাধা নেই।

২৭৭ বাবু রকো লুফটার (ফিতুর)

"عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ بَعْلِهِ وَنَزَمَ لَهُمْ رَكُونَ اللَّهِ نَظَرًا مَّقِيلًا وَمَنْ أَدَّى صِدَاقَةَ مِنْ الصُّدَّاقَاتِ (ابن ماجة ১/২)"

অনুবাদঃ ইবন আবুদল (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ নামক সদকাতুল ফিতুর- রোয়াকে বেহুদা বা অশ্রীল কথাবার্তা ও আচার থেকে পরিত করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ধার্মিক করেছেন। যে বাণ্ডী তা (ঈদুল ফিতুরের) নামায়ের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসেবে গণ্য। আর যে বাণ্ডী তা নামায়ের পরে পরিশোধ করে তা অন্যায় সাধারণ দান-খোয়া তার অনুরূপ হিসেবে গণ্য।

২৭৭ বাবু মাতু নোড়ি সরকাতুল ফিতুর প্রদানের সময়

"عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ بَعْلِهِ وَنَزَمَ لَهُمْ رَكُونَ اللَّهِ نَظَرًا مَّقِيلًا وَلَا يَوْمٍ مِّنْهُمْ (بخاري ১:২৫৪)

অনুবাদঃ ইবন উমর (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাও) আমাদেরকে সদকাতুল ফিতুর লোকদের ঈদের নামায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের
বাপ কোন যোগ্য ফিতর সদকাতুল ফিতরে দিতে হবে

... কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে

মনোনীত উমর (রাশি) বলেন, ইবন উমর (রাশি) ইদুল ফিতরের এক বা দুই দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর প্রদান করতেন।

বিশ্লেষণ: যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে-

(১) সদকাতুল ফিতরের সংজ্ঞা
(২) সদকাতুল ফিতরের কুরআন
(৩) সদকাতুল ফিতর কর (কি পরিমাণ মালয়ের) উপর ওয়াজিব?
(৪) সদকাতুল ফিতর কখন ওয়াজিব হবে?
(৫) সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়কাল।
(৬) সদকাতুল ফিতর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব?
(৭) কি পরিমাণ সদকাতুল ফিতর দিতে হবে?

(১) সদকাতুল ফিতরের সংজ্ঞা আর্থিক অর্থে "চদে আফর" দুটি শব্দ গঠিত হয়েছে। যে শব্দটি সম্ভব পদ। যাকে আরবীতে বলা হয় মার্কিপ ওয়াজিব যে শব্দটি এর শব্দ হল - চদে (সম্ভাব্য বিশ্লেষণ) অর্থে আরব আর্থিক অর্থে যে পদের সাথে অন্য বিশ্লেষণের সম্ভব করা হয়।
সুতরাং আধিকারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়ের অর্থ হল দান, কৃপা, অনুগ্রহ, দয়া, অনুকম্পা, সদকা, খয়রাত, যাকাত ইত্যাদি। এর বহুবচন আর সদি শেষের অর্থ হল- ইফতার করা, ভঙ্গ করা, বিরতি দেয়া, অবসান ঘটানো, খুলে ফেলা ইত্যাদি। সুতরাং সমস্ত বিষয়ের অর্থ হল রোয়া অবসানের সদকা। যা সাধারণত রোয়ার ফিতরা হিসেবে পরিচিত।

- চাইতে আরো বেশ কয়েকটি নামে অভিহিত করা হয়। যথা-
  ১. রমজান
  ২. প্রথে রমজান
  ৩. চাইতে রমজান
  ৪. চাইতে চাইতে
  ৫. রমজান

পরিভাষিক সংজ্ঞা:
(১) ইসলামী আইন শাখার ভাষায়-

হুগ হুগ মুসলমান অগ্রগণ্য পর্যন্ত ফিতির নামায়ের পূর্বে এক সা’ বা অর্থ সা’ পরিমাণ যে খাদ্য গরীবদেরকে দান করে থাকে, তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়।

(২) কতিপয় ফিকহ শাখাবিদ বলেন, ঐদুল ফিতরের দিন মালদার ব্যক্তির উপর তার নিজের ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে যে সদকা আদায় করতে হয়, তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়।

(৩) ওহীদ ইবনুল জারাহ বলেন, সদকায় ফিতর হল নামায়ের মধ্যে সাহু সিজদার নয়। রোয়ায় যদি কোন লোকসান বা ঘটিত হয়, তাহলে এর ফিতি পূর্ণ হল- সদকাতুল ফিতর।

(নৈমিত্তিক জ ২৪ সং)

(৪) ফাতিমা লাল্ম যা প্রয়োজনীয় মানুষের বাতিক চাইতে তুর্কি নির্দেশ বিকলচি তুর্কি নির্দেশ।

ফাতিমা তাই চাইতের তুর্কি নির্দেশ না তুর্কি নির্দেশ। (বাড়ি জ ৯৬ সং পৃ ১০৭)

অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতর হল যে মাল সম্পর্ক বজায়ের পরিকল্পনাতে সুনির্দিষ্ট আকারে দায়ার্বুদ দান করা হয়। ইহা হেবার পরিগত হয়। কেননা, এটি দেয়া হয় সমাপ্ত বজায়ের উদ্দেশ্যে সমাবেশের কৃপাবশত নয়।
২. সদকাতুল ফিতরের হুকুমঃ সদকাতুল ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাজে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেই, আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয়া। (আবদুল হাই আল-লখনভী বলেন, ইমাম মালিকের অভিমতত্ত্ব তাই)।

(শরহ মস্লিঃ ১৭ সং ৩১৭)

দলীল

... উন অন্ত্বন গাল ফরয় রসূল আল্লাহ চ্ছল আল্লাহ উল্লীলা মস্লে জকোয়া ৪(১)

النَفْطُ طَهِّرَةُ لِلْصَّيْامِ الخَالِدِ

(জকোয়া অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদেসাটি বর্ণিত হয়েছে।)

(শরহ মস্লিঃ ১৭ সং ২০৮)

দলীল

... উন অন্ত্বন মাহ রসূল আল্লাহ চ্ছল আল্লাহ উল্লীলা মস্লে ফরয় জকোয়া নফট... ৪(২)

(অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদেসাটি বর্ণিত হয়েছে।)

উল্লিখিত হাদেসাদের যেহেতু ফরয় (ফরয়) শব্দ উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং ইহার ফরয় হওয়ার দলীল।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা সুন্নতে মুহাম্মাদ।

তিনিও ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদেসাটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, হাদেসে ফরয় শব্দের অর্থ হচ্ছে ফরয় গেটি অর্থাৎ রসূল (সাঃ) সদকাতুল ফিতর নির্দেশন করেছেন,

কাজেই ইহা দ্বারা ফরয় সাব্যস্ত হয় না; বরং ইহা সুন্নতে মুহাম্মাদ।

(তনরিম অশ্বত ২৪ সং ২০৫)

* কেউ কেউ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করা পূর্বে ফরয় ছিল। কিন্তু যাকাত ফরয় হওয়ার কারণে ইহা রহিত হয়ে গেছে। তবে এ মতটি খুবই দীর্ঘী।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহেবালীনের মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা

ওয়াজিব। (عدلালির ৯ সং ১০৮)

দলীল

২. সদকাতুল ফিতরের হুকুমঃ সদকাতুল ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মাজে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেই, আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয়া। (আবদুল হাই আল-লখনভী বলেন, ইমাম মালিকের অভিমতত্ত্ব তাই)।

(শরহ মস্লিঃ ১৭ সং ৩১৭)

... উন অন্ত্বন গাল ফরয় রসূল আল্লাহ চ্ছল আল্লাহ উল্লীলা মস্লে জকোয়া ৪(১)

النَفْطُ طَهِّرَةُ لِلْصَّيْامِ الخَالِدِ

(জকোয়া অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদেসাটি বর্ণিত হয়েছে।)

(শরহ মস্লিঃ ১৭ সং ২০৮)

দলীল

... উন অন্ত্বন মাহ রসূল আল্লাহ চ্ছল আল্লাহ উল্লীলা মস্লে ফরয় জকোয়া নফট... ৪(২)

(অনুচ্ছেদে পূর্ণ হাদেসাটি বর্ণিত হয়েছে।)

উল্লিখিত হাদেসাদের যেহেতু ফরয় (ফরয়) শব্দ উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং ইহার ফরয় হওয়ার দলীল।

* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা সুন্নতে মুহাম্মাদ।

তিনিও ইবন উমর (রাঃ)-এর হাদেসাটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, হাদেসে ফরয় শব্দের অর্থ হচ্ছে ফরয় গেটি অর্থাৎ রসূল (সাঃ) সদকাতুল ফিতর নির্দেশন করেছেন,

কাজেই ইহা দ্বারা ফরয় সাব্যস্ত হয় না; বরং ইহা সুন্নতে মুহাম্মাদ।

(তনরিম অশ্বত ২৪ সং ২০৫)

* কেউ কেউ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করা পূর্বে ফরয় ছিল। কিন্তু যাকাত ফরয় হওয়ার কারণে ইহা রহিত হয়ে গেছে। তবে এ মতটি খুবই দীর্ঘী।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহেবালীনের মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা

ওয়াজিব। (عدلালির ৯ সং ১০৮)
অর্থাৎ, ... আমর ইবন শুআইবের দাদা থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাহ) মক্কার গিরিপথে একজন খোষককে (এই খোষণা দিয়ে) পাঠালেন, সাবধান৷ সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। চাই নর হোক বা নারী, মৃত্যুবিহীন হোক বা দাস, ছোট হোক বা বড় হোক, দুই মুদ্র গম। অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে এক সা’ খাবার।

দলীল

(১) উন্ন ব্যাস আল্লাহ উল্লাহী স্লাম অমর সার্খা যেখন মৃত্যুরে হাত ঘাট অল্লাহ উল্লাহী স্লাম (নিয়ম জূ সোলুব্বু মুসলিম হাস্ক ২৪)

অর্থাৎ, ইবন আলাবাস (রহ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাহ) মক্কার উপকণ্ঠে এক আহানাফদেরকে এই বলে খোষণা দিতে নির্দেশ দেন যে, সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

দলীল

(২) উন্ন ব্যাস আল্লাহ উল্লাহী স্লাম অমর সার্খা যেখন মৃত্যুরে হাত ঘাট অল্লাহ উল্লাহী স্লাম (নিয়ম জূ সোলুব্বু মুসলিম হাস্ক ২৪)

রূপরেখিত হাদিসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে ওয়াজিব সাবান্ত হয়, ফরয বা সুমত সাবান্ত হয় না।

জুবাবঃ আহানাফদের পক্ষ থেকে তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাব- ইমাম শাকফী এবং আহমদ ইবন হামল (রহ) খবর ওয়াহিদ দ্বারা ফরয সাবান্ত করেছেন। অথচ, ফরয কেবল কুরআন ও মূতাওয়াতির হাদিসের দ্বারাই সাবান্ত হয়। খবর ওয়াহিদ দ্বারা সাবান্ত হয় না।

আর ইমাম মালিক (রহ) যে ইবন ফরস্ত এর অর্থ নিয়েছেন, তার জবাবে আহানাফগণ বলেন, (১) মালিক (রহ) একে যততুকু হালকা মনে করেছেন আসলে সদকাতুল ফিতর তততুকু হালকাবাদীন নয়। কারণ, নবী করীম (সাহ) এ ব্যাপারে হাক জবাব করেছেন।

(৩) দাকিকুল ঈদ বলেন, যদিও আহামদ রহ ব্যাপারে ইবনুল ফরস্ত এর অবাধিতার অর্থ নির্দেশ (নিয়মান), কিন্তু শরীরের পরিভাষায় এটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এখানেও ওয়াজিবের অর্থ প্রবর্তকরাই উত্তম।

অবশেষে আহামদ ইবন হুমাম (রহ) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এতে মোলিক কোন বিবাদ ও বিরোধ নেই। বরং শাকফী এখতেলাফ রয়েছে। কেননা শাকফী ও আহমদ (রহ) সদকাতুল ফিতরকে এই পর্যায়ের ফরয বলেন না যে, এর অস্বীকারকারী কাফের।
আর ইহাকেই আহনাফগণ ওয়াজিব বলে থাকেন৷ মূল বিষয় হল এই যে, তিন
ইমামের নিকট ফরম এবং সুন্নতের মধ্যবর্তী অনা কোনো ক্ষত নেই৷ যার ফলে তাঁর
ইহাকেও ওয়াজিব না বলে সুন্নত বলেন৷ কিন্তু আহনাফের মতে ফরম এবং সুন্নতের
মধ্যবর্তী আরো একটি ক্ষত রয়েছে৷ আর তা হল ওয়াজিব৷ সুতরাং ইহা কেবল
বিশ্লেষণমূলক পার্থক্য, মৌলিক কোন পার্থক্য নয়৷ (টনজিম লাহিড়ত ২৪ সং (২))

৩. সদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিবঃ কি পরিমাণ মাল থাকলে বাক্তির উপর
সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানীক্য রয়েছে৷
* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ৷)-এর মত, এমন প্রত্যেক বাক্তির উপর
সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব, যার নিকট নিজের এবং পরিবারের এক দিন, এক
রাতের খাবার রয়েছে৷ সুতরাং ইহা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুনিদিষ্ট কোন নিসাব
নেই৷ (দৃষ্ট তৃতীয় জ ২৪১৯, টনজিম জ ১৬, দৃষ্ট মশক্ত৷ ২ সং (১৮৫))

দীলীলঃ নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, সদকাতুল
ফিতরের ক্ষেত্রে যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোথাও এর নিসাবের
পরিমাণের কথা উল্লেখ করা হয়নি৷ সুতরাং বুঝা যায় যে, এতে নিসাবের কোন
প্রয়োজন নেই৷

* ইমাম আবু হানিফা (রহ৷)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক ঐ বাক্তির উপর
ওয়াজিব, যার নিকট নিজের প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পন্দ হবে,
অথবা সদকাতুল ফিতরের ঐ নিসাব, যা যাকাতের নিসাব, তবে এতে তুল্কু পার্থক্য যে,
এতে যাকাতের মত বর্ধনশীল মাল হওয়া এবং বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়৷
(দৃষ্ট তৃতীয় জ ২৪১৬, টনজিম জ ২০, দৃষ্ট মশক্ত৷ ২ সং (১৮৫))

দীলীল (১)ঃ সদকাতুল ফিতরের ব্যাপার যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এর
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতরকে যাকাতুল ফিতরকে দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।
যেমন- ইবন আব্বাস, ইবন উমর, আবু সাইদ খুদরী (রা) প্রমুখের হাদিসেও
যাকাতুল ফিতর শওক ব্যাপ্ত হয়েছে৷ সুতরাং ইহা দ্বারা একথারই ইঙ্গিত বহন
করে যে, যাকাতের নিসাব যা, সদকাতুল ফিতরের নিসাবও তা৷

দীলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনুল কারীমেও সদকাতুল ফিতরকে যাকাত শৰ দ্বারা
প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন-

- قَدْ أَقْلَحُ مِنْ تَرْكِي وَذَكَرَ اسْمُ رَبِّي فَصَلَ-
- অর্থাৎ, নিশ্চয় সাফল্য লাভ করে সে, যে (সদকাতুল ফিতর আদায় করে) নিজেকে শুধু করে করে নিয়েছে এবং তার পালনকর্তার নাম সুরন করে (ঈদের দিন তাকবীর পড়ে), অতঃপর (ঈদ) নামায
আদায় করে। (আলাত৷ ১৪-১৫)
হযরত ইবন উমর, আবু সাইদ খুদরী এবং আমর ইবন আউফ (রা) বলেন, উত্তর আযাতটি সদকাতুল ফিতরের ব্যাপারে নামিল হয়েছে এবং সালাত দ্বারা ঈদের নামায এবং দ্বারা "সদকাতুল ফিতর" আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

(মুহাফজ বেল জ৅ সমালোচনা মোহার ১৩১ সুলত ও ইদ নামানি জোত ১০ সুলত)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর মানে সদকাতুল ফিতর আদায় করেছে।

দলিল

... একই সময়ে, বায়ুচন্দকে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর কথা বলেন, যদিও ঐ কথা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণে আজ সদকা আদায় করবে বটে, কিন্তু পরদিন সে নিজেই দরিদ্রতার কারণে অনেকে নিকট ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। তারপর কৃষ্ণমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। (নূর আনন্দ ৫০-৫৬ উল্লেখ অর্থ)

8. সদকাতুল ফিতর কোন সময় হতে ওয়াজিব হবে: সদকাতুল ফিতর কোন সময় হতে ওয়াজিব হবে এখানে ইমামগণের মধ্যে মতানৈকতা রয়েছে:

* ইমাম শাফেক, আহমদ এবং ইসহাক (রহ) -এর মতে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল রমযানের শেষ দিনের সূর্য অত্যন্ত যাওয়ার পরপরই অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাত্রি আগমনের সাথে সাথে। অতএব, ঈদুল ফিতরের রাতে কোন শিন্ত জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ ইসলাম প্রণীত করলে অথবা সামর্থ্যবান হলে তাদের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না। (দ্রস মশকোর ২৫ সুলত)

দলিলঃ যেহেতু এ সদকা "ফিতর" (রোহায় ভঙ্গ বা ইফতার)-এর কারণে হয়ে থাকে, আর ইফতারের সময় হল সূর্যাস্ত। সুতরাং এই সময় থেকেই সদকা ওয়াজিব হওয়া উচিত।
* ইমাম মালিক (রহ.) এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন। একটি হল, ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত (যা এইমাত্র বর্ষিত হল)। অপরটি হল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত। (যা নিয়ে উপস্থাপন করা হল)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদের দিন সকাল বেলা অর্থাৎ সূরোহ সাদিক উদিত হওয়ার পর। অতঃপর, সূরোহ সাদিকের পূর্বে যে লোক মৃত্যুবরণ করবে কিংবা সম্পদ বিলুপ্তির কারণে অস্থায়ী হয়ে যাবে তার উপর সদকাতুল ফিতর আদায়ের হবে। পক্ষান্তরে, যে শিয়া সূরোহ সাদিকের পূর্বে জমাগ্রহণ করবে কিংবা কোন লোক মুসলমান হবে অথবা দারিদ্র্যতার অবসান ঘটতে কমিয়ে সামর্থ্যবান হবে, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। (درب مشكبة: ج ۲ ص ۱۸۵)

دليلاً

... "عن ابن عمار قال: آمَنَّا أَسْمَعْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُلَّمْ يَزَكُّهُ الْفَطْرُ

آنَ تَؤْدَى قَبْلَ حُرُجَ النَّاسِ إِلَى الصُّلُوْةِ الخَالِدَةِ"

(منى تؤدي (أنيعتحدة: پوره وحيد: تغريبه) হয়েছে।)

জবাবে আহনাফগণ শাফেঈদের জবাবে বলেন, রমজান সূরীজের পরে যে “ফিতর” হয়, এটা তো একটি রীতিসিদ্ধ স্বাভাবিক নিয়ম, যা প্রতিদিনই হয়ে থাকে। অতএব, সূরীজে একে ‘ফিতর’ হওয়া উচিত যা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত হয়। অর এটা হল ঈদের দিনের ফজরের ওয়াজ। সূররাং এরপর থেকে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া উচিত।

(۵) সদকাতুল ফিতর আদায়ের সময়কালে চার ইমাম এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ঈদুল ফিতরের নামায় যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুহতাহাব। (عبدة الغاري ج ۹ ص ۱۰۱، معايم السنن ج ۲ ص ۱۰۷)

অতঃপর সদকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতরের দিনের আগে বা পরে আদায় সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, পুরোর রমজানের যে কোন দিন সদকাতুল ফিতর প্রদান করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে তাঁর মতে সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে ঈদের দিন থেকে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কারণ বিলম্ব করা হলে তা আদায় হিসেবে গণ্য না হয়ে কায়া (দায়িত্ব থেকে মুক্তি) হিসেবে গণ্য হবে। এর দ্বারা সওয়াবের আশা করা যাবে না। (المعرف ج ۶ ص ۳۱۴، شرح المهدب ج ۶ ص ۳۲۸)
* ইমাম আহমদ ইবন হায়ল (রহ.) বলেন, ইদুল ফিতরের এক বা দু'দিন পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা জায়ে। এর পূর্বে আদায় করা জায়ে নয়।

(المعلمي ج ۳ ص۱۸) তবে কোন কোন হায়লী বলেছেন, মাসের অবর্গ অতিক্রম হওয়ার পর ঈদের আগে আদায় করা জায়ে আছে। উল্লেখ যে, ইদুল ফিতরের পরে আদায় করলে তাঁদের সবার নিজেই তা কায়া হিসেবে গণ্য হবে।

* হাসান বিন যিয়াদ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্ধারিত সময় হচ্ছে একমাত্র ইদুল ফিতরের দিন। সুতরাং ঐ দিন আদায় না করলে তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা এটা ঐ দিনের সাথেই হাজ। (تنظيم الاشتات ج ۲۵ ص۲۰)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট কোন সময়ের নেই। তাঁর মতে, এক অথবা দু’ বছর পূর্বেও তা আদায় করা জায়ে।

(المعلمي ج ۹ ص۱۰)

তবে ঈদের নামায়ের পূর্বে আদায় করা মুতাবাহ। ঈদের দিন আদায় করতে না পারলে তা কায়া বা রহিত হবে না। সারা জীবনে যেকান সময় আদায় করলে তা আদায় হিসেবেই গণ্য হবে। বিলম্বের জন্য যতটুকু গোনাহ হবে, আদায়ের দ্বারা তাত্ত মাফ হবে যাবে। (تنظيم الاشتات ج ۲۰ ص۲۰)

৬. সদকাতুল ফিতর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিবঃ

* বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়।

* মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলামের উপর তা ওয়াজিব নয়।

* সামর্থ্যবান তথা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। অতএব, কেউ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে তার উপর তা ওয়াজিব হবে না।

তবে এই নিসাব পরিমাণ সম্পদ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনস থেকে অতিরিক্ত হওয়া চাই।

আর এ বাপারে সবাই একমত যে, প্রত্যেক বাধীন সামর্থ্যবান মুসলমান নিজের এবং স্ত্রী নাবালেগ স্ত্রীর ও মুসলমান চাকর-চাকরানী তথা পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। উল্লেখ যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার বাধী যদি সদকাতুল ফিতর প্রদান করে তাহলে স্ত্রীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে এবং কোন স্ত্রী যদি নিজেই সামর্থ্যবান হয় তাহলে ধূস্মাত্র তার নিজের সদকাতুল ফিতর তার উপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর এমন সামর্থ্যবান স্ত্রীর যাদের পিতামাতা দরিদ্র বা অসহায় হয়ে যায়, এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সদকাতুল ফিতর আদায় করা স্ত্রানের প্রতি কর্তব্য।
দাদার পরিবারের প্রধান হচ্ছে পিতা। এক্ষেত্রে পিতা যদি দাদা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঐ পরিবারের সদকাতুল ফিতর আদায় করার দায়িত্ব দাদার উপর বর্তমান।

* কাফের গোলামের জন্য তার মালিককে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেকি ও আহমদ ইবন হামদ, আবু সাওর, হাসান বসরী (রহ.)-এর মতে, কাফের দাস-দাসীর জন্য মুসলিম মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

(নির্দেশনা 27 সং)

দলীল (১) বন্ধু করীম (সা) ইরশাদ করেন-

লেস উল্লে মসলমান ফিতর অন্য কোন সদকাতুল ফিতর হাড়া অন্য কোন সদকা নেই।

দলীল (২) হাফেশ ইবন হাজার (রহ.) ফাতহুল বাহার কিতাবে ইবন মুনির (রহ.)-এর সূত্রে যুগান্ত ইবন উমর (রাওয়া) থেকে বর্ণনা করেছেন-

ইনো ইবন ওমর কামন হজরূর তাহতে হেতু তাহতে উইকিসহ মসলমান ও কাফির গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন।
দলীল (৩) হযরত ইবন আকাস ও আবু বিতা বাবা (রা) থেকে বর্ণিত-

যখন রোহিত ধর্মের তুলনায় ইসলাম কে মাফি না দিয়া যাওয়া কঠিন যাওয়া কঠিন যাওয়া কঠিন যাওয়া কঠিন (নম্বর ২ সফোর, চত্বর ২ সফোর)

অর্থাৎ, ... ব্যক্তি তার মালিকানাধীন প্রত্যেকটি গোলামের পক্ষ থেকে সদকায় ফিতর আদায় করত। তাই সে গোলাম ইয়াহুদী হোক কিংবা কুরআন।

সুতরাং উপরের লিখিত হাদিস ও আহারের দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাফির গোলামের জন্যও মুসলমান মালিকের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-

(১) ইবন উমর (রা)-এর হাদিসে যে, “মন্ত্রণালীন” শব্দটি উল্লেখ রয়েছে, তা ইমাম মালিক (রহ)-এর সন্নদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন সন্দেহ পাওয়া যায় না, বরং শত্রুজাতি শুধুমাত্র গোলামের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ সন্দেহ যা উল্লেখ রয়েছে তাই প্রাধান্য পাবে।

এ ব্যাপারে ইবন বায়বায় (রহ.) তো বলে ফেলেছেন-

"ইহারা মিত্রের প্রতি প্রকাশ করে অপরের জন্যে আসন ও মাননি!" (হাসানী আইজহার, চূড়ান্ত কর্ম, দ্বিতীয় পর্যায় দলীল ১।

(২) লক্ষ্যীয় বিষয় হল এই যে, তিন ইমাম ইবন উমর (রা)-এর হাদিস দ্বারা কাফির দাসের উপর সদকাতুল ফিতর ফরয় না হওয়ার দলীল প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ ইবন উমর (রা) নিজেই কাফির দাসের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। (দেখুন, হানাফীদের প্রদত্ত দ্বিতীয় দলীল।) সুতরাং এমন মতানৈক্য হাদিস এককে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (দুরদূরন্থ, চত্বর ২ সফোর ৫০৫)

(৩) ইমাম তাহবী (রহ.) বলেন, যদিও একথা মনে নেয়া হয় যে, “মন্ত্রণালীন” শব্দটি প্রকৃতপক্ষে দেয় সহিত সন্দেহ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, এর পরেও আমরা বলব যে, “মন্ত্রণালীন” শব্দটি মূলত গোলামের সাথে সম্পৃক্ত সাবান করে না, বরং এর দ্বারা একথা প্রকাশ করে না, “তথ্য সাদাক কার উপর ওয়াজিব। আর এ হিসেবেই “মন্ত্রণালীন” শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ,
দলীল

... অনন্ত সুবিধার্থী বলেন যে কোন তৃণ যেখানে আকাশ ছাড়া ছাড়া শুনতে পারে তা বলে যে কোনো সুবিধা নিয়ে ইমামদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক, শাফেই ও আহমদ (রহ).-এর মতে, সদকাতুল ফিতরের গম দেয়া হেক কিংবা যে, জেলার বা কিসমিস সবকর্মোর ক্ষেত্রে মাথাপিছু এক সা ওয়াজিব।

(دَرَسُ تَوْمَيْدٍي ج ٢ ص ۹۸۸، تَنْظِيمِ ج ۲ ص ۵۰)

- ২৩ -
দলীল (২): আবু ইসহাকের সনদে বর্ণিত আছে—

রক্তাদির ফিরি সাতে মন্ত ও সাতে মন্ত হইতে । (দোর তামাদি জ ২ বাংলা ২৪, নন্দী, জ ২৫)

অর্থাৎ, সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ হল এক সা থেকে অথবা এক সা গম।

দলীল (৩): ইবন উমর (রাঙ্গ) ইরেশাদ করেন ।

... صدقة الفطر صدقة من نور । (নন্দী, জ ২৫)

অর্থাৎ, গমের ক্ষেত্রে সদকাতুল ফিতর হল এক সা।

তারা বলেন, উল্লিখিত হাদিসগুলো স্পষ্টভাবে গমের কথা উল্লেখ রয়েছে। সত্তরাং বুঝা যায় যে, গমের ক্ষেত্রেও এক সা সদকাতুল ফিতর দিতে হবে।

* ইমাম আবু হাসিম (রহ.), খোলাফায়ে ইরশীদে, ইবন মাসুদ, মুহাম্মদ ও জাবির (রাঙ্গ) প্রমুখের মতে, গম বা আটা অর্থ সা আর অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এক সা প্রদান করা যায়।

দলীল (৫):

... عن عبد الله تعلية أو تعلية بن عبد الله بن أبي صفيর عن أبيه । (১)

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من نور أو قطر على كل اثنين

صغير أو كبير حرام أو عبد ذكر أو أنتي ... (বো দাউদ জ ২২৮, বাংলা ২২, নন্দী, জ ২৫)

অর্থাৎ, ইবন বিক্রিয়া ইবন সালাবা অথবা ছায়াইবারা ইবন আবুল্লাহ ইবন অবী সুআয়র (রহ.) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সালাবা (রাঙ্গ) ইরেশাদ করেছেন, ছোট বা বড়, বাদীন বা ক্রাইটোস, নর বা নারী তোমাদের প্রতি দুজনের পক্ষে এক সা গম নির্ধারিত করা হল।

* দুই মুদ হল অর্থ সা। সত্তরাং পূর্ণ ১ সা হয় ৩৬ ছাতক, আর অর্থ সা হয় দেড় সা তিন ছাতক।
উক্ত হাদীসে গমের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতি দু`জনের জন্য এক সা` প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেকের উপর অর্থ সা` প্রদান করাই ওয়াজিব।

দলীল (২) উন্ন হিন্দু বলেন তাঁর বিশ্বাস ফি অর্থ রসূল সালাম।

বোঝা যায় তা হল রসূল সালামের উপর স্বীকার করেন যে তিনি হিন্দু মতের সহপাঠী।

অর্থাৎ, ... আল-হাসা (আল-বসরী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূল সালাম আব্দান (রা) রমজানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিসরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন: ... রাসূল সালাম (সাঁ) এই সদকা এক সা` পরিমাণ খেজুর বা বালি অথবা অর্থ সা পরিমাণ গম প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার করেছেন।

দলীল (৩) হযরত সালাবা ইবন আবু সুআলের তাঁর পিতা সুতে বর্ণিত মারফু হাদীস-

দ্বারা রসূল সালামের উপর স্বীকার করেন যে তিনি ঐন্দ্রিয় ও মনোমুগ্ধ অথবা মনোমুগ্ধ সান।

আর তাইনা সদকাতুল ফিতর আদায় কর জনপ্রতি এক সা খেজুর এবং এক সা যোগ অথবা অর্থ সা গম।

দলীল (৪) হযরত আহমদ বিনত আবু বকর (রা)-এর হাদীসে রয়েছে-

কোন কোন তাঁ নতুন বুকের উপর স্বীকার করেন যে তিনি ঐন্দ্রিয় রসূল সালামের উপর স্বীকার করেন।

অর্থাৎ, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সালাম (সাঁ)-এর যুগে দুই মুদ্র গম সদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

দলীল (৫) উন্ন হিন্দু বলেন যে বিশ্বাস ফি অর্থ রসূল সালাম।

অর্থাৎ, ... বিশ্বাস ফি অর্থ রসূল সালাম।

মুক্ত মনের মির্ড উন্ন কর খাগ মনোমুগ্ধ অথবা মনোমুগ্ধ কর যাত্রী উপর স্বীকার করেন।

(তথ্যসূত্র: আহমদুল হাদীস, শরীফুল আব্দুল্লাহ, সুআলাতুল ইব্রাহিম)
অর্থাৎ, ... আমর ইবন তাইবের দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (সাহ) মক্কার গিরিপথে একজন ঘোষককে (এই ঘোষণা দিয়ে) পাঠানেন, সাবধান! সদকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব ... দুই মুদ গম। অথবা এছাড়া অন্য কিছু হলে এক সা খাবার।

উপরে উল্লিখিত হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গমের সদকাতুল ফিতর অর্থ সা প্রদান করা ওয়াজিব।

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমাম হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাস)-এর হাদিস দ্বারা যে দলাল পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, হাদিসে উল্লিখিত দ্বারা গম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা খাদ্য জাতীয় প্রত্যেক বক্তুকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা যুরকানী (রহ.) শরহ মুয়াতীয় বলেন, তাঁর যে খাদ্য দ্বারা ভুট্টা, বাজো শস্য বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা নবী করীম (সাহ)-এর সময় গমের প্রচলন ছিল না। যেমন, হাফিজ ইবনে হাজার (রহ.) ইবনে খুয়ায়মা সূত্রে হযরত ইবনে উমর (রাস)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন-

"কানে তোমার মসজিদের সাদক্ষি নতুন এই খাদ্যে যেন বুঝাতে যাবে আল্লামা শরহ। এটা উল্লিখিত দ্বারা গমের এক সা প্রদান করতে থাকব। নন হওয়া নিজেই বলে।" এর জবাবঃ

কানে তোমার ধারায় এই খাদ্য বুঝাতে যাবে এটা উল্লিখিত দ্বারা গমের এক সা প্রদান করতে থাকব।

অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ)-এর যুগে সদকা সুলতান খেজুর, কিসমিস ও বর্ণ ছিল। গম ছিল না।

অতএব, তাঁর খাদ্য দ্বারা গম বুঝানো প্রচলন তখন থেকে শুরু হয়েছে, যখন থেকে নবী করীম (সাহ)-এর পরে গমের ব্যবহার অধিক হারে বেরোয়েছে। তত্কালে খাদ্য জাতীয় প্রত্যেক বক্তুকেই খাদ্য বলা হত। যেমন, হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাস) নিজেই বলেন-

(১) এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাস) প্রথম থেকেই গমের ফিতরা এক সা হিসেবে আদায় করতেন, বরং উদ্দেশ্য হল- প্রথম থেকেই
হৃদয়ত মূল্যবিন (রা) মদিনায় আসার পরেই খুদ্রী (রা) নিজের আমলের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাননি। যদিও অন্যান্য লোকেরা হয়তো মূল্যবিন (রা)ঊর হুকুমের উপর আমল করতে গিয়ে অন্যান্য শস্যের পরিবর্তে অর্থ সা গমের দ্বারা ফিতর আদায় করতেন। কিন্তু খুদ্রী (রা) গমের পরিবর্তে সর্বদা অন্যান্য শস্যের দ্বারা এক সা’ আদায় করতেন। এমন নয় যে, খুদ্রী (রা) গমের সদকাতুল ফিতর মে অর্থ সা’ তা জানতেন না বা মেনে নেননি।

হযরত হাসান বসরী (রহমতুল্লাহ) এর রেওয়াতে -

"ইন মোরাও পুরুষে এ নিয়ে আইন সুবিদে আন ইনুম এ নিয়ে আইন সুবিদে নির্বাচনে ইলে রক্ষেরি গুরুত্ব কর। ফল আকু সুবিদে এর সুবিদে সাধন ফুটে কিংবা কিংবা। তরু এবং তার চাঁদ মন বির" (খাতারী ১ ১৯২)।

অর্থাৎ, মারওয়ান আবু সাইদ খুদ্রী (রা) এর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, আপনি আপনার সোসারের যাকাত আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তখন আবু সাইদ খুদ্রী (রা) বার্তাবাহককে বললেন যে, মারওয়ান জানেন না, আমাদের উপর দায়িত্ব হল, প্রত্যেকের মাথাপিছু এক সা জেজুর অথবা অর্থ সা গম।

* হযরত গানমহক (রহমতুল্লাহ) বললেন, যদিও মেনে নেয়া হয় যে, হযরত খুদ্রী (রা) প্রথম থেকেই গমের এক সা সদরা দিতেন। অতঃপর মূল্যবিন (রা) এর অর্থ সা-এর আদেশ নেনো তিনি এক সা দেয়ারই দৃঢ় প্রতিজ্জ করছিলেন- এর জন্য তিনি বললেন, হযরত আবু সাইদ খুদ্রী (রা) এর প্রথমে একথা জানা ছিল না যে, গমে অর্থ সা ফিতরা স্বয়ং নরী করীম (সা) নির্ধারণ করছেন। বরং মূল্যবিন (রা) এর এই হুকুমকে খুদ্রী (রা) তার পক্ষ থেকে কিয়াস ভেবেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে অস্বীকার করছিলেন। কিন্তু জানার পর হযরত খুদ্রী (রা) এর কর্মসূচী ও মাযাহাব এটাই ছিল যে, গম অর্থ সা’ ওয়াজিব। (করকমের, ১ ২২৪)।

তিন ইমামের প্রাত্ত অবশিষ্ট দুটি হাদিসের জবাব ইসলামের প্রথম যুগে গমের ফিতরা এক সা দেয়া হত, অতঃপর অর্থ সা-এর হুকুম দেয়া হয় এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

... প্রতিটি অর্থ সা’ স্বল্প তালেবের বিস্তীর্ণ নির্দেশনা উল্লেখ নির্দেশনার ফুটন্ত সৃষ্টি... চাঁদ

মনে তালম ও চাঁদ এর স্বল্প তালেবের বিস্তীর্ণ নির্দেশনা উল্লেখ নির্দেশনার ফুটন্ত সৃষ্টি...
চন্দ্র উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ) সদকাতুল ফিতর হিসেবে ... এক সা খেজুর বা এক সা যথায় করা ধর্ম করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ সা গমনে এক সা খেজুরের সমান দিতে লাগল।

* বাবু তুমকীল রকো চ ২২৯

অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

৷ উদ্দীপনা অভ্যাস সান্ন্যাস সাল্লাল্হু অল্লামাং রাষ্ট্রিয় সেল্লাম ফি তুমকীল সত্ত্বের পূর্বাঞ্চলে শালিয়ে নিলে তাহাকে তাহার প্রধান পরিচিত হন।
অনুবাদঃ আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আকবাস (রা) নবী 
করীম (সা)-এর নিকট (সময়ের পূর্বে) দৃষ্ট যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা 
করলে তিনি (সা) তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করেন।

বিশ্লেষণঃ যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়ে কিনা?
এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, নিসাব পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ যাকাত 
প্রদান করে, তাহলে তার যাকাত আদায় পরিশ্রম হবে না, বরং পরে যখন ঐ ব্যক্তি 
নিসাবের মালিক হবে, পুনরায় যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। 
কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া।
তবে পূর্বের প্রদত্ত সম্পদ নফল সদরা হিসেবে পরিগণিত হবে।
কিন্তু নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পদের উপর এক বছর সময় 
অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করে, তাহলে তার যাকাত আদায় হবে 
কিনা এক্ষেত্রে ইমামদের মধ্যে মতানৈকী পরিলক্ষিত হয়।
* ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী, লাইস এবং হাসান বসরী (রহ)-এর মতে, বছর 
পূর্তি হবার পূর্বে অগ্রিম যাকাত প্রদান করলে তা আদায় হবে না। কেননা, যাকাত 
ফরয হওয়ার পূর্বের পূর্বার্দ্ধ হচ্ছে বর্ষপূর্তি হওয়া। (মুনফর ৭৫ সং ১৬)

দলীলঃ নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ فِي مَالِ زَكُوةٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ - (ابو داود ج ১ ২২১ বাবি পি জ ১)

السائمة ، ترمذي ج ১ ১৩৮ বাবি না না (على الطالخ نسائي ج ১ ১২৫)

অর্থাৎ, যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নেই।

কিয়াসী দলীলঃ নামায় যেরূপ নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলেই ফরয হয়, সময়ের 
পূর্বে আদায় করলে তা আদায় হয় না, ত্রতঃ যাকাতও ফরয হয় বছর পূর্তি হলে।
সুতরাং বছর পূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না।

(দ্রুস তুরাদি ج ২ ৫৮-৫০) 

এ ব্যাপারে হাসান বসরী (রহ)-এর উক্তি হল:

مَنْ زَكَّى فِي الْوَقْتِ أَعْدَّ كَالْصُّلُوْفَة - (عبن ج ৪৭)

অর্থাৎ, কেউ যদি সময় আসার পূর্বে যাকাত আদায় করে তবে তা নামায়ের ন্যায় 
দোহার কবে। (পুনরায় পড়ুবে)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেক, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (রহ)-এর মতে,
নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করা জায়ে আছে। (عبن ج ৪৭)
বাবে ফির আল্লাহ ভক্তি হয়ে যাওয়ার সময় বলা হয় যে, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে তাই আদায় হবে না, বরং এর পরে একবার বুঝানো উদ্দেশ্য যে, যে মালে এক বছর পূর্তি হয়নি, তার উপর যাকাত ফরয় নয়।

তবে যদি কেউ নিসাবের মালিক হওয়ার পর আদায় করে দেয়, তাহলে আদায় না হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া অন্যান্য হাদিস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

কিয়াসী দলিলের জবাবে ওয়াকি নামায় ওয়াজিব হওয়ার কারণ। অথবা বছর অতিরিক্ত হওয়া যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত, রাসুল মোহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) যাকাত না করলেও ওয়াজিব হওয়ার কারণ নয়। সুতরাং বছর পূর্তি করে নামায়ের ওয়াজের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

(দৃস তৃতীয় গ ২০৮ সূত্র)
বিন্দুমাত্র যাকাতের সম্পদ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা জায়ের কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতবাদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাকাত স্থানান্তর করা জায়ের নয়।

(নীতি আইনতাত জ ২/২)

দলীল (১): পূর্বতন ইমামদের কাছে উক্ত হয়ে আছে যে, নবী করিম সাহেব (সাহেব) এর যুগের যাকাতের কাছে আদায় করা হত। এ সময়ে সেই সকল এলাকার সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

দলীল (২): ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন ও মুআমি (রহ.)-এর মতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাকাত স্থানান্তর করা জায়ের। তবে উক্ত হল, এক এলাকার যাকাতের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য এলাকায় স্থানান্তর না করা। অর্থাৎ, প্রয়োজন ব্যতীত স্থানান্তর করা মার্কার হয়।

অর্থাৎ, ... রাসূল সাহেব ও মুআমি (রহ.)-কে তারা প্রেরণার সময় বলেন, যে এ সময়ে যাকাত স্থানান্তর করা হয় না।

*(নীতি আইনতাত জ ২/২)*

যেমন, নবী করিম সাহেব (সাহেব) ইরশাদ করেন-
আহকামুল হাদীস ৩৬২ যাকাত অধ্যায়

লেখাটির প্রথম অংশের জোর করতে হয় ও এটির অন্যান্য কিছু করার জন্য, মুসলিম লোকদের শরীআত ও আহকামের জোর ব্যবহার করতে এবং এটির আধ্যাত্মিক পরিস্থিতিতে একটি প্রাণ বদলা করতে হয়।

এখানে উল্লিখিত হয়েছে যে, মাদীনার শহর উত্তম, আর এই নবী করিম (সং) বেদুইনদের কাছ থেকে যাকাত এবং মদীনার সব মুহাজরদেরকে দিতেন।

যুক্তিবিন্দুত্ব দলীলে আসলে ব্যাপারটা একটি বাইবেল দর্শন লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, একরকম সাধারণতরি করায় কোন অসুবিধা থাকতে পারে না। বরং অনুমিতই দিতে হয়। কারণ সুমাসজীবা ও তাদের পূর্বের ভিত্তি অনুবিষ্ট গড়ে তুলতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারী হয়। যেহেতু, আমাদের দেশের অথবা বিশ্বের কোন এক প্রাসঙ্গিক অর্থের ফল উৎপাদন হল। আবার করা হচ্ছে কোন এক হস্তের কিছুই উৎপাদন হল না, বরং সেখানে চরম দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, এক্ষেত্রে উৎপাদনশীল এলাকায় গোষ্ঠী না থাকলে যাকাতের সম্পদ আদায় করে যেখানে কোন ফসলই উৎপাদন হয়নি সেখানে হানত্র করা উচিত। কারণ তারাও এতে হাকিম। কিন্তু দেখা না হলে এটা হবে অবিচার এবং ইসলামী নীতি-নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিত।

জবাবঃ হানাফীগণের পক্ষ থেকে প্রথম দলীলের জবাবঃ ইমরান বিন হুসাইন ছিলেন নিমিশ সময়ের জন্য কোন একটি নিমিশ স্থানের যাকাত আদায়কারী। তিনি বিশেষ পরিবর্তনিতে ঐ কথা বলেছিলেন। প্রহর্যকৃত দলীল তো হবে তাই যা যম নবী করিম (সং) আমল করেছেন।

(তন্ত্রে) আল-ইশ্বায়ি (২:১৬) ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত হয় এর ফেরাইমের কথা।

স্বর্ণমটি ফেরাইম-এর দিকে ফিরেছে, হয়তো এর দিকে নয়। অর্থাৎ, চাই যামনবাসীর গুরুর হক অথবা অন্য যে কোন শহরের মুসলিম গুরুর হক, সবাইকে দেয়া বৈধ হবে।

(মানুষের জীবন ৫:২৫)
বাবু মনে যুক্তি মিত্র যত গ্রন্থি চির ২২৯

যাকাত কাছে দিতে হবে এবং কাছে ধনী বলা যায়

... উপন আল্লাহ শালুকে রসূল এর স্বাধীন করে লিখা হলো এবং তার ব্যবধানে নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করা হয়। তাই বাবু জানু, বিদ্যমান মহামুখী হোক এবং কোনো কোনো সময়ে যে দুর্বল ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হয় সে যে জানার হয় না।

হয় তাই এই ব্যাখ্যাটি শুনুন এমন ব্যবস্থা করা হয় যে এই ব্যবস্থাটি নিরুপায় হবে।

অনুবাদঃ ... যিনিদের হাসি আস-সুদায়ী (রাই) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাহি)-এর বিধান হাসির হয়ে তাঁর নিকট বায়াদ প্রচার করি। অন্যদিকে তিনি একটি দীর্ঘ হাসি বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, তাঁর নিকট এক ব্যাখ্যা এসে বলে, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান কর। তখন রাসূলুল্লাহ (সাহি) তাতে বলেন, আল্লাহ তাআলা (সদরতার মাল খচনির ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ হয়নি, বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবৃতি করেছেন। যদি তুমি তাদের অনুজ্ঞা হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।

বিশেষণঃ মূল মূল বা যাকাত ব্যাপারে হাদিসমূহ যাকাত ব্যাপারের ৮টি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-
যাকাত অধ্যায়

৩৬৪

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্তে আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হবে এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আলাহার পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মসজিদের জন্য- এই হল আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান। আল্লাহ সবর্ণ, প্রজামায়।” (তাওয়া ৬০)

নিম্নে যাকাত বক্তনের খাতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হল-

১। ফকির বা দরিদ্রঃ ফকির বা দরিদ্র বলতে ঐ সকল নারী-পুরুষকে বুঝায়, যারা পুরোপুরি সহায়-সহায়ক বা একেবারেই নিঃস্ব নয়। তথ্যসূত্র চাহিদা পূর্ণ যা যারা অন্যের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। তাহাড়া জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়া অক্ষম, দুর্বল, পশু, অভাবপ্রাপ্ত লোকদেরকেও সামরিকভাবে দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

২। মিসকিন তথা নিঃস্ব বা সর্বহারাঃ মিসকিন বলতে সহায় সহায়ক একেবারে নিঃস্ব ঐ ধরনের পুরুষ ও মহিলাদেরকে বুঝায়, যারা অপরের দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত চলতে পারে না।

৩। যাকাত আদায়কারী ও বক্তনকারীঃ যাকাত বিভাগে কর্মরত যে সকল কর্মচারী রয়েছেন, যারা যাকাত-উদ্দেশ্য আদায়, বক্তন ও সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়ের নিয়জিত, এ সকল কর্মচারী যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিকও হয়, তবুও তাদেরকে যাকাতের অর্থ থেকে বেতন-ভাবা প্রদান করা যাবে।

৪। মুআলামাতুল কুলুব বা যাদের মন পাওয়া উদ্দেশ্যঃ মুআলামাতুল কুলুব বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রস্ত নও মুসলিমকে বুঝায়। ইসলামের স্বার্থে নও মুসলিমদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এবং তার মন জয়ের উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ খরচ করা যাবে। যদিও সে নিসাব পরিমাণ সম্পদদের মালিক হয়।

৫। গোলাম আযাদ বা দাস মুক্তির ক্ষেত্রঃ মাকাতিব গোলামের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে গোলাম তার মালিকের সাথে চুক্তিতে শুরু হয়, এরপর গোলাম আযাদের ক্ষেত্রে যাকাতের মাল ব্যয়িত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ দাস-দাসীর বেলায় এই আইন প্রযোজ্য নয়।

৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রঃ ঐ সকল ঋণী, যারা ঋণভারে জড়িত অথচ ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিক কোন ক্ষমতাই তাদের অবশিষ্ট নেই। এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করা যাবে।
৭। আল্লাহর রাশিয় জিহাদঃ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রাণ-পণ প্রচেষ্টা চালাত তাদের আর্তিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকলে যুদ্ধাত্ব ও প্রায়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনার জন্য যাকাতের টাকা ব্যয়িত হতে পারে।

৮। মুসাফির বা ভ্রমণকারীঃ মুসাফির বা ভ্রমণকারী বলতে বুঝানো হয়েছে যারা স্বাস্থী প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভ্রমণের অবস্থায় অর্থের অভাবে পথচলা থেমে যায়। ঐ সম্পদশালী মুসাফির ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ।

“মুআলাফাতুল কুলুব”-এর ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলেচনায় সাধারণত তারা ছয় শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। উলামাদের নিকট মুআলাফাতুল কুলুব তথা নও মুসলিম বা অমুসলিমকে দীনের স্বার্থে চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত যাকাত দেয়ার হক্ক এখনও অবশিষ্ট আছে, নাকি এটা নবী করিম (সা)-এর যুগের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং তাঁর ইতিকালের সাথে সাথে তা রহিত হয়ে গেছে– এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানীক্য রয়েছে–

* ইমাম শাফেঈ, আহমেদ ইবন হাবল, যুহরী, কাশফ আব্দুল ওহাব (রহ.) প্রথমের মতে, নও মুসলিম বা অমুসলিমকে মন জয়ের জন্য এবং ইসলামের সমৃদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য যাকাত প্রদান করার মুহক্ক এখনও অবশিষ্ট আছে, তা রহিত হয়নি।

দলীল (১): পবিত্র কুরআনের আযাত–

إِنَّا الصَّدْقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَعَلَّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَّقُونَ اللهُ مِنْ نَارٍ

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ইবন আনাস, হাসান বসরী (রহ.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মতে, নও মুসলিমকে মন জয়ের জন্য এবং ইসলামের সমৃদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য যাকাত প্রদান করার হক্ক এখনও অবশিষ্ট নেই;

বরং রহিত হয়ে গেছে। (ফতুহে আলেম ২০ সং ১৫০, মুকর আল মন্তুর ২৮৩ সং)

দলীল (১): একক বলেন, উক্ত হক্ক মানসুখ (রহিত) হওয়ার জন্য এই আযাত নাসিখ (রহিতকারী) যা সূরা কাহাকে বর্ণিত হয়েছে–

الحَقِّ الَّذِي رَحِيمَ فَقِنَّ شَاءَ فَلَيْقُولُوا وَمَنْ شَاءَ فَظَيَّنَّ

অর্থাৎ, “সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করকে এবং যার ইচ্ছা অমান্য করকে।” (কাহাফঃ ২৯)

* আল্লামা শামি (রহ.) বলেন, মুআলাফাতুল কুলুব-এর রহিতকারী আযাত হল–

- অর্থাৎ, তোমরা মুহাম্মদ রশূতা তাদের পাও। (তাওবাহঃ ৫)

* অথবা, সূরা নিসার আযাত–

وَلَنَّ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفَّارِينَ عَلَى الْمُؤْمِينِ سَيِّئَٰتًا
অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কোন পথ রাখবেন না। (নিসা: ১৪১)

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ‘মু-আল্লাহফাতুল কুলুব’-এর হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে এবং বুঝা যায় যে, তাদেরকে প্রথম প্রথম এজন্য যাকাত দেয়া হত যাতে তাদের মন পরিত্যক্ত থাকে এবং ইসলামের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু অনেকেই বলেন, সাহাবায়ে কিরামের মুখে ইহা রহিত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর সময়কালের একটি ঘটনা- নবী করিম (সা) উয়ায়নাহ ইবন হিস্না নামক এক কাফিরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উপহার দিতেন। কিন্তু নবী করিম (সা)-এর ইসংকলনের পর যখন এ ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট একই উদেশ্যে আসে, তখন তিনি (রা) বলেন, নবী করিম (সা) তো তার মন জয়ের জন্য সম্পদ প্রদান করতেন। এখন আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় দান করেছেন। সুতরাং এখন আমাদের নিকট তাদের কোন অংশ নেই। চাই তাদেরা ইসলাম গ্রহণ কর বা না কর, তাতে কিছু আসে যায় না। (ফতুহ আল-কাদিমা ১৫, ৪৫, ফতুহ ইসলাম ২৬, ৭৫) অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন- 

الحقِّ فِي رَجُلٍ يُقَدِّمُ فَنَّهُ شَهَّةٌ قَبْلَ وَيْلُونَ وَفَيْنَ شَهَّةٌ فَلَيْكَفْ- 

কেউ কেউ বলেন, এ হুকুমটি নবী করিম (সা)-এর যুগের সাথে খাস ছিল।

* আল্লাহ কুরআনী ও কাজি সানাইলুলাহ পালিপঘী (রহ.) এ ব্যাপারে একটি সূচনা তত্ত্ব প্রদান করেন, “মু-আল্লাহফাতুল কুলুব”-এ কাফির কখনো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং এর দ্বারা একমাত্র উদেশ্য হল ঐ সকল নও মুসলিম, যারা দরিদ্র। সুতরাং এ ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে রহিতের প্রয়োজন হয় না। আর নবী করিম (সা) কাফিরদের মনোরঞ্জনের জন্য যে মাল দিতেন, তা যাকাত থেকে নয়, গনীমতের মাল থেকে।

(তৎসর তারিখি ৫, ১৭৬, তৎসর মোহরি ৪, ২২৪)

যাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয় যাকাতের অর্থ যাদেরকে প্রদান করা যাবে না এবং প্রদান করলেও যাকাত আদায় হবে না। ইসলামী চিত্তবিদ্যায় তাদেরকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন-

১। নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং তাদের পিতামাতা।

২। নিজের স্বজন, নাতি-নাতনী

৩। স্বামী

৪। স্ত্রী

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ইসলামী নিয়মের মূল ব্যতীত অন্যান্য নিয়মের মূল যাকাত প্রদান করা অধিক সুওয়াবের কাজ। (drs মস্কিমা ২, ১৮১, drs তুরাই ২, ৪৭২-৪৭৪)
৫। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। আবার যাকাতের হকদার এমন কাউকে এত বেশি পরিমাণ যাকাত প্রদানও বৈধ নয় যা দিলে সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

৬। কোন অমুসলিমকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (এ ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

৭। বনু হাশিম (রাসূল সাহ-এর বংশ) গোড়ের লোকদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়।

কাকে ধনী বলা যায় এবং কার জন্য সওয়াল করা জায়েঃ কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ব্যক্তিকে ধনী বলা যাবে এবং অনেকের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে--

উল্লেখ যে, ধনী তিন প্রকারঃ

(১) যার নিকট বর্ধনশীল মাল রয়েছে এবং পাশাপাশি সে সাহাবী নিসাব হবে।

এমন ধনীর উপর যাকাত, কুরবানী এবং সদকাতুল ফিতর সবই আদায় করতে হবে। তার জন্য সবর্প্রাকার সদকা গ্রহণ করা হারাম।

(২) যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে, তবে বর্ধনশীল মাল নয়, এমন ধনীর উপর যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে তার জন্য যাকাত ও অন্যান্য সদকা গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু কুরবানী করা, সদকাতুল ফিতর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

(৩) যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বর্ধনশীল এবং বর্ধনশীল কোন

মালই নেই, এমন ধনীর উপর যাকাত, কুরবানী এবং সদকাতুল ফিতর কোনটাই আদায় করতে হবে না। তবে এমন ব্যক্তি সওয়াল ব্যতীত যাকাত গ্রহণ করতে পারবে।

(দ্রস মেষকুং এ ১৮৮, দ্রস তরমাজ জ ২ স৫৪-৪৭)

* ইমাম শাকেই (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি ৫০ দিরহাম বা তৎসম মূল্যের সম্পদের

মালিক হবে, সে-ই ধনী। তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না। তিনির

(রহ.) বলেন, ইহা ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.):এর উক্তি।

দলীল অস্তু যা রসূল মিও প্যাক হস্তান্দ দ্রমে অনিশ্চিত কিনা মুহম্মদী মিও মন্ত্বিতে মিও

(পূর্ণ হাদিসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে)

* কেউ কেউ বলেন, আহমদ ইবন হামল, ইবন মুবারক ও ইসহাক (রহ.)-এর

মতে, যার সব সময় বা অধিকাংশ সময় সকল বিকালের খানা জোটে এবং অন্যের

মুখাপেক্ষী নয়, সেই ধনী। তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা বৈধ হবে না।
* এ ব্যাপারে হানাফীদের অভিমত হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এক দিন এক রাতের খোরাক থাকে তার জন্য সওয়াল করা জায়েহ নয়। তাহারা সুস্থ ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্যও সওয়াল করা জায়েহ নয়। অবশ্য যার নিকট একদিন এক রাতের খাবারেরও ব্যবহার নেই, তার জন্য সওয়াল করা জায়েহ আছে।

(দৃষ্টি তর্থম জ (২৬) সে থেকে)

দলিলঃ

... কালে নতুন নির্দেশ হয়ে মোস্তাফান্‌ এলাহু লালুত্তায়ি নামা কে নানা প্রেম হলে তার নিকট আসা করে নানা প্রেম নিকট আসা করে।

যেন কী মুহূর্তে বুঝে যেন প্রাঙ্গন এই প্রাঙ্গন। (বিবাদ ডাউজ জ (৩২) সে থেকে)

অর্থাৎ, ... রাবী নুসারিকের অন্য বর্ণনায় আছে, সাহায্যের সেতুকা কারণ, ইয়া রাসুলুল্লাহ। ধনী (অমুখানপীকৃ হওয়ার সীমা কি, যার কারণে অন্যের নিকট চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেন, কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকল ও সক্ষম প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। অন্য বর্ণনায়, “যা তার রাত-দিন বা দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট” উল্লেখ রয়েছে।

কালে উত্তার কে ঝোঁকে আর্ব আলী বন শায়েসী জান আম্ব এভাবে লেখা না তখন লেখা না।

ল্যাডি নামা সে উদ রাত বলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন আমার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, শক্ত, সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাত্রাগ্রহণ বৈধ নয়।

* ইমাম গায়লী (রহ.) বলেন, যদি কারো পরিবার-পরিজন না থাকে, তাহলে তার জন্য এক দিন এক রাতের খাবার থাকলে সে সওয়াল করতে পারবে না। আর যদি পরিবার-পরিজন থাকে, তাহলে পঞ্চাশ দিঘ্রেম থাকলে সওয়াল করতে পারবে না।

* অবশেষে শাহ ওয়ালীউদ্দৌলাহ ও তাহাবী (রহ.) এই নিয়মকালের সমাধানকল্পে বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতি ধর্মন্ত্র হবে। কারো পঞ্চাশ দিঘ্রেম জরুরী, কারো এর থেকে বেশি জরুরী, কারো বা এর থেকে কম প্রয়োজন। সুতরাং অবশ্যই পরিপ্রেক্ষিতে সওয়াল করা জায়েহ বা হারাম ধর্মন্ত্র হবে।

(নিয়ম এলাশুরাত জ (৩) সে থেকে, দৃষ্টি তর্থম জ (১৮) সে থেকে)
বাবুকে কম যেতে র্জল দুইতে মিনের কচুকে সংখ্যা সংখ্যা ২৩১
এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে এই বিষয়ে বর্ণিত। তিনি বললেন: নাম সাহিব ইবন আবু হাসামাহ নামক জেনারে আনসারী তাঁকে বলেন যে, নবী কুরআন (সা: তাঁকে দিয়ারাতের (রক্তমূল্য) হিসেবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন, অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়ার (রক্তমূল্য) যিনি খায়বরে নিহত হন।

বিশেষ্যঃ একজনকে এত বেশি পরিমাণ যাকাত প্রদান করা বেধ নয় যা দিলে সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এত কম পরিমাণ দেয়াও উচিত নয়, যার দ্বারা সে কিছুই করতে পারবে না।

উপরের বিশেষ্য হাদিসে যাকাতের মাল থেকে যে একশতটি উট দেয়া হয়েছে তা মূলতঃ বায়তুল মাল থেকে দিয়ার বা রক্তমূল্য (হত্যাকারীর উপর ধার্মিক ক্ষমতাপূর্ণ) হিসাবে দেয়া হয়েছে।

* তবে ইমামদের মধ্যে যে বিষয়ে এখতেলাফ রয়েছে তা হল- পবিত্র কুরআনে মস্তফা, যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যে সকল প্রকার উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক প্রকারের যাকাত দিতে হবে কিনা-

* ঈমাম শাফেই (রহ.)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যে আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি খাতে কমপক্ষে তিনজনকে যাকাত প্রদান করা জরুরী। তবে, কোন শহরে যদি প্রত্যেক প্রকারের লোক না পাওয়া যায়, তাহলে যে কয় প্রকারের লোক পাওয়া যাবে তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

(যাকাত অধ্যায় ৫ সংখ্যা ২০০, অল্ম ২১ সংখ্যা ১৬৮)

দলিল (১) আললাহ তাআলার বাগী- (নবী ২০) অর্থাৎ "ল" দ্বারা যে প্রত্যেক সম্পর্ক (সম্পর্কের) করা হয়েছে তা মূলতঃ অধিকারের বিবরণের জন্য।

সুতরাং আট প্রকারের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের যাকাত প্রদান করা জরুরী। অতঃপর লক্ষণীয় যে, প্রকারসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার হয়েছে। আর
দলীল (১) ৪: পবিত্র কুরআনের আয়াত-

إِنْ تَنْبِدَوْنَ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَهَا يَوْمَئِنْ تَحْفَظُوهَا وَتُؤْتِوهَا الفَرْقَةَ فَهُوَ حَيْرَٰلْكُمْ

ategorical, যদি তোমরা প্রকাশে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপন কর এবং অভাবপ্রুদ্ধদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। (বাকারাি: ২৭১)

উক্ত আযাতে লাম جنسى (শ্রেণী বা জাতি বুঝাতে যে অলিফ লাম ব্যবহৃত হয়) প্রবিষ্ট হয়ে আমাদেরকে সকল সদকাকে বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে যাকাতও অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মধ্যে এক প্রকার শুধুমাত্র ফকিয়েকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এক প্রকারে দেয়া যথেষ্ট হবে।

দলীল (২) ৪: বেসামরি বা খিজ বা অর্থাং, ... হযরত ইব্রাহীম সে রূপে যান যারা নামক নামক নামক, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)

فُقَرَاتِ الْخ (ابو داود: ১১৩ বাবি বাবি কানিসিয়া) ২৩৫ পানের তাজিয়ায় প্রকাশে করে বলেন, ... অল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয় করেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হেত তা গ্রহণ করে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করবে।

উক্ত হাদিসেও এক প্রকারের (ফকির) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইজমাই হযরত উমর, ইবন উমরা, ইবন আব্বাস, হুয়াইফা, সাইদ ইবন যুবাইর (রাও) প্রমুখ থেকে এই রেওয়েতটর পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
জব্বরঃ হানাফীগণ বলেন, “আমি আমার প্রস্তাব এর দ্বারা যে আমি আমার প্রস্তাবটি লিখি”
করা হয়েছে, তা অধিকার প্রমাণের জন্য নয়, বরং নিদিষ্ট বয় খাতের বিবরণের জন্য। অর্থাৎ এ আট প্রকার ছাড়া অন্যদের দেয়া জায়ের নয়। আর এটা তো আসে সীমাবদ্ধতা (ছাত্র) বুঝা নারে জন্য।
(ドレスッシュ জো চু সোং ১৬০ চু)

استغراق "الف لام" (الف لام) (الف لام) (الف لام) (الف لام) (الف لام) (الف لام) (الف لام) (الف لام)

سُبْحَانَ اللّهِ الَّذِिّ الْقُدُّوْحِ لاَ تَقَدِّمَ عَلَيْهِ نَعْمَتًا مِّنْهُ وَلاَ ثَمْنَةً مِّنْهُ وَلاَ كَبْرٍ مِّنْهُ.

(फ़त़िली अली- (सम्पादन और दीक्षा) 24 उपन्यास भाग फ़िल्टर और स्पिनिंग)

भोलुङ्काक चित्तवी निन्तः आहल दीनम च ३३५

अमुस्लिमदेण दान-खयरात करा

... अनुभव कहा जिसे अमी तापिः अमी तापिः फ़्लेक्स और राजी कमः राजी कमः मश्रिकः

फ़ल्लः जा सुझुल लली इन अमी प्रेमिः अमी प्रेमिः राजी कमः मश्रिकः आफ़िशः का नैमः

अनुवादः ... आसमा (रांग) हते वर्तित। तिनि वलन, आमार माता, तिनि इसलाम वैरी और कोराइश धर्मः अनुरागी थी। (कुराइशदेण साथे हुँडायविया नसिकः समय) आमार निकट आगमन करवे। आमि जिजिसा करिः इया रासुलालाह। आमार माता आमार निकट एसेछेन, किन्तु तिनि इसलाम वैरी मुशरिकः। एखन (अतीतःतार बन्धन हेतु) आमि कि ताके किछू दान करन। तिनि वलनः हँ, तुम्हि तोमार मातार साथे अनुभवपूर्ण ब्यवहर कर।

विशेषतः ए ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, সাধারণ (নফল) দান সদরক অমুসলিমদের প্রদান করা বৈধ আছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের যোগ্যানো হল-
আহকামুল হাদিস

যাকাত অধ্যায়

লাইনের লেখা নামে এক্সেলেন্ট লেখা প্রথমে দেখা বর্তমানে মুসলিম কান্তিকে তাদের সত্যিকার প্রদান করা হয় না। মুহাম্মদ নিশ্চিত আল্লাহ ইসলামকারীদেকে তাদের অনেক নিয়ম দিয়েছেন।

(মুমতাজহাইমাব, ৮)

এমনকি ইমাম আবু হাফিজ ও মুহাম্মদ (রহ. ) বিশ্বীদেরকে (ইসলামী রাজ্য করে তাদের আমলের নাগরিক) সদকাতুল ফিতর প্রদান করা আর্য মনে করেন।

তবে উত্তম হল মুসলিমদেরকেই প্রদান করা। (দান আল শান্তের ২ সালের ৩৬)

প্রশ্ন হল, মুসলিমকে যাকাত প্রদান করা জায়েত কিয়া। এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক রয়েছে।

* ইমাম মুহার, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং যুহরী (রহ.)-এর মতে, মুসলিমকে যাকাত দেয়া জায়েত।

(কেন দেয়াক্কাট উমাইয়ার ১৪ সালের ৬)

দলীল

ইমামের সোনার লেখা নামে এটি যাই হোক উক্ত আয়াত এর ব্যাপক অভিনব করা হয়।

দলীল (২৪) নবীর করিম (সা) সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে কাফির হওয়া সত্যিকার উপহার প্রদান করেন।

* চার ইমাম ও জমকুর উলামাদের অভিমত হল, মুসলিমদের যাকাত প্রদান করা বিধ নয়। (দ্রস তোমরে ২ সালের ৩৪)

জমকুরদের দলীল এবং ইমাম মুহার (রহ. )-এর প্রদান দলীলের জবাব

ইবন আকাবা (রহ. )-এর হাদিস (রহ. )-এর হাদিস (রহ. )

(হাদিসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, “যাকাত উত্তোলন করবে তাদের ধনীদের পক্ষ থেকে”। এখানে তাদের বলতে তা মুসলমানের বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোন অমুসলিম তো আর যাকাত প্রদান করবে না। এবং দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, “এবং তাদের গ্রেহ মধ্যে বিতর্ক করবে এখানেও তাদের বলতে মুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই যুক্তিমুক্ত।
প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা, যাকাত প্রতিষ্ঠিত থেকে অমুসলিমদেরকে অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যাখ্যা-“মুআলারাফাতে কুলুবে” শামিল ছিল না।

ইমাম কুরত্তুবী (রহ.) বীর তফসীরে রাসূল করিম (সা) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার খাত থেকে দান করেছিলেন, সর্বাপেক্ষা তাদের নামখামসহ উল্লেখ করে বলেছেন-“যদি জমাদী মুল্লিম মোমঝ ও মুম্ম ফিম্ম কাফীর” (তরকরির জি ১৮৭ সখ)।

অর্থাৎ, মূলতঃ তারা সবাই ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

কাফেরফুল্লাহ পানিপথী (রহ.) তাফসীরে মায়হাতীরে বলেন-“তারা নিশ্চিত করে যে, অল্লাহ তিউঀ পরম আল্লাহ নিশ্চিত হইল কেবলে ইসলামের অভিযোজি হইল।” (তরকরির জি ২১৩-২১৩)।

অর্থাৎ, কোন বাণীয় থেকে একথা প্রমাণিত নেই যে, রাসূল করিম (সা) কাফেরগণকে মন জয়ের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন।

আর সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে কাফির অবস্থায় নবী করিম (সা) যে সম্ভব দান করেছিলেন, সে সম্পর্কে ইমাম নবী (রহ.)-এর উক্তিত দিয়ে লেখা হয়েছে যে, এবং দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুমাইন যুদ্ধের গোপনীয়তার মালের মূল মালের মাল অব্যাহত হয়েছিল সেখান থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা বলা যায়, বায়তুল মালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের জন্য ব্যাখ্যা সমস্ত কিদাববিদগণের নিকট জানায়।

সর্বোপরি বলা যায়, যদিও এ ব্যাপারে ইমাম যুফার (রহ.)-এর কিছু দলীল বেশ শক্তিশালী, কিন্তু এর বিপরীতে বিপুল সংখ্যক উমাইয়ার ইজমা এর থেকেও বেশ শক্তিশালী ও মজবুত। অবশেষে ইহাই প্রমাণিত হল যে, অমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদান করা বৈধ নয়। (ফাকিহ বলে জি ২১-২১াগু)
হজ্জ অধ্যায়

৪: বাবু ফাতেহ হজ্জ চৌধুরির বর্ণনা

... তাঁর বৃদ্ধি বলে আল্লাহর বান্ধব ব্যক্তি উপরে আল্লাহর প্রতি যার রহমত ও দয়া।

তদুপরি জুমা রাহুল হজ্জ, যে শন্দটি কে তুমি বিশেষ করে দেখবে। রাহুল হজ্জ, যে শন্দটি কে তুমি বিশেষ করে দেখবে।

মাজা চৌধুরি (২১২)

অনুবাদঃ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আকরা ইবন হাবিব (রা) নবী করিম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূল হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয়, না জীবনে একবার? তিনি বলেন, (জীবনে) একবার (হজ্জ করা ফরয়)। এর অধিক যদি কেউ করে তবে তা তার জন্য অতিরিক্ত।

বিশেষণঃ হুসাইন জুফী (রহ) বলেন, হজ্জ শন্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায়। যেমন-

(১) হজ্জ-হারফ যবরযোগে (রাজা হামিদ)

(২) হজ্জ-হারফ যবরযোগে (রাজা হামিদ)

তবে যবর যোগে হজ্জ শন্দটি ইসমাইল হজ্জ বর্ণে বিশেষ বলে। যেমন, কুরআনে এসেছে-

(১) আর "হজ্জ অথর্ত হজ্জ (ক্ষেত্র) মূলকিত এই মাস মুসলমান সুবিদিত। (বাকারাং ১৯৭)।

(২) অবন যে যোগে হজ্জ শন্দটি ইসমাইল হজ্জ বর্ণে বিশেষ বলে। অন্যদের থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত আছে। (মুয়াবিন সেন ক্রিয়ামূল ৩৭)

আর সম্ভবত হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, এ দুই পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে। (আলে ইমরান হজ্জ)

হজ্জ-এর প্রতিধিক অর্থঃ

(১) ইচ্ছা

(২) সংকল্প

(৩) আস্তানা

(৪) পরিদর্শন
হজ্জ অধ্যায়

(৪) মহৎ জিনিসের ইচ্ছা
(৫) পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন ইত্যাদি।

হজ্জের পরিভাষিক সংজ্ঞায়:

"ব্যবহার মুক্তিশীল মানুষ মুক্তি ভূমিতে মুক্তি সম্পন্ন করে মুক্তি লাভ করে। (নির্দিষ্ট সময়ে)"

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কর্ম আদায় করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যিনি বিষয়ক করাকে হজ্জ বলা হয়।

"হজ্জে বিজ্ঞহতি, তথা প্রলোভন অপেক্ষায় বিলুপ্তি মাত্র বিলুপ্তি।"

নির্দিষ্ট কতগুলো আমলসহ বাইবেলর উদ্দেশ্যে গমন করা।

- এর গ্রহীকার বলেন -

হজ্জে বিজ্ঞহতি, তথা প্রলোভন অপেক্ষায় বিলুপ্তি মাত্র বিলুপ্তি।

অর্থাৎ, আল্লাহর সম্ভাব্য মাত্রের উদ্দেশে যদি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে পবিত্র কার্যকরী যোগ্যতার করায় ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলা হয়।

"হজ্জে বিজ্ঞহতি, তথা প্রলোভন অপেক্ষায় বিলুপ্তি মাত্র বিলুপ্তি।"

- গ্রহীকার বলেন -

- এর গ্রহীকার বলেন -

হজ্জে বিজ্ঞহতি, তথা প্রলোভন অপেক্ষায় বিলুপ্তি মাত্র বিলুপ্তি।

অর্থাৎ, আল্লাহর নেকটা লাতের উদ্দেশে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে বয়স্তাল হারানার উদ্দেশ্যে গমন করা।

(৫) কেউ কেউ বলেন -

হজ্জে বিজ্ঞহতি, তথা প্রলোভন অপেক্ষায় বিলুপ্তি মাত্র বিলুপ্তি।

অর্থাৎ, হজ্জ হচ্ছে, একটি মহান রোমান আদায় করার জন্য পবিত্র কারা ঘরের যিনি বিষয়কের নিয়ত করা।

হজ্জে ফরয় হওয়ার সময়কালে:

হজ্জ কখন ফরয় হয়েছিল, এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে।

(১) কোন কোন জিনিস বলেন, হজ্জের পূর্বে হজ্জ ফরয় হয়। (তবে এই উক্তি দুর্বল)

(২) আল্লামা কুরতুবী (রহ,) উলুক করেন যে, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয় হয়।

(৩) ইমাম বায়াহারী (রহ,) বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে।

(৪) আল্লামা মাওয়াদী (রহ,) বলেন, ৮ম হিজরীতে।
(৫) কেউ কেউ বলেন, ৭ম হিজরীতে।
(৬) বিশ্বাস মত হলে, ইমামুল হারামীন আবুল মাদালী আব্দাল মালিক ইবন আসাফরাস (মৃত্যু: ৪৭৮ হ।) বলেন, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরম্য হয়। ( عمدة الفاري ج ৯ সং ২২৩, فتح الباري ج ৩ সং ৩৩৫)

দলীলঃ পবিত্র কুরআনে এসেছে—

وَلَهِيَّ عَلَى الْمَّسَلِّيّ حَجِّ الْبِينَيّ مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سِبَّالًا— (ال عمران- ১৭)

আর এ আয়াতটি নবম হিজরীর শেষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(১) ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ এমন কিছু কর্মালী নিজের উপর হারাম করে নেয়া, যা মূলতঃ হারাম নয়। কিন্তু হজ্জের সমাপ্তার্থে হাজির জন্য হারাম ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجِّ ﷺ نَقَتٌ ۛ فَلَا رَقَتٌ وَلَا فَسُوقٌ وَلَا جُدُالٌ فِي الْحَجِّ—

অর্থাৎ, যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ্জ করার ইচ্ছা করে, তার জন্য উক্ত সময়ে কৃষি সত্ত্ব, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিদ্ধয় নয়। (বাকারেঁ ১৯৭)

ইবন আব্বাস (রাও) বলেন— রাসূল (সা) বলেছেন—

لا يُجاوِز أحد الْبَيِّنَاتِ إِلَّا مُحْرَّمٌ —

অর্থাৎ, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীর্ত অতিরিক্ত না করে।

(২) তথা বিলম্বিত মাসের নবম তারিখ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে—

وَفِوْفَ عُرْفَةٌ—

... عَنْ عَلِيّ بْنِ الْخَبَّازِ قَالَ: كَانَ قَرْبِيَّ وَمَنْ ذَانُ دِينَهَا بَيْقُونُ بِالْمَوْدُعَةِ وَكَانُوا يُسْقُونُ الْحُسَنَ وَكَانَ سَابِرُ الْعَرْبِ يَقِفُونُ يَعْرُفُونَ قَالَ ﷺ: جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمْرُ اللّهِ تَعَالَيْ نِيَّتهُ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ أَن يَتَبِّيِّنُ عِرْفَاتِ ۛ فَيَقِفُ يِنَّا ثُمَّ يَقِفُ يِنَّا كَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: تَعَالَيْنَ ثُمَّ أَقِفْوا مِنْ حَيْبٍ أَقِفْنَا النَّاسُ— (ابو داود ج ২৩৫ বাব দরকাম বেলরফা, بخارি ج ১ সং ২২২ বাব দরকাম বেলরফা, ترمذي ج ১৭৭ বাব দরকাম বেলরফা এবং । ج ২৪৪ বাব দরকাম বেলরফা)

অর্থাৎ, ... আয়িশা (রাও) বলেন, কুরায়েশ্রা, তাদের ধর্মের অনুসরণ করে মূজদিলিফে অবস্থান করত এবং একে বীরভূতের (প্রকাশ) হিসাবে আখ্যায়িত করত। আর আবেদের অন্যায় সমস্ত লোকেরা আরাফাতে অবস্থান করত। তিনি
হজ্জ অধ্যায়

(আরিশা রাও) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর, আল্লাহ তাআলা নবী করিম (সান)ের কে আরাফাতে গমনের এবং সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেখান হতে প্রত্যাবর্তন ও নির্দেশ দেন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বানী, "আর তোমরা সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন কর যে স্থান হতে লোকেরা ফিরে আসে।"

* অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, এক লোক নবী করিম (সান)ের জিজ্ঞেস করেন, হজ্জ কিরূপ? তখন নবী করিম (সান), জনৈক ব্যক্তিকে এতদসম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বললে সে বলল,

...আল্লাহ যোম উরাফা (আবু দাউদ জ. ১/১৬৫) হজ্জ অধ্যায় (২০০-২০৫) প্রস্তর উরাফা, বন মজাহ ২৩ (২৩)।

অর্থাৎ, ...হজ্জ হল, আরাফাতে অবস্থান করা।

(৩) তথা ফিলহজের ১০, ১১ অথবা ১২ তারিখ বাইতুলরাহ শরীফ তাওয়াক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,- ও নির্দেশ করেন যে এই গৃহের তাওয়াক করুন। (হজ্জ ২৯)

* হাদীসে বর্ণিত আছে-

"আল্লাহ আর্বাস আন রশোল লহ্ব সালিল লহ্ব উল্লাহ উল্লাহ নাম তাফ ফি হজ্জ উল্লাহ উল্লাহ বুরান উসলত নাম বিলকন বিলকন (আবু দাউদ জ. ২/২৫৯) হজ্জ অধ্যায় (২১৩)।

বাব জাতির তাছাতে বুকর অথবা নাম জাতির বাব জাতির জাতির বাব জাতির জাতিতে বাব জাতির জাতিতে বাব জাতির জাতিতে বাব জাতির জাতিতে বাব জাতির জাতিতে বাব জাতির জাতিতে (২১৭)।

অর্থাৎ, ইবন আব্বাস (রাও) হতে বর্ণিত। বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ (সান) উচ্ছ সাবার হয় বাইতুলরাহ (রাও) তাওয়াক করেন এবং রূখ ইয়ামানীকে (খানায় কাবার যে কোনো হজজের আসওয়াদ স্থপণ তাকে রূখ ইয়ামানী বলে) তাঁর হজের লালির দ্বারা ইশারাও চব্ব করন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

..."আল্লাহ আর্বাস আন রশোল লহ্ব সালিল লহ্ব উল্লাহ উল্লাহ নাম তাফ ফি হজ্জ উল্লাহ উল্লাহ বুরান উসলত নাম বিলকন বিলকন (আবু দাউদ জ. ২/২৫৯) হজ্জ অধ্যায় (২১৩)।

অর্থাৎ, ...হজ উমর (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সান) তাওয়াকে ইফাদা (আর্বাস তাওয়াকে যিহয়ার) দশ বিল-হজের দিন সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি (মক্কা হতে) প্রত্যাবর্তন করে মিনাতে যুহরের নামায আদায় করেন।

উল্লেখ যে, ইমাম শাফেই (রহ.)-এর মতে, মাথা মুহানা এবং সাপো করাও ফরয়।
হাদিসে বর্ণিত আছে—

(১) সাফা ও মারওয়া পাহাড়গড়ে ৭ বার সায়ি করা (সৰু) বা দৌড়ানো। আল্লাহ তাআলা বলেন—

(২) মুসলিমাকে অবস্থান করা।

(৩) জামারায় পাথর নিক্ষেপ করা।

(৪) উন উল্লেখিত বিষয়ের তলিয়ে যানে আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রশ্ন করা। সুতরাং যারা জেনে নিতে পারেন সেই অংশ পড়তে পারেন। এক কোনো দূর্বল পাঠককে নানা করার জন্য আমি এ পৃষ্ঠা দুটির বিষয়ে প্রস্তাব করতে চাই।

(বাকারাঁ ১৫৮)

... বনেই সেই ব্যক্তি যাকাত বলেন ভাল।... তো সাফা ও মারওয়া পাথরের সেই আৎপর সেই।

(আবু দাউদ জঘন্য ২৬১ পাতা আর এর পর পুনরায়)

অন্যতম, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা যারা পড়তে পারেন সেই অংশ পড়তে পারেন। এক কোনো দূর্বল পাঠককে নানা করার জন্য আমি এ পৃষ্ঠা দুটির বিষয়ে প্রস্তাব করতে চাই।

(বাকারাঁ ১৫৮)

... আল্লাহ তাআলা বলেন—

(আবু দাউদ জঘন্য ২৬১ পাতা আর এর পুনরায়)

অন্যতম, আল্লাহ তাআলা বলেন—

(আবু দাউদ জঘন্য ২৬১ পাতা আর এর পুনরায়)

অন্যতম, আল্লাহ তাআলা বলেন—

(আবু দাউদ জঘন্য ২৬১ পাতা আর এর পুনরায়)
অর্থাৎ, ... আরিশা (রাষ্ট্র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহিব) মক্কায় যুদ্ধের নামায আদায়ের পর দিনের অর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ায় পর অতিরিক্ত তাওয়াফ সম্পাদন করেন। অতঃপর তিনি মিনাতে গমন করেন এবং সেখানে তাশরীকের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। আর তিনি সূরা পশ্চিমাদেশে ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেন। নবী করিম (সাহিব) প্রতি জামরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকুরীর ধনী (আল্লাহু আকবর) দেন।

(৪) মাথা মুখন করা বা চুল কাটা। আল্লাহ তাতালার বাগী-

লত্যাহুন মসজিদ হরম অন্তর্ভুক্ত শায়া আল্লাহ বৈবা মূলধন রোকসম মুক্তচিত্রন।

অর্থাৎ, আল্লাহ চান তো তোমারা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্ররেখ করবে নিরাপদে মতকুম্ভকিত অবস্থায় এবং কেশ করিতে অবশ্য হবে। (ফাতহঃ ২৭)

... বিবে আমুর আন রসোল তং সচলা আল্লাহ উল্লাহ ও সমূল হলে রাষ্ট্রী ফি হলে জহিন্ত।

(৫) তাওয়াফে বিদা বা বহিরাগাতদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

... বিবে আমুর আন ক্যান নানা নিস্তার ফৌনা ফি কল জুর বিল ফৌল ত্রে সচলা আল্লাহ উল্লাহ ও সমূল হলে রাষ্ট্রী ফি হলে জহিন্ত।

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাষ্ট্র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহিব) বিদায় হজরের সময় বৈবা মতকুম্ভ মূলধন করেন।

(৫) তাওয়াফে বিদা বা বহিরাগাতদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

... বিবে আমুর আন ক্যান নানা নিস্তার ফৌনা ফি কল জুর বিল ফৌল ত্রে সচলা আল্লাহ উল্লাহ ও সমূল হলে রাষ্ট্রী ফি হলে জহিন্ত।

অর্থাৎ, ... ইবন আবাস (রাষ্ট্র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকরা (হজরের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনের পর তার হকুম আহকাম সমাপনকে তাওয়াফে যিথারাতের পর) প্রভাব করে। তখন নবী করিম (সাহিব) বলেন, তোমাদের কেউ যে শেখবারের মত তাওয়াফ (অর্থাৎ তাওয়াফে বিদা) পালন করে প্রভাব করে না।

অন্য এক রেওয়াযতে আরিশা (রাষ্ট্র) হতে বর্ণিত হচ্ছেঃ-

ফােলোর ফি আচ্ছায় পা রঙিল ফার হল ফৌল ফার বিল সচলা সচলা ফৌল ফৌল ফৌল ফৌল ফৌল।

(হীন আর্জ তম ইনসর্ফ সংগঠনা তল মহিমা- (আব দাও জ ১ ব ২৪ পাব বলোনতি)}

অর্থাৎ, ... তখন তিনি তাঁর সাহবীদেরকে গমনের জন্য প্রকৃতি হতে ঘোষণা দেন এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি ফয়রার নামায়ের পূর্বে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন।
ঢোকে মাহরাম* ব্যতীত মহিলাদের হজ্জে গমন

... তাই আপনি হোক তাদের কাছে রাসূল নিঃসর্গ দান করেন। লোকের পক্ষে যা হবে না তাই হজ্জে নয়। তাকে জীবনের মিলন দেওয়া হয়েছে। (বখতির 61:২৫) বাব মূল, সন্ত্রাস এ পরিপরিসমূল, সন্ত্রাস এ পরিপরিসমূল

অনুবাদঃ ... আবু হূরায়ারা (রাঘ) বলেন, রাসূল(س) ইল্লাহ করেন, কোন মুসলিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পূর্ণ সন্ত্রাস ব্যতীত এক রাত্রের পরিপরিসমূল দূরত্বেও সফর করা বৈধ নয়।

বিশ্লেষণঃ বিত্তশালী মুসলিম মহিলা মাহরাম না থাকা অবস্থায় সে হজ্জ করবে কিনা—এ বিষয়ে ঈমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। যথা—

* ঈমাম মালিক, শাফেকি ও আহমদ ইবন হায়ত (রহ) এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপত্ত হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরপূর্ব নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(পাইলের মজহত ১ চ ৩৩৫, ফলকের বিদ্য ২ চ ৩৩০)

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী—

* ঈমাম মালিক, শাফেকি ও আহমদ ইবন হায়ত (রহ) এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপত্ত হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরপূর্ব নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(নোমেন বিদন চ ২ চ ৭৩)

দলীল (২) হজ্জে হযরাত আবু হূরায়ারা (রাঘ) হতে বর্তমান, রাসূলুল্লাহ (সাঘ) ইল্লাহ করেন—

* ঈমাম মালিক, শাফেকি ও আহমদ ইবন হায়ত (রহ) এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপত্ত হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরপূর্ব নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(নোমেন বিদন চ ২ চ ৭৩)

* ঈমাম মালিক, শাফেকি ও আহমদ ইবন হায়ত (রহ) এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপত্ত হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরপূর্ব নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(নোমেন বিদন চ ২ চ ৭৩)

* ঈমাম মালিক, শাফেকি ও আহমদ ইবন হায়ত (রহ) এর মতে, মহিলার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বামী অথবা মহরাম সাথে থাকা শর্ত নয়। এছাড়াও হজ্জ আবশ্যক হবে। তবে শর্ত হল, পথ নিরাপত্ত হতে হবে এবং হজ্জের সফর এরপূর্ব নির্ভরযোগ্য সাথীদের সাথে হতে হবে, যাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য মহিলাও থাকবে।

(নোমেন বিদন চ ২ চ ৭৩)
অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ ফরয় করা হয়েছে, অতএব, তোমরা হজ কর।

দলীল (৩) আদী ইবন হাতিম (রা) এর রেওয়ায়েতে প্রিয়নবী (সা) এর ইরশাদ রয়েছে—

১৫৭ সনে—(সেদ ইবাদে, জি. ৪)

অর্থাৎ, যার কুদরতের মুঠোয় আমার জীবন তাঁর (আল্লাহ্‌র) কসম, আল্লাহ তাঁর অবশয় এ (সীরের) বিষয়টি পূর্ণ করে ছাড়বেন। এমনকি একজন মুসাফির মহিলা হিয়ারা থেকে বের হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়ারি করবে কারো সহযোগিতা ব্যতীত।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাউরী এবং আহমদ ইবন হামজ (রহ) এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, মহিলা যদি মক্কা-মুকাররমা থেকে সফরের পরিমাণ দূরত্ব থেকে তাহলে হজের সফরে স্বামী অথবা কোন মাহারাম সাথে থাকা জরুরী। আর এই শর্ত ছাড়া তাঁদের মতে হজ ওয়াজিব হবে না। বরং হজের সফরই জায়েত হবে না।

(BEGINNING OF THE 1ST PAGE)

দলীল (১) অনুসারে তারমত বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) বলেন—

... আবু সাইদ (রা) হাদিস বলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আকাদারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মাহারাম ব্যক্তি না থাকে।

দলীল (৩) বলেন—

... আবু সাইদ (রা) হাদিস বলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ ও আকাদারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার তিন দিনের অধিক দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়, যদি তার সাথে তার পিতা, তার ভাই, তার স্বামী, তার পুত্র বা কোন মাহারাম ব্যক্তি না থাকে।

(END OF THE 1ST PAGE)
প্রতিক্ষেত্রের দলিলসমূহের জবাবে আহনাফগণ বলেন যে,

(১) আলাহ তাআলা হজ্জ ফরয় হওয়ার জন্য পুরণ করাওনে উল্লেখ করেন, মন দিয়ে সনাতন তথা মনে করুন, যে বা পাথেয়ের সামর্থ্য রাখে।” তার উপর হজ্জ ফরয়। আর মহিলার জন্য সাথে মহারাম পরুষ থাকা সবীল তথা পাথেয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন কোন মহিলার মহারাম থাকবে না, তখন সে হজ্জের পাথেয়ের উপর সামর্থ্যবান না হওয়ার কারণে তার উপর হজ্জ ফরয় নয়।

(২) শাকেই ও মালিকীগণ দলিলের মে ব্যাপকতার কথা বলেছেন, তা আসলে ঠিক নয়। বরং সামঞ্জস্যের তা কোন কোন শর্তের সাথে শর্তায়িত। যেমন, রাসূল নিরাপদ হওয়া শর্ত। অতএব, উপরিউক্ত প্রমাণদির ভিত্তিতে অতিরিক্ত শর্তারোপ করা হবে এবং খাস করা হবে এবং বলা হবে যে, স্বামী অথবা মহারাম ব্যতীত মহিলার উপর হজ্জ আবশ্যক নয়।

(দৃষ্টি তোমাদিগ চোখে ২৩ সু, তন্ত্রে আশাত ৪২ সু)(

আরেকটি অনুচ্ছেদ (অবলম্বে হজ্জ সম্পন্ন করা)

٤٦٢٤ পাব বয় নুরেই অনুবাদiram... ইবনে আবাস (রাও) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাও) ইহরাদ করেন, যে বাক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে সে যেন অবিলম্বে তা সম্পন্ন করে।

বিশেষণ... কারো উপর হজ্জ ফরয় হওয়ার পর তা তাখ্যকিভাবে আদায় করা ওয়াজিব, নাকি অবকাশের সাথে বিলম্বে আদায় করা যাবে- এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছেঃ
* ইমাম শাফেহী, মুহাম্মদ, আওয়ামী এবং সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর মতে- হজ্জ তাত্ত্বিক আদায় করা কর্মের ভাবে মিলিত আদায় করার অবকাশ রয়েছে।

(নিয়ম ২৯ শতাব্দী)

দলীল (১): হজ্জের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (সাওরী) দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। সুতরাং হজ্জ যদি তাত্ত্বিক ওয়াজিব হতো তাহলে রাসূল (সাওরী) একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করতেন না।

দলীল (২): হজ্জ ফরম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা আরো স্পষ্ট (সাদাকায় নির্দেশ) যা তাত্ত্বিকভাবে পালনীয় নয়।

দলীল (৩): সালাতকে যেমন তার নির্ধারিত ওয়াজের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, অনুরূপ হজ্জকেও সময়-সুযোগ পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে। কেননা, হজ্জ হচ্ছে সারা জীবনের একটি করণীয়।

(নিয়ম ২৯ শতাব্দী)

* ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ ও আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হজ্জ তাত্ত্বিক আদায় করা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হতে বিলম্ব এবং তাত্ত্বিক উভয় রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে, তাত্ত্বিকের রেওয়ায়েতটি অধিক সহীহ।

(দৃষ্টি তর্কল্পনা ৩৫ শতাব্দী, মুনরীফ ইল-পর্রিবেশ ২১ শতাব্দী)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২): হজ্জ পালন করার জন্য আল্লাহ তাআলা কেবল সক্ষম মুসলমানদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ তাত্ত্বিকভাবে পালন করার মাঝেই সাম্প্রতিক কল্যাণ নিহত।

দলীল (৩): হজ্জ বছরে একবার এক নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস। আর এক বছরের মধ্যে মুত্তা এসে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সবসময় আশঙ্কা থাকে যে, বিলম্বী ব্যক্তি আগামী বছর জীবিত নাও থাকতে পারে। সুতরাং ফরম হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা উচিত।

(নিয়ম অল্পবির্জন ২১ শতাব্দী)

জবাবঃ প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাবে আহমাফি ও অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে, নবী করীম (সাওরী) হজ্জকে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করার কর্মকাণ্ড করার হাজার থাকতে পারে- (১) হয়ে তখন রাসূল (সাওরী) নবুদ্বতের দায়িত্বে ব্যতি ছিলেন, (২) অথবা বিশেষ কোন ওয়ায়ের কারণে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। অর্থাৎ বর্বরতার যুগে আরবের কাফিরদের মধ্যে হজ্জ নাসি তথা যুদ্ধ করার প্রয়োজনে নিজেদের স্বয়ং অনুযায়ী হারাম মাসগুলোকে আগে-পিছে করার প্রচলন ছিল। যেহেতু ২০
হিজরীতে ফিলহজ মস যথার্থ সময়ে এসেছিল, তাই তিনি দশম হিজরীর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (درب ترميي ج ۳ ص۴۴)
(۳) অথবা হজ মৌসুমে তৎকালীন কুমাংকরাচ্ছন্ন (যেমন- উলস হয়ে তাওয়াফ করা ইতাদি) সমাবেশকে নবী করিম (ص۴) এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই লক্ষ করা যায়, নবী করিম (ص۴) আবু বকর (ر۴) কে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোন বিবেক বাক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না। (۴) অথবা, অন্য কোন তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নবী করিম (ص۴) দশম হিজরী পর্যন্ত হজ বিলম্ব করেছিলেন।
(المنفي ج ۳ ص۴۴)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ আসলে দ্বিতীয় দলীলটি হানাফী ও অন্যান্য ইমামগণের দলীল। কেননা আয়াতে (اتموع الحج) (امر) এর সীমানা আনা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যতদূর সম্ভব তৎক্ষণিক আদায় করা উচিত। আর অবহেলা করতে গিয়ে কেউ যদি হেজ না করে মারা যায়, তবে ইজমা অনুযায়ী সে ব্যক্তি কবরী ও নাবির দরদে দাফত্ত হবে।
(التمم ج ۲ ص۳)

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ হজস্থগে সালাতের সাথে কিয়াস করা সৌভাগ্য নয়। কেননা, প্রতিটি সালাতের সময় সীমাবদ্ধ। ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে সালাতের দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভ ঘটবে। পক্ষান্তরে হজস্থ সীমাবদ্ধ কোন সময় নেই। সুতরাং, বিলম্বের ফলে মৃত্যুজনিত কারণে হজ অসমাপ্ত থাকলে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। অতএব, সত্রতা হিসেবে হজ তৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব হবে।

باب في الصيي حج ص۴۴

关乎ับن آبیاس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبًا قَصَلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا مِنَ القُوَّةِ قَالُوا المُسْلِمُونَ قَالُوا فَقَالُوا قَالُوا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَفَزَعَتْ امرأة فَأَحْدَثَتْ يَعْبُدُ الصَّيِّبِ فَأَخَرَجَهُ مِنْ مَحْفُوْجِهِ فَقَالَتْ بَيًا رَسُولُ الله ﷺ فَلَهُنَّ حَجَ قَالَ نَعُمَ وَلَكِ أَجْرُكَ (سُلَيْم ج ۱ ص۱۴۴) باب صحة حج الصيي

و أجر الخ، ترمذي ج ۱ ص۱۸۵ حج الصيي، اين ماجة ص۱۲۴)

انهBAT ۴۴ (ر۴) حج در بور্জ. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ص۴) রাওয়া নামক স্থানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে একদল সাওয়ারীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি
হজ্জ অধ্যায়

তাঁদের সালাম করো এবং বলো, তোমরা কারা? তুমি বলো, আমরা মুসলিম।
তাহির জিজ্ঞাসা করো, আপনারা কারা? সাহাবীগণ বলো, আল্লাহর রাসূল।
তুমি এক মহিলা তীর-সর্পস্ত হয়ে তার ছেটা বাচার বাহু ধরে স্বীয় হাওদা হতে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ছেলে কি হজ্জ করতে পারে? তিনি বলেন হুঁ, এবং তোমাও সওয়ার হবে।

বিশেষণঃ যাদের উপর হজ্জ ফরময় হজ্জ একটি শারীরিক ও আর্থিক ব্যবহৃত ইবাদত। তাই সালাত ও সাওমের নায় সাবজনীনভাবে হজ্জ ফরময় নয়; বরং কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সাধারণ এর উপর হজ্জ ফরময় হয়ে থাকে।

শর্তগুলো হলো-

১. মুসলমান হওয়া। যেহেতু ইহা ইসলামের মৌলিক একটি ইবাদত। সুতরাং অসুলিমের উপর হজ্জ ওয়াজিব নয়।

২. স্বাধীন হওয়া। তাই দাস-দাসীর উপর ইহা ফরময় নয়। কেননা নবী করিম (সাঁ) বলেন-

(আবু ইবন হায়ত বলেন) অর্থাৎ, যদি কোন গোলাম দশারও হজ্জ আদায় করে, অতঃপর আমাদ হয়, তবুও তাকে (সামর্থ্যবান হলে) পুনরায় ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

৩. প্রাণ বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপংক বয়স্ক বা ছোট বাচার উপর হজ্জ ফরময় নয়।

কেননা নবী করিম (সাঁ) বলেন-

(আবু ইবন হায়ত বলেন) অর্থাৎ, যে শিশু নাবালেগ অবস্থায় হজ্জ আদায় করেছে, বালেগ হওয়ার পর তাকে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

৪. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং পাগলের উপর হজ্জ ফরময় নয়। কেননা নবী করিম (সাঁ) বলেছেন-

(আবু ইবন হায়ত বলেন) অর্থাৎ, জ্ঞান থাকলে সে রসূল নবী তাঁকে হজ্জ আদায় করবে। সুতরাং পাগলের উপর হজ্জ ফরময় নয়।

- ২৫
৫. সুষ্ঠ হওয়া। তাই রূপে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরম নয়। আল্লাহ তালালা ইরাশ করেন- 
ফেন কেন পস্তথায় এই আদায় হৃদয়ে কৃষ্ণ শিন্তি মুখী সি চিন্তাও সত্যই সত্যই।
অর্থাৎ, যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হতে পারে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোগী রাখতে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে।
(বাকারাইং ১৯৬)

৬. আর্থিক সামর্থ্যমান হওয়া। অর্থাৎ, ধন থাকলে ধন পরিশোধের পর পরিবারের নিয়া প্রযোজনার খরচ ব্যয়ীত হজ্জ রওয়ানা থেকে থেকে শুরু করে হজ্জের কাজ সম্পন্নপূর্বক বাড়ি ফেরা পর্দায় খরচপত্ত বহন করার ক্ষমতা থাকা। কেননা,
শুধুমাত্র তারা প্রমাণ হয়েছে- 

৭. হজ্জের রাত্রি নিয়োগ থাকে। সুতরাং রাত্রি নিয়োগ না থাকলে হজ্জ ফরম হবে না। যেমন, আল্লাহ তালালার বাণী- 
ফেন ওই নিয়োগ না থাকলে হজ্জ ফরম হবে না। যেমন, আমি তালালার বাণী- 
অর্থাৎ, আর যদি (তোমরা হজ্জ করতে) বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ, তাই তোমাদের উপর ধর্ম। (বাকারাইং ১৯৬)

৮. মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত শর্ত হজ্জ, হজ্জের সফরে স্বামী বা অন্য কোন মাহরাম পুরুষ তার সঙ্গে থাকা। (শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সঠিক করা যায় মাহরাম হবে। যেমনঃ পিতা, পুত্র, দানা, চাচা, ভাতিজা প্রভৃতি।) যেমন, ইবন আকাস (রাগ) বলেন, রাসূল (সাফাও) ইরাশ করেন-

লা তহজিন আমরা লা উমাহান্ড মহর্ম- (সন্দ দার ফতুল্লাহ ২১৩ সংখ্যক)
অর্থাৎ, কোন মহিলায় বেন মাহরাম ছাড়া হজ্জ না করে। 

... আবার মহর্মের কাজ কেলো রসূলের সাহেব লানাম লাগে যানে জেল হৃদয়ে মসমূত মসমূত 

তোসা সীমার লেলো এর নো রজিল হুলো তো মাতুড়ো মাতুড়ো- (আবু দাউদ জ ১৪১ সংখ্যক)

ফেন আলাম হজ্জ দুয়ার মুখর না হয়। থেকে খারিজ জ ২৫১ যুট হৃদয়ের মসমূত 

ATE এর দাবী মহর্মের অন্যতম মাতুড়ো হন।

অর্থাৎ, ... আবু কবিরায়া (রাগ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাফ) ইরাশ করেন, কোন মুসল্লিম মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত এক রাতের পরিমাণ 

দুর্বলতা সফর করা বৈধ নয়।

নামালের শিশুর হজ্জ দাউদ যাহারী বলেন, শিশুর হজ্জ ওট্ট হবে এবং উক্ত হজ্জের 

মাধ্যমেই তার ফরম হজ্জ আদায় হয়ে যাবে, সুতরাং বালেগ হওয়ার পর নতুনভাবে 

তার ভিন্নতা কোন হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

(মাফার সালতান জ ৫৪ সংখ্যার উদা কারী জ ১০ সংখ্যক)
দলীলঃ অনুম্নেদের শুরুতে হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর হাদিস। তথ্যায় নবী করিম (সাঃ) শিষ্ট হজ্জের প্রশ্নের উত্তরে নিঃসরণ (হাঁ বলেছেন।

* দাওয়া যাহেরা ব্যতিত সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, নাবালেগ শিশুর উপর হজ্জ ফরম নয়। অতএব, কোন নাবালেগ শিশু হজ্জ করার পর যদি বালেগ হয় এবং পরবর্তীতে তার মধ্যে হজ্জ ফরম হওয়ার অন্যতম শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে পুনরায় তার হজ্জ আদায় করার ফরম।

(দ্রু তুর্মুজি জি ৫১৩ সং, দ্রু মিয়ে জি ২২ সং)

দলীলঃ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) এর শায়াহ করেন-

যিমা শোইনি হজ্জ উসরা তেম বল্গ ফাদা হজ্জ ইসলাম (সুন্দর হামক)।

অর্থাৎ, যে বাচ্চা দশ ব হজ্জ করেছে, অতঃপর বালেগ হয়েছে, তাকে পুনরায় ইসলামের হজ্জ আদায় করতে হবে।

জবাবঃ (১) নবী (রহ.) বলেন, যদিও হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে এর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে যে, শিশু অবশ্য হজ্জ করার পর পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

(২) নবী করিম (সাঃ) “হাঁ” বলার দ্বারা তার ফরম আদায় হয়ে যাবে এমনটি সুযোগননি; বরং হাঁ বলে তিনি (সাঃ) শিশুকে প্রশ্নাধিকারের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন।

(নৃনুরেশন অনুসন্ধান ২ সং)

* আল্লামা নবী (রহ.) বলেন, জমহুর উলামা এবং ইমাম শাফেইত, মালিক ও আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতে, শিশু যদি হজ্জ করে তবে তা দুর্লভ হয়ে যাবে এবং তা নফল হিসেবে গণা হবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর যদি হজ্জ ফরম হয়, তাহলে এ হজ্জ যথেষ্ট নয়, বরং তাকে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, শিশু যদি হজ্জ করে তবে তা শুদ্ধ হবে না; বরং এটি একটি বাড়িত কামেলা। তিনি আরো বলেন, নাবালেগ শিশুর উপর ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে একটিই তার জন্য আবশ্যক নয়। অতএব, সে ইহ্রাম বাঁধার উপযোগী না হওয়ার কারণে তার ইহ্রামই শুদ্ধ হয়নি। তার হজ্জ শুদ্ধ এক ধরনের প্রশ্নাধিকার।

(শরী নূর জি ৩২ সং)

কিন্তু আল্লামা বিহোরী (রহ.) লিখেন, একই সমৌধান সত্য নয়; বরং ইমাম আবু হানিফা ও সমন্ত অহমাকাফ এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুর হজ্জ প্রায় যোগী এবং তার ইহ্রাম কার্যকর। অর্থাৎ, হাফেজদের মায়াগুলো জমহুরের অনুরাগ। অবশ্য যদি সে ইহ্রামে নিষিদ্ধ কাজকর্ম থেকে কোনটিতে লিপ্ত হয়, তাহলে শিশু বা অভিজাত করো উপর দয় (পত্ন) বা ফিদা ইত্যাদি দেয়া ওয়াজির নয়।

(মুনাফ সেন জি ৫৬ সং)
মীকাত শব্দের আধিপাতিক অর্থ:

মূল্য-এর গুজন মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। এর আধিপাতিক অর্থ হলঃ

১. সময়

২. প্রতিপ্রতি। যেমনঃ- বিদেশ বা আলোচনার সময়, যে দিনের প্রতিদিন চালিত হয়, তা হলো সময়।

(মসুরে কর্মহ ৪ ভাগ ১৭২-১৭৪)
আহকামুল হাদীস

৩৮৯

হজ্জ অধ্যায়

৩. মাকান - নিদিষ্ট স্থান। এর বহুবচন হল এই যে মুক্তিকারক

শব্দটির প্রয়োগ পত্রিকা কুরআনেও পাওয়া যায় -

অর্থাৎ, নিষেধ বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (নবাঘ ১৭)

মীকাতের পরিভাষিক সংজ্ঞা

১. শরীয়তের পরিভাষায় মীকাত বলা হয় -

হুম মাকান লালি হরম মহজাহ ও মোতাবৃত যে না লালি মোতাবৃত রাখা হয়।

অর্থাৎ, মীকাত বলা হয় যেখানে স্থান বিস্তার হজ্জ ও উমরাকারী লোকদের জন্য ইহরাম বিদ্ধ রয়েছে অথবা স্থানটি ইহরাম ব্যতিক্রম করা যায় না।

২. এই বেলে, যে স্থান বিস্তার হজ্জ ও উমরাকারী লোকদের জন্য ইহরাম বিদ্ধ হয় সে স্থানকে মীকাত বলে।

৩. কারও কারও মতে, যে পাঁচটি স্থান ইহরাম ব্যতিক্রম নির্দিষ্ট, তাকেই মীকাত বলা হয়।

৪. হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম ব্যতিক্রম নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলে।

মীকাতের সংজ্ঞা যারা মক্কা বাইরে থেকে হজ্জ ও উমরা করার জন্য ইহরাম করবে তাদের জন্য নবী করীম (সা) ৫টি স্থানকে মীকাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

১. যুল হলাইফাই ইহা মদিনাবাসী এবং মদিনার পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

ইহা সবচেয়ে দুরবর্তী মীকাত। মদিনা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

২. জুহুফতি সিরিয়াবাসী এবং সিরিয়ার পথে (মেমেন মিসর) আগমনকারী লোকদের জন্য।

৩. কারুক মানানিলি ইহা নজদবাসী এবং নজদের পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

৪. ইয়ালামলাম ইহা ইয়রাম, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান তথা পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের জন্য।

দলীল অনুসারে স্থানের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

৫. যাতে ইরাক ইরাকবাসী এবং ইরাকের পথে আগমনকারী লোকদের জন্য।

দলীল হাদীস ঝাঁকঁই আল্লাহর কাছে অর্জন করে - 

(বেইবি, বেইবি, ১২৪৩, খাতিরে জো পিবিসি বেইবি ভাই আল্লাহর কাছে ও অর্জন করে।)

অর্থাৎ, ... আরিয়া (রাঘ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) ইরাকবাসীদের জন্য `যাতে ইরাককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

* তাহাড়া আরো দুই প্রকার মীকাত রয়েছে।
দলীল (১৪) হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

"প্রত্যেক র্সৌলুর বাক্য সালে আল্লাহ উপরে ও সম্পূর্ণ ত্ব্যোক্ত হন ও অস্তিত্বের মন্ত্র মিথ্যা করেন। এর সত্যিই অমান্য।" (খুজুরি জী পং বাবু মহল্লা হামাম, সাম জ ১৩৬৪ বাবু মোহাম্মদ আহমেদ)

অর্থাৎ, ... রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, উল্লিখিত স্নায়ুমূখ হজ্জ ও উমরার নিয়োগকারী সে স্নায়ুর অধিবাসী এবং সে সীমারেখা দিয়ে অভিক্রমকারী অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাধার স্নায়ু।

উক্ত হাদিস থেকে জানা যায় যে, যারা হজ্জ বা উমরার করার ইচ্ছা পোশণ করে না তাদের ক্ষেতে মীরত্র প্রয়োজন নয়। সুতরাং তাদের ইহরাম বাধার প্রয়োজন নেই।

দলীল (২৪) নাম ১ বিশ্বের বাইরে আল্লাহ বাইরে সালে আল্লাহ বাইরে

"সে দিন সমাজ নিচে যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মক্কার বাইরে প্রবেশ করেন। এভাবে বুঝা যায় যে, সেদিন যেহেতু মহান সংগঠন (সঃ) মক্কায় হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে নয় বরং মক্কার বাইরের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এজন্য তিনি ইহরাম বধান করেন।"

(নন্দন অনুসন্ধান ১২ সঃ)

* ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, সুফিয়া সাতী, লাইস, আতা (রহ.) ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঙ্গুনের মতে, হজ্জ বা উমরার নিয়ত করকে বা না করকে সর্বব্যাপী।
আহকামুল হাদিস      ৩৯১      হজ্জ অধ্যায়
ইহরাম বেঁধে মকায় প্রবেশ করা ওয়াজিন। ইহরাম ব্যতীত মকায় প্রবেশ করা জায়েহ নয়। দলিলি

... عَنْ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يُجاوَزَ أَحَدُ الْبَيِّنَاتِ الْأَتَّامُ حَرَّمَـا (مصنف ابن أبي شيحت)

অর্থাৎ, ... ইবন আকাবাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম না করে।

اللهُ رَأَى إِبْنَ عَبَّاسٍ يُرْجَعُ مِنْ جَأَوْزِ الْبَيِّنَاتِ غَيْرُ مَحْرُومٍ (২)

অর্থাৎ, ইবন আকাবাস (রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। (সূত্রঃ ঐ)

উপরের স্থলিত হাদিসের মধ্যে ইহরামের কথা হজ্জ বা উমরাকারীকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি।

দলিল (৩)ঃ তাছাড়া মীকাতের নির্দেশটি মূলতঃ কাবা ঘরের সম্মান প্রদর্শনে বলা হয়েছে। সুতরাং হজ্জ অথবা উমরা পালনের নিয়ত করুক বা না করুক সবার উচিত কাবা ঘরের সম্মান করা। (নিষেধের আশে জ ২ : ৪) (নিষেধের আশে জ ২ : ৪)

জবাবঃ আহনাফরণ প্রতিক্ষের জবাবে বলেন:

-একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা হজ্জ বা উমরা করতে চায় তাদের জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা ফরমাইন। কিন্তু যারা হজ্জ বা উমরা করতে ইহ্রাম পোষণ করবে না তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে না। এমন কোন কথাও হাদিসে উল্লেখ নেই। সুতরাং মুহম্মদ মাফাইন (বিপরীত অর্থ)-কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না।

(২) দ্বিতীয় হাদিসের জবাবে বলা যায় যে, যাৎ নবী করিম (সা) বলেছেন-

آنْ مَكَّةَ حَرَّامَ لَمْ تَحْلِلْ لَأحَدٍ قَبْلَيْنَ لَا لَأحَدٍ بَعْدَيْنَ إِنَّا حَلَّتْ لَيْسَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ

ثمَّ غَادَتْ حُرَّاً تَعِينُي الْدُخُولُ يَعِينُ إِحْرَامَ-(دরس مكتوبة ج ২ : ২২)

অর্থাৎ, মক্কা হারাম নগরী। ইহা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না। আমার পরেও কারও জন্য হালাল করা হবে না। কেবল মক্কা বিজয়ের দিনে কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছে। আবার হারাম হয়ে গেল। অর্থাৎ ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা হারাম।

অতএব ঐ দিনের উপর অনুমান করা সঠিক নয়। কেননা এটা ছিল নবী করিম (সা)-এর জন্য খাস।
হজ্জে ইফরাদ

... কুরআনের বর্ণনার দিকে আল্লাহু অব্লাইহে পিতৃ পাঢ়ায় বলেছেন যে, সেই পাহ্য কর্মকর্তা হলেন আরো উচ্ছেদ করে নিয়ে আসান গ্রান্থ পাঠকের চেরি থেকে করেন।

হজ্জের প্রকাশনের ইসলামী শরীয়তে হজ তিন প্রকার। যথা-

1. হজ্জে ইফরাদ (الحج الإفراد)

2. হজ্জে তামাতো (الحج التمتع)

3. হজ্জে ফিরান (الحج الفرار)

ইফরাদ হজ্জের বর্ণনার শব্দটি ফরে থেকে বাবে এর মাসদার। আত্মীতাকর্ম অর্থ হচ্ছে- একাকী হওয়া, বোন শরীয়ক না হওয়া, পৃথক করণ, চিন্তিতকরণ, আলাদাভাব্য ইত্যাদি। যেমন, পরিতে কুরআনে এসেছে- রোপ না তাদের ফরে যাচ্ছে, এ আমার পালনকর্তা, আমাকে এক রেখে না। (আল্লাহ ৭২)

পরিভাষায় ইফরাদ হচ্ছে- যা এরখানে পাল্লার বিনাশী মূল্য হচ্ছে। অর্থাৎ, হজ্জের মানে মীকাত হচ্ছে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে এর কাজ সমাপ্ত করাকে হচ্ছে ইফরাদ বলা হয়।

المفرد بالحج هو الذي يحرم بالحج لا غير- (বদাউল সালাতে ২) অর্থাৎ, হজ্জে ইফরাদকারী হলেন, যিনি শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, অন্য কিছুর নয়।
কিরান হজ্জের বর্ণনা

কিরান হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ হুমায়ুন বিন অলাদ তখন কোনো সত্তে একটি কাজকর। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি। এজন্য আরবীতে সঙ্গীকে করা হয়। যেমন, পরিসের কুরআনে এসেছে৷

নতুনে নই শ্রেণী ননু হতো না বুলোেে।

অর্থাৎ, "আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়ন্ত্রিত করে দেই। অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী।" (যুক্তরূপঃ ৩৬)

পরিভাষায় কিরান হচ্ছে৷

হুমায়ুন হচ্ছে ৷ বুলো যে কোনো মুখোমুখি হচ্ছে প্রথম বিন অলাদ। মুখোমুখি হচ্ছে কোনো বিন অলাদ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি। এজন্য আরবীতে সঙ্গীকে করা হয়। যেমন, পরিসের কুরআনে এসেছে৷

কিরান হচ্ছে ৷

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।

কিরান হচ্ছে ৷

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।

তামাতু হজ্জের বর্ণনা৷ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ৷ অলাদ। অলাদ। তখন কোনো সত্তে একটি কাজ করা। মিলন, সংযোগ, সম্পৃক্ততা, যুক্ত করা ইত্যাদি।
অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও উমরা একত্রে পালন করতে চায়, তবে তাকে কিছু সহজতা, তা দিয়ে কুরআনী করবে। (বাকারাঁ ১৯৬)

দলীল (২)

... বার্তা যেন বিদা লালন ও হামিদ সাহেব করে তোমাদের সমুদ্রের আগে যেন তার দুর্বলতা।

(আবু দাউদ সাহেব, তার আলাদা তোলাগুলো) (১) চুরিক ১ সং বাবা যাতে বলেন, সময় ঋতুর দিনে সময় ঋতুর পূর্বে উমরা করেন।

দলীল (৩)

... মোহিন বন হুজুর শাহীন হজ করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

সুতরাং নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৪)

... হামিদ বন আলুই শাহীন (রাহীম প্রিয় তোমাদের সামনে করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৫)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৬)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৭)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৮)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (৯)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (১০)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (১১)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (১২)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (১৩)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।

দলীল (১৪)

... তোমাদের সাথে করে নামাযের পালন করেন এবং তোমাদের পূর্বে উমরা করেন এবং আমার নাম তার সাথে তামাতু হজ করে।

নবী করিম (সাহেব) বলেছেন, তামাতু হজ আদায় করেন, অতএব, হুজুর (সাহেব) যা করেছেন তাই উত্তম।
সুতরাং উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে যে, নবী করিম (সা) তামাতু হজ্জের আশা পোষণ করেছেন। সুতরাং, তাই উত্তম।

* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, ইফরাদ হজ্জ সর্বোত্তম। অতঃপর তামাতু, তারপর কিরান হজ্জ। (ফতুহ বারী জ ৩৪০ স। ২২)

দলীল (১)


gn হাতে হাতে রসূল সাল্লাল্হাতাল্হিআ ঔমার হজ্জের প্রথম দাওয়া (তৃতীয় প্রথম দাওয়া)

দলীল (২)

(রাও চ ৩৬১, সর্মি চ ৩১২, সর্মি চ ৩০৪, বাবি উভয় প্রথম দাওয়া)

দলীল (৩)

(কোন উল্লেখ জুন ৫ সৃষ্টি)

অর্থাৎ, জাবির (রাও) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা) হজ্জের ইহ্যাম বেধেছেন, এর সাথে উমরা ছিল না।

সুতরাং উপরোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইফরাদ হজ্জ উত্তম।

* ইমাম আরু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ও ইবন মুনিবি (রহ.)-এর মতে, হজ্জ কিরান সর্বোত্তম। অতঃপর তামাতু, তারপর ইফরাদ।

(ফতুহ বারী জ ৩৩২, সর্মি জ ১৫৯, সর্মি চ ৬৩ সেন্টি চ ৩৭৩)

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী

ঔদ্ধত্য হজ্জ ও উমরার প্রথম দাওয়া হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন পালন কর। (বাবি চ ১৬৬)

দলীল (২)

}

গেল নায়িকার আল্লাহ তাআলার বাণী

ঔদ্ধত্য নায়িকার আল্লাহ তাআলার বাণী

(বাবি চ ১৬৬)
অর্থাৎ, ... আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা (ইয়াহিয়া, আকুল আরবী প্রমুখ) তাকে বলতে জেনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে তাদিবিয়া পাঠ করতে জেনেছি। তিনি বলতেন, আমি হজ্জ ও উমরার জন্য (হে আল্লাহ) তোমার সমীপে হজ্জ করিব।

দলীল (৩) 
"... উন্নতির দায়ে তোমরা প্রত্যেকে ইসলামের সুন্দর এবং আল্লাহর সেবা করো। আল্লাহর সেবা করা নিলম্বন করো না।" (৪)

দলীল (৪) 
"যা আল্লাহ জানান, তাতে বিশ্বাস কর। তাহাতে আল্লাহের সুন্দর।" (৫)

অর্থাৎ, হযরত উমের সালামা (ر) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী কৃষ্ণ করিম (س) একে ইরশাদ করতে জেনেছি, তিনি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন! তোমরা হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাধ।

তিনি বলতেন যে, মহান নবী (س) যে হিয়া পরিবার-পরিজনকে কিরানের হুকুম দিয়েছেন, তিনি নিজে কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন।

দলীল (৫) হযরত আরিশা (ر) হতে বর্ণিত-

"আহলত মুহর্রম হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাধ।"

যার প্রতিযোগিতা ইসলামের সুন্দর এবং আল্লাহর সেবা করো। (র) হতে বর্ণিত। নবী কৃষ্ণ করিম (س) একে ইরশাদ করতে জেনেছি, তিনি মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন।

দলীল (৬) হযরত বারা ইবন আবি এবং আনাস (র) থেকে বর্ণিত। নবী কৃষ্ণ করিম (س) বলেন- (৬)

"ও কি আল্লাহ দিয়ে কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। তথায় তাকে জেনেছি। তারা তার হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। তার হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। তারা তার হজ্জ আদায়কারী ছিলেন।"
আল্লাহু আকুমল হাদীস

হজ্জ অধ্যায় ৩৯৭

সাহাবা (রা) দ্বারা প্রমাণিত আছে। এমনকি হযরত আনাস (রা) থেকে ১৬ জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন যে, বিদায় হজ্জ নবী করিম (ص) কিরান হজ্জ আদায়কারী ছিলেন। (مَعَارِفِ الرَّسُولُ ﷺ ٨٣-٨٤)

আকুলী দলিলে ইবন কুদামা বলেন, হজ্জ কিরান পালন করা অধিক কষ্টকর। কেননা, এতে একই ইহরামে একই সফরে দুটি ইবাদত করা হয়- যা তামাতু বা ইফরাদে নেই। তাই বলা হয়, অপরিচিত অর্থাৎ, উত্তম আমল তাই, যা অধিক কষ্টকর। অপরদিকে নবী করিম (ص) ইরাশাদ করেছেন-

"আল্লাহ আজ্ম তোমার জন্য বড়ো দুর্দণ্ড করবেন-" (খায়িরাত জ ২৪০ বাব অহর সুলতান উল্লেখ)

অর্থাৎ, তোমাদের কষ্ট অনুপাতে তোমাদের সওয়ার হবে।

জবাবঃ ইমাম আহমদ বিন হায়লের প্রদত্ত দলিলসমূহের জবাবঃ

(১) শায়খ ইবন ইসমাইল (রহ.) বলেন, পবিত্র কুরআন শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের পরিভাষায় তামাতু শব্দটি দ্বারা কিরানই উদ্দেশ্য। (নন্দিং আশাত জ ২ সো)

(২) আলুমামা তেকের (রহ) বলেন, যে সকল হাদীসসমূহে তামাতু শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তথায় তামাতু দ্বারা অথবা বা অভিধানিক তামাতু উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ, উমরাও সাথে হজজকে মিলিয়ে উভয়টিকে একই সফরে আদায় করে সুবিধা লাভ করা, যাতে প্রত্যেকটি আলাদা অথবা আদায় করতে না হয়। কেননা, তামাতু শব্দের অর্থই হল অন্য বস্তু থেকে সুবিধা পাওয়া। (দ্রস মশকোর জ ২২৯)

ইমাম আহমদ (রহ) যে আয়িশা (রাঘ) ও ইমরান বিন হুদাইন থেকে তামাতু-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয় থেকেই কিরানের রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের রেওয়ায়েতে-তমু-এর যে শব্দ রয়েছে, এর দ্বারা কিরান হজজ বুঝানো হয়েছে। (নন্দিং আশাত জ ২৩০)

(৩) তাহাড়া আরো বলা যায় যে, নবী নবী করিম (ص)-কে "লাল্লাল ইবিন উমর" বলতে শুনে এ ধারণা করে নিলেন যে, নবী করিম (ص) তামাতু হজজ সম্পন্নকারী ছিলেন। অথচ কিরান হজজ সম্পন্নকারীরও তালিবিয়া। কেননা, কিরান হজজ আদায়কারীর জন্য তিন ধরনের তালিবিয়া পাঠ করা যায়ে-

কেল্লাল ইবিন উমর।
(৫) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর ৪র্থ দলীলের জবাবে বলা যায়, জাহেলি যুগে হজ্জের মাসসমূহের উমরা করার প্রচলন ছিল না। তাই নবী করিম (সা.) তাদের এই তৃপ্ত বিশ্বাস ও কুফ্তার্কে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে উপরিকুল প্রত্যাশাটি করেছেন। সুতরাং ইহা সর্বোত্তম হওয়ার দলীল হতে পারে না।

ইমাম মালিক ও শাফেক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবঃ

(১) আরিশা (রা) ও প্রমুখ রেওয়ায়েত হতে ইফরাদ হজ্জের যে বর্ণনা এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- হজ্জ ফরয় হওয়ার পর নবী করিম (সা.) মাত্র একবার আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি (সা.) উমরা আদায় করেছেন চারবার।

(২) অথবা, হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্বারী (রহ.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-

"ফাদলে মসাবিক হজ্জ ও উমরা নামের ওপর আর অক্তবুল- (ال 마련ص ৩২৪ ও বিভাগ ৩:৬)"

অর্থাৎ, উমরা ও হজ্জের মাঝখানে হালাল হওয়া ব্যতীত একই ইহরামে তিনি আদায় করেছেন, যা পবিত্র কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

(৩) অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নবী করিম (সা) ইফরাদ হজ্জের অনুমোদন দিয়েছেন এই উদ্দেশ্য নয় যে, নবী করিম (সা) স্বয়ং ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন।

(৪) অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, "ফাদলে মসাবিক হজ্জ ও উমরা নামের ওপর আর অক্তবুল- অর্থাৎ, পৃথিবীতে তিনি হজ্জের কার্যাদি সম্পাদন করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, হজ্জ ইফরাদ করেছেন।

(৫) অথবা, বর্ণনাকারী "ফাদলে মসাবিক হজ্জ ও উমরা নামের ওপর আর অক্তবুল"

করেন ধারণা করেছেন যে, নবী করিম (সা) ইফরাদের নিয়ত করেছেন। বাক্সে এ তালিবিয়া কিরান হজ্জ আদায়কারীর জন্যেও পড়া বেধি। সুতরাং নবী করিম (সা) কিরান হজ্জই আদায় করেছেন।

(৬) ইমাম শাফেক ও মালিক (রহ.) হযরত জাবির (রা)-এর হাদিস দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে আহমদগণ বলেন, “উক্ত হাদিস দ্বারাও ইফরাদ প্রমাণিত হয় না। কারণ উক্ত হাদিসেই পরের অংশে বর্ণিত আছে, “যিলহজ্জের চার রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপনীত হই এবং তাওয়াফ ও সাত করি। এরপর রাসূল সাহীদ (সা) আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন।”

(ابو داود ج ৬:২৪৯)

কিরান হজ্জ উক্তম হওয়ার ক্ষেত্রে আরো প্রতিষ্ঠা করান।

১. কিরান হজ্জের রেওয়ায়েত ইফরাদ ও তামাকু-এর তুলনায় অনেক বেশি।
২. যে সকল সাহাবী (রা) হতে ইফরাদের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তাদের থেকে কিরানেরও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। যেমন হযরত ইবন উমর, হযরত আয়শা (রা) প্রমুখ। কিন্তু এরূপ সাহাবীর সংখ্যা অনেক, যাদের থেকে শুধু কিরান বর্ণিত আছে। যেমন - হযরত আনাস, উম্মে সালামা (রা) প্রমুখ।

৩. ইফরাদের সকল হাদিস (ফেথুল্লাহ ফেথুল্লাহ করমমূলক), পক্ষপাতের কিরানের হাদিসের মোকাবিলায় প্রাধান্য লাভ করে।

৪. ইফরাদ এবং তামাতুর ক্ষেত্রে সহজেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু কিরানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন সমাবেশ নেই।

৫. কোন রেওয়ায়েতে নবী করিম (সা) থেকে প্রমাণিত নেই যে, তিনি ‘ইফরাদ করেছি’ অথবা ‘তামাতু করেছি’ (افرتن) (تستعت) বলেছেন। কিন্তু হযরত বারা বিন আব্বেব ও আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে ‘কিরান করেছি’ (قرنت) শহ সপ্তা ভাষায় উল্লেখ রয়েছে।

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাম্বারী (রহ) বলেন, ইফরাদের হাদিসের না-সূচক আর কিরানের হাদিস হাঁ-সূচক অথবা পরস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় হাঁ-সূচক হাদিস অপ্রাসাদিক পাবে। সুতরাং কিরান হজ্জ যে সর্বোচ্চ তা প্রমাণিত হলো।

(দ্রশ তৃতীয় চ ৩৭, তন্তুম আলিহ ২০ চ ৫২)

باب الرجال يحج عن غيره - ص ২৫২

যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষে (বদলী) হজ্জ করে
হজ্জ অধ্যায়

হজ্জ অধ্যায়

(নামায়, রোয়া)। সুষ্ণ বা অসুষ্ণ কোন অবস্থাতেই এতে নিয়োগ বা প্রতিনিধিত্ব জায়ের নয়।

(২) শুধুমাত্র অর্থিক ইবাদত। যেমন, যাকাত। এতে সুষ্ণ ও অসুষ্ণ সর্ববহূমিতে প্রতিনিধি বানানো জায়ের আছে।

(৩) শারীরিক ও আর্থিক সংস্থিত ইবাদত। যেমন, হজ। শক্তি-সামর্থ থাকায় এতে প্রতিনিধিত্ব জায়ের নয়, কিন্তু কৃত্তিবাসীর অঙ্গমত বা অতিশয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্বজনীন প্রতিনিধিত্ব জায়ের আছে।

(দ্রস তুর্কি জ ১০১-৫৫৩, হেদায়াত জ ১ সূত্র ২৭০)

প্রথম আলোচনাঃ

বদলী হজের বিধান বদলী হজ আদায় করা জায়ের কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে:

* ইমাম মালিক ও লাইস (র.হ.)-এর মতে, যদি মৃত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে হজের ওপর করে থাকে, তাহলে তার এই ওসিয়াতকৃত হজ এক তৃতীয়োক্তব সম্পদে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ আদায় করা জায়ের নয়।

(যুদ্ধ তাহরি জ ১০১-৫৫৩)

দলীল

... উন্ন অবসান আন এমারা সালাত তুলু অল্লাহ উল্লাহ ও সালান ও ও (১)

অিপেহা মাত ও মল যজ্ঞ কাল হজিও উন অল্লাহ কান অল্লাহ (নসাই জ ২ সূত্র ২ এবং দেখ মেহে হজ)
আর্থাৎ, ইবনে অব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূল (সাঃ)কে তাঁর পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে, তিনি হজ্জ না করেই ইসলামকাল করেছেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

দলীল: এদের প্রতি বর্ণিত। একজন মহিলা হজ্জ মান্ত করেছিল, কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করল (হজ্জ আদায় করতে পারল না)। আরপর তার তাই রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি বলেন, তুমি আমি কেন কর, যদি তোমার বোনের দেনা থাকত তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, হু। রাসূল (সাঃ) বলেন, তাহলে আল্লাহর হকও আদায় কর, কেননা তা আদায় করার অধিক দাবি রাখে।

* ইব্রাহীম নাখী (রহ.-)-এর মতে, হজ্জ কেন মুলাভিনিকতা নেই। তিনি হজ্জকে নামায ও রোয়ার উপর কিয়াস করেছেন।

দলীলঃ হযরত ইবনে অব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

(আলায়, কেউ কারো পক্ষ থেকে নামায পড়বে না এবং কেউ কারো পক্ষ থেকে রোয়া রাখবে না।

* ইমাম আবু হামিদ, শাফেই, আহমেদ, ইসহাক ও সাওরী (রহ.)-এর মতে, অতিশয় বৃদ্ধ, আমৃত্ত অক্ষমতা (যেমন পক্ষাঘাত) অথবা মৃত লোকের পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা জায়ে। এবং সুখ ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের দ্বারা হজ্জ আদায় করা আদী জায়ে নয়।

এ ব্যাপারে তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ হল- যদি মৃত ব্যক্তির সিম্মায় হজ্জ ফরয় হয়ে থাকে এবং সে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় ওসিয়াত না করে থাকে, তবে উত্তরাধিকারীদের সিম্মায় তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো অপরিহার্য নয় এবং মৃত ব্যক্তি ফরয় আদায় না করার এবং মৃত্যুর সময় ওসিয়াত না করার কারণে গুননাহীর হবে। অবশ্য যদি কোন উত্তরসূরী বা অন্য কেউ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করে, তাহলে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হামিদ (রহ.) বলেন-
অর্থাৎ, আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ সে এর ফল পাবে।

কিন্তু যদি মূর্ত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে হঙ্গম করানোর ব্যাপারে ওসিয়ত করে থাকে, তাহলে তার ওসিয়ত এক তৃতীয়াঙ্গ মাল দ্বারা পুরা করতে হবে। এবং এই এক তৃতীয়াঙ্গ মাল দ্বারা ওসিয়ত পূরণ করা সম্ভব হলে তার ওসিয়তকে পুরা করা উত্তরসূরীর জন্য অপরিহার্য হবে। তখন মূর্ত ব্যক্তির দেশ থেকে কাউকে বদলী হঙ্গমের জন্য পাঠানো হবে। যদি এক তৃতীয়াঙ্গ মাল দ্বারা স্বীয় দেশ থেকে হঙ্গম করানো সম্ভব না হয়, তাহলে কিয়াজের দাবী তো এই ছিল যে, ওসিয়ত বাতিল হয় যাবে এবং এক তৃতীয়াঙ্গ সম্পদ উত্তরসূরীদের মধ্যে বন্ধ হবে। কিন্তু ইসতিহাস তথা সূক্ষ্ম কিয়াজ অনুযায়ী মূর্ত ব্যক্তিকে এই ফরণ থেকে নিকটতা দানের লক্ষ্যে এমন কোন এলাকা বা দেশ থেকে বদলী হঙ্গম পাঠানো হবে, যেখান থেকে এক তৃতীয়াঙ্গ সম্পদই হঙ্গমের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

* ইমাম শাফেকি (রহ.) বলেন, ওসিয়ত করক বা না করক সর্বাপেক্ষা তার পক্ষ থেকে হঙ্গম করানো ওয়ারিসদের জন্য আবশ্যক। এই হঙ্গম করানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যায় হয়ে গেলেও। (শর্ন নোরি ১, চ ৪৩১)

দলীল (১৪) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

দলীল (২৪) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

* এই হঙ্গমের জন্য গাইলার যা রূপোল আলী ইন আলা শিখ কীত লা স্টেপ্তুে হজী ও উম্মার নামে নাম নামে হজী উম্মার নামে নামে হজী উম্মার নামে নামে হজী উম্মার নামে নামে হজী উম্মার নামে নামে হজী উম্মার নামে নামে হজী 

(৩৪) মূর্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হঙ্গম করানোর দলীল। হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দলীল যথেষ্ট।

জবাবঃ

১. ইমাম মালিক (রহ.)-এর হাদীস বলে কেবল প্রতিনিধিত্বের বৈধতার কথা বুঝানো হয়েছে। ইহা প্রতিনিধিত্ব তথা অতিশয় বৃদ্ধ ও অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বকে নিষেধ করে না। নিয়ম
হল - ২০. ইব্রাহীম নামের কিয়াস সহীহ এবং স্পষ্ট হাদিসসমূহের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়।
(৪৪১, হিরাবাই: জ ১: ২৩, পঞ্চভ: জ ৩)

* তাছাড়া, তাঁর কিয়াস যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কেননা, নামাজ ও রোধ হচ্ছে শারীরিক ইবাদত, আর হজ্জ আর্থিক ভূমিকায় অন্যতম। সুতরাং এটা কিয়াসসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয় আলোচনায় যে ব্যক্তি নিজে (কখনো) হজ্জ করেনি, সে অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।
* ইমাম শাফেইঈ, ইসহাক ও আওয়াজীর (রহ.) মতে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ আদায় করেনি, অন্যের পক্ষ হতে তার হজ্জ করা জারীয় হবে না।

দলীল (৬) বলে, আঃ ইবন আবাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) জনক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, “লাক্যাকা আন শুরুর্মাতা (আমি শুরুরামার পক্ষে হাজির।)” তিনি জিজ্ঞাসা করেন শুরুমার কে? সে ব্যক্তি বলে, আমার ভাই আরো আমার বন্ধ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: আচ্ছা, তুমি কি হজ্জ করেছ? সে বলে, না। তিনি বলেন, প্রথমে তুমি নির্জনের হজ্জ আদায় কর, পরে শুরুরামার হজ্জ সম্পন্ন কর।

উক্ত হাদিসে প্রথমে নিজে হজ্জ আদায়ের জন্য নির্দেশ (মারমা) এর ছোটাহাটো ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় না করে, তার জন্য অন্যের পক্ষে হজ্জ আদায় করা জারীয় নয়।
* ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি সে ব্যক্তি অন্যের হজ্জ করলে মাকরহ তান্তীহিসাহ জারীয় হবে, তবে মুল্লা আলী কারিম (রহ.) একে মাকরহ তাহরিমী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দলীল (১৩৪) অনুসন্ধানের শুরুতে আল্লাহ ইবন আবাস (রা) হতে বর্ণিত হাদিস।
যেহেতু নবী করিম (সা) ঐ মহিলাকে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা এবং না
করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা বাতিতেই বদলী হজ্জের অনুমতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, বদলী হজ্জ সহীহ হওয়ার জন্য প্রথমে নাজের হজ্জ জরুরী নয়।

দলীল (২) দারা কুতুনীতে আহে-

২. এই নিজের হজ্জ আদায় করে নেবে।

জবাবঃ

১. ইমাম শাফেকি ও ইসহাকের দলীলের জবাবে হানাফী মাযহাবের ইমাম তাহবী বলেন, শুরারমার হাদীসটি মালুল (মুবল) এবং ইমাম হুমাম বলেন, উক্ত হাদীসটি মাফু না মাফু এ নিয়ে মতানীক্ষা রয়েছে।

২. অথবা, শুরারমার হাদীস দ্বারা উত্তম বুঝানো হয়েছে। আর খাসআমি মহিলার হাদীস দ্বারা বৈধ বুঝানো হয়েছে।

আহলাফরাও একথাই বলেন যে, যে পূর্বে নিজে হজ্জ আদায় করেছে, তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানোই উত্তম।

(নোম আংশি ২ অি ৭২)

৪৫৫ সীমার বিভাষ করা

... শুনান বেগুর আলী সুলতান ইলের মো মুহরিম বায়তার বিভাষক করা

(হুদ্দরি বায়তার ৪৮ অি ৫২ বায়তার মুহরিম বায়তার ৫২ অি ৬৬ বায়তার মুহরিম বায়তার)

অনুবাদঃ ... ইবন আকবাস (র।) হতে প্রতিষ্ঠা। নবী করিম (স।) মায়ুনা (র।)-কে ইহ্রাম অবস্থায় বিভাষ করেন।

বিশেষতঃ মুহরিম বায়তার ইহ্রাম অবস্থায় বিভাষ করা জায়েম কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানীক্ষা রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেই, আহমদ ইবন হামল, ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, আওয়াই এবং সাইদ ইবন মুসাইমিয়া (রহ.) প্রমুখের মতে, ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করা বা কাউকে করানো অথবা বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার কোনটিই জায়ে নয়। যদি বিবাহ করে তবে বাতিল হয়ে যাবে।

(মুরাফ জ-৬ সী ২৪৩)

(১) দলিল

... ইসলামের ভাষায় রসূল মুহম্মদ সাল্লাল্হু আলাইহি ও সালাম তার শরীয়ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন - (তরমো জ-১ সী ৩৪৫, মুসলিম জ-২ সী ৪৫৩, অব দাউজ জ-১ সী ২৫৫, মুসলিম জ-১ সী ২৬)।

(২) রসূল মুহম্মদ সাল্লাল্হু আলাইহি ও সালাম তার শরীয়ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন - (তরমো জ-১ সী ৩৪৫, মুসলিম জ-১ সী ২৬)

(৩) তরমো জ-১ সী ১৭৯, মুসলিম জ-১ সী ১৪২

(৪) অর্থাৎ, ... ইয়ামাদ ইবন আসিম মায়মনী (রাছ) হতে বর্ণিত। মায়মনী (রাছ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঁ) আমাকে সারিফ নাম বলে বিবাহ করেন এবং এই সময় আমরা উভয়ই হালাল অবস্থায় ছিলাম।

(৫) দলিল

... আবু বারিয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (س) হযরত মায়মনী (রাছ) তাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়। তাঁর সাথে মর্যাদা যাপন করেছেন হালাল অবস্থায়। আব আন্স হতে উভয়ের মাঝে বার্তাবাহিক।

(৬) পর্যালোচনা সমাপ্ত হলে, মুহম্মদের জন্য ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করা এবং করানো উভয়টিই জায়ে আছে। তবে ইহ্রামের অবস্থায় সহস্রা বা সহস্রা সংক্রান্ত কার্যালী জায়ে নয়।

(মুরাফ জ-৬ সী ২৫২)
দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী—অর্থাৎ, তবে 
সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
করে নাও। (নিসা ৩) উক্ত আয়াতে বিয়ের কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে।

dলীল (২)ঃ অনুসরণের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

dলীল (৩)ঃ 
"এটি মুহর্ম—(তখানি জ ১ সুর, মুহ জ ৪তম সুর)
অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাব (সা) তাঁর কোন 
এক ক্ষেত্রে মুহর্ম অবশ্য বিয়ে করতেন।

dলীল (৪)ঃ হযরত ইবন মাসুদ সম্পর্কে ইবরাহিমী নাক্ষত্র (রহ.) বলেন,
"কাঁ লা বে যায় সে আর হোসোন আর মুহর্ম (তখানি ১ সুর)
অর্থাৎ, ইবন মাসুদ (রা) মুহর্মের বিয়েতে কোন অসুবিধা মনে করতেন না।

dলীল (৫)ঃ হযরত আনাস (রা) সম্পর্কে অসুরার ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদ বলেন——
সালতে আনস বেন মালক নকাজ মুহর্ম ফরাছা লা বে হেল হো এল কান লাসেু—
(তখানি ১ সুর)
অর্থাৎ, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) ক-মুহর্মের বিয়ে সম্পর্কে সিডেস 
করেছিলাম। উপরে তিনি বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। এতে কেবল ক্রয়-
বিক্রয়ের ন্যায়।

ুপরোক্ষিত বর্ণিত হাদিসসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুহর্মের জন্য 
বিবাহ করা বা করানো উভয়ই জায়েহ। (যদিও এমতাবস্থায় বিবাহ করা সঙ্গত নয়, 
কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবে।)

জবাবঃ ইমামরাওর প্রথম দলীলের জবাবে আহ্নাফগণ বলেন—
(ক) উক্ত হাদিসে এই বিশেষণ করা হবে যে, মুহর্ম অবশ্বিয় বিবাহ করা এবং 
বিবাহ করানো তার শানের বিপরীত। কেননা, সে ইহুদি বেধে সৃষ্টিকর্তার ইশকে 
মহরতে নিবন্ধ হওয়ার পরেও সৃষ্টির ইশকে লেগে যাওয়া আদৌ সমীচীন নয়। তাই 
নবী করিম (সা) বিবাহ করা এবং করানোর ব্যাপারে নির্দেশিত করতে গিয়ে এ 
উক্তিটি করেন।

(খ) অথবা, এই নিষেধ মাকরহ তানিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি ইহা ঐ 
ব্যক্তির জন্য, যে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না এবং সহায়তায় জুড়িয়ে 
যাওয়ার সমূহ সম্ভবত রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে।

(المعرفة ج ۹ ص, ۳۴۸, إعلاء السن ج ۱۱ ص ۴۹)
(গ) হেদায়া গ্রহহীন বলেন, হাদিসে মূলতঃ নিকাহ দ্বারা মুহারিম ব্যক্তির ইহুরাম অবস্থায় সক্ষম করতে পারবে না। (প্রতি জন ২:৩২, বয়ফারা প্রতি ১৫:৪:৪, সিয়াদী ২:৩২)

(হ) উল্লিখিত তিন ইমাম আবু রাফে এবং ইয়ামিদ বিন আসিম-এর হাদিস দ্বারা যে দলীল শেষ করেন, এর জন্য হল- আসর বিন দিনার বলেন, ইয়ামিদ বিন আসিম হলেন তুষীয় রাবি। সুতরাং ইচ্ছা দলীলযোগ্য নয়। যদি ইহাকে সুমায় বলেও মনে নেয়া হয়, তবুও এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং হল, ইমাম অর্থহীন, বিয়ে তা ইহুরাম অবস্থাতেই হয়েছে, কিন্তু হালাল অবস্থায় বিয়েটি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা ইহুরাম অবস্থায় তো আর কোন মুখরাত্রি উদযাপন করা যায় না এবং ওলীমাও করা যায় না। যার ফলে বিয়ে করাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ পায়নি।

(২) ধরস বিএকো জন ২৪৭, ধরস হরুই ৩:৪২।

* আবু রাফে-এর হাদিসের জবাব হল, উক্ত হাদিসটি এবং এতে উত্তর দিক দিয়ে সমাজসাহিত্য এবং মানববিদ্যা পূর্ণ। তাই এই হাদিস দলীলযোগ্য নয়।
* তাহার উক্ত হাদিসটির সন্দে মাতারআল ওয়ারাক নামে একজন রাবি রয়েছে।
* যার ব্যাপারে ইমাম নাসারী বলেন- রীসায়ি বিজিয়ে অর্থাৎ তিনি মজবুত রাবি নন এবং ইমাম আহমদ বিন হামল বলেন- কার্তী হন তাঁর সৃষ্টিশক্তি ছিল কম।

* ইয়ামিদ বিন আসিম-এর হাদিসের ব্যাপারে বলা যায় যে, কতক রেওয়ায়েত ইয়ামিদের মায়মূনা (রাই) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কতক রেওয়ায়েত মায়মূনা (রাই) এর নাম উল্লেখ না করে মুসলিম নেয়া হয়েছে। তাই ইমাম তিরমিয়ে ইয়ামিদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন- হাদ হাদ হাদ হাদ হাদ (এটি গোলীর হাদিস)।

উল্লেখ যে, এই মাসআলাটির ব্যাপারে বড় বড় সাহাবা, ফুকাহা এবং আবুবেতিনদের পক্ষ থেকে ইতিহাসলেখ্য মতামত রয়েছে। ফলে কেন এক পক্ষ অবলম্বন করে নির্দিষ্ট একথা বলা যায় না যে, উক্ত মতটি সুমায়। তাই সকল নির্দিষ্ট এসে অগ্রাধিকারের দিকটি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

* হানাফীরা ইবন আব্বাস (রাই)-এর হাদিসটিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে বলেন-(১) ইবন আব্বাস (রাই)-এর হাদিসটি সিহাল সিয়ার সকল ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। পশ্চিমে তিন ইমামের হাদিসটি এমন নয়। তাই সিহাল সিয়ার কিওয়ানগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ইয়াসিদ ইবন আসমের হাদিসটি বুখারী এবং নাসারীতে বর্ণিত হয়নি। এমনিভাবে আবু রাফের (রাই) হাদিসটি
বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং যে হাদীসটি সীহাহ সিফার সকল কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই উহাই প্রাপ্তিকর্মেরা।
(২) ইবন আকবাস (রাজ)-এর এই রেওয়ায়েতটি মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত
হয়েছে। বিশষতরূপে অধিক সুত্র পাওয়া যায়। (মৌরফ আল সিন ৬: ৩০-৩১) (৩)
(৩) ইবন আকবাস (রাজ)-এর রেওয়ায়েতটি হযরত আবু হুরায়ারা (রাজ) ও হযরত
আযিদা (রাজ)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা এর প্রহর্ণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
(দার قطني ج ۳ ص ۴۱۳، مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲۲۷، الفتح البلازي ج ۹ ص ۱۴۳)
(৪) ঐতিহাসিকগণ হযরত ইবন আকবাস (রাজ)-এর হাদীসটিকেই প্রাঙাযায়
দিয়েছেন। (السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۲۵۵، طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۲۲)
(৫) ইযাযিদ ইবন আসিম-এর একটি রেওয়ায়েত ইবন আকবাস (রাজ)-এর
রেওয়ায়েতের মত। (طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۲۳)
(৬) বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের জায়গাটির নাম ছিল সারিফ।
এটি হল মক্কা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত, যা মীরাতের অন্তর্ভুক্ত।
(طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱۲۵)
সুতরাং এমতাবস্থায় যদি নবী করিম (সার)-কে মুহরিম না মানা হয় তাহলে তো
একথাই ধরে নেয়া হবে যে, নবী করিম (সার) ইহরাম ব্যতীত মীরাত অতিক্রম
করেছেন- যা জায়েহ নয়।
(৭) ইবন আকবাস (রাজ) আবু রাফে এবং ইযাযিদ বিন আসিম (রাজ)-এর তুলনায়
অধিক জানি এবং অধিক সাক্ষ্যবিহীন।
(৮) হযরত ইবন আকবাস (রাজ)-এর হাদীসটি কিয়াসের সাথে সামঝান্ড রয়েছে।
যেমন- ইহরাম অবশ্য সেলাই করা কাপড় এবং সুগঢ় ব্যবহার করা জারী নয়। কিন্তু
এগুলো ক্রয় করে দেশে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে জারী আছে, ঠিক এমনিতে বিয়ে
করে মহিলাকেও দেশে নিয়ে আসা জারী আছে। কারণ বিয়ের ক্রয়-বিক্রয় (যদিও কিছু পার্থক্য রয়েছে) কিন্তু তা ব্যবহার করা তথা যৌন সত্ত্বার বা
যৌনকার্যে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্য করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

النُّسُخُةُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَام -
১. যৌন সত্ত্বা করা
২. অন্যান্য ব্যাংকলাপ করা
৩. নারীর সামনে যৌন সত্ত্বা সংক্রান্ত ব্যাংকলাপ করা
৪. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া
৫. কারো সাথে ঝঁড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-
ফেরে ফেরে হেরিয়ে জ্যোৎস্না না রেখা না ফেল, না জানান না পথের লাইন।
অর্থাৎ, এসব মাসে যে লোক হজ্জের নিয়োগ করেন, সে ক্রীয় সংস্কার, পাপচার এবং ঝগড়া-বিবাদ করবে না। (বাকারাং ১৯৭)
৬. হুলচর কোন প্রাণী হত্যা বা শিকার করা। এমনকি মশা, মাছি, উকুন ও ছাঁড়াপোকাও মারা নিশেধ। আল্লাহ তাহালা বলেন- "লা তেলেতুলা স্বেদুলা ও মাও হুদুর"।
অর্থাৎ, তোমরা ইহুদিদের অবস্থায় শিকার বন্ধ করো না। (মায়েদাং ৯৫)
৭. শিকার করা জন্য অন্যকে উৎসব করা।
৮. শিকারের সন্ধান দেয়া।
৯. সুঝীদ, সাবান, তেল, আতর ও স্ব-পাখার ব্যবহার করা। রাসূল (সার) জন্য সুগন্ধি ব্যবহারকারীকে বলেছিলেন-

আগুলু বাঁক আট দ্বারের দ্বারে (মোস্তফা ১২০/২৫৩ পাব ছাঁড়াপোকার আল্লাহ)
অর্থাৎ, ... তুমি তোমার (শরীর ও কাঠাবোর) সুগন্ধি ধৃঢ় ফেল।
১০. নখ কাটো।
১১. পুরুষেরা মাথা ও মুখ ঢাকবে না। মহিলারা মাথা ঢাকবে কিন্তু পাদ বজায় রেখে মুখ স্পর্শ করে এমন নেকাব লাগাতে পারবে না। তবে মুখ থেকে একটু দূরে থাকে এমন নেকাব দ্বারা পাদ রক্ষা করতে হবে।

... উন্নত অম্বর উনবিশ সা সলীলী সাবশ ওলম ফালাম মাফুহামে লাগিনে না বিতক।
(মোস্তফা ১২০/২৫৩ পাব মা পয়স মোশর)।
অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রায়) নবী করীম (সার) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুহম্মদ সৈয়দােরা যেন চেহারায় নেকাব না ঝুলায়।
১২. মাথার চূল বা দাঁড়ি খেতামী জাতীয় সুগন্ধি ঘাস দ্বারা ধৌত করা।
১৩. চূল, দাঁড়ি বা শম ছাঁটা বা টেনে তোলা।
১৪. সেলাই মুক্ত কাপড় পরিধান করা। তবে মহিলাদের জন্য এ হুকুম নয়। ইবন উমর (রায়) বলেন, রাসূল লাহা (সার) -কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, মুহাম্মদ ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে?

কালের নয় বিপ্লবের সাবশ ওলম স্বর্ণ ও শুক্র ও শরীরের ছোট্ট গুন।
(মোস্তফা ১২০/২৫৩ পাব মা পয়স মোশর)
অর্থাৎ, তাঁর বলেন, সে কামিল (জাযম), টুপি, পায়জামা এবং পাঙ্ক্য পরিধান করবে না। ... অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে, এক সাহারীকে তিনি নিদেশ দেন, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল।
১৫. সুগম্যযুক্ত কাপড় পরিধান করা। অবশ্য সুগম্য দূরীভূত হলে তা পরিধান করা জায়েন।

عبد الله بن عمر لله صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهم

الزُّعْفَرَانِ مِن الْيَيَّابِ ... (ابو داود ج 1 ص 203)

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবন উমর রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (ص) মুহরিম
কীলোকদেরকে জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

১৬. চূল বা দাড়িতে চিকিনী বা আঙ্কুল চালানো।

১৭. গোফ কাটা ইত্যাদি। (ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭৭, ২৩৭-২৩৮ সাল ২১২)

(বব্বাদাস ইকরামা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজার ইবন আমর
আনসারী (ر) কে বলতে গেলেন কিন্তু, রাসূলুল্লাহ (ص) ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ
শক্র কারণে বা চলনশক্তি রুহিত হওয়ার কারণে (ইহামারের পর হজ বা উমরা
করতে) অস্বীকার হয়, তবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। তবে তাকে পরবর্তী বছর
হজ করতে হবে। রাবী ইকরামা বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে আবাস (র) ও
আবু হুরায়ারা (ر) কে জিজ্ঞাসা করলে তারা উভয়ে এর সত্যতা বীকার করেন।
(উক্ত অনুচ্ছেদেই অন্য একটি হাদিসে “অথবা রোগের কারণে” কথাটি উল্লেখ
রয়েছে।)

বিশ্লেষণঃ (বব্বাদাস ইকরামা) হজ বা উমরার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ততা ওধধারত
দুর্ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত নাকি অসুস্থ, চলনশক্তি রুহিত হওয়া বা অন্য কোন কারণেও
হতে পারে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।
* ইমাম মালিক, শাফেই, আহমদ ইবন হামল, ইসহাক এবং লাইস (রহ.) প্রমুখের মতে, বাধাগ্রস্ত হওয়া কেবল দুষমনের সাথেই সম্পৃক্ত- অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে হবে না। (عدة الفاری ج ۱۰ ص ۱۴۰)

দলীল (۱): পবিত্র কুরআনের আযাত- 

فَإِنَّ أَخْصَارَمُنَّ فَمَا أَسْتَيْسَرْ مِنَ الْهِنْدَیِّ

অর্থাৎ, অতএব হচ্ছ ও উমরা করতে পিয়ে যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ, তাই তোমাদের উপর ধার্য। (বাকারাং ۱۹۶)

যখন নবী করীম (ص۱) এবং সাহবায়ে কিরাম ۶৭ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সাধ্যির সময় দুষমনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন, তখন এই আযাতটি নামিল হয়। সুতরাং রুক্কাম গেল, অবরুদ্ধতা কেবল দুষমনের সাথেই খাস। (تفسير ابن كثير ج ۲۳۱ ص ۲۳۱)

دলীল (۲): হযরত ইবন আব্দান এবং হযরত ইবন উমর (رَأَى) হতে বর্ণিত-

لَا حَصْرَ إِلَّا مِنْ عَدْوٍ

अर्थात, श्रद्ध छाड़ा कोन अवरुद्धता ने।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফীয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখসী, আতা (رَأَى), আদুল্লাহ ইবন মাসূদ, যায়েদ বিন সাবেত (رَأَى) প্রমুখের মতে, যে জিনিসই ইহরাম কার্যকরণ বা সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী হয়, তাই ইহাস্বার (অবরুদ্ধতা)। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে দুষমন, অসুস্থ, বন্দীদশা, খংগুটা, পাথেয় হারিয়ে ফেলা অথবা সাগরে জাহাজ অটিকে যাওয়া প্রতি অবস্থার কারণ হিসেবে গণ্য করা হবে। (عدة الفاری ج ۱۰ ص ۱۴۰)

دলীল (۱): আল্লাহ তাআলার বাণী- 

فَإِنَّ أَخْصَارَمُنَّ فَمَا أَسْتَيْسَرْ مِنَ الْهِنْدَیِّ

উত্ত আযাতে ইহাস্বার (বাধাগ্রস্ত হওয়া) শদ্ধ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আধিকাংশ অধিকাংশ বিধানের মতে, ইহাস্বার শদ্ধ প্রকৃত অর্থে রোগের কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর আলোচনা আযাত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (التفسير الكبير للرازي ج ۵ ص ۱۰۱-۱۰۲)

دলীল (۲): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

دলীল (۳): কিয়াসের চাহিদাও এই যে, যে কারণ শক্র দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তা অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। আর উভয়টিই হচ্ছ পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং উভয়টির হুকুমো একই হওয়া উচিত।
ব্যাপকতা অনুযায়ী হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, নিশ্চিত কোন শানে নুযুলের সাথে তা সম্পৃক্ত নয়।” সুতরাং উক্তি আযাতে অহিংস শপথি ব্যাপক। তাই ব্যাপকতার কারণে অসংস্কৃত, বদ্ধীড়শা ইত্যাদিও এতে শান্তিল রয়েছে।

ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির জবাব হল-
১. কুরআনুল করিম ও হাদীসের মোকাবিলায় ইহা দলীলযোগ্য নয়।
২. অথবা, এ উক্তি দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, অবন্দ্ধতার পরিপূর্ণ এবং প্রকৃট রূপ হল শক্ত দ্বারা অবন্দ্ধ হওয়া। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইহা ছাড়া অবন্দ্ধতার আর কোন কারণ হতে পারবে না। (মুনাফ সন্ন ৩ সং ৩৮৩, দ্রশ মুক্তিজ ২ সং ২৬৩)

অবরোধের হুকুমঃ
* ইমাম মা'লিক, শাফেইয়া ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, অবরোধের ফলে হালাল হওয়ার নিয়ম হল, কুরবানীর পত্নী সে স্বল্পেই জবাই করবে, যেখানে সে শক্ত কর্তৃক অবন্দ্ধ হয়েছে। কুরবানীর পত্নী হেরেমে পাঠানো জবাই নয়। অতঃপর মাত্রা মুডানো বা চূল ছাঁটানোর কাজ করিয়ে নিবে।
* ইমাম আবু হাসিনা (রহ.), হযরত ইবন মাউদুর ও ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, অবরোধের ফলে হালাল হওয়ার নিয়ম হল, অবন্দ্ধ ব্যক্তি একটি কুরবানীর পত্নী হারামে পাঠাবে এবং একটি সময় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে নিবে যে, এই সময় ঐ কুরবানীর জন্ত হারাম জবাই করা হবে। যখন সে সময় এসে যাবে, তখন সে হালাল হয়ে যাবে। উক্তি ব্যক্তির মাত্রামুডানো বা চূল ছাঁটানো জবাই নয়।

(দ্রশ তৃতীয ২ সং ২১১, দ্রশ মুক্তিজ ২ সং ২৩০)

উল্লেখ্য যে, ফরম হজ কারো মতেই অবরোধের কারণে বাতিল হয় না। সর্বসম্মতির মতে তার উপর কাশা করা যেতে পারে ওয়াজিব। (মুনাফ সন্ন ৩ সং ৩৭৬)

৩২০

বাবু তোলা বু বহু উচুর সং

আসরের পরে তাওয়াফ করা

.. উন্ন জিবির বন মোহদিন বেল্ল বাবু সালাম বাবু বল্ল বাবু মোহদিন বাবু বল্ল বাবু।

(তৃতীয ১ সং ১৭৫)

বাবু তোলায় উচুর তোলা; দ্রশ মুক্তিজ ২ সং ২৩৫ বাবু তোলায় উচুর তোলা।
দলীলঃ উপরিউক্ত হাদিস।

* ইমাম মালিক, আবু হানিফা, সাহেবাইন, সাঈদ ইবন যুবায়ের, হাসান বসরী এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, তাওয়াফের পরে দু'রাকাত নামাই মাকরহ ওয়াকে আদায় করা জায়েয় নয়; বরং সূরোদয় কিংবা সূরোদয়ের পর আদায় করতে হবে।

(عمدة الغاري ج, ص271)

দলীল (১)

... عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا وَالشَّهْسَبُ مُرْتَقِعًا (ابو داود ج, ص181 باب من رخص فيما الخ، بخاري ج, ص82، ترمذي ج, ص423 باب في كراهة الصلاة الخ، نسائي ج, ص91)

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ص) আসরের পর নামাই পড়তে নিষেধ করেন। তবে যদি সূর্য উপরে থাকে (ভিন্ন কথা)।

দলীল (২)

... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَاَرِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَفَّتُ بِالْيَبِينَ مَعَ عُمَّرِ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدُ صَلَاةِ الصَّبِيحِ فَلَمَّا قَضَى عُمَّرُ طَوَافُهُ نَظَرَ فَلَمْ يَلْمَشُ فَرِكَّبَ حَتَّى أَنْهَى بِذَيِّ طُوْيِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (اللفظ للمؤطا ص, ص278، بخاري ج, ص220 باب الطواف

بعد الصبح والصر)।

অর্থাৎ, ... আবুর রহমান ইবন আজ্মুল কারী বলেছেন, তিনি ফজরের নামায়ের পর হযরত উমর ইবন খাভাব (রা)-এর সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফ শেষে উমর (রা) তাকিয়ে সূর্য দেখতে পাননি। তাই তিনি আরোহণ করে চলে
হজ্জে অধ্যায়

আলেম। বীর্যু নামক স্থানে এসে সওয়ারী বসিলেন, তাঁতঃ পর দুই রাকাত নামায আদায় করলেন।

দলীল (৩): মুসনাদে আহমদে হযরত জাবির (রাও) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে-

... লম নকন তেঙ্গে বগঁ চলো এ চল্প হতি তুল্ল শমস উলা। লগু উকল হতি

তুরব- (ফখ হাসি পাটা এটি ৩১ সা, মজিম আলাদাত জ ৩ সা) (২৪৫)

অর্থাৎ, আমারা ফজরের নামায় পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাওয়াফ করতাম না।

দলীল (৪): হযরত আবু সাইদ খুদারি (রাে) হতে বর্ণিত-

আলে তাফ বথ চল্প কলাফ ফ্রাগ জলস হতি চলষ্ট শমস- (عمدة الغاري ৯ সা) (২৭১)

অর্থাৎ, তিনি ফজরের পর তাওয়াফ করেছেন। যখন তা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তখন সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে ছিলেন।

জবাবঃ শাফেঈ ও আহমদ (রহ.):-এর প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, হাদিসে বর্ণিত “আই সাফেঈ” (যে কোন সময়) দ্বারা “মারকুহ সময় ব্যক্তি যে কোন সময় নামায আদায় করতে নিষেধ নয়” একথা বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশের উদেশ্য ছিল বনু আবদ মানাফকে এই হিসাবে দেয়া যে, তারা যেন আসা-যাওয়ার জন্য হারামের রাক্ত সর্বদা খোলা রাখে। কেননা, আবদ মানাফের ঘর-বাড়ি বায়ুত্তুলাহ এবং হারাম শরীফকে বেইজন করে রেখেছিল। যখন এই দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়া হত, তখন কোন মানুষ হারাম শরীফ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। এইজন্য নবী করিম (সা.) এমন উক্তিটি করেছিলেন। সুতরাং এর অর্থ এই নয় যে, হারাম শরীফে নামায আদায়কারীদের জন্য কোন মারকুহ সময় নেই।

(কলকেজ দরিদ জ ১ সা) (২৮২)

২৬০ হজ্জে কিরান আদায়কারীর তাওয়াফ

... িন হাজির বন উদ্ধ প্তরুল হইয়া নম প্তীফ নিদি দ্বারা আলো প্তেল ও আচারের

বিন চাানা এলো তুল্ল হজ প্তীফ হইবে। (বঠারি জ ২২১ বাহি ২৪৪) বাবু জাহা বসান অলাত

সমাল জ ১ সা, ৪৪০ বাবু জাহা বসান অলাত

ওয়াদা, নাসানি জ ৩২ সা, ২০৫ তালুফ অলাত)
অনুবাদঃ ... জাবির ইবনে আনুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়ার মধ্যে এককালের অধিক তাওয়াফ
করেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম তাওয়াফ।
কিরান হঙ্জ আদায়কারীর তাওয়াফ সংখ্যায় কিরান হঙ্জ আদায়কারী মোট কয়টি
তাওয়াফ করেন এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেকী ও আহ্মদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, কিরান হঙ্জ
পালনকারী সর্বমোট তিনটি তাওয়াফ করে। যথা-
(১) তাওয়াফে কুদুম, (২) তাওয়াফে মিয়ারাত (অর্থাৎ উমরা ও হঙ্জের জন্য
তাওয়াফ), (৩) তাওয়াফে আল-বিদা।
অতএব, কিরান হঙ্জ পালনকারীর জন্য তাওয়াফে উমরা আলাদাভাবে আদায় করার
প্রয়োজন নেই, বরং এটা তাওয়াফে মিয়ারাতের মধ্যেই গণ্য হবে। মের্টফা, হঙ্জ ও
উমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই। উভয়ের জন্য একটি
তাওয়াফই যথেষ্ট।
(মুহাম্মদ উসমান জুনী জুনী ২০০৩, মহিলার ছত্র, ৩-৫৫ (৪৬৭-৪৬৮))

দলীল (১) অনুভূমিকের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসের বারো বাক্য যায় যে,
কিরান হঙ্জ উমরার জন্য আলাদাভাবে তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

দলীল (২) উন্ন জানার রসূল ইব্লিস এলা ইসলাম উল্লেখ এবং যাহার হেফাজত
ফত্ভার নিয়মোতা এবং জাতি (লেকে তাহরিন)
অর্থাৎ, ... হরমত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হঙ্জ ও উমরা
মিলিয়ে আদায় করেছেন। (হঙ্জে কিরান করেছেন)। অতঃপর হঙ্জ ও উমরার জন্য
একটি তাওয়াফ করেছেন। (পৌরবের হাদিসের সত্য দ্বিত)।
উপরালিখিত রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, উমরার জন্য আলাদা তাওয়াফ করা
প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা, ইবনুলাইম নাব্বনি, আওয়াই, সুফিয়ান সাওরী, শাফেকী (রহ.)
এবং ওয়ালিয়া সাহাবীদের মতে, হঙ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ সহ
মোট চারটি তাওয়াফ করে হবে।
(عمة الغاني ج ৬, ص ১৮৪)

(১) সর্বপ্রথম তাওয়াফে উমরা, যার পরে সারাই করে হয়।
(২) তাওয়াফে কুদুম, যা সুন্নত।
(৩) তাওয়াফে মিয়ারাত, যা হঙ্জের রুকন।
(৪) তাওয়াফে আল-বিদা, যা ওয়াজিব।
হজ্জ অধ্যায়

দলীল (২) হজ্জত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ)-এর হাদীস-

قَالَ ﷺ طَافُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ ﷺ عَلَيْهِ ﷺ وَسلَّمَ طَافُ لَعَمَّرَتَهُ وَحَقِّيَّةٌ طَوَافِينِ وَسَعَى


অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাওয়াক্য করেছেন। তিনি উমরা ও হজ্জরের জন্য দুটি তাওয়াক্য ও দু’ সাই করেছেন। আবু বকর, উমর, আলী ও ইবন মাসুদ (রাঃ) অনুরূপ করেছেন।

দলীল (৩) হজ্জত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর রেবায়েত-

أَنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ ﷺ عَلَيْهِ ﷺ وَسلَّمَ طَافٍ طَوَافٍ وَسَعَى سَعِيٍّ-

(د) (ق) (ج) (দ) (ছ) (খ) (গ) (ভ) (ব)

অর্থাৎ, নবী করিম (সা) দু’ তাওয়াক্য ও দু’ সাই করেছেন।

এখানে আরো অনেক হাদীস ও আহার রয়েছে, যা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জরের জন্য মুমান পৃথক পৃথক তাওয়াক্য ও সাই রয়েছে, তেমনিতভাবে উমরার জন্যও আলাদা তাওয়াক্য ও আলাদা সাই রয়েছে।

(উল্লেখ্য যে, দারা কুতুনী থেকে বর্ণিত হাদীসের মতে যদিও কতক রাবীদের যোগ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন কিতাবের মূল্যায়ন করলে একথাই প্রতিযোগ্য হয় যে, তারা অধিকাংশই ছিলেন সংশয়ের উদ্ধের।)

(হুসানুল্লাহ ইবনে হুসাইন ১-২, ১৮৫-১৮৬, তেহেরিন কলেজ, জ ২, ২০০৬-২০০৫)

জবাবঃ উল্লিখিত তিন ইমমের দলীলের জবাবে আহ্মাফগত বলেন, হজ্জত জবির ও আহিয়া (রাে)-এর থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর আলোচনা বিষয়ের দিকে লক্ষ করলে সকল হাদীসই বিশেষণের দাবী রাখে, এবং এগুলোর বাহিক অর্থ করা নিকটই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বাহিক অর্থে দেখা যায় যে, নবী কর্ত্তা (সা) শুধু একটি তাওয়াক্ষ করেছেন অথচ সবাই একমত যে, তিনি (সা) একাধিক তাওয়াক্ষ করেছেন। আর এমতাবাহ্যঃ তিন ইমম এ সকল হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত বিশেষণ করে থাকেন-
একটি তাওয়াক্ষ দ্বারা উদেশ্য হল তাওয়াক ফিয়াত, যার মধ্যে তাওয়াক উমরাও অত্যন্তুর্ক রােল।
আহকামুল হাদিস

ছক্ক অধ্যায়

আর হানাফীগণ বলেন যে, এ সকল হাদিসে বর্ণিত একটি তাওয়াফ দ্বারা তাওয়াফকে উমরা রুখানো উদ্দেশ্য, যার মধ্যে তাওয়াফে কুদুম অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাওয়াফে কুদুম আলাদাভাবে আদায় করার প্রয়োজন নেই। আর এক্ষেত্রে হানাফীদের মতামত অগ্রাধিকারের কারণ হল, এর দ্বারা রেওয়ায়েতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন হয়।

(২) অথবা, বলা যায় যে, এক তাওয়াফ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য তিনি একটি তাওয়াফ করেছেন। এখানে এটিই উদ্দেশ্য, তদ্বিপরীত বা অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইতিপূর্বে উমরার জন্যও তাওয়াফ করা হয়েছে।

(৩) কাজী পানিপথী (রহ,) বর্ণনা করেছেন যে, সহীহ হাদিসগুলো অধ্যয়ন করলে কোন কোন রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, নবী করিম (সাৰ্ব) পদব্রজ সাঙ্গ করেছেন।

(মসলম ২ সং, ২৯৬ নাসিম ২ সং)

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আরোহণ করে সাঙ্গ করার উপলক্ষ রয়েছে।

(নাসিম ২ সং, ২৪১ বিবরণ এবং তালিকার জন্য)

সুতরাং এগুলোর অবসানের মৌলিক ব্যাখ্যা হল, তিনি (সাৰ্ব) দুইবার সাঙ্গ করেছেন।

একবার পদব্রজে, আরেকবার দুইবার আরোহণ করে। অতএব, যেসব রেওয়ায়েতে এক সাঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর সামাধিক উক্তি হল, পর্যটন বিরোধের সময় অতিরিক্ত অংশ প্রমাণকারীর বিষয়ের প্রাধান্য হয়।

(মোহরি ১ সং)

মাহার কেশ মূল্য ও কর্তন করা

৪ বাবু হল্লাক ও তলাকির সং

(বখারি ১ সং, ২৩৩ বাবু হল্লাক ও তলাকির সং)

মসলম ১ সং, ২০৪ বাবু তলাকির বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;

মাহার বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, এবং মাহার সং;
হজ্জ অধ্যায়
তাদের জন্য কি? তখন তিনি বলেন, মাথায় চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরকার রহম করুন।

বিশ্লেষণ: হজ্জে (কুরাবানীর দিন কংকর নিকটত্বের পর) কেশ মুখন করা অথবা ছাঁটা ওয়াজিব। তবে চুল ছোটটার চেয়ে মুখন করাই উজ্জম।
প্রশ্ন হল পুরো মাথার কেশ মুখনো অথবা ছাঁটা ওয়াজিব, নাকি কতক অংশের দ্বারা তা আদায় হয়ে যায়ে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ
* ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, পূর্ণ মাথা মুখনো অথবা ছাঁটা ওয়াজিব।

দলীল

آنَ اللَّهِ ﺍِلْهيُ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ جَمِيعَ رَأسِهِ وَقَالَ حَذَّرُوا عَلَيْيَ

مَقَاسِمَكُمْۚ (تنظيم الأشتات ج.2 ص.106، درس مشكوة ج.2 ص.243)

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) তাঁর সমস্ত মাথা মুখন করলেন এবং বললেন, তোমরা আমায় থেকে হজ্জের বিধিবিধান শিখে নাও।

* ইমাম আবু হানিফা ও শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, মাথার কতক অংশ মুখনো বা ছাঁটা ওয়াজিব। কিন্তু মাথার সব চুল মুখনো অথবা ছাঁটা মুখাহাব এবং উজ্জম, তবে ওয়াজিব নয়।

دلالان

عن ابن عباس قال قال قال قال قال قال لبيب معاوية أعلمت أبي قصرت من رأس

الأجري صلى الله عليه وسلم (مسلم ج.2 ص.108 باب جواب تفسير الغير بالغاري ج.1 ص.237)

অর্থাৎ, ইবন আকাস (রাঃ) বলেছেন, মুআবিয়া আমাকে বললেন, তুমি কি জান, আমি রাসুলজাহ সা.রা)-এর মাথার চুল ছোট দিয়েছি।

হাদিসের উল্লিখিত (মধ্য হতে, থেকে) হরফটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় ভর্তৃত্ব তীব্রতা বলা হয়। অর্থাৎ, যে এমন একটি হরফ যা কিছু কিন্তু এ হরফ করে যে বিষয়ে বব্বরত হয়, সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা.)-এর মাথার কতক অংশের চুল হতে ছোট করতেন, সম্ভবত স্পর্শ নয়।

دلالان

عن معاوية حدث أُحِذَّ من أطراف قصر اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম (সা.)-এর কেশ মোচারকের পর্যায়ে ছাঁটনা।

उक्त হादीसें দ্বারা মাথার কতক অংশের চুল ছোট তাদের প্রমাণ মিলে।

(تنظيم الأشتات ج.2 ص.105)
উল্লেখ যে, অন্যর সময় মাথা মাজাহ নিয়ে ইমামদের মাঝে কোন মতভেদ রয়েছে, এমনিতে এখানেও মাথা মুস্তানা বা ছাঁটার পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেকের মতে, তিনটি চুল মুস্তানা অথবা কেটে ফেলা যথেষ্ট। শাফেকের
  মায়াবানের কাহো কাহো মতে একটি চুলই যথেষ্ট।

* ইমাম আবু হাফিজ (রহ) এর মতে, মাথার চার ভাগের এক অংশ মুস্তানা বা
  ছাঁটা ওয়াজিব।

(عمة الداري ج ١٠ ص ٣٣، فتح الباز ج ٣٠٠ ص ٤٤٠، شرح نوري ج ٣٠٠ ص ١٢٠)

জবাবঃ ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ) এর জবাবে আহনাফ ও শাফেকের বলেন,
“পূর্ণ মাথার চুল মুস্তানা বা ছাঁটা উত্তম, আর কতক অংশ মুস্তানা বা ছাঁটা
ওয়াজিব। এতে উভয় হাদিসের উপর আমল হয়ে যায়।”

উল্লেখ যে, চুল ছেটি করার চেয়ে মুস্তানা উত্তম বলার কারণ হল,
(১) নবী করিম (সা) মস্তক মুস্তানকারীদের জন্য পরপর দুইবার রহমতের দুআ
করেছেন, আর চুল ছেটি করে কর্তনকারীদের উপর মাত্র একবার দুআ করেছেন।
  হাদিসটি অনুসরণের প্রয়োজন হয়েছে।

পবিত্র কুরআনেও মুস্তানকারী শব্দটি আমে উল্লেখ করা হয়েছে—

(২) ইবন হাজর (রহ) বলেন, ইহার আরেকটি কারণ হল, মস্তক মুস্তানকারী
  ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রবর্তী এবং এর দ্বারা আল্লাহর জন্য অধিক বিনিয় প্রকাশ
  পায়। যার দ্বারা হাজিন নিয়ে তাদের বিশ্বদ্বিতা প্রাপ্ত হয়। পক্ষপথের চুল ছাঁটার মধ্যে
  সৌন্দর্যের কিছু অংশ রয়েছে যায়। (فتح المлим ج ٢٨٨)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ যদি কারো মাথায় চুল না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির উচিত বীর
  মাথার উপর ভুর দিয়ে ছাঁচতে, যাতে অনুসরণের ক্ষেত্রে ওয়াজিবের হুকুম আদায়
  হয়ে যায়। (بديال الصالح ج ٢٠ ص ١٤٠)

* মহিলাদের জন্য মাথা মুস্তানার হুকুম নেই, বরং মাথা মুস্তানা তাদের জন্য মাকরহ
  তাহরিমী। তারা এক আনুভূতি পরিমাণ চুল কর্তন করবে। (بديال الصالح ج ٢ ص ١٤١)

দলিলঃ

... عن ابن عباس قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على
  النساء الحلق إنما على النساء التفصييل— (ابو داود ج ١ ص ٢٧١ باب الحلق والقصور، তমিদ
  ج ١ ص ١٨٢ باب كرائحة الحلق للنساء)
ঋষিৎ, ... ইবন আবুলাবু ইরাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) হজ্জের পূর্বে উমরা আদায় করেন।

‘উমরা’-এর আভিধানিক অর্থঃ ছবিটি ঝুলে-এর ওয়েন একবচন। বহুবচনে ‘উমরা’ ও ‘ফুরাত’, এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—

১. লেসু উমরা - মতকাবরণ পরিধান করা

২. আবাদ বা নির্মাণ করা। যেমন ইরাশাদ হচ্ছে—

ইিমায় ইমরু মস্জিদ আলেহওয়ালে আলিয়ালে অর্থৎ— নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি। (তাওবাহঃ ১৮)

৩. আলাহের তীর্থ—ফিয়ারত করা

৪. ছুর্ণপূর্ণ স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা। ছবটির ব্যবহার পরিষ্কার করে কুরআনেও পাওয়া যায়— ওয়ায় ওয়াহ উমরা উমরা লেসু (البقرة ১৬৬)।

উমরা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

(১) আল্লাহর আইনী বলেন,

’’ঈমান’ ও লেসু উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা।’’

অর্থাং, মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে পরিপূর্ণ করা বিভা প্রদক্ষিণ করা এবং সাফা-মারওয়া যাত্রায় মাঝে মাঝে দৌড়ানো উমরা বলা হয়।

(২) ফিকহুস সুনাহ-এর প্রশ্নকার বলেন—

’’ঈমান’ ও লেসু উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা উমরা।’’

অর্থাং, মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে পরিপূর্ণ করা ঘর প্রদক্ষিণ করা এবং সাফা-মারওয়া যাত্রায় মাঝে মাঝে দৌড়ানো উমরা বলা হয়।
অবর্ত্ত, বায়তুল্লাহ শরীফের যিযারত ও তার চতুর্দিকে তাওযাফ করা এবং সাফ-মারওয়া পাহাড়বন্দরের মধ্যবর্তী হাসে সায়ারি করাকে উমরা বলা হয়।
(৩) শরহ বেকায়াহ-এর প্রাপ্তিক বলেন-

العمرَةُ هيَ زيارةُ البيتِ الحرام على وجبٍ مخصوصٍ

অবর্ত্ত, উমরা হল নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফ যিযারত করা।
(৪) আল কামুসুল ফিকহী গ্রহে বলা হয়েছে-

هيَ قدَدُ الكعبةِ للنسكِ المعروفِ أي الطواف والاسقُي

অবর্ত্ত, উমরা হল সুপ্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক ইবাদত তথা তাওযাফ এবং সায়ার উদ্দেশ্যে কেবার যিযারতের ইচ্ছা পোষণ করা।
(৫) মুনজিদ অভিধানে আছে-

هيَ أفعالٍ مخصوصة نسَنَ بِالحج الأصغر

অবর্ত্ত, এমন কিছু নিদিষ্ট কাজ যাকে হচ্ছে আসগর (ছেট হজ) বলা হয়।

(উমরার রুকনসমূহ)। কোন বলতোর রুকন বলা হয় যা যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু দাঁড়ায়। উমরার রুকন তথা ফরম করে সে সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে

* ইমাম মালিক ও আহমদের (রহ.) মতে, উমরার রুকন তিনটি। যথা-

ক. ইহরাম বাঁধা

খ. বায়তুল্লাহ শরীফ তাওযাফ করা

গ. সাফ-মারওয়া পাহাড়বন্দরের মাঝে সায়ারি করা।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, চারটি। উপরালিখিত তিনটিসহ চতুর্থটি হচ্ছে মাধা মুর্তানো বা চুল কাটা।

* জমশুদের মতে, উমরার রুকন হচ্ছে দুটি। যথা-

ক. বায়তুল্লাহ শরীফ তাওযাফ করা,

খ. সাফ ও মারওয়া পাখাড়বন্দরের মাঝে সায়ারি করা।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে একটি। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওযাফ করা।

হজ্জ ও উমরার মাঝে পার্থক্যঃ হজ্জ ও উমরা যদিও শরীরিক ও আর্থিক ইবাদদের সমূহের একই শ্রেণীতে ইবাদত এবং ইবাদদের মধ্যে সমানতার হয়। তবুও এ দুই প্রকারের ইবাদদের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যথা-

অভিধানিক পার্থক্যঃ ক. হজ্জ শমের আভিভাষিক অর্থ হচ্ছে, ইচ্ছা করা, সাক্ষাৎ করা, ইরাদা করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উমরা শমের অর্থ হল যিযারত করা, আবাদ করা ইত্যাদি।

খ. হজ্জ শমটি মাসদার আর উমরা শমটি ইসমে মাসদার।
মাদাহুতার পার্থক্যঃ হল মাদাহুতার জন্য শব্দটির মাদাহুতার জন্য শব্দটির জন্য শব্দটির জন্য শব্দটির জন্য শব্দটির

পারিভাষিক পার্থক্যঃ হল যে সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যে সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যে সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যে সময়ে নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যিনি করা। উমরা হল যেকোন সময় নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ যিনি করা।

হুকুমগত পার্থক্যঃ

ক. হজ্জ ফরয এবং উমরা সুন্নত।

খ. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। বরং বছরের যেকোন সময় উহা আদায় করা যায়। (তবে হজ্জের পাঁচ দিন ব্যতীত- আরাফার দিন, কুরাবানীর দিন, তাশরীফের দিন অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩)

গ. হজ্জে আরাফাত ও মুয্যদালিফায় অবস্থান করতে হয়। কিন্তু উমরায় কোন অবস্থান নেই।

ঘ. হজ্জের রূপক তিনটি আর উমরার রূপক দুইটি। (যদিও কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।)

৬. জমরায় কংকর নিকেল হজ্জের ওয়াজিব। পক্ষতরে উমরায় কংকর নিকেলের বিধান নেই।

চ. হজ্জে তিনবার তাওয়াফ করতে হয়। উমরায় মাত্র একবার তাওয়াফ করতে হয়।

ছ. হজ্জ করলে কবীরা (বড়) তোনাহ মাফ হয়ে যায়। উমরার মাধ্যমে কেবল সগীরা (ছোট) তোনাহ মাফ হয়।

জ. কারো কারো মতে, সাধারণত হজ্জকে বড় হজ্জ বলা হয়, পক্ষতরে উমরাকে ছোট হজ্জ বলা হয়। ইত্যাদি।

উমরা সুন্নত না ওয়াজিবঃ উমরা সুন্নত না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে:

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ ইবন হামল, আরু সাওর, সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঈ (রহ) ও ইবন আকাস (রাছ)-এর মতে, জীবনে একবার উমরা আদায় করা ওয়াজিব তথা ফরয।

(দুর্দশ তৃত্তীয় গ ২০ সং সং)

* বাদায়ামাওয়ানি-এর গ্রহণের বলেন যে, আহমাদদের মাঝে হতাই। অর্থাৎ জীবনে একবার উমরা আদায় করা (সাদাকাতুল ফিতিরের নাম) ওয়াজিব।

(দুর্দশ চার্ট গ ২২ সং)

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ)-এর দলীলঃ

দলীল (১)ঃ পবিত্র কুরআনের আযাত- 'আইমুনা হজ্জ ও মুহর্রম ল্যান্ড'
অধ্যায়, “তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর।” (রাবকারাঃ 196)

* ইমাম মালিক, যুহেন্দু ইবন ফয়ল, ইবন খুমাম এবং আবু হানিফা (রহ.)-এর
* সুপ্রসিদ্ধ মায়হাব হল- জীবনে একবার উমরা আদায় করা সুন্দর মুহাকারা এবং
* একাধিকবার উমরা করা মুহাকার।

(2) ৩২ (নীলেম আলুমাত জ ১)

অধ্যায়, যায়েদ ইবন সাবিত (রাও) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাও) বলেন, হজ্জ এবং
* উমরা দুই ফরমা।

(1) ৯০ খাঁদি জ ১৬১ বাপ ও ৯৩ বাপ বিশেষ উপভোগে বাব নিয়ম ৫২

* হাদিস গাজী বা রসূল আল্লাহর উমরা ফরিদা কাল্লাম গাল! লন তরিম হ্রে লক (লবাও ৫ ৩২)

(2) ৬৫ (ক্ষেত্র)

অধ্যায়, ... জাবির (রাও) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাও)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে
* আল্লাহর ইমাম! উমরা কি হজ্জের মত ফরমা? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে উমরা
* করা, তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

(3) ৩২ (বিন মহাদ ১৩১ বাপ উমরা)

অধ্যায়, ... হয়ত তালাহ (রাও) নবী করিম (সাও)-কে বলতে শুনেছেন, “হজ্জ
* জিহাদ তুলা, আর উমরা ফলক কাজের মত।”

(4) ৬৫ (ক্ষেত্র)

অধ্যায়, ... ইবন মাসুউদ (রাও) বলেন, হজ্জ ফরমা এবং উমরা ফলক কাজের মত।
উপরোক্তিতে হাদিসকল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উমরা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নতে মুআকাদাদ।

জবাবঃ প্রতিপক্ষের প্রথম দলীলের জবাবে আহলাফগণ বলেন-

(১) আয়াতে যদিও হজ্জের সাথে উমরা শদটির উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা হজ্জের ক্ষেত্রে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ততা অপরিহার্য নয়।

(২) উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, উমরা আরম্ভ করার পরে তা পূর্ণ করার হজ্জ দেয়া হয়েছে। কেননা, নফল আমল গুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(৩) তাছাড়া, শাফেইদের দলীল হিসেবে প্রদত্ত আযাতটি নামিল হয়েছে ৬৭ হিজরীতে। আর এ আযাত দ্বারা হজ্জ ফরম হয়নি, বরং হজ্জ ফরম করা হয়েছে-

যেমন আল্লাহ প্রয়োজন হজ্জ বিষয়ের সিদ্ধান্ত (ال عمران آية ١٧)

আযাত দ্বারা, যা নামিল হয়েছে ৯ম হিজরীতে।

বিভিন্ন দলীলের জবাবঃ হাদিসটি হিসাবে ইবন্সীরীন থেকে এবং ইবন সীরিন যায়েদ থেকে মাওকুফে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদিসটি মাওকুফ হওয়ার কারণে তা দলীলের কথা নয়। (তন্মুখ ২৬ সুর) (৭৭)

বাবের বিধায় তাওয়াকফ করে ফাসাহে বিদায় করে

মহিলা যদি তাওয়াকফ বিদায় পূর্বে তাওয়াকফ করে

... উন্নতী মহিলারা যদি তাওয়াকফ করে ফাসাহে বিদায় করে

রসূল মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ নামী আল্লাহ নামী আল্লাহ নামী

ধ্রুবতাতে মিলন প্রাগায় ফাসাহে ফাসাহে ফাসাহে

তখন তাকে করে তখন তাকে করে তখন তাকে করে

(দ্বিতীয় তথ্য তথ্য তথ্য তথ্য) তখন করা পর্যন্ত আমার মদিনায় ফিরতে পারব না।

তখন তাকে করে, ইয়া হাসন হাসন ইহবাই করে দাস অবদান উদাহরণ তখন তাকে করে,

সম্পূর্ণ করেন। এতদপ্রেক্ষে তিনি বলেন, তবে তো একথাই (আমরা মদিনাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং তার জন্য আর তাওয়াকফ বিদায় প্রয়োজন নেই।)
বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে। কোন হাদিসে এসেছে- 
... আয়াতুল কুরাইশের সন্নিধানে মসজিদের মধ্যে আল্লাহু আলীকে নিয়ে নিয়ে আসেন। তাহলে তারা পাল্লাতে আল্লাহু আলীকে নিয়ে আসেন।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হজ্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।

বিশ্বেষণঃ খাঁড়ুতী মহিলার হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি। হজ্জ পালন করতে গিয়ে কোন মহিলা যদি হ�্জকালীন সময়ে খাঁড়ুতী হয়ে যায়, তাহলে সে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্যসব আহকাম আদায় করবে।
বর্ণনাকরী (ওয়ালাহী ইবন আব্দুর রহমান) বলেন, তখন হারিস (রাঘ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অনুরূপ ফাতওয়া দিয়েছেন।

* উমর (রাঘ) ব্যাপারে অন্য সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মহিলার মসিক আসতে তুর করে, তাহলে তার থেকে বিদায় তাওয়াফ বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। প্রথমদিকে যায়েদ ইবন সাবিত ও ইবন উমর (রাঘ)-এর অভিমত হয়। উমর (রাঘ)-এর অনুরূপই ছিল। পরবর্তীতে তাদের এই মত পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়েছে।

(عدده القاري ج 10 ص 62) 

দলীল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

(২): ... পূর্বের গল্প মনে ভাবেন যেহেতু বিদায়ের সময় বায়াতুল্লাহ থেকে বিদায় নেই।

অর্থাৎ, ... হয়রত ইবন উমর (রাঘ) বলেন, যে বায়াতুল্লাহ শরীফে হজ্জ করবে, সে সব শেষে বায়াতুল্লাহ শরীফের নিকট যাবে। অর্থাৎ বিদায় হজ্জ করবে। তবে ব্যতিক্রম শুধু ঝুঁকোতুরারা। তাদের জন্য নবী করিম (সা) অবকাশ দিয়েছেন। তাদের জন্য ঝুঁকোতুর থেকে পবিত্র হয়ে বিদায়ী তাওয়াফের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

(১): উত্তর হাদীসটি হযরত আরিয়া (রাঘ) থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

(২): আল্লামা খাতাবী (রহ.) হযরত উমর (রাঘ)-এর মতের এই প্রহয়গ ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মতে ঝুঁকোতুরী মহিলা থেকে বিদায়ী তাওয়াফ তখন বাদ পড়ে না, যখন প্রচুর সময় এবং অবকাশ থাকে। অর্থাৎ, যদি তার জন্য অবস্থান করা সম্ভব হয়, তাহলে অবস্থান করা জরুরী হবে। কিন্তু যদি সময়ের সংকীর্ণতা ও সফরের তাড়া থাকে, তাহলে এমনতাবস্থায় তাঁর মতেও আরিয়া (রাঘ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা হবে।

(معلم السنة للخطاب ج 29 ص 450)

তাওয়াকে যিয়ারের পূর্বে যদি কোন মহিলার মসিক আসতে শুরু হয়, তাহলে এর হুকুম: পূর্বের হুকুমে এমন মহিলাকে তাওয়াকে যিয়ারের হতে বিরত থেকে পবিত্রতার অপেক্ষা করতে হবে। পবিত হওয়ার পর তাওয়াকে যিয়ারের আবশ্যক হবে। এ ব্যাপারে সমত ইমাম একমত পোষণ করেন।

(المغني ج 300 ص 444)
বর্তমান হৃদয়ঃ বর্তমান আধুনিক যুগে যেখানে হাজারের যাতায়াত, অবস্থানের তারিখ এবং সময় সুনিদিষ্ট হয়ে থাকে এবং ভিসার সীমিত তারিখ থাকে। কোন হাজারের জন্য সেবা তারিখ ও সময় পরিবর্তনের বিষয়গুলো থাকে না এবং আইনের দৃষ্টিতে তার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় হাজেয় ও নিফাস বিষয়টি মহিলা বীয় পরিবর্তনকালে তাওয়াফ ঘটিয়া যায়। হাজারের যাতায়াত পরিবর্তনের বিষয়টি তালিকায় পরিলে সে কিছু করে।

তবে, যদি পরিতৃত হওয়া ও তাওয়াফ করা পর্যায় মহিলার জন্য মক্কায় অবস্থান করা সম্ভব হয়, তবে তাওয়াফ তার জন্য নিকটস্থে ও চালিয়ে হবে।

(ফতুহ ইবন তামিম ৩২6-৩৪৪)
(দৃষ তরাদতি ৩৫০)

প্রাকৃতিক নাম ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগুয়া ধর্মে ছিলেন নাগু�
তাঁকে পূর্বে-পরে (হজ্জের কাজ) করা সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হয় তার জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখন কর এবং এতে কোন দোষ নেই।

বিশেষ৷ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইয়াওমুন নহর বা ঘিরছাড়ের ১০ তারিখে হাজারগণ চারটি কাজ করে থাকেন। যথা-

১. কংকর নিক্ষেপ করা

২. কুরবানী করা

৩. মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করা

৪. তাওয়াফে বিয়ারত করা।

(মসলমন ১৫ আহমেদ ৩২৪-২২, বাড়ালা মজহুব ১২ চতুর্থ, প্রথম ভাগ ২৫৭)

প্রশ্ন হল, উপরের বিবর্ধিত চারটি কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক কিনা। এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* লালমান মালিক, মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) ও আহমেদ সাহেব (রহ.) সহ জমহুর ফকরী সাহাবী ও আলিমদের মতে, এগুলোর মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব, ওয়াজিব নয়।

তাই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হলে দম (পশ্চিম কুরবানী) দিতে হবে না।

(মফিলে জ ২৫ সি ২৪৬-২৪৮, উপরের প্রথম ভাগ ৪)

ঢালীল (১) পূর্বে বিবর্ধিত হাদিস।

ঢালীল (২) ইবন আকাসা (রা) হতে বর্ণিত-

... ফসাহা জর্জু ফুলাল এরা উল্লেখ করেন যে, ফলে অনই ফলে ওটু পর হ্রাঁ মুক্ত হলে (বৃহদ ১ চতুর্থ, প্রথম ভাগ ২৫১

বাবু ভাল নবী, নবী ২৩৪ পাবা আতা রহ. বৃহদ ১ চতুর্থ, প্রথম ভাগ ২৫২, লুমাদ ১

চতুর্থ, যুগো মাঝে ২৫২)

অর্থাত, ... জনৈক ব্যক্তি নবী করিম (সা) কে জিজ্ঞাসা করে, অমি কুরবানীর পূর্বে মহৎ মুক্ত করেছি। (এক তাবু কি করব?) জাবাবে তিনি বলেন, তুমি কুরবানী (এখন) কর। এতে করা দোষ নেই।

উপরের বিবর্ধিত হাদিসগুলো নবী করিম (সা) তথা “এতে করা দোষ নেই” বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয়, নতুন তিনি (সা) দেয়া কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এগুলোর মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। তাই এই ধারাবাহিকতা ইচ্ছাকৃত বা চুলে অথবা না জেনে তাকে করে ফেলতে দম দেয়া ওয়াজিব। ইবরাহীম নাথ্যর অভিমত ও তাই।

(মফিলে সি ২৫ সি ২৪৬-২৪৮, উপরের প্রথম ভাগ ৪)
খ্যাত অধ্যায়

(ফতুহ আল কুরান 3:146)

কবরের মধ্যে নামায

(ফতুহ আল কুরান 3:147)
দলীল (১/৪) আল্লাহ তাআলার বাণী-

ফোলা এবং মসজিদের সূর্য ও মাহিদৃষ্টি কোন জ্বলন্ত সূর্যের মতো দেখা যায়।

দলীল (২/৪) অর্থাৎ, ... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ) যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেব-দেবী বিদ্যমান ছিল। ... ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এর প্রতিটি কোণায় তাকীম (আল্লাহু আকবার) উদ্ধারণ করেন এবং এর প্রতিটি রুপকথা ছিল।

অর্থাৎ, ... (স্যাঃ) ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ) যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন। কেননা সেখানে তখন অসংখ্য দেব-দেবী বিদ্যমান ছিল। ... ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং এর প্রতিটি কোণায় তাকীম (আল্লাহু আকবার) উদ্ধারণ করেন এবং এর প্রতিটি রুপকথা ছিল।

অতঃপর তিনি সেখানে নামায় আদায় না করে বের হয়ে আসেন।
দলীল (৩) ইবন আকরাস (রাঘ) বলেন—

"আহ্মেদের আসামায় বাড়ানো না দেখলেন আল্লাহ তাঁহাকে নিজের সন্তানের মধ্যে। বলতেন যে এই মানুষের হাতে পড়বে অন্যান্য হাতে পড়বে না।" (সলততে জী চুত ১২৯)

ওরুৎ, আমাকে ইবন আকরাস (রাঘ) বলেন যে, নবী করিম (সাং) যখন তাঁদের শীলে উপাসনা করতে পারেন না তখন তাকে সবধিকে নিয়ে যাতে না দায়িত্ব দেওয়া হয়। বের হওয়া পর্যন্ত তার নামায় পড়েন।

* ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে, কবার শরীরে নফস নামায পড়া জায়ে আছে।
  কিন্তু ফরয নামায পড়া কর্মরহ। (ফত্তাবাদের জী চুত ১২৩)
  কেননা, নবী করিম (সাং) হতে ইহাই প্রমাণিত আছে যে, তিনি কবারগুলো নফস নামায পড়েছেন। ফরয নামায পড়েন।

* ইমাম আবু হানিফা, শফেই (রহ.) সহ জমহুরের মতে, কবারগুলো ফরয এবং নফস উভয় প্রকার নামায আদায় করা জায়ে আছে। (ফত্তাবাদের জী চুত ১২২)

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

"কেঁদিয়ে নিনু যেন কর্মাহন না চাওন কাল কোনো কুমার বা কৃষ্ণ, কিছু স্বপ্ন কর্মাহন না করো কাল ক্ষিপ্তে কুমার কর্মাহন না করো কাল ক্ষিপ্তে। প্রত্যেক কাল ক্ষিপ্তে কুমার কর্মাহন না করো কাল ক্ষিপ্তে।" (আব্দুল জব্বার)

ওরুৎ, আবু রহমান ইবন সাফওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন আকরাস (রাঘ) হতে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাং) কবার মধ্যে প্রবেশ করে কি করেন? তখন তাকে তাঁর বলেন, তিনি সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

দলীল (৩) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

"... মুল্লাল আন্ত প্পী তালি আল্লাহ গুরু রং সং দু জী জী।" (নবী করিম)

ওরুৎ, ... হযরত বিলাল (রাঘ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাং) কবার অভাবে নামায পড়েন।

উপরের সিদ্ধান্তটি হাদিসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করিম (সাং) হযরতে কবার নামায পড়েন, তাই কবার ভিতরে যেকোন নামায আদায় করা হবে না।

জব্বার: হযরত ইবন আকরাস (রাঘ) হযরতে প্রিয় কবার শরীফ নামায়ীর সামনে থাকার জন্য যুক্তি পেশ করেছেন, এর জব্বারে জমহুরগণ বলেন যে, নামায শরীফ

(টেক্সট স্ক্রিপ্ট)
হওয়ার জন্য পুরো কাব্য সামনে থাকা শুরু নয়; বরং কতক অংশ সামনে থাকাই যথেষ্ট। যা বেলায় (রাশ)-এর বর্তিত হাদীস থেকে প্রমাণ মিলে যে, বয়ং নবী করিম (সাহ)- কাব্য শরীফের ভিতরে নামায় পড়েছেন। সুতরাং পুরো কাব্য নবী করিম (সাহ)-এর সামনেও ছিল না। (তন্ত্রে সােমন ১ সর্কি১)।

তাহাতে আলাহা মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, যদিও আসল কিন্তু বায়তুলহ তথা কাব্য; কিন্তু কাব্য দিকে মুখ করা সেখান থেকেই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। তাই দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বুঝা কাব্য দিকে মুখ করে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও স্থলের মাধ্যমে নির্ভুল দিক নির্ধারণ করে নামায পড়া আদে সম্ভব নয়। তাই আলাহা তায়লা পরিস্কার কুরআনের আযাতে কাব্য কথা উল্লেখ না করে 'মসজিদুল হারাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ (দিক)-এর পরিবর্তে বিভিন্ন উল্লেখ থাকায় কিন্তু কাব্য মুখ করা ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে গেছে।

* হযরত আদুলখাত ইবন আব্দা সাহ (রাশ)-এর হাদীস থেকে একথা বুঝা যায় যে, নবী করিম (সাহ) কাব্য নামায পড়েননি, বরং শুধুমাত্র তাকবির বলেছেন। পক্ষান্তরে বিলাল (রাশ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বয়ং নবী করিম (সাহ) তথা নামায আদায় করেছেন। আর বিলাল (রাশ)-এর বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে গিয়ে জমঘুরণ বেশ কিছু যুক্তি ও বাস্তব প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. নবী করিম (সাহ) কাব্য শরীফের মোট দুইবার প্রেরণ করেন, একবার নামায আদায় করেন এবং দ্বিতীয়বার নামায আদায করেননি। আর ইবন আব্দাস (রাশ) দ্বিতীয় অবস্থাটির বর্ণনা করেছেন। (মুতার সাহী ২ সর্কি৩)

২. বিলাল (রাশ)-এর হাদীসটি হল ইব্ব-বোধক এবং ইবন আব্দা সাহ (রাশ)-এর হাদীসটি হল না-বোধক। আর নিয়ম অনুযায়ী বিলাল (রাশ)-এর ইব্ব-বোধক হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করেন।
৩. অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ধিত হাদিস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, কাবায় প্রবেশকালে নবী করীম (সাহ) এর সাথে তিনজনের একজন হলেন বিলাল (রাহ)। সেখানে ইবন আকাব (রাহ) উপস্থিত ছিলেন না।

* তৃতীয় দলীলের জন্যে জময়দুংগ বলেন-
   (১) কাবা থেকে প্রবেশের পর তাঁরা পৃথক হয়ে যান। আর এ সময় নবী করীম (সাহ) এর সাথে বিলাল (রাহ) এক কোণে থাকেন। এ সময় কাবার দরজাও বন্ধ করে দেয়া হয়। বুধবারীতে উল্লেখ আছে—

   (২) কেউ কেউ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (সাহ) কাবার ভিতরের দেয়ালে অতিক্রম হবে উঠিয়ে ফেলার জন্য হয়ত উসমান ইবন যায়েদকে পানি আনতে পাঠান। আর এই ফাকে নবী করীম (সাহ) দুই রাকাত নামায় আদায় করে নেন। যার ফলে নবী করীম (সাহ) এর নামায়ের ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন না।

   (৩) সর্বোপরি বলা যায় যে, হয়ত বিলাল (রাহ) শুধু নবী করীম (সাহ) এর নামায়ের বর্ণনাই দেননি; বরং হয়ত ইবন উমর এর প্রশ্নের জবাবে তিনি নবী করীম (সাহ) এর নামায়ের পূর্ণ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। যা অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ধিত হাদিসে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

* মালিকগণ কাবায় ফরয় নামায় পড়ার ক্ষেত্রে যে মাকরহ বলেছেন, এর জবাবে জময়দুংগ বলেন যে, কাবায় (যেকোন) নামায় পড়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্তরপত্ত হওয়ার মূল কারণ এই যে, এতে কাবার কিছু অংশ নামায়ির পিছনে থাকে। অথচ নবী করীম (সাহ) স্বয়ং আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইহা নামায় জায়েমের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। যখন একথা সাধারণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কাবারুগে নামায় পড়া বৈধ, তুরান্বিত ফরয় নামায় কাবারুগে কেন জায়েজ হবে না? এবং মাকরহই বা হবে কেন? নাজায়েজ হওয়ার জন্য তো সুনিশ্চিত কোন দলীল পাওয়া যায় না। অথচ এ ব্যাপারে মালিকগণ দলীল প্রদান করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তুরান্বিত ফরয় এবং নফলের মধ্যে মনগড়া কোন বৈষম্য করা যাবে না। কেননা, ফরয় ও নফল নামায়ের হুকুম পবিত্রতা ও কিবলার ক্ষেত্রে অভিম। (যদি তুরস্ক ৫৭৩ সু)
মদীনায় আগমন

... অ্বি হোমা বা তাহীদের নিয়ন্ত্রণে ইসলামী সৌভাগ্য ও মসজিদ হারম ও মসজিদ আল-কাসির (সাল্ফ) ১-২৭ বা মসজিদিতে তাদের বিশালতা ও পুষ্টির জন্য সফর করে না। মসজিদিতে হারম, আমার এ মসজিদ নবী (সাল্ফ) এবং মসজিদিতে আকাশ।

কবর যিহারত

... রবীলা ইব্নে হুরায়ার বা বনু থানিব বাবুন মুহাম্মদ তার সাহায্য একটি হাদিস ব্যতীত আর কোন হাদিস নেই কিন্তু তখন তার মতে তিনি বলেন, সেটি কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, একদা আমার হাদিস এর সাথে শহীদদের কবর যিহারতের উদ্দেশ্য বের হই। অতঃপর আমরা যখন 'হুরায়ার ওয়ায়াকিম' নামক সাহায্যে উপনিবে হই, তখন সেখানে অবতরণ করি, যেখানে তাদের কবর ছিল।

বিল্পেশ্বর কবর যিহারত জায়েহ কিনা, এ নিয়ে ফকীহগণের নিকট মতানীক রয়েছে।

* উপরাল্পরীখিত হযরত আবু হুরায়ার (রাজ)-এর হাদিসের আলোকে আল্লামা ইবন তামিয়া, শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-জাদরী, কাজী হুসেইন ও ইয়াহ (রহ.)-এর মতে, হাদিসে বর্ণিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সফর করে।
তবে কেউ যদি মসজিদের নববীর নিয়ে সফর করে, তাহলে নবী করিম (সাহ.)-এর কবর যিয়ারত করা জায়েয় আছে।

(নরমিলের অংশটির প্রারম্ভ; ১২২, মজুম হোসেনের ১৩১৫, সুতোর তথ্যে, ২ সেপ্টেম্বর, ১১১১)

দলীলঃ অনেকেদের হুততে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসের রওজা মুমিনকের কথা উল্লেখ নেই। তাঁরা আরো বলেন যে, যেহেতু হাদিসের হজ্জ বায়তুল (ব্যতিরেকে হব) নির্দেশ নেই, তাঁরা তাঁদের একটি চর্চা করে এবং সুতোর এর একটি হব ব্যতিরেকে নির্দেশ নেই।

সুতোর মূল বেকার হব নিয়ম-র অধীনে, তরুণ তাঁর মসজিদের ব্যতিরেকে কঠোর গোষ্ঠীর জন্য সফর করবে না।

সুতোর কারো কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয় নয়। এমনকি নবী করিম (সাহ.)-এর রওজার উদেশ্যেও নয়।

* ইবন হযম (রহ.)-এর মতে, পুরুষদের জন্য সফর জীবনে একবার হলেও যিয়ারত করা ওয়াজিব।

(ফতুহ বাদী গল ১১৮, ১৩১৫, নরমিলের অংশটির প্রারম্ভ; ১৩১১)

দলীলঃ

... নন বৃষ্টিতে আহে ইলাহু আল্লাহু নামুন কোন প্রশ্ন তেরুতুম। মুল বায়তুল হুতে কবর যিয়ারত।

(তরুণ তরুণত কঠোর গোষ্ঠীর জন্য সফর করবে না। তরুণ তরুণত কঠোর গোষ্ঠীর জন্য সফর করবে না।

সুতোর মূল বেকার হব নিয়ম-র অধীনে, তরুণ তাঁর মসজিদের ব্যতিরেকে কঠোর গোষ্ঠীর জন্য সফর করবে না।

সুতোর কারো কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয় নয়। এমনকি নবী করিম (সাহ.)-এর রওজার উদেশ্যেও নয়।

* ইবন হযম (রহ.)-এর মতে, পুরুষদের জন্য সফর জীবনে একবার হলেও যিয়ারত করা ওয়াজিব।

(ফতুহ বাদী গল ১১৮, ১৩১৫, নরমিলের অংশটির প্রারম্ভ; ১৩১১)

দলীলঃ

... হা কবর বর্ণিত। নবী করিম (সাহ.) এর মতে, আমি তাঁদেরকে কবর যিয়ারত করার নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মদকে তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব, তাঁদের কবর যিয়ারত কর। কারণ, প্রথম আয়াতটিকে সুরু করিয়ে দেয়।

উক্ত হাদিসের কবর যিয়ারত করার জন্য সর্পিলের (আমর) ব্যবহার সর্পিলের। আর আমর আসে ওয়াজিবের জন্য।

(নীল মোটপার ৪ কল. ১১০-১১৭)

* সংখ্যায়রক্তি আলিমদের একমাত্র রয়েছে যে, পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত মাসনূন ও মুহাম্মদ, তবে ওয়াজিব নয়। এবং নবী করিম (সাহ.)-এর কবর যিয়ারত করা অনেক ফযুলতের কাজ।

(শরহ নোয়ারী গল ১১৪, ১৩১৪, ফন্দায় চামী গল ১৩৪)
ণ্ডে আবির্ব আল্লাহ তালায় সালাম কাল মন্ত্র অফার কায় বেদ মোটো কৃষ্ণ (১)।

লামে ফারিজী ধারে হামার হাদিস কন আরামে মোটো কান ফাল জোন্য গুমম (২)

অর্থাৎ, ইবন উমর (রাহ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, আমার ইসলামের পর যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করত আমার কবর যিয়ায়ার্দ করল, সে যেন আমার জীবনদায়া যায় আমার যিয়ায়ার্দ করল।

লামে আলে তালায় সালাম কাল মন্ত্র অফার কায় বেদ মোটো কৃষ্ণ (২)

লামে আলে তালায় সালাম কাল মন্ত্র অফার কায় বেদ মোটো কৃষ্ণ (২)

অর্থাৎ, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার (রওজ) যিয়ায়ার্দ করল, সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিষ্ঠা হবে।

লামে (৩) নবী করিম (সা) ইরশাদ করেন-

মন আরামে মোটো কান ফাল জোন্য গুমম (৩)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ায়ার্দ করল, তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে গেল।

অন্যান্য কবর যিয়ায়ার্দ বৈদ্যতার লামে-

(১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েত রাবিতা অর্থ ইবন আল-হাদায়ের হাদিস।
(২) ইবন হায়ম (রাই) এর অভিমতের পক্ষে প্রদত্ত হাদিস। ইবন হাদিস দ্বারা বুক্রা যায়, ইসলামের প্রথম দিকে যরখ লক্ষনের আকীরা পরিপক্ষ ছিল না, তখন নবী করিম (সা) কবর যিয়ায়ার্দ করত নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন ধর্মবিশ্বাস পরিপক্ষ হল, তখন কবর যিয়ায়ার্দের অনুমোদন দিয়েছেন।

(৩) আন তুহী সুলাহ আল্লাহ তালায় সালাম কাল যতি ফাল জোন্য পাহারে ওঁর দেহপ্রার্থ পাচ প্রান প্রাপ্ত রাসো কুল (৪)

অর্থাৎ, নবী করিম (সা) উহাদায়ে উহুদের কবর প্রতি বছরের শুরু বা শেষে উপস্থিত হতেন।

জবাবে ইবন তাইমিয়াহ ও অন্যান্যদের লামে হিসেবে পশ্চিমে হাদিসের জবাবে জমানুরগ বলেন যে, আলে ইবন হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্থুতি তিনটি মসজিদের ফয়েলত বর্ণনা করা। সুতরাং উক্ত হাদিসে কে বাপিকাতে শ্রদ্ধা দ্বারা বায়া করা নেয় এবং মুহকুমত নেয়। কেননা তখন এর অর্থ
দাঁড়ায়, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যেমন, ইলম অনুষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, হালাল মাল উপার্জন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা জায়ের নয়। অথচ একথা কেউ মনে নেবে না। বরং এগুলো করা হালাল এবং সওয়াবের কাজ।

সুতরাং কে এভাবে ব্যাপক না মনে মসজিদ (মসজিদ) শব্দ দ্বারা খাস মানা অধিক যুক্তির যুক্তি। যা উক্ত হাদীসের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তখন মূল বাক্যটি হবে- 

লা-কিন্তু রহালে মসজিদে এলা তরে মসজিদে (دروص ترمدي ج 102 ص)

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ব্যতীত তোমরা অন্য কোন মসজিদে গমনের জন্য সফর করবে না।

* তাহাড়া উপরের বিষয়টি স্পষ্টভাবে হাদীসেই বর্ণিত আছে-

লা-যাত্রী তরে মসজিদে এলা তরে মসজিদে (سند أحمد)

অর্থাৎ, কোন সাওয়ারিয়ার অধিকারীর জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকস ও আমার এই মসজিদ তথা মসজিদে নবী ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে নামাজের জন্য সফর করা সমীচিত নয়।

সুতরাং, আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, নবী করিম (সাহেব) ও আউলিয়াদের কবর যিহারত করা জায়ের এবং সওয়াবের কাজ।

* ইবন হায়মের দলীলের জবাবে আলিমগণ বলেন যে, হাদীসে যদিও কবর যিহারতের জন্য আমরের সীমা ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু উসুল হল- নিষেধের পর যখন কোন আমর আনা হয়, তখন তা ওয়াজিবের জন্য আসে না; বরং তখন ইহা আসে বৈধতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ পূর্বে কবর যিহারত নিষেধ ছিল, পরবর্তীতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

(তন্মেধ- ইকানী 149 ص)

প্রাসঙ্গিক আলোচনার মহিলাদের জন্য কবর যিহারত জায়ের কিনা, এ নিয়ে ফকীহদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

* কতক আলোচনার মতে, মহিলাদের জন্য কবর যিহারত নাজাজের তথা মাকরহ।

(শরহ মেহদি 507 ص)

দলীলঃ

... উমের আশা তাঁরা ইসলামের উপরে উসম্বার এবং যাত্রার জন্য তাঁর যুগের (الغُنْفُور) জুরায়িরা (রাষ্ট্রীয়) হয়ে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাহেব) বেশি বেশি কবর যিহারতকারীদের প্রতি অভিমন্যু করেছেন।
* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, যদি ফেতনার আরো না থাকে, ধৈর্যশত্রু খুব বেশি হয় এবং কবরের পার্শ্বে কাল্পনিক এবং বিলাপ শুরু করার আরো না থাকে, এমন মহিলার জন্য কবর যিতার করা জায়ের হয়ে।

(মুহাম্মদ জী চূর ১২০ সং, আলেমের সমুদ্র জী চূর ০২৬-০২২, মসোলাজ ২৪ ৫০৫, পাঁজা উল্লম্ব রুয়) ৫০ ৫০

দলীল (১): হযরত বুরাইদা (রা.)-এর হাদিস। (হাদিসটি উক্ত অবস্থায় ইবন হাবাবের দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।) তাতে নিষেধের পর ফরুজেরা তথ্য তাঁরা কবর যিতার করা নিষয়ের দেয়া হয়েছে। যা নারী-পুরুষকে অন্তর্জীবন করে।

কারণ মহিলারা সমস্ত আহকামে পুরুষদের অধীন হয়।

দলীল (২): হযরত আরিশা (রা.) নবী করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন:

কীভাবে আতীত হয়েছে যে রসূল তাঁর লোক? (তৃষ্ণিই এটি যার ফলাফল)

অর্থাৎ, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি তাঁর কিভাবে বলো? (অর্থাৎ, যখন মহিলারা কবর যিতার করে।) উত্তরে নবী করিম (সা.) বললেন, তুমি বল -

সালাম উল্লাহ আলাহু আলামু উস্তাদুল্লাহ এন ইন চাঁদাল উল্লাহ পিকক ফরাহিন- (সালম জী চূর ১২০)

অর্থাৎ, কবরবাণী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তাঁর আমাদের মধ্যে থেকে অগ্রগামী ও পশ্চাতগামী সবার প্রতি দায় করে। আমরাও ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব।

দলীল (৩): মহিলাদের জন্য কবর যিতার জায়ের হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হল, আত-তামহীদে আম্মুর্লাহ ইবন আবু মুলাইকা (রহ.)-এর রোগাস্তে- হযরত আরিশা (রা.) একদিন কবরহ্মান থেকে বিদায়ে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, উল্লম্ব মুমিনান! আপনি কোথায় এলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা তাঁর আরো মহিলার কবর থেকে। আমি তাঁকে বললাম, রাসুলুল্লাহ (সা.) কি কবর যিতার করে, নিষয় করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রথমে কবর যিতার করতে নিষয় করতেন, অতঃপর কবর যিতার করার অনুমতি দিয়েছেন।

(ঐদায়ের জী ৫২ চূর) তাহাঁতা মহিলাদের জন্য যে কবর যিতার জায়ের, এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদিস রয়েছে।

জবাব (১): অভিসমাতের হাদিসটি ছিল নবী করিম (সা.) কর্তৃক কবর যিতারের অনুমতি প্রদানের পূর্বকার। যখন তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তখন এটা নারী এবং পুরুষ সবাই অন্তর্জীবন হয়ে গেছে।
(২) কুরতুলী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসে মূলত ঐ সকল মহিলাদের উপর
অভিসম্পাত করা হয়েছে, যে খুব বেশি বেশি কবর যিয়ারত করে। কেননা, এর দ্বারা
অনেকাংশে ব্যাখ্যা হল নয় এবং বাধাহীনভাবে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে
থাকে।

সত্কীকরণঃ আলামা আনোয়ার শাহ কাশিরী (রহ.) বলেন, অবস্থার পরিবর্তনে
বর্তমানে কুকুম পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ, যদি মহিলাদের থেকে বেশি অস্থিরতা অথবা
বেপর্দেশী, পুরুষের সাথে মেলামেশা অথবা বিদায়ের লিপ্ত বা অন্য কোন ফিতনার
আশঙ্কা হয়, তবে নিষেধই প্রাধান্য পাবে।

(العرف الشذى ج ١ص ٢٠٤)

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ফিতনার যুগে আউলিয়াদের মাযারে গিয়ে মানুষ বহু
গহিত, বিদায়ী এবং প্রচলিত বিভিন্ন কুকুরপ্রামূলক এমন এমন শিরকী কাজ করে যা
কুফরীর সমন্বয়। তাই তাদের কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা জায়েষ্ঠ নয়।

(فتاوى رشيدية ج ٢٣ص ৩২)
বিবাহ অধ্যায়

বিরুদ্ধে কাতরতা

২৭৯ সংখ্যার নিবন্ধের উৎসাহ গ্রহণ

... উল্লেখিত যে কোনো একটি রাজত্বকালের অধিকারী রাজা, জাহাঙ্গির নামক মহান রাজা, তিনি তার দীর্ঘকাল ধরে সরাসরি নির্দেশনা দিতেন এই আলোচনায়।

বিশ্লেষণ:
- এর অভিধানিক অর্থ: রক্ষণ শব্দটি মূল ধাতু হতে নিঃস্বত, ইহাবাবে বিবেচিত হয়।
- এর মাসদার: এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে।
2. এক্ত্রিকরণ

3. সহবাস করা। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

চিত্তি তোমাদের ফলে তোমরা তোমাদের মধ্যে বাধাদিয়ে করবে তোমাদের মধ্যে। এই কথা তোমাদের মধ্যে ধরে রাখবে তোমাদের মধ্যে।

অর্থাৎ, তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে (সহবাস) করে না নেবে, তার জন্য হলাল নয়। (বাকরাও ২৩০)

4. বন্ধন। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

যদি তোমরা তাদের ব্যাক্তিগত অর্থ দিতে পারে, তবে তাদেরকে বাণী দিতে পারে।

অর্থাৎ, তবে যেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে বাণী দিতে পারে তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নাও, দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। (নিসাও ৩)

5. ভাল-মদ্দে বিচারের জন্য। যেমন, আল্লাহর বাণী-

যদি তোমরা তাদের ব্যাক্তিগত অর্থ দিতে পারে, তবে তাদেরকে বাণী দিতে পারে।

অর্থাৎ, তবে যেসব মেয়েদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা ভাল-মদ্দে বুঝতে পারে। (নিসাও ৬)

মতপার্থক্য: ইমাম আবু হানিফা ও শাফেক (রহ.)-এর মাঝে নিকাহ শব্দটির হাফিজী ও মুজাজি (রূপক) অর্থ নিয়ে কিছুটা মতবাদ রয়েছে।

* ইমাম শাফেক (রহ.)-এর মতে, নিকাহ হল অর্থ হল বা বন্ধন, আর হাফিজী ও মুজাজি অর্থ হল বা সহবাস।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, নিকাহ হল অর্থ হল বা সহবাস এবং বন্ধন অর্থ হল বা বন্ধন।

* আবার, কেউ কেউ শব্দটিকে মুখোর্ত (মুতরক) অর্থবোধক বলেছেন।

(নাবির মুসলিমন সাহেব বলেছেন: ইমাম আবু হানিফা মুতরক শব্দের মূল অর্থ হল হল ৭১৬, বাইর রাজার চৌরাই ছয় সংস্করণ হিসেবে, বিলক্ষণ ১০ সূত্র ৩-৪)

নিকাহ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা:

1. শরহে বেকায়া প্রণেতার ভাষায়- নিকাহ হল মুসলিম রাষ্ট্রের একটি নিয়ম।
অর্থাৎ, যেৰূপে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘটিত বন্ধনকে বিবাহ বলা হয়।

২। তাকাহ হুয়ু আশুতোষিয়া ইন্দিরা সাহেব
অর্থাৎ, নিকাহ হল বিবাহ বন্ধন।

৩। হুয়ু আশুতোষিয়া ইন্দিরা সাহেব
অর্থাৎ, বিবাহ হল এমন একটি বন্ধন, যা সেচ্ছায় মহিলার উপভোগের মালিক হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে।

৪। আলামা শাওকানী বাণী
অর্থাৎ, বিবাহ হল স্বামী-স্ত্রীর এমন এক বন্ধন, যার দ্বারা সহবাস বৈধ হয়।

৫। কর্তিপা উলামা বাণী

dলিওল (১) আলামা তাআলার বাণী- (ঈদে আয়াত ৩)
dলিওল (২) আলামা তাআলার বাণী- (ঈদে আয়াত ৩)
dলিওল (৩) আলামা তাআলার বাণী- (ঈদে আয়াত ৩)

ফাতিহাতু মাতুল কুরআন
dলিওল (১) আলামা তাআলার বাণী- (ঈদে আয়াত ৩)
dলিওল (২) আলামা তাআলার বাণী- (ঈদে আয়াত ৩)
dলিওল (৩) আলামা তাআলার বাণী- (ঈদে আয়াত ৩)

বিবাহের হিকুম নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে- * আহলে যাওয়াহের মতে, বিবাহ ফরয়ে আইন। যে ব্যক্তি মহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্তেও বিবাহ করবে না, সে জনাহাগার হবে।

অর্থাৎ, ... মাতুল কুরআন (রাও) হতে বর্ণিত। ... নবি করীম (সাও) বলেন, "তামরা বিয়ে করো এমন স্ত্রীলোকদের, যারা স্বামীদের অধিক মহরত করে এবং অধিক সম্মান প্রসব করে। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিকের কারণে (পূর্বতন উল্লম্বদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

কর্তিপা উলামা বাণী
উপরোলিখিত আযাত ও হাদিসগুলোর ব্যবহার হয়েছে। আর উসুলের কায়দা হচ্ছে - অর্থাৎ, আমর অল্লাহর নামে ওয়াজিবের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং বিবাহ করা নামায-রোধ নয় ফরে আইন।

(নীলের অশনিক চ ২ সংখ্যা ১৬৪)

* ইমাম শাফেইঈ (রহ.)-এর মতে, অন্ন সোরান তথা আজ্ঞাসংযুক্তের ক্ষমতা থাকা অবশ্যায় বিয়ে করার চেয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া উত্তম। তাঁর মতে, বিবাহ কোন ইবাদতের কাজ নয়; বরং ক্রয়-বিক্রয়ের নয় বিবাহ একটি মুবাহ (অনুমোদিত) বিষয়।

(ফজর বাবর জ ৯ সংখ্যা ৫০৪)

এমতাবস্থায়- অর্থাৎ বিবাহের চেয়ে নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকা উত্তম।

দৈনিক (১) আল্লাহ তাআলার বাণী- দুই হাজার অর্থাৎ, এদেরকে (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে।

(নিসাঃ ২৪)

উত্ত আযাতে বিবাহ হালাল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে। আর হালাল এবং মুবহ সম পর্যায়ের শব্দ।

সুতরাং ইহা ক্রয়-বিক্রয়ের মত একটি হালাল বিষয়। বলারাবুল্লা, ক্রয়-বিক্রয়ের চেয়ে নির্জনে নফল ইবাদত করা উত্তম।

দৈনিক (২) আল্লাহ তাআলাহ হযরত ইয়াহীওয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন-

- অর্থাৎ, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শ যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (ইমরানঃ ৩৯)

উত্ত ইয়াহীওয়া আল্লাহ তাআলা বিয়ে না করার কারণে ইয়াহীওয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন।

* বাদায়ে গ্রহকার বলেন, জমুনুর উল্লামাপ্রে কিরামের মতে, যদি যৌন ক্ষুদ্র তীব্রতার ফলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং শ্রীর মোহন ও ভরণ-পোষণ দানের ক্ষমতা থাকে, তবে বিবাহ করা ওয়াজিব। অন্যথায় সে শুনাহার হবে।

(ঈদাঁক সন্তানে ২ সংখ্যা ২৮৬)

* আল্লাহমা ইমাম কারী-এর মতে বিবাহ করা মুক্তাহাব।
* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ব্যক্তির অবহানুসারে বিয়ের হুকুম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) যদি যৌন উত্তেজনা খুব বেশি হয় যে, বিয়ে না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং মহর ও ভরণ-পোষণ প্রদানে কমতাবান হয়, তাহলে বিয়ে করা ফরয়। কেননা, রাসুল (সাভ) ইরশাদ করেন–

মনে অস্তু মুক্তি মন্তু ত্যে করে ভূত্ত না মুক্তি মন্তু ত্যে করে ভূত্ত

(অনুচ্ছেদের শুরুতে পূর্ণ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে)

তবে এ অবস্থায় অর্থ-সামর্থ্য না থাকলে রোয়া রাখবে। যেমন, নবী করিম (সাভ)

فَعَلَّهُ بِصُمَّةٍ قَالَهُ، وَجَاءَهُ

(খ) যেন পিপাসা তীব্রতর হলে এবং সংমিশ্রণ ক্ষমতা ক্ষীণ হলে বিয়ে করা ওয়াজিব।

(গ) যেন ক্ষমতা না থাকলে বিয়ে করা হারাম।

(ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থত-বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে এবং বিবাহের পর ত্রীর মহর, ভরণ-পোষণ এবং সহসাস করতে সক্ষম হলে ও ত্রীর উপর যুক্ত-নির্যাতনের আশঙ্কা না থাকলে বিয়ে করা সুন্দর এবং নফল ইবাদতের জন্য নির্জনতার চেয়ে বিয়ে করা উত্তম ও সওয়াজের কাজ।

(فَقْحِ الْبَابِيِّ ج ۸۹(ص ١٠٩، عمَّدة الفارِج ۲۰ ص ۲۷۶، فَقْحِ الْفَيْجِرِ ۳ ص ۱۰۱، دِعَاءُ الصَّلَالِحِ ۲ ص ۳۸۸)

دলিল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী–

وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ آذارَ حَا وَذُرُّةً–

অর্থত্ব, আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্রী ও সম্ভান-সজ্জিত দিয়েছি। (রাদঃ ৩৮)

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিকাংশ নবী-রাসুল বিবাহের উপর আমল করেছেন। যদি বিবাহ না করাই উত্তম হত, তাহলে তারা বিবাহ করতেন না।

دলিল (২): সর্বত্রে বড় দলিল হল, যখন নবী করিম (সাভ) নিজেই বিবাহ করেছিলেন এবং অন্যান্য বিবাহ করার জন্য ব্যাপক উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং বিয়ে যদি উত্তম না হত তাহলে তিনি আজিজের বিয়ে না করে নির্জনে ইবাদত করেই কাটিয়ে দিতেন।

دلیل (۳): হয়তো আবু আইবু আন্সারী (رَاح) হতে বর্ণিত হাদিস–

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَرْجِعُ مَنْ سَتَّنَى الْمَرْسَلِينَ الْحَيَاةَ وَالْقَتْرُ

وَالسَّوَاكُ وَالنَّكَاحُ (التليمخاء الحبرالج /ص ۱۶)

অর্থত্ব, ... রাসূলুল্লাহ সাভ) ইরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলগণের সৃষ্টি বা আদর্শ। লজ্জা, আত্মা বা সুগঢ় ব্যবহার, মিসওয়াক ও বিয়ে।
দলীল (৪) হযরত আবিশা (রা) হতে বর্ণিত হাদিস -

... প্রাচীন রসূল আল্লাহ তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনার মাধ্যমে মোস্তানী, ফলস্বরূপ তাঁর প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে যা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
(তথা রূপান্তরলীগত হয়ে ফলস্বরূপ তাঁর প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে যা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
অন্যদিকে তাঁর প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে যা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
তজ্জীব ইকবাল, পুস্তক জয় ২-৫৭, ৭৫-৮৫ তরফে নির্দেশনার মাধ্যমে মোস্তানী) 

অর্থাৎ, রাসূলুর্রাহ (সাই) ইমরানকর্তা নির্দেশনার মাধ্যমে মোস্তানী, ফলস্বরূপ তাঁর প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে যা 
(তথা রূপান্তরলীগত হয়ে ফলস্বরূপ তাঁর প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে যা 
অন্যদিকে তাঁর প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে যা 
তজ্জীব ইকবাল, পুস্তক জয় ২-৫৭, ৭৫-৮৫ তরফে নির্দেশনার মাধ্যমে 

অর্থাৎ, আবিশা (রা) হতে বর্ণিত হাদিস -

... প্রাচীন রসূল আল্লাহ তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনার মাধ্যমে মোস্তানী, ফলস্বরূপ তাঁর 
(তথা রূপান্তরলীগত হয়ে ফলস্বরূপ তাঁর 
অন্যদিকে তাঁর 
তজ্জীব ইকবাল, পুস্তক জয় ২-৫৭, ৭৫-৮৫ তরফে 

অর্থাৎ, ... নবি করীম (সাই) বলেছেন, ইসলামকে কোন বৈধতা নেই। 
বিদ্রোহী সত্ত্বানেও বর্ণিত আছে -

অর্থাং, আবিশা (রা) হতে বর্ণিত হাদিস -

... প্রাচীন রসূল আল্লাহ তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনার মাধ্যমে মোস্তানী, ফলস্বরূপ তাঁর 
(তথা রূপান্তরলীগত হয়ে ফলস্বরূপ তাঁর 
অন্যদিকে তাঁর 
তজ্জীব ইকবাল, পুস্তক জয় ২-৫৭, ৭৫-৮৫ তরফে 

হাদিস ২৭)

আহলের পক্ষ থেকে জবাবঃ ১. আহলে যাহিদের দলীলগোলার জবাবে বলা যায় 
তারা হলের শাহিদ অপরিহার্য সাব্য করেছিল, তা বিষয়বস্তুর জন্য 
প্রয়োজন নয় বলে সেগুলো যোগের চরম উত্তেজনার উপর প্রয়োজন।

২. ইমাম শাফেই (রহ)-এর দলীলগোলার জবাবে বলা যায় যে, খোদ বিবাহ 
ব্যাপারটি মুযাকাত কাজ। তবে আনুষ্ঠানিক কাজ করা হয়ে যায় থাক। যেমন খোদ 
ক্রম-বিক্রম বিষয়টি একটি মুযাকাত কাজ। কিন্তু স্নাতক ও পরিবার-পরিজনের জন্য 
প্রয়োজনের তালিকার তালিকার কথনা কথনা তা ফরম এবং ওয়াজিব হয়ে থাকে।

৩. হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর বিবাহ না করা, এটি উম্মেতে মুহাম্মদী (সাই)-এর 
জন্য দলীল হতে পারে না। কেননা, হতে পারে তাঁর শরীয়তে বিয়ে না করা উম্মে 
ছিল, কিন্তু আমাদের শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে।

৪. হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) বিবাহ না করে। তাঁর শরীয়তে বিয়ে না করা আমাদের জন্য 
দলীল হতে পারে না।

(درস তরুণী জু ছাত্র-খেলোয়াড় ৩-৪৯)
কোন কোন শব্দ দ্বারা বিয়ে সংযুক্ত হবে, এ বিষয়ে ইমামেদের মাঝে মতানৈক রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেকী (রহ.) বলেন, মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা বিয়ে সংযুক্ত হয়-

(ক) যেমন, কুরআনের পানীয়—

(খ) যেমন, কুরআনের পানীয়:

্রের ব্যবহার হয় ব্যবহার ত্রোঞ্জ ()a

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আয়তলোচনা করে বিবাহ বদলে আবদ্ধ করে দেব।

(তুর্ক ২০)

প্রতিযোগী যে, তাঁর মতে, হীরা (প্রদান) শব্দ দ্বারা বিবাহ সংযুক্ত হবে না। তিনি বলেন, হীরা শব্দ দ্বারা বিবাহ হয়। একমাত্র রাসূল (সা) জন্য নিষিদ্ধ। যেমন, কুরআন বলে যাহা-চাহুন কি হয় তাঙ্গর মুনিয়েন।

অর্থাৎ, ইহা আপনার জন্য খাস, (অন্যান্য) মুমিনদের জন্য নয়। (আহ্যাবঃ ৫০)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ বিষয়ে একটি মুলনৈতি পেশ করেছেন। তা হচ্ছে—

যে প্রাচীন ত্রোঞ্জ ও ত্রোঞ্জ যে শব্দ এবং এমন প্রতিটি শব্দ দ্বারা যার দ্বারা তাংকিম মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, নিমোক্ত শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ সহীহ হবে।

যেমন—

(ক) পুষ্প (ঝ) হীরা (ঝ) ত্রোঞ্জ (ঝ)

(খ) শুরার (চ) চন্দ্র (চ) ত্রোঞ্জ (চ)

(ঁ) ভূতে (চ) ভূতে (চ) ভূতে (চ)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, হীরা শব্দটি যেহেতু তাংকিম মালিকানার অর্থ দেয়, তাহেতু উহা দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা, আহ্যাব তাআলা বলেন—

মোহে নি হয়না পুষ্পে ত্রোঞ্জ ত্রোঞ্জ ত্রোঞ্জ

অর্থাৎ, কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নিনীর কাছে সমর্পন করে, নিনী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হারাল হবে। (আহ্যাবঃ ৫০)

আহ্যাবের পক্ষ থেকে জবাবে ইমাম শাফেকী (রহ.) যে দলীল পেশ করেছেন, তার জন্যে আহ্যাবের বলেন যে, ইহার দ্বারা মহর ওয়াজিব না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছ। অর্থাৎ, মহর নামে বিবাহ করা রাসূল (সা) -এর জন্য খাস। এটাই হচ্ছে—

চাহুন কি হয় তাঙ্গর মুনিয়েন এর মর্মাধিক। আবহা, উক্ত আয়াতটি চাহুন কি হয় তাঙ্গর মুনিয়েন এর মর্মাধিক।
বিবাহ অধ্যায়

বিবাহের রুকনসমূহ

তথা যে উপকরণ দ্বারা বস্তু অস্তিত্ব আসে তাকে রক্র (রুকন) বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের রুকন দুটি।

১. বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক নারী-পুরুষের মাঝে যার উক্তি আগে হয় তাকেই ইজাব বা প্রত্যাব বলা হয়।

২. গ্রহণ বা মেনে নেয়া। যার সম্ভাব্যতমুলক উক্তি পরে হয়, তার সম্ভাব্যতিতেই কর্মুল বলা হয়।

বিবাহের শর্তসমূহ

তথা বস্তুর বর্ষণ নির্দিষ্ট উপাদানসমূহকে শর্ত বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে বিবাহের শর্ত দুটি।

১. (সাধারণ শর্ত): পাত-পার্থী একজন হওয়া, যাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কেন বাধা না থাকে। যেমন, যাদেরকে বিয়ে করা হারাম (মাহরাম) একজন না হওয়া, লা রা না হওয়া কাফির না হওয়া ইত্যাদি। কেননা এদেরকে বিবাহ করা হারাম। এগুলো হল সাধারণ শর্ত।

২. (বিশেষ শর্ত): দু’জন স্বাধীন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু’জন নারী উপস্থিত থাকা (ঈমাম আবু হানিফা মতানুযায়ী) যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

- উস্তাদস্বরূপে কে বলতে পারে লাজাল্লাহ নাম’তে বলেন না তাকে জালালউর রহমত ও হামামাত।

আর্থাৎ, দু’জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মাঝে থেকে। যদি দু’জন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা। (বাকারাঁ ২৮২)

* ঈমাম শাফকেই (রহ.) বলেন যে, এক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষাৎ প্রচণ্ডোগ্য নয়।

* ঈমাম মালিক (রহ.) বলেন যে, বিয়ের সাক্ষীর কেন প্রয়োজন নেই। বিয়ের সংবাদ প্রচার করে দিলেই হবে। তিনি দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদিসটি পেশ করেন-

... উন্মুখী তাহাদের বালা বাদ রাশুলে সালাতে লোৰ সায়িলে যাদের আদের আলুতার এই তক্তাহ এভাবে ফিস মসাজিদে অস্পষ্টে অস্পষ্টে ও বাইদারু দুগ দুগুদু দুগুদু দুগুদু- (নবম সচিব ২০০ বাব আলান তক্তাহ,)

(আব্ব মাহা)
বিবাহ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্যঃ
ইমাম শাফেই (রহ.) সহ অনেকেই বলে থাকেন যে, বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের মতই একটি মুবাহ বিষয়। কারণ উভয়টি (প্রস্তাব) ও ফুল (কুবুল) শব্দব্য ঘোরা সম্পাদিত হয়ে থাকে।
কিন্তু বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি করুল ও ইজাব শব্দব্য ঘোরা সম্পাদিত হলেও উভয়ের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে-
1. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ইজাব ও করুলের উভয় শব্দ অতীতকালীন হওয়া আবশ্যক।
যেমন, পং ও শ্রীলত্ব
অথ একজন বলবে আমি বিভিন্ন করেছি এবং অপরজন বলবে আমি ক্রয় করেছি। কিন্তু বিবাহের মধ্যে একটি অতীতকাল (فعال মাত্র) এবং অপরটি নির্দেশ (আর্ম)-এর শব্দ হলেও চলবে। যেমন- রোগিত এবং অথ একজন প্রস্তাব করবে আমাকে বিয়ে কর এবং অপরজন বলবে, আমি বিয়ে করলাম।
2. বিয়ের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি প্রস্তাবক ও গ্রহণকারী উভয়টি হতে পারে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পারবে না।
3. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সব ধরনের কার্যক্রম প্রয়োগ করা জায়গায়। কিন্তু সুধীর মধ্যে শরীর কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম প্রয়োগ করা জায়গায় নয়।
4. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি উকিলের দিকে যায় না।
5. বিবাহের মধ্যে অভিভাবকের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অলির ভূমিকায় কোন গুরুত্ব নেই।
6. ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মল্ক উন্ন তথা বস্তুর উপর একচেট মালিকানা অর্জিত হয়, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে শুধু মল্ক প্রতিপাদ তথা সম্ভোগের মালিকানা অর্জিত হয়।
7. বিবাহের মধ্যে কমপক্ষে দু’জন সাক্ষী লাগবে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সাক্ষী শর্ত নয়।

* এক্ষেত্রের বাদমত্ত। আমাদের দেশে প্রচলিত তবলার নয়।
৮. বিবাহের মধ্যে কিন্তু কভূ (সমতা)-এর গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ক্রম-বিক্রয়ের মধ্যে এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

৯. সব লোকের সাথে ক্রম-বিক্রয় করা যায়, কিন্তু বিবাহ তার বিপরীত। কারণ, সব নারীর সাথে বৈমানিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায় না।

১০. অমুসলিমের সাথে ক্রম-বিক্রয় করা যায়। কিন্তু মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে বিবাহ জায়েহ নয়।

১১. ক্রম-বিক্রয়ের মধ্যে খুচরা পড়তে হয় না, কিন্তু বিবাহের মধ্যে খুচরা পড়তে হয়।

১২. ক্রম-বিক্রয়ে কয়েক ধরনের ক্ষতির (পছন্দের স্বাধীনতা) থাকে। তবে বিবাহের মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

২৮১: বাবুর প্রসাদের কর্তৃক চূড়ান্ত দুর্দামন

... অন্তর্ভুক্ত হোন যে রসূল প্রধান দেবী তাঁকে রোম দ্বারা স্নেহ করতে পারে। তিনি সব পূর্ব স্নেহ দ্বারা তাঁকে সম্পন্ন হয়ে পূর্ব স্নেহ দ্বারা তাঁকে সম্পন্ন হয়। তিনি হাফস বলেন, এটা তার নিকট খুবই অসম্ভবী মনে হয় এবং তার চেহারা মোহার বেশ পরিবর্তিত হয়। তিনি (আরবী) (হাফস ও মুহাম্মদ ইবন কামার) একমাত্র হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি (আরিশা) বলেন, ইয়া রাসুলওয়ালা। ইনি আমার দুঃখ ভাই। তিনি (সাং) বলেন, তাঞা তামাদের দুঃখ ভাইদেরকে সুযোগ দিবে। বন্ধু দ্রুত নির্বাচনের জন্য শীতল দুর্দামনে দূষণ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়।

রাসুল-এর আধিপত্যক অর্থের রসদটি বাবুর প্রসাদ অথবা বাবুর প্রসাদ অর্থে ফেলে ফেলে ফেলুন। তাপিত প্ররোচ এর মাঝারী। মূল শুভ জিন্স স্বাভাবিক। আধিপত্য অর্থ হচ্ছে শুভ শুভ শুভ দুই দুই দুই এর অর্থে, নারীর জন্ম হতে দুধ পান করা, ক্ষণিক, ক্ষণিক কাল। এভাবে
দুন্নশুন্যশ শিশুকে বলা হয় রাখার প্রয়ো এবং দুধ দানকারিণীকে বলা হয় রাখা প্রয়ো বা 
মু’সুম শাব্দিক প্রয়োগ পবিত্র করুন নানেও পাওয়া যায়- 

"লোটাত ব্যাপ্ত আল্লাহের সঙ্গে কালীনের লিনে আরাছে আর তার রাখার যেহেতু- 
অথবা, আর সত্তানরত জাতিরা তাদের সত্তানদেরকে পৃষ্ঠ দো বছর দুধ খাওয়াবে, যদি 
দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চাই। (বাকারার ২৩৩)

রাখার-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় 

১। শরীয়তের পরিভাষায় রাখার বলা হয়- 

হো মাস মত দুধ মোটায় মোটায়। 
অথবা, নির্দিষ্ট এক সময়কালে নারীর জন্ত থেকে দুধ চুষে পান করাকে বলা হয়। 

২। কেউ কেউ বলেন- 

ইসম লোহারু লতীন নামাতে ইমারাত ওতম হয়। ফি মোটা ফিট মোটা কোন 
অথবা, রাজার হল বিশিষ্ট জনসাধারণের সময়কালে কোন মহিলার দুধপান করার নাম। 

* সকল ইমাম একদিকে উপরে একমত পোষণ করেন যে, বংশের কারণে যা হারাম, 
তা (ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে) দুধ পানের কারণেও হারাম হয়। 

যেমন, হাদীসের বর্ণিত আছে- 

বিষয় মোটায় মোটায় স্পিয়ে স্পিয়ে স্পিয়ে 
যখন রাখার রাখার যা যখন রাখার রাখার। (আল অরফা ও সান্তর ২:১)

১৮০ বাবা হামি রাখার রাখার মা হামি 
রাখার রাখার মা হামি। (আল অরফা ও সান্তর ২:১)

১৬৬ বাবা হামি 
রাখার রাখার মা হামি। (আল অরফা ও সান্তর ২:১)

প্রশ্ন হল, কোন নারী যদি বয়স্ক কোন পুরুষকে দুধ পান করার যেহেতু, তবে 
(রাখার রাখার মা হামি) সাবান হবে কিনা। এ বায়ারা বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। 

* হযরত আলী, ইয়াইশা (রাখ), আতা ও দাউদ যাহেদী (রহ.)-এর মতে, একমাত্র 
রাখার রাখার বায়ান হবে। আল্লাহমা ইবন হুমায় (রহ.)-এর মতে, একমাত্র 
রাখার রাখার বায়ান হবে।
বলেন, রাজাচারের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যাকে হোক অথবা বাচা থাকুক, সর্বাধিক কুরমাত সাব্যস্ত হবে। (মালিক 31:19–21)

দলিলঃ

... ফাতেহা সহযোগিতা করে। এর পর উহার প্রথম ধরনের প্রশংসা এবং তাদের মূল সচেষ্টার সময় ব্যবহার করে। যে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

অর্থাৎ, ... নবী কবর্মে (সাধ) এর সহযোগী আল্লাহ (রাজ) ও সালামা (রাজ) হতে বর্ণিত। আরু হুমায়ন ... সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে লালন-পালন করেন। ... অতঃপর সাহা বিন সুহায় ইবন উমর আল-কুরায়েশি, পরে আল-আমিরী যিনি আরু হুমায়নকে সাহা ছিলেন, আগমন করেন এবং বলেন, ইয়া রসূল আনারা! আমরা সালেমকে পুত্র হিসেবে গণ্য করি। আর সে আমার সাথে এবং আরু হুমায়নকে সাথে আমাদের ঘরে (আমাদের সকল হিসাবে) লালিত পালিত হয়েছে। আর সে আমাকে একই বিষয়ের মধ্যে দেখেছে। আর আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে যা নামিল করেছেন, তা আপনি বিশেষতায় অবগত। এখন তার সম্পর্কে আপনি কি নিদেশ দেন? নবী কবর্মে (সাধ) তাকে বলেন, তাকে পাঁচবার তোমার দুখ পান করাও তাতে তুমি তার দুঃখ মাতা হিসেবে পরিগণিত হবে। অতঃপর তিনি তাকে পাঁচবার দুঃখ পান করান এবং তিনি তার দুঃখ মাতা হিসেবে গণ্য হন।

এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত সাহা সালেমকে যখন দুখ পান করিয়েছেন, তখন তিনি বলেন এবং বয়স্ক ছিলেন।

* ইমাম আরু হানিফা, মালিক, শাফেঙ্গ ও আহমদ ইবন হামল (রহ.) সহ জমানুর ফকিহদের অভিমত হল- বয়স্ক পুরুষকে দুখ পান করানো হলে কুরমাত সাব্যস্ত হবে না। হুমায়ন গুহমাত হটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে, বয়স্কদের দুঃখ পান করানো হারাম। (তন্ময় আশেত 32:178)

দলিল (১) প্রভু কুরআনের বর্ণিত:

* ও যদি তাদের প্রতি আমার পথে আরো অপরাধ শেষ হয়, তাহলে আমি এই রুদ্ধার— (পরে 232)
দলীল (২) পবিত্র কুরআনের বাণী—

হমন ও চৌধুরী তে দুটো শহীদ। অর্থাৎ, তাকে (সত্তানকে) গর্ভে ধারণ করতে ও তার খন্ডে ছাড়তে সময় হল বিশ্ব মাস। (আহকাফঃ ১৫)

উপরের পাঠিয়ে আয়াতিত্য বারা প্রাচীনকাল হয় যে, এই রাষ্ট্র শিক্ষকেল সাবান হয়ে থাকে। অপরদিকে হাদিসে বর্ণিত আছে—

দলীল (২) বলে—

লুহমে তাফি (ইবো দাওদ ৬১ পাপে বারানসের সহায়তা)

অর্থাৎ, আহ্লাদ ইবন মাসুদ (রাশ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃখপান

করানোর অর্থই হল (পাশানার) অষ্টি মজবুত করানো এবং গোপুর বৃদ্ধি করা।

দলীল (৩) বলে—

হযরত ইবন আব্বাস (রাশ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাই) ইরাসাদ

করেন—

লুহমে তাফি (ইবো দাওদ ১৭৪ পাপে বারানসের সহায়তা)

অর্থাৎ, গৌরব ও দুর্বলরে মধ্যেই রাজার ধর্মবিহীন হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রাতঃ (১) তাঁরা যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এর জন্যে ইবন

হাজার আসকারা (রহ)। বলেন, এই ঘটনাটি ইসলামের প্রাচীন যুগের ছিল, পরে

তা রহিত হয়ে গেছে। (২) অথবা, এটি আরু হোয়ায় ফা (রাশ)—এর জন্য একটি খাস ঘটনা। যা তাঁদেরই প্রবর্তন দলীলের শেষকে উল্লেখ রয়েছে—

যা আরু হোয়ায় প্রবর্তন দলীলের শেষকে উল্লেখ রয়েছে—

চূড়ান্ত ইবন আল তৈমুর এর কথা আর মূল্য লাভ করেন (রাশ)। হতে বর্ণিত। 

বিশেষত উমরে সালামা ও নবী করিম প্রথম এ (প্রায় বয়সে দুঃখ পানকারিগণকে নিজেদের নিকট উপহার হতে বাধা দিতেন, বরং তারা ছোটবেলায় দুঃখপান করাকেই প্রাথমিক দিতেন (যেমন মাজরের নয়)। আর আরু হোয়ায় ফা (রাশ) সম্পর্কে বলতাম, আশাবাদ শব্দগুলি। আমাদের জাতের নয়, সত্বরত এটা (সালামের ব্যাপারটি) নবী করিম (সাই) এর তরফ হতে বিশেষভাবে অনুমোদিত ছিল, যা অন্যদের জন্য বৈধ নয়।
বাবু হল যাহো মায়ে খুশি প্রস্তুত সচিব ১৮১

পাঁচালির কম দুধপানে হুমায়ত (হারাম) প্রতিষ্ঠিত হবে কি?

নাবী সালাম বলেন, আল্লাহ তাআলাকে কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে দাস্বাদুর দুধ পান করা হলে হুমায়ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর পাঁচালির দুধপান করানো হুমায়তের জন্য নির্ধারিত হয় এবং পূর্বব্দের নির্দেশ মাননৌক (রহি) হয়। অতঃপর নবী করিম (সাহ) ইনতিকাল করেন এবং এর কিরাম (পুণ) অবশিষ্ট থাকে।

বিশ্লেষণঃ কি পরিমাণ দুধ পান করলে রাগিণী সাব্যন্ত হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে:

* দাউদ যাহেরী, আবু সাওর, আবু উবাইদ, ইসহাক, ইবন মুনবির (রহ.)-এর মতে, কমপক্ষে তিন চেষ্টা দুধপান করলে হুমায়ত রাগিণী সাব্যত হবে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তার উদ্দেশ্য হলো (২২ সে),

দলীল উন্মে ফ্যাল (রাব) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সাহ) বলেন-

(২) হযরত উমাইয়া ফ্যাল (রাব) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সাহ) বলেন-

(৩) উমাইয়া ফ্যাল (রাব) হতে আরো বর্ণিত আছে যে-
বিবাহ অধ্যায়

* ইমাম শাফেয়ে ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি চোষণা খুব়াত সাবাইত হবে। আর এই পাঁচবারও বিভিন্ন সময়ে হতে হবে।

তথ্যাত্র থেকে প্রতিবার তৃণিদায়ক পান জরুরী। (ফতুহ তেহমিদ 3: 200)

দলীল ৪ অনুক্রমের দুর্বলতা বর্ণিত হয় এবং এর মতে, পাঁচবার দুধপান করানোর দ্বারা দূষণ দুধপান করানোর নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পাঁচবারের কম চোষণার দ্বারা খুব়াত সাবাইত হবে না।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সাহেবাইন (আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ), সুফিয়ান সাখরী, আওয়াই, আতা, হাসান বসরী এবং ইমাম আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হয় এর মতে, পাঁচবার দুধপান করানোর দ্বারা দূষণ দুধপান করানোর নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পাঁচবারের কম চোষণার দ্বারা খুব়াত সাবাইত হবে না।

দলীল (১) যে সমস্ত নারীদের বিয়ে করা হারাম, এর তালিকা একটি করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন- "যদি সকল নিয়ম অনুসরণ না করেন, তবে তোমাদের কে মাতা যা তোমাদেরকে জন্য পান করিয়েছে। নিসা: ২৩ উক্ত আয়াতে শতবিংশতবে রোহক দুধপান (দুধপান)-কে হারাম হওয়ার কারণে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কম-বেশির কোন পার্থক্য করা হয়নি। (হকিম আল ফরর লাল হুসাইন 7: 1-24)

দলীল (২) ... রোহক দুধপান খুব়াত ক্ষণ উল্লেখ থাকেন। পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি চোষণা খুব়াত সাবাইত হবে।

... ঝুমর্ম যদি রোহক দুধপান খুব়াত ক্ষণ উল্লেখ থাকেন। পাঁচবার বা এর চেয়ে বেশি চোষণা খুব়াত সাবাইত হবে। (ইবনু মাদুরি 5: 206)
অর্থাৎ, ... আয়াশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুঃখপানের কারণেও হারাম হয়।

উক্ত হাদিসেও শতাব্দীভাবে দুঃখপানের কথা বলা হয়েছে। কম বা বেশি এমন কোন শার্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (৩)ঃ অন্য একটি মারফত হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে—

قَالَ اللَّهُ ﷲ صَلَّى اللَّهُ ﻋَلَيْهِ ﻭَسْلَمُ ﻲَحْرَمُ ﻣِنَ الرَّضَايَ ﻣَأْ ﻲَحْرَمُ ﻣِنَ ﻰَلْسبِ قَلِيلَٰهُ

وْكَبَّرَهُ (جمع المسانيد لالخوارزمي 2 ص 171، عقود الجوهر الملفية ج 1 ص 169، نسائي ج 2 ص 82 : الفقر الذي يحرم من الرضاعة)

অর্থাৎ, ... নবী করিম (সাঃ) বলেন, বংশের কারণে যা হারাম হয়, তা দুঃখপানের কারণেও হারাম হয়। দুধের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক।

দলীল (৪)ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস—

مَا كَانَ مِنَ الْحُواَّلِينَ وَإِنَّ كَانَتْ مَسْتَةٌ وَاِحْدَى فِهْيَ ﻲَحْرَمُ (مؤذن إمام محمد ص 276،

مصنف عبد الروزاق ج 7 ص 466)

অর্থাৎ, দুধের মধ্যে যদি এককালে উপরের দুধ হোক তা হারাম সাবান হবে।

উপরের লিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুধ কম পান করলে বা বেশি পান করলে সম্ভব হয় না।

যুক্তির নিরীক্ষণে একথা প্রমাণিত হয় যে, দুধপান করলের অর্থাৎ হল অস্ত্রী মজবুত

করানো। আর তা দিনবার আর্থিক পাঁচবারে যেমন হওয়ার সমান অন্ধ অর্থ, তা

এককালে পানের দ্বারাও সম্ভব।

আহান্নারদের পক্ষ থেকে জবাবঃ

(১) আহসান আহসানের প্রদত্ত দলীলসমূহের জবাবে আহান্নারদের বলেন যে, এই ধরনের

হাদিসসমূহ কুরআনের আযাত এবং ইবন আব্বাসের হাদিস হাদিস হাদিস হাদিস হাদিস হাদিস

বহু হয়ে গেছে।

যেমন, হযরত আব্বাস ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর সামনে এককালে কেউ

"লাহর"

রোপন এবং হাদিসটি উল্লেখ করলে, তিনি (রাঃ) বলেন—

"হাদিসটি উল্লেখ করলে, তিনি (রাঃ) বলেন—

(১) হায়া পূর্ব ছিল। এখন এককালে দুধ চানই হারাম সাবান হবে।

(২) অথবা বলা যায় যে, তিনি বা পাঁচ বার বলার উদ্দেশ্য হল পেটের মধ্যে দুধ

প্রবেশ করা। একদেশ দুধ দুধ দুধ দুধ দুধ দুধ দুধ

প্রবেশ করার

সত্বাবনা কম, তাই তিনি তিনি বা পাঁচবারের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুন এককালে
চোখার দ্বারাও যদি নিষিদ্ধ জানা যায় যে, পেটে দুঃখ প্রবেশ করেছে, তাহলে এর দ্বারাও কুরআনের জাহাজ এর অনুযায়ী পরিহার করা যাবে।

* ইমাম শাফেক (রহ.-) এর বর্ণিত হাদিসের জবাবে আহানাফগণ বলেন যে, উক্ত হাদিসের বর্ণিত অর্থাৎ, “এবং এর কিরামত অবশিষ্ট থাকে”

যে অংশটি বর্ণিত হয়েছে, তা মূলত ঐ সকল লোকের কিরামত, যাদের নিকট ইহুদির রহিত হওয়ার খবর পাচ্ছিনি। কেননা ইহা নবী করিম (সাহ.-) এর ইন্তিকালের অন্ত কবর পূর্বে রহিত হয়েছিল। অতঃপর এ ব্যবাপারে তাঁরা (যখন) অবগত হলেন, তখন তারা তা মেনে নেন। অন্যথায় স্পষ্ট বিষয় হল যে, হযরত আযিশা (রাণ.-) এর উদ্দেশ্য যদি এই হত যে, এসব শব্দ মানসূত্র হয়নি, বরং রয়ে গেছে, তাহলে এগুলোকে মাসহােক (কুরআনের কপিতে) অন্তর্ভুক্ত করানোর চেষ্টা করবেন না।

* হেদায়া প্রহকার বলেন—

"আহানাফরা শাফেকের উপর উক্ত যে কটিতে প্রহৃত তাব্লিরী এএদ -

অব্যাহত এ ব্যবাপার যত হাদিস রয়েছে (সবই খবরে ওঠছে), সেগুলো কুরআনের মুকাবিলায় দলীল হতে পারে না।

* আহানাফরা শাফেকের উপর উক্তা অভিযোগ করে বলেন যে, পাঁচবার চোখের আযাত পবিত্র কুরআনে কোথায় রয়েছে? তা আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। কেননা উসমানী মাসহােকে পত্র রচনা করেছে যে, “পাঁচবার চোখ” এর কথা কোথাও উল্লেখ নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই শব্দগুলো পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে, যা নবী যুগের একদম শেষের দিকে রহিত হওয়ার কারণে হযরত আযিশা (রাণ.) ও এ সম্পর্কে জানতে পারেননি। আর এটা কোন অনুসন্ধানিক বিষয় নয়।

(যদি তেমন ইমামের কথায় মন্তব্যরূপে থাকুক তাহাতে কুরআনের অধ্যাত-)

দুঃখপানের সময়সীমায় শিক্ষক দুঃখ পান করানোর সময়সীমা কতদূরুক, তা নির্দেশনের ক্ষেত্রে ইমামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

* ইমাম শাফেক, আহমদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.-) সহ জমকুরের মত, শিক্ষক দুঃখপানের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল দু'বছর।

(যে তেমন ইমামের কথায় মন্তব্যরূপে থাকুক তাহাতে কুরআনের অধ্যাত-)

দুলতি (১) পবিত্র কুরআনের আরাত-
দলীল

"বিবাহ অধ্যায়

অর্থাৎ, আর সত্যনবতী নারীরা তাদের সত্যনেত্র পূর্ণ দু’বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়ার পূর্বে মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (বাকাফঃ ২৩৩)

* ইমাম যুফার (রহ) এর মতে, দুধ ঑াঁওর সময় সীমা ভিন বছর। (فتح القيدرة ৩০৭)

* দাউদ বাহেরীর মতে, দুধ ঑াঁওর নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নেই।

দলীলঃ “হুয়ায়ফার (রাছ) পালিত পূর্ব সালমকে পরিণত বয়সেও দুধ ঑াঁওর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এতে বুঝা যায় যে, এখানে কোন সময় সীমা নেই।”
(পুরো হাদিসটি পূর্বে অমরণ বর্ণিত হয়েছে।)

* ইমাম মালিক (রহ) এর পক্ষে বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়, তবে প্রসিদ্ধ মত হল দু’বছর দু’মাস। (فتح القيدرة ৩০৭, فتح البازري ৯৬)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে, দুধ ঑াঁওর নিম্নতম সময় সীমা হচ্ছে দু’বছর থেকে ২৪ মাস। আর উর্ধ্বতম সময় সীমা হচ্ছে আড়াই বছর থেকে ৩০ মাস। (فتح القيدرة ৩০৭, فتح البازري ৯৬/১৪৬, تنظيم الأسئلة ২)

দলীলঃ আলাহ তাআলার বাংলি- হলে নির্ধারণ লাগে শুধুই।

অর্থাৎ, আর তার গর্ভধারণ ও তার জন্য ছাড়ার সময় হল ব্রিশ মাস। (আহকাফঃ ১৫)
আয়াতটি বাঙ্গাল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে একথা বুঝা যায় যে, গর্ভধারণ ও দুধ ঑াঁওর প্রতোকটির জন্য আলাদাভাবে ব্রিশ মাস সময় প্রয়োজন। মূলত আয়াতটির উদেশ্য তা নয়। বরং উক্ত আয়াতে হলে (সত্তার গর্ভধারণ) সংজ্ঞায়িত নয়। আর ফোটাল (মায়ের দুধ ছাড়ানো) বাক্যটি স্ত্রী একটি বাক্য। কেননা, হলে- এর নিম্নতম সময় হল হামাস এবং এর উর্ধ্বতম সময় হল দু’বছর। যেমন, হাদিসে এসেছে।

(দার قطلي ج ৩:২২, سن كبر مبَّمّي ج ৭:৪৪, فتح القيدرة ج ৩:৩০)

অর্থাৎ, হযরত আয়িশা (রাছ) হতে বর্ণিত, গর্ভধারণকাল দু’বছরের বেশি হয় না, যদিও চরকার ছায়া পরিবর্তিত হওয়ার পরিমাণ সময়ও হেক না কেন।
সুতরাং এর সময়কাল আড়াই বছর রয়ে গেল। নতুন আয়তে প্রত্যেকটির জন্য যদি বিশ মাস ধরে নেয়া হয়, তাহলে এর মূল উদ্দেশ্যই বাহ্য হবে। কারণ উপরিভাগ হাদিস দ্বারা জানা গেল, একটি সত্তান গর্ভে বিশ মাস থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, গর্ভধারণ এবং দুঃখ পান উভয়টির সময় যদি একে বিশ মাস ধরা হয়, তাহলেও মুশকিল। কেননা একটি সত্তান যদি দুই বছর (২৪ মাস) গর্ভে থাকে, তাহলে বিশ মাস পুরা করতে হলে তাকে মাত্র চাছ মাস (২৪+৬=৩০ মাস) দুঃখ পান করানো যাবে। যা কেউই বীরকার করেন না।

সুতরাং এর সঠিক জবাব দিতে গিয়ে আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন, উক্ত আয়তে হাল (গর্ভধারণ) দ্বারা হাল ফি বৈস্তেন তথা পেটে গর্ভধারণ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল হাল ফি লাদ। তথা জমের পর মাতুকেকে লালন-পালন বুঝানো উদ্দেশ্য। অতএব, উক্ত আয়তে দ্বারা শুধুমাত্র রাজাআতের সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

(তফসিল মদরক ২৫ সং, ফিশ বারি চ ৪০ সং)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে ইমাম শাফেকি ও সাহেবাইন সহ প্রমুখের দলীলের উত্তরে আহতাফগণ বলেন-

১। আল্লামা ইবন তুমাম (রহ.) বলেন, আয়তের বর্ণনা প্রসংলগ্ন লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এখানে মসলে ইস্তিজাহ (আশয় প্রাথমিক বিষয়) বলনা করা উদ্দেশ্য। কেননা, আয়তে এলালদাহ (সত্তানসমূহ) দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সত্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাই আযাতের পরের অংশ বলা হয়েছে-

وَعَلَيْهِ الْمُوْلَودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِوْسُوَتهُنَّ

তা অর্থাৎ, আর সত্তানদের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সময় (তালাকপ্রাপ্ত) নারীর খোরপোর্ষের দায়িত্ব বহন করা।

তাই বলা যায়-

 فالحولِّين مَدَّةٌ إِسْتِحْقَاقِ الأجْرَةِ لَا مَدَّةٌ الرِضَاَةِ—(تلتيم الاختوان ১৭৮)“

“দু’বছর হলো দুঃখপান করানোর পারিপ্রমিকের অধিকারের সময়, দুঃখপান করানোর সময় নয়,” সুতরাং ঐ তালাকপ্রাপ্ত মহিলা যদি বীর সত্তানকে দুঃখপান করায়, তাহলে সে দু’বছরের পারিপ্রমিক পাবে, এর বেশি নয়।

আহতাফগণ আরো বলেন যে, শাফেকীদের আযাতে হোলাইন (দু’বছর) উল্লেখের দ্বারা ইহা অপরিহার্য নয় যে, দু’বছর পর দুঃখপান করানো যাবে না। কেননা, আযাতের পরবর্তী অংশে দেখা যায়-
ফানি আরাদা ফুসালান  অর্থাৎ আর যদি মাতা-পিতা ইচ্ছা করে যে, তাহলে নিজেদের পারিপারিক পরামর্শক্রমে দুধ হাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই।

উক্ত আয়াতে ফানি আরাদার ফুসালান অর্থাৎ ফানি ফুসালান নিয়ে বিষয় বা পরে আসার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দুর্বলদের পরে যদি ইচ্ছা করে, তাহলে পরামর্শক্রমে আরো সময় বাড়িয়ে দিয়ে পারে (তবে এক মাসের উদ্ধের নয়)। সতরাং বুঝা গেল, আয়াতটি মূলত দুধক্ষার মেয়েদের সীমা নির্ধারণের জন্য আসেনি।

(ফরহিদ উদ্ধর জ, ৪০-৪১, ফুসালান: তাফতে তাফতে)

হযরত ইবন আকবাস (রাজ) এর হাদিসটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদ্ধর প্রয়োজ্য। অর্থাৎ দুর্বল রাজাদের ক্ষেত্রে তালকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পারিপারিক দেয়া হবে। অথবা বলা যায় যে, হাদিসে দুধক্ষার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সময়সীমার কথা উল্লেখ রয়েছে, সর্বাধিক সময়সীমার কথা নয়।

দাউদ বাহরীর প্রদত্ত দলীলের উদ্ধর চিত্তে বলা যায় যে, এ ব্যক্তিকর্মী নির্দেশটি স্বধূ সালেম (রাজ) এর জন্য খাস ছিল। এটা ব্যাপক নির্দেশ ছিল না। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(আলনোর ২, সূত্র: বিভক্তি: ১৭৬)

মুতাব বা ভেগ বিবাহ

২৮৩: পিতার মতে 

মুতাব বা ভেগ বিবাহ ঘটতে পারতে, যেখানে উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই যে পিতা বিবাহ ঘটাতে পারেন।

(মসলা: ২২, মুতাব বিবাহ দেওয়া, ১৪২)

অনুবাদঃ যুবর্জী (রহ.) হতে বর্ণিত হলেন, এক শেখা আমি উমর ইব্রাহিম আলীর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই মুতাব বিবাহ সম্পর্কে দাবি ছিল, তখন আমি আর পিতার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলদাদ আলী (সাহ) বিদায় হজরের সময় এরকম (মুতাব বিবাহ) করতে নিষেধ করেন।

বিশেষণ: মুতাব বিবাহের আভিধানিক অর্থঃ শুরু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হল আর ধরা উপভোগ করা যায়।
(২) হো মা যেস্ততে তুমি

(৩) ক্ষাক্ষণ

(৪) স্বতঃ

(৫) বিনোদ, প্রমোদ ইত্যাদি।

পরিব কুরআনেও শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-

ওমা হিঁতে হিঁতে এনা মতান মুতান

অর্থাৎ, পারিব জীবন প্রতারণার ভোগ-সামগ্রী বরুণ কিছু নয়। (হাদিসঃ ২০)

মনোনীত-এর পারিষদিক সংজ্ঞা:

১. হীর্দায়া প্রসঙ্গকার বলেন-

আর্থাৎ, মুত্তা হচ্ছে কোন নারীকে একথা বলা যে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে এত সময় ধরে উপভোগ করব। (উল্লেখ যে, এই মহিলা তা করব হবে)

২. ইবনুল ফারাহের মতে-

হীর্দায়া মুত্তা এভাবে আত্মীয় বিনিময়ে নারীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিয়ে করা।

৩. আল্লামা দাক্কিকুল ঈদ বলেন-

নির্দিষ্ট কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাকে মুত্তা বলে।

৪. কেউ কেউ বলেন, “যদি কোন লোক কোন তীর্থক্রমে কোন ভোগের জন্য বিবাহ করে তবুও বিবাহকে মুত্তা বা ভোগ বিবাহ বলে।”

৫. কতিপয় আলেম বলেন-

আর্থাৎ, মুত্তা বিবাহ হল, মহিলাকে কিছু সময়ের জন্য বিয়ে করা, উক্ত সময় নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক।

মোটকথা, কোন নারীর সাথে অস্থায়ী ভিত্তিতে যৌন আচরণ করার লক্ষ্যে টাকা বা কোন সম্পদের বিনিময়ে সাময়িকভাবে চুক্তি ও শর্ত সাপেক্ষে বিবাহ করার নাম হলো মুত্তা বিবাহ। এতে নিকাহ শব্দটি উল্লেখ থাকবে না এবং দু'জন সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না।
মুতাবর হৃদয়ঃ মুতাবর বিবাহের হৃদয়ের ব্যাপারে মতানৈকা রয়েছে। নিলে তা দলীলসহ উপস্থাপন করা হল-
* রাফেলি এবং শিয়াদের মতে, প্রয়োজন মুতাবর বিবাহ জানায়। তারা বলে, কেবল যদি বীর গৃহে স্ত্রীর নিকট থাকে তার জন্য মুতাবর নিষিদ্ধ। তবে সে যদি দীর্ঘদিনের জন্য সফর থাকে, তাহলে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার জন্য মুতাবর বৈধ হবে। (তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে যে, কেবল যদি একবার মুতাবর বিবাহ করে, তাহলে সে হযরত হুসাইন রাঘ-এর শাহ্দাদের সাওয়াব পাবে এবং যদি দীর্ঘদিনের করে তাহলে হযরত আলী রাঘ-এর শাহ্দাদের সাওয়াব পাবে। ইত্যাদি) (ملج الصادقين)

(১) আলীহ তাআলার বাগী- فَمَا ٱسْتَمَتَّعْتُمُ بِيَّنَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فِرْضَتِهَا
অর্থাৎ, অন্তত তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। (نিসাি ২৪)

উল্লেখ যে, উত্ত আলাতে (ভোগ করা) শরীর উল্লেখ করা হয়েছে। (বিবাহ) শরীরের উল্লেখ করা হয়নি। আর (سِمَتَّعَ) (মুতাবর) এবং আলাতে (مُتَّع) এর মুখ্য সমর্থন করে। আর ইহা মুতাবর ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। কেননা বিয়ের ক্ষেত্রে তার হার প্রদান করা হয়।

دَرَس٢ُ ۱۶۴ ۱۵، تنظيم الاشتات (ج ۰ ص)

(২) তাহাড়া, উবী ইবন কাব এবং ইব্রাহিম অব্ব মাসউদ (রাঘ)-এর কিরাতে উল্লেখ আছে যে- فَمَا ٱسْتَمَتَّعْتُمُ بِيَّنَهُنَّ إِلَيْ أَجْلِ ٱلْمَسْتَمَتٕ
অর্থাৎ, অন্তত তাদের মধ্যে যাকে তোমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করবে।

(৩) কিরাতে সপ্তভাবে ‘‘এই মস্তমিঃ’ বা ‘নির্দিষ্ট সময়ের’ কথা উল্লেখ রয়েছে। আর নির্দিষ্ট সময়ে তো মুতাবর ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। সুতরাং মুতাবর বিবাহ জানায়।

(২) عن سَلَمَة بن الأكوٓف قال كَذَا فِي جَيْش فَأَتَانَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى فَقُولُوا لَهُمْ أَنَّمَا تَسْتَمَتَّعُوا فِي الْجَيْس مِنَ الْلَّهِ عَلِيَّهُ وَسُلَّمُ وَقَالُوا أَنَّنَا نَسْتَمَتَّعُونَ (۱۸۱-۱۸۷)

(১) অর্থাৎ, সালামা ইবন আল আকওয়া (রাঘ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমারা একদা সেনাদলে থাকাকাছাড়া নবী করিম (সাঘ) আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদেরকে মুতাবর বিবাহের অনুমতি দেয়া হল।
দলীল (১) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (২) অনুসারে শরীয়ত হাদিস।

দলীল (৩) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (৪) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (৫) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (৬) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (৭) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (৮) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (৯) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (১০) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (১১) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।

দলীল (১২) হবীব তাহার বাণী—

হাজি মৃত্যুর সময় তিনি জানান যে, তার পুত্রীর বিয়ে তাদের কেন্দ্রে হবে, তারা যে নারী হয়ে থাকবে। তারা নিজেদের কেন্দ্র হিসেবে পরামর্শের জন্য তাদের নিয়োগ দেবে।
দলীল (৫৪) হযরত রাবীআ (রাছ) হতে বর্ণিত হাদিস:-

বিবাহ অধ্যায়

নিহারিত হয়েছে যে উল্লেখিত নামের প্রথম ঘটনার সময় নবী নবীর পিতা মুসলমানদের হাদিস প্রেরণ করেছিলেন। এই হাদিসের অধ্যয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন।

দলীল (৫৫) নবী নবীর পিতা মুসলমানদের হাদিস প্রেরণ করেছিলেন। এই হাদিসের অধ্যয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন।

দলীল (৫৬) নবী নবীর পিতা মুসলমানদের হাদিস প্রেরণ করেছিলেন। এই হাদিসের অধ্যয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন।

দলীল (৫৭) নবী নবীর পিতা মুসলমানদের হাদিস প্রেরণ করেছিলেন। এই হাদিসের অধ্যয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন।

অন্যদিকে দলীল (৫৮) মানুষের বিবাহ ও কাম প্রতি চরিতার্থ করার জন্য হয়েছে। এই হাদিসের অধ্যয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন।

(নোট: এই হাদিসের অধ্যয়ন ও অনুসরণ প্রয়োজন।)
রাফেলি ও শিয়াদের দলীলের জবাবঃ (১) আযাতে ইস্তেফাতে বোক করার দ্বারা উদেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদেশ্য হল ইস্তেফাতে বিবাহের মাধ্যমে ভোক করা। আযাতের পূর্বার্থে গর্ভনাসমূহের দ্বারা ইহৈর প্রমাণিত হয়। (রৌহ সালামী ৭৫:২) আর উক্ত আযাতের এই আইর জরুরি, পরিশ্রমিক, ভাড়া বুধানো উদেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদেশ্য হল মুহূর্তে বা তাদের মহর আদায় করা। যেমন, অন্য আযাতে ইরাশদ হয়েছে—

(নিসাঃ ২৫)

উক্ত আযাতের জরুরি শব্দ দ্বারা মহর বুধানো হয়েছে। সুতরাং বোকের জন্য জরুরি শব্দ ব্যবহার করা কোনো দোষপূর্ণ নয়।

(২) আর উক্ত ইবন কাব এবং আমাল্লাহ ইবন মাসুদ (রাঃ)-এর কিরাতীতের উক্তি হল, উক্ত আযাতে 'তাহার সেই আইর' (নিদিষ্ট সময়) দ্বারা উদেশ্য হল মূর্ত্তি। বিয়ের মধ্যবর্তী সময় বুধানো উদেশ্য নয়।

(৩) হযরত সালামা (রাঃ)-এর হাদিসের ব্যাপারে বলা যায় যে, হাদিসটি হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অপরদিকে হযরত সালামা (রাঃ) নিজেই এর বিপরীত হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর হাদিসটি বর্জনীয়। ইবন মাসুদ (রাঃ)-এর হাদিসের ক্ষেত্রে একথাই বলা যায় যে, হারাম সংক্রান্ত হাদিস দ্বারা জায়ম সংক্রান্ত হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে।

প্রাধান্য লাভের করণের আহলে সম্মত ওয়াল জামাতের মত প্রাধান্য লাভের করণ হল—

(১) মুতাব বিবাহ জায়েশ সংক্রান্ত হাদিসের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অথচ মুতাব বিবাহের হারাম সংক্রান্ত হাদিসের সংখ্যা অসংখ্য। সুতরাং অসংখ্য হাদিসের উপর আমল করতে হবে।

(২) যে সকল সাহবী জায়েশ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তীতে তাঁদের কথা থেকে ফিরে এসেছেন।

(৩) মুতাব বিবাহ জায়েশ মোহারার পক্ষে যে দলীল পাওয়া যায়, সেগুলোর উপর হারাম হওয়ার হাদিসসমূহ নিয়ম অনুযায়ী প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

(৪) অথবা, অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) দের দ্বারা তামাতু হচ্ছে কথা বলেছেন, কিন্তু রাবী হ্রদত মনে করেছেন, এটা মুতাব বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা। তাই বর্ণনায় ভুল হয়ে গেছে।
(5) প্রয়োজনের তাগিদে নবী করিম (সাঁ) তা জায়েম ফাতোয়া দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তিনি নিজেই তা হারাম ঘোষণা করেছেন।

অধিকন্তু বলা যায়, শাহ আবদুল আতিয়া (রহ) বলেন, মুতআ বিবাহকে ইসলাম কখনো সমর্থন করেনি। বরং বিভিন্ন যুগের শতকের নবী করিম (সাঁ) বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহার অনুমতি দিয়েছিলেন, যাকে নিকাহ মৌখিক বিবাহ নিকাহ মৌখিক এবং নিকাহ মৌখিক এক নয়।

(فتাওয়া উসমানী জ ৩৭ (২৭)

আব্দাল তক্কুল ইসমাইল মতে, বিভিন্ন যুগে বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে অনুমতি দেয়া হত তা নিকাহ মৌখিক (অনুমতি) হিসেবে দেয়া হত, হলো (বৈধতা) প্রদানের জন্য নয়। যেমন, অতি সুধীর অবস্থায় শুকনের গোষ্ঠ খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

(دروس ترمیمی ج ۳ ص ۴۰۴، جامع الاصول ج ۱۱ ص ۴۴۴-۴۴۵، مجمع الارواج ج ص ۲۶۶-۲۶۷، کنز الفناء ج ص ۳۲)।

আব্দাল আনোয়ার লেখেন, ইসলামে কখনো মুতআ বিবাহ বৈধ ছিল না। বরং জাহেলী যুগে যেমন বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল, ঠিক মুতআও এগুলোর মধ্যে একটি ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেহেতু হুকুম-আহকাম নামিল হচ্ছিল না, তাই জাহেলীয়ের অভাস অনুমান তাঁরা আমল করছিল। অতঃপর আন্তঃ আন্তঃ হুকুম নামিল হতে লাগল এবং অন্যান্য বিবাহের ন্যায় মুতআ বিবাহের অভাস হয়।

(فیض البکیری ج ۳۴ ص ۱۳۸-۱۳۹، چاحم الاصول ج ۱۱ ص ۴۴۴)

প্রাসঙ্গিক আলোচনার অনেকেই বলে থাকেন যে, হযরত আব্দুর রহীম ইবন আব্বাস (রাও) থেকেও মুতআ বিবাহ জায়েহ হওয়ার উদ্দিন পাওয়া যায়।

(شرح مینادی الأختام ج ۲ ص ۱۴)

কিন্তু, ফিকহের কিংবদন্তিসমূহ গতিরভাবে অধ্যয়ন করলে একথা প্রতিযোগিতায় হয় যে, খায়বর এবং আওলাস যুগে (যে সময় মুতআ নিষেধ হয়) হযরত আব্দুর রহীম ইবন আব্বাস উপস্থিত না থাকার কারণে যৌনশিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না শুধু এমন নির্মায় বাড়ির জন্য মুতআ বিবাহকে জায়েহ মনে করতেন। অতঃপর যখন তিনি (রাও) তা নিষেধ হওয়ার খবর জানতে পান, তখন তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসেন।

(نصب الرابیة ج ۳ ص ۱۸۱)
ইমাম তিরিমিয়ী (রহ.) বর্ণনা করেন—

... আল্লাহ তোমাই দেবী আল্লাহ তোমাই দেবী ।

রূখিয়া এই মন্থনে তোমাই মুন্ত আল্লাহ তোমাই দেবী আল্লাহ তোমাই দেবী ।

স্তম্ভ মুহম্মদ (রমা) ১২৩ পঞ্চ নকাশ অধ্যায়

অর্থাৎ, ... মুতআ বিবাহ ইবনে আকাবাস (রা) থেকে কিছুটা অবকাশ ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ص) থেকে বর্ণিত এইসব হাদিসের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তিনি সীমিত মত প্রত্যাহার করে নেন।

সুতরাং বুধ্ব গেল, মুতআ বিবাহ যে হারাম, এর উপর সাহবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাহাদা হিয়াদা গ্রন্থকার ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষ থেকে যে মুতআ বিবাহ জায়েহ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, মূলত তা সহীহ নয়। কেননা, হিয়াদা গ্রন্থকারের জ্ঞান, আল্লাহ তোমাই দেবী আল্লাহ তোমাই দেবী আল্লাহ তোমাই দেবী ।

কেননা মালিকিয়াদের কোন কিছু মুহম্মদ জায়েহ হওয়ার বর্ণা পাওয়া যায় না। তাহাদা ব্যাপার ইমাম মালিক (রহ.) মুহম্মদ হযরত আল্লাহ (রা) হোট মুতআ নিষিদ্ধের হাদিস বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, সীমিত মুহম্মদ হযরত আল্লাহ (রা) ঐ সকল রেখায়াতেই উল্লেখ করতেন, যা তাঁর মাহবুবের অনুকূলে ছিল।

মুতআ বিবাহ হারাম ঘোষণা হওয়ার সময়কালঃ উপরোক্ত হাদিসসমূহ সহ বিভিন্ন হাদিসগুলি অধ্যয়নের ফলে দেখা যায় যে, মুতআ বিবাহ হারাম হওয়ার সময়কাল নিয়ে বেশ অসামান্য রয়েছে।

(১) হযরত আল্লাহ (রা) এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহা ৭ম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধে হারাম ঘোষিত হয়।

(২) সাবুরা (রা) এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহা মক্‌কে বিজয়ের দিন হারাম ঘোষিত হয়।

(৩) হযরত আল্লাহ (রা) এর অন্য এক রেখায়াতঃ অনুযায়ী হুলাইন যুদ্ধে হারাম ঘোষিত হয়।

(৪) সালামা ইবনে আকওয়া (রা) এর বর্ণনা অনুযায়ী, আওয়াতস যুদ্ধে তিনি দিনের জন্য হারাম ঘোষণা হওয়ার পর তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম ঘোষিত হয়।

(৫) জবির ইবনে সাবুরা আনসারী (রা) এর এক বর্ণনা অনুযায়ী, তারুক যুদ্ধের সময় মুহম্মদ বিবাহ হারাম করা হয়।

বর্ণান্তরের মাঝে সামঞ্জস্য বিখ্যাতঃ (১) কায়ী আযাব (রহ.) বলেন, মুতআ বিবাহ খায়বরের সময়ই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ ঘোষণা তাকীদ হিসেবে বিভিন্ন
যুদ্ধে বার্বার দেয়া হয়েছিল। সুতরাং যিনি যে যুদ্ধে এই হুকুম প্রথমে শুনেছেন, তিনি
তাই বর্ণনা করেছেন।

(২') হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, মক্কা বিজয়, হুরাইন এবং
আওতাস যুদ্ধ যেহেতু একই সফরে হয়েছিল, এজন্য কেউ একে মক্কা বিজয়, কেউ
হুরাইন যুদ্ধে আবার কেউ আওতাস যুদ্ধের কথা বলেছেন।

(চপ্টা হাইদর জঃ ১০ সংবাদ ১৩৩৬-০

(৩) এ ব্যাপারে অধিক নির্ভরযোগ্য মত প্রকাশ করেছেন, হযরত আল্লামা তিল্লী
(রহ.)। তিনি বলেন, প্রথমত একবার খায়বর যুদ্ধের সময় (৭ম হিজ) মুতাব
বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর আওতাস যুদ্ধের
সময় একটি নিদর্শন সময়ের জন্য দ্বিতীয়বার অনুমতি দেয়া হয়। অতঃপর চিরকালের
জন্য এ ধরনের বিবাহ হারাম ঘোষণা দেয়া হয়। ইমাম শাফেকী ও ইমাম আবু
হানিফা (রহ.) সহ জমকুরের অভিমতও তাই।

(হাসায়ে সন্দি তরুণে আল্লামা হামিদ আল হুসেন জঃ ১০

২৮৩ বাবু মেহের উল্লিখিত ছি

... হে অল্লামা তোমাদের নিকট হইলে তোমাদের দরকার নির্ধারিত হইবে
(তফসীলি জঃ ১০৫ পৃথক মেহের উল্লিখিত ছি)

অনুবাদঃ ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি
তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে সে, আর যে ব্যক্তি সামী তালাক দেওয়ার পর
পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছায় তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিয়ে তার জন্য হালাল করে
নেয়, তারা উভয়েই অভিশপ্ত।

বিশ্বেষণঃ মুহারর বলা হয়, দ্বিতীয় সামীকে, আর মুহারর বলা হয় প্রথম সামীকে।

(মোতাবেক ১০৭ পৃথক)

তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে যদি প্রথম সামী ফিরিয়ে আনতে চায়, আর এক্তরে
বিশ্বেষণ: নিকট সামী যদি এই শর্তে এ তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে বিয়ে করে যে, সহবাসের পর
তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এই বিয়ে কটাকট কার্যকরী হবে এ নিয়ে
ইমামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম মালিক, শাফেকী, আহমদ, ইসহাক, নাখস, কাতাদা, লাইস (রহ.)সহ
জমকুরের মতে, যদি দ্বিতীয় সামী এই শর্তের উপর বিবাহ করে যে, সহবাসের পর
ক্রীত তালাক দিয়ে দেবে, অথবা কেবল প্রথম সামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে
বিবাহ অধ্যায়

ধোঝি করে থাকে, তাহলে উভয় বিয়ে শুরু হবে না এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে না। (ঋষীভক্তিতে)

ধোঝি (১): অনুচ্ছেদের গুরুত্বে হযরত ইবন মাসউদ (রাহ)-এর বর্ণিত হাদিস। উভয় স্বামীতে তার উপর অভিচারের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা যে একটি কত বড় মন্দ বিষয় তা সহজেই অনুময়ে। আর বিবাহ হালাল হওয়া একটি বিশাল নেয়ামত।

সুতরাং এর কোন নির্দিষ্ট শর্ত থাকতে পারে না।

ধোঝি (২): হযরত আমূল্লাহ ইবন উমর (রাহ) থেকে বর্ণিত হাদিস-

"তার উমর বা নাতির অন্য একবার হলে কি জানা রাখলে এসে এনে এলে তিন একদিন তাদের মোড়ে মোড়ে তিনি তালুক দিয়েছে। অতঃপর এ মহিলাকে তার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বিয়ে করে ফেলেছে, যাতে সে এই মহিলাকে তার ভাইরের জন্য হালাল করে দিতে পারে। এই মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? উভয়ঃ তিনি বললেন, না। তবে আগ্রহের বিয়ে ব্যতিক্রম। আমরা ভে এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাহ) এর যুগে যিনা গণ্য করতাম।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, যে কোন শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে শুরু হয়ে যাবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। তবে শর্ত হল, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সম্মান হবে। (কিন্তু এমন শর্ত সাপ্তাহিক বিবাহ মাকরন তাহরীম)

(বিজয়নবীর রাজাকর্ম, সং ৮)

ধোঝি (১): আলহার তাআলার বাণী-

"তার উমর বা নাতির অন্য একবার হলে কি জানা রাখলে এসে এনে এলে তিন একদিন তাদের মোড়ে মোড়ে তিনি তালুক দিয়েছে। অতঃপর এ মহিলাকে তার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বিয়ে করে ফেলেছে, যাতে সে এই মহিলাকে তার ভাইরের জন্য হালাল করে দিতে পারে। এই মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? উভয়ঃ তিনি বললেন, না। তবে আগ্রহের বিয়ে ব্যতিক্রম। আমরা ভে এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাহ) এর যুগে যিনা গণ্য করতাম।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, যে কোন শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে শুরু হয়ে যাবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। তবে শর্ত হল, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সম্মান হবে। (কিন্তু এমন শর্ত সাপ্তাহিক বিবাহ মাকরন তাহরীম)

(লেখক বাইরের রাজাকর্ম, সং ৫৮)

ধোঝি (২): হযরত ইবন মাসউদ (রাহ) থেকে বর্ণিত হাদিস-

"তার উমর বা নাতির অন্য একবার হলে কি জানা রাখলে এসে এনে এলে তিন একদিন তাদের মোড়ে মোড়ে তিনি তালুক দিয়েছে। অতঃপর এ মহিলাকে তার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বিয়ে করে ফেলেছে, যাতে সে এই মহিলাকে তার ভাইরের জন্য হালাল করে দিতে পারে। এই মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? উভয়ঃ তিনি বললেন, না। তবে আগ্রহের বিয়ে ব্যতিক্রম। আমরা ভে এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাহ) এর যুগে যিনা গণ্য করতাম।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত হল, যে কোন শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে শুরু হয়ে যাবে এবং প্রথম স্বামীর জন্যও হালাল হবে। তবে শর্ত হল, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সম্মান হবে। (কিন্তু এমন শর্ত সাপ্তাহিক বিবাহ মাকরন তাহরীম)।
বিবাহ অধ্যায়

লা জোহিয়া, قَامِرَةَ عِمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلَّقَهَا وَأَوَعَدهَا يَعِلاَقَةً إِنَّ

(مصنف عبد الرزاق ج ۲۱۷)

অর্থাৎ, ইবন সীরান (রহ.) বলেন, এক মহিলা এক লোকের কাছে খবর পাঠাল, অতঃপর মহিলাটি সে পুকুরটিকে বিয়ে করে ফেলল, যাতে নিজেকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে নিতে পারে। তখন উমর (রা) সে লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন তার বিয়ে ঠিক রাখে, এ মহিলাকে তালাক না দেয় এবং তিনি তাকে শাস্তির ভয় দেখাতেন, যদি তাকে তালাক দেয়।

উক্ত হাদীসের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে হলাল করার শর্ত নাজায়েন হওয়া সত্ত্বেও আকদ সম্পাদিত হয়ে যায়। তাই হযরত উমর (রা) উক্ত বিয়েকে ভেঙে দেননি। হযরত আবু হানিফা (রহ.) বলেন, শর্ত ফাসেদের দ্বারা বিবাহ ফাসেদ হয় না, বরং শর্ত বাতিল হয়ে যায় এবং বিবাহ সীমাহীন হবে।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ হযরত ইবন মাসউদ (রা)-এর হাদীসের জবাব দিতে গিয়ে আহানাফগণ বলেন, লক্ষ্যীর বিষয় হল এই যে, উক্ত হাদীসে মুহাররিন এবং মুহার শর্ত ব্যবহৃত হয়েছে। আর শর্ত দুটির মধ্যে বিয়ে হলাল থেকে উৎকৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং মূল হাদীসটিতে একথার দলীল যে, এ মহিলার বিয়ে হলাল হবে এবং প্রথম স্বামীর জন্য হলাল হবে। নতুনা হাদীসে মূল হলাল হবে এবং শর্ত শর্তের উল্লেখ করা হত না; বরং অন্য শর্ত উল্লেখ করা হত। তবে একথা সত্য যে, তাদের উপর যেহেতু লানত করা হয়েছে, তাই এমন কাজ করা মানুষকে আহানাফগণও।

(দুর্গ-খুনাজ জ ۲۸)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ (১) হযরত ইবন উমর (রা)-এর উক্তিতে যিনার সাথে এই আমলটির উপমা শুধু হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে, বিয়ে সম্পাদিত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। এর সমর্থন এর দর্শন হয় যে, হযরত ইবন উমর (রা) এই ব্যাপারে স্বামী-শ্রীকে বিচ্ছেদের কোনো ক্ষেত্রে দেখনি।

(২) হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ। আর হানাফীগণের দলীল হল কুরআন। সুতরাং কুরআনের মুকাবিলায় খবরে ওয়াহিদ দলীলযোগ্য নয়।

(দুর্গ-খুনাজ জ ۲০)
বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির পাত্রী দেখা

১. নবী করিম (সা) বলেন,-

রসূল সালেহিন তাকে তাঁর মুহাম্মদ নিয়ে বিবাহ করেন এবং তিনি বিবাহের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে এসেছেন।

২. নবী করিম (সা) বলেন,-

রসূল সালেহিন তাকে তাঁর মুহাম্মদ নিয়ে বিবাহ করেন এবং তিনি বিবাহের উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে এসেছেন।
* ইমাম মালিক (রহ.) হতে আরেকটি অভিমত পাওয়া যায় যে, পাত্রের অনুমতি সাপেক্ষে দেখা জায়ে আছে। (মরফা: ৫ সৗ ১১১)

* ইমাম আবু হানিফা, শাফেই, আহমদ, ইসহাক, হাসান বসরী, আওয়াই, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) প্রমুখের মতে, প্রক্ষেপিত করেন তার অনুমতি সাপেক্ষে অথবা অনুমতি ব্যতীতই দেখা জায়ে। শুধু জায়ে নয়, বরং দেখা মুক্তাহাব এবং উত্তম। আল্লামা নব্বী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমতও জমহুরের অনুরূপ, অথবা কনের অনুমতি ছাড়াও দেখা জায়ে আছে। (মরফা: ৫ সৗ ১১২-১১৩, শরহ নোয়েজ ১ সৗ ৪০৬)

উল্লেখ যে, পাত্রের চেহারা এবং উভয় হাতের তালুক্য দেখার অনুমতি রয়েছে। অন্য কোন অঙ্গ দেখা জায়ে নয়। যদি অন্য কোন অঙ্গের ব্যাপারে সম্প্রদায় হয়, তবে কোন বিশৃঙ্খল মহিলা পাঠানো যেতে পারে। (دروش مشکوطة: ৫ সৗ ৫৬)

দলীল (১) অনুচ্ছেদের গুরুত্বে হযরত জাবির (রাশি) এর বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) অনেক হোড়া হযরত জাবির (রাশি) এর বর্ণিত হাদিস। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা)-এর নিকট ছিলাম। এক ব্যক্তি নবী করিম (সা)-এর নিকট এসে জানাল যে, সে আনসার এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। নবী (সা) লোকটিকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? লোকটি বলল, না। নবী করিম (সা) বললেন, যাও, তুমি তাকে দেখে নাও।

ফলস্বরূপ নবী করিম (সা) দেখার জন্য নির্দেশনায় শব্দ ব্যবহার করেছেন।

দলীল (৩) অনেক হোড়া হযরত জাবির (রাশি) এর বর্ণিত হাদিস। তিনি এক রমণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন নবী করিম (সা) তাকে বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ, ইহা তোমাদের উভয়ের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য অধিক সহায়ক হবে।
দলীল (৪): মুহাম্মদ ইবন সালামা (রা) হতে বর্ণিত -
সুন্নর রসূল ল্যান্ড রসূল ল্যান্ড রসূল ল্যান্ড রসূল ল্যান্ড এড়া তোমার তোমার তোমার তোমার তোমার তোমার 
কোন কোন কোন কোন কোন কোন 
কোন কোন কোন কোন কোন 
কোন কোন কোন কোন 
কোন কোন কোন কোন 

কান্ড না তাম্মল হয়েছে মস্তক চুম্বকের তাম্মল চুম্বকের তাম্মল চুম্বকের তাম্মল চুম্বকের 
অর্থাৎ, আমি রাসূল ল্যান্ড (সাহ)কে ইরশাদ করতে দেনি যখন আল্লাহ তাকে আল্লাহ তাকে আল্লাহ তাকে আল্লাহ তাকে আল্লাহ তাকে 
তোমাদের কাছে কোন মহিলাকে বিয়ে করার বিষয় জানতে করেন, তখন তাকে দেখাতে কোন অনুমতি নেই। (এক রেয়ায়াতে আছে, যদিও তা কোনের জন্য দেখা তোকে না করে)
উপরোক্ত হয়, দলীল তারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখা নায়কের যোগ; রয়ে দেখা জানের ও মূজাহাদের জন্য।
জবাবে অর্থাৎ যারা দলীল হিসেবে হয় তার আল্লাহ রবিয়ে (রা) এর যে হাদিস লেখাকে 
করেছেন, এর জবাব হল - রক্ষার হাদিসে রক্ষার হাদিসে রক্ষার হাদিসে রক্ষার হাদিসে 
ীরা মুহাম্মদের প্রতি 
দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে, যাকে বিবাহ প্রস্তাব অথবা বিবাহ করার কোন ইচ্ছা 
নেই। কিন্তু যদি কোন নির্দিত মহিলাকে বিয়ে করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকে, তাহলে 
তোমাদের কাছে নিষেধ নেই। হাদিস মূজাহাদের তারা তার প্রমাণিত হয়। (অন্তরের ঝর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

২৮৪ঃ বাবের পীর উল্লাহ বা অভিভাবক

... উদ্দেশ্য হলে রাজাত তালুর রসূল ল্যান্ড রসূল ল্যান্ড রসূল ল্যান্ড রসূল ল্যান্ড এড়া তোমার তোমার তোমার তোমার 
কোন কোন কোন কোন 
কোন কোন কোন 
কোন কোন কোন 
কোন কোন কোন কোন 

কান্ড না তাম্মল হয়েছে মস্তক চুম্বকের 
অনুবাদঃ ... আলিশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ল্যান্ড সাহ) ইরশাদ 
করেছেন, যদি কোন জীলায় তার অভিভাবকের অনুমতি বাচিত কাউকে বিবাহ 
করে তবে তার বিবাহ বাতিল হবে। তার তিনি এই উক্তীকে তিনি বাচিত কাউকে 
করার সূত্রে সহস্রাব্দ করে তবে ঐ সহস্রাব্দের কারণে তার বিবাহ বাতিল হবে। 
আর এর উক্তি এরূপ অভিভাবক যদি এ সম্পর্কে মতবিরোধ 
করে তখন দেশের সরকার তার অভিভাবক হবে। মেনে যা কোন অভিভাবক 
নেই, দেশের সরকার তার অভিভাবক।
বিশেষণে ওলী (উল্লেখ)-এর আভিধানিক অর্থ

আল্লাহর শক্তিটি একীভূত। এটি ছিফাতের সীগা। এর বহুবচন হচ্ছে । শক্তিটি আল্লাহর মানুষ থেকে উদ্ভূত। অবিভুক্ত এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যাপ্ত হয়। যেমন-

১. ফাতাহ রাজি-বন্ধু। যেমন, আল্লাহর বাণী-নিশ্চয় তখন কে আপনার সাথে যে ব্যক্তির একীকরণ হয়, তবে আল্লাহর ব্যাখ্যা তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই।

২. নালাক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- নিশ্চয় তার আল্লাহ ব্যাখ্যা তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই।

৩. রোপ-প্রতিপালক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- কোন আল্লাহ ব্যাখ্যা তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই। (আনআমঃ ১৪)

৪. আল্লাহর বাণী-নিশ্চয় তখন কে আপনার সাথে যে ব্যক্তির একীকরণ হয়, তবে ওলী শনির সর্বন্তরাধিকারী অর্থ হল অভিভাবক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- 

৫. মালিক হওয়া। যেমন বলা হয়- ফলান আল্লাহর বাণী, অর্থ হল অভিভাবক। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- 

ওলীর পরিভাষাকার সংজ্ঞা:

১। নামক গ্রহণ বলা হয়েছে আল্লাহর বাণী, ইচ্ছায় বা অন্যতম যেখানে তথ্য অন্যের উপর কর্মকর্তা হয়, তাকে ওলী বলা হয়।

২। কিছু বৈশ্বিক বলা হয়েছে আল্লাহর বাণী, যার কথা মানুষের উপর বাজারিত হয়। এতে সে রাজি থাকুক বা অস্বীকার করুক।

৩। ওলীর বলার ব্যক্তি-কিলিন বলা। যার কথা ইচ্ছায় বলা হয়েছে আল্লাহর বাণী, তাকে ওলী হলেন ঐ ব্যক্তি যার উপর কোন বস্তু বা লেনদেনের বিশ্বদর্শন স্বীকৃত হয়, ফলে তাকে ছাড়া ঐ বস্তুটি শুধু হয় না।
বিবাহ অধ্যায়

৪৭৪

৪। আল্লামা ইবনুল হুমায়ুন বলেন— আল্লাহ হোমন দূর দূর প্রকাশ করেন জানো যে, ওলী বলা হয় যিনি বোধশক্তিসম্পন্ন, প্রাতুকবিক এবং উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগাতা রাখে।

বা ওলীর প্রকারভেদঃ বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকতৃত্ব দু'প্রকার। যথা-

১। বলপ্রযোগের ক্ষেত্রে অভিভাবকতৃত্ব।

২। বলপ্রযোগের ক্ষেত্রে অভিভাবকতৃত্ব।

উল্লেখ যে, বলপ্রযোগের ক্ষেত্রে অভিভাবকতৃত্ব চারটি উপায়ে সাব্যস্ত হয়। যেমন—

১) আজ্ঞার দ্বারা

২) মালিকানা দ্বারা

৩) প্রত্যাশি দ্বারা

৪) নেতৃত্ব দ্বারা

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি:

এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, বলপ্রযোগের অভিভাবকতৃত্ব কোন ধরনের নারীর উপর প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ যে, এক্ষেত্রে মহিলাদের চারটি প্রকার রয়েছে—

১) তথা বালোগা অকূমারী। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বিয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।

২) বারুক্ত স্বীকৃত তথা নাবালিকা বামারী। এ ব্যাপারেও সকলেই একমত যে, বিয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের প্রয়োজন রয়েছে।

৩) বারুক্ত স্বীকৃত তথা বালিকা বামারী। ইমাম শাফেইeq (রহ.)-এর মতে এমন মহিলার অভিভাবক প্রয়োজন এবং ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে প্রয়োজন নেই।

৪) নাবালিকা স্বীকৃত তথা নাবালিকা অকূমারী। ইমাম আবু হানিফার (রহ.)-এর মতে এমন মহিলার অভিভাবক প্রয়োজন এবং ইমাম শাফেইeq (রহ.)-এর মতে প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ যে, এখানে কূমারী (বাবুক্ত) বলতে এমন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যে নারী কোন দিন যেকোন উপায়ে সহায়ে লিঙ্গ হয়নি এবং তার মৌননাকের এক ধরনের পাতলা পর্দা ফাঁকে হয়নি। সে বালিকা হেক অথবা নাবালিকা 'হেক। আর অকূমারী (বিশেষ) বলতে এর বিপরীত দিকটি বুঝানো হয়েছে।
* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, শান্তি বাধাপ্রয়োজন হওয়ার মাপকাঠি হল বকাত বা কুমারীতা। অতএব, মহিলা যদি কুমারী হয়, সে বালেরা হোক অথবা নাবালেরা হোক, অভিভাবক ইচ্ছা করলে মহিলার অনুমতি বাধ্যতা তাকে বিবাহ দিতে পারবে। আর যদি কুমারী হয় তাহলে মহিলার অনুমতি বাধ্যতা বিয়ে দিতে পারবে না। সে বালেরা হোক অথবা নাবালেরা।

* পশ্চাতের ইমাম আহমদ আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অভিভাবকদের মাপকাঠি হল চতুর বা আলমবস্ত। অতএব মহিলা যদি অন্নালবস্ত হয়, সে কুমারী থাকুক বা অকুমারী থাকুক, অভিভাবক ইচ্ছা করলে তার অনুমতি বাধ্যতা বিবাহ দিতে পারবে। আর যদি মহিলা বয়স্কা তথা বালেরা হয়, চাই সে কুমারী থাকুক বা না থাকুক, তার উপর অভিভাবকের কোন বল প্রয়োগ চলবে না। এমন মহিলা যদি অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যতা নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলে তাহলে তা কাফরকী হবে।

(بدائع الصفاعت ج ۲ ص، ۲۴۱، فتح القدر ج ۲ ص، ۱۲۱)

অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যতার বিয়ের হুকুম (حكم الذكاح يقتضي إذا ولى)

সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, অন্নালবস্ত, জান-বুজ্জিহীনা ও দাসীর বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যতা গুহ্য হবে না।

তবে স্বাধিন, প্রাণীবস্ত ও বুজ্জিবিবেকসম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যতা গুহ্য হবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হামল, ইসহাক, ইবন হুমহ (রহ.) ও জামহুরের মতে, এ ক্ষেত্রে মহিলাদের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি বাধ্যভুমি গুরুত্ব হবে না।

(بداية المجتهد ج ۷ ص، ۴۴۹، الملفي ج ۷ ص، ۴۵۱)

দলীল (۱) আল্লাহ তাআলার বাণী- وَأَنْفِخُوا الْأَكْبَلِي مِنْكُمْ -অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। (নূর: ۳۲)

উল্লুক আয়াতটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অভিভাবকদেরকে সম্প্রতি করা হয়েছে, যেন মহিলাদেরকে বিবাহ দিয়ে দেয়। সুতরাং রুখা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজেদের কোন অধিকার নেই, বরং এর ফলস্মাদার হচ্ছে অভিভাবকগণ।
দলীল (২) আল্লাহ তাআলার বাণী-

ফালকেহুন্ন পিনান আলীহান

অর্থাৎ, অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর। (নিসাঅ ২৫)

উক্ত আয়াতেও বিয়ের জন্য পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদি মহিলাদের অধিকার থাকত, তাহলে তাদের কথাও উল্লেখ থাকত।

দলীল (৩) অনুচ্ছেদের সূত্রে বর্ণিত হাদিস।

...(৪)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, স্বাধীন, প্রাত্যাহরণ ও রুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন মহিলার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত শুধু হবে। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবক হওয়ার সুযোগ এবং উপস্থাপন করে। উল্লেখ যে, ইমাম আয়াম ও সাহেবািনের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে কুফু (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমতা) হওয়ার ব্যাপারে অনেক রেওয়ায়ের বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কিংবা তাদের অধিকার তাদের ফলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তই উপরিত হওয়া যায় যে, সমতা না হলেও বিবাহ শুধু হবে যাবে। (ফ্যাট ফিকুর ৩৫ এবং ৩৬, সুবিন হাফিজ ২ ও ৩, ভ্রম এবং সর্পিল ৫, ১০)

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-

বা বলুন বেগলানে আলীহান না জানার উপরে ফি আনসেহান পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই উল্লোনুন পাই 

অর্থাৎ, অতঃপর তারা (মহিলারা) যখন ইন্দ্র পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিগত ব্যবহার নিলে তাদের তাদের কোন পাপ নেই। (বাকারাঙ্গ ২৩৪)

উক্ত আয়াতেও প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ মূলত মহিলাদের কাজ এবং তাদের নিজেদের বিবাহ নিজেরাই করতে সক্ষম।

দলীল (২) আল্লাহ তাআলার বাণী-

ফানুন রোজ না তেলার হুন ব্যাপার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার জুজুর দেখার 

অর্থাৎ, তোমরা যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়র্ধের) তালাক দেয়, তবে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্ত্রী বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঙ্গ ৩৩০)

উক্ত আয়াতেও বিবাহের সম্পর্ক মহিলার দিকে করা হয়েছে। অভিভাবকের দিকে নয়।
দলীল (৩) ... 

اسلام بن سعد البصري أسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ...

جاكته امرأة فقالت يا رسول الله أنت قد وجبت نفسها للفت قيامًا طويلاً 
فقال رجل فقال رجل فقال يا رسول الله زوجتهها إن لم تكن لك بها حاجة 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتهها يمًا معك من القرآن 
(ابو داوود ج 1 ص 287 باب في التزويج على العمل يعمل، بخاري ج 2 ص 776 باب عرض المرأة نفسها 
الخ ص 471 ص 457 باب الصداقة ووجوز كونه الخ، ترمذي ج 1 ص 211 باب مهور النساء 
نسائي ج 2 ص 88 باب هبة المرأة نفسها الخ، ابن ماجة ص 137) 

أرخاً ... ساحل ابن سعد الابن السعيد (را) هذه قرية. هذا ابن بن بن، راكان لشا (س) Classified in 100 يتفاوض مع 300 تبادل خبرة من 400 يتفاوض مع 400 تبادل خبرة من 400 يتفاوض مع 400 

أمم ... 

عند ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الام ج 4 

アクビه بنفسه من دينته والبكير تسوق في نفسها وذنها صمائها - (ابو داوود 

م 287 باب في النسب، مسلم ج 1 ص 455 باب استبدال الفتاح في التكاثر، ترمذي ج 1 ص 211 باب 

استبدال الفتاح، نسائي ج 2 ص 476 استبدال البكر في نفسها، ابن ماجة ص 136) 

أرخاً ... إسحاق ابن عباس (را) هذه قرية. هذا ابن بن بن، راكان لشا (س) Classified in 100 يتفاوض مع 300 تبادل خبرة من 400 يتفاوض مع 400 تبادل خبرة من 400 يتفاوض مع 400 

أمم ... 

عند عائشة ألم زوجته خفصة بنت عمرو الرحمق ابن أبي بكر (ج 5) 

مع مهدي بن زبيـر وعبد الرحمن غريب - (طحاوي ج 2 ص 1)
অর্থাৎ, হয়ত আরিশা (রাষ) স্বীয় তাতিজি হাফসা বিনত আমুর রহমান ইবনে আবু বকরের বিয়ে তার পিতার অবতর্ণনে মুনিয়র ইবনে যুবারের (রাষ)-এর সাথে দিয়েছিলেন।
উক্ত হাদিসেও পরিলক্ষিত হয় যে, এ বিয়েটিও হয়েছিল অভিভাবক ছাড়া।
যুক্তিভিত্তিক দলঃ যুক্তিও বলে যে, নারী একজন স্বাধীন মানুষ। তাই তার স্বীয় সম্পদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃকের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। নতুনা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার হক নষ্ট করা হয়।
সুতরাং কুরআনের বাণী, বিভিন্ন হাদিস ও যুক্তি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বালোক মেয়ের বিবাহ অভিভাবক ব্যতীতও উদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও ফেতনা থেকে পরেগে করার জন্য অতি উদ্দেশ্য হল অভিভাবক উপস্থিত থাকা।

প্রতিপক্ষের দলঃ

আয়াতের জবাবঃ আয়াতে বর্ণিত "অয়ামিএ" শব্দটি (ٰ) এর বহুবচন। এর অর্থ হল "মন নে রে ভাবিন" বা অর্থাৎ, যার কোন জীবনঙ্গী নেই। পুরুষ হেক অথবা মহিলা। সুতরাং এমতাবস্থায় আয়াতের উদেশ্য হল- পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য উম্ম পা হল এই যে, তারা যেন অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত আন্তর্যাত্মা না হয়। কিন্তু যদি অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করে ফেলে তাহলে কি হবে, এ বাপারে আয়াতে কিছুই বলা হয়নি। অতঃপর "অয়ামিএ" দ্বারা যেহেতু বালোক পুরুষ-মহিলা উভয়ই শামিল। আর বালোক পুরুষের বিবাহ যেহেতু অভিভাবকের মাধ্যম ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে জানুয়ারী হয়, সুতরাং বালোক মহিলার বিবাহও অভিভাবকের মাধ্যম ব্যতীত জানুয়ারী। আয়াতের উদেশ্যও তাই। যদিও সুন্নাতের পরিপরা কাজ করার কারণে মেয়ে হিসেবে একটু বেশি নিরোধ হবে। এটা ভিন্ন কথা।

(সুরারুফের বৃত্তি ৬ সুরা ৪০৯)

"ফানিকহুর বাদন উল্লেখন" (২) আয়াতের জবাবঃ এই আয়াতটি মূলত স্বাধীন মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে না। বরং স্বাধীন মহিলাদের বিবাহের জন্য অন্য সুপ্রস্তু আয়াত রয়েছে। যে হানাফীগণ প্রথম দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বরং উক্ত আয়াতটি (ফানিকহুর) দ্বারা তো হানাফীগণের অভিমত প্রমাণিত হয়। কেননা, উক্ত আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, একজন মহিলা তার বাধ্যের ক্ষেত্রে বিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে। কারণ, আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে অহেল শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর শব্দটি (ব্যাপক), পুরুষ মহিলায় হোক অথবা মহিলায় মালিক হোক।

(আহকাম আলরাষর্মি ৩২ সুরা ৩২)
(৩) হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিসের জবাবঃ
ক. উত্ত হাদিসে হযরত ছোট নাবালগো মেয়ে অথবা দাসীর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ
যদি কোন ছোট মেয়ে অথবা দাসী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করে ফেলে, তাহলে সে
বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। একথা তো আহমাদরাও বলে থাকেন।
খ. অথবা, প্রথম এগুলি ফিরিয়ে দিন এগুলি বলে হয়েছে, এই বিবাহ বেশিদিন হয়।
ফিরিয়ে দিন এগুলি বলে হয়েছে, এই বিবাহ বেশিদিন হয়।
না, বরং অতীতে অর্থাৎ তা বাতিলের দিকে গড়াবে।
গ. অথবা, বিবাহ হয়ে যাবে সত্যা, তবে এমন বিবাহ কায়েদাযুক্ত নয়। যেমন, পবিত্র
কুরআনে বলে তাই রেখানো হয়েছে। রিইলা মাই খুল্লিত হাতে বাতিল হয়, হে
আমাদের রব। এসব তুমি নির্ধারিত সূত্র করিনি। (আলে ইমরানঃ ১৯১)
ঘ. আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিসে এমন লিখিত পাওয়া যায় যে, অভিভাবকের অনুমতি
ব্যতীতও বিবাহ হয়ে যায়। যেমন, হাদিসে উল্লেখ রয়েছে: ফেরান তোমরা ফাল্লো পেরে।
অর্থাৎ, “আর যদি তার সাথে সহবাস করে তবে ঐ সহবাসের কারণে তাকে মহর
দিতে হবে।” সুতরাং বিবাহ যদিও শুধুই না হয়, তাহলে মহর কেন ওয়াজিব হবে?
২. অথবা, অভিভাবক ঘরে সাত, ২. অথবা, অভিভাবক ঘরে সাত, পাক উদেশ্য হবে। অর্থাৎ, মহিলা নিজের সত্তার
সত্যা, তবে হাদিসের অর্থ হবে, যদি মহিলা ঈসায় রাজি না থাকে, তাহলে
বিবাহ মূল্য হবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে।
৫. তাছাড়া হযরত ইবন আকবাস (রাঃ)-এর হাদিসটি সনদের ভিত্তিতে অধিক
শক্তিশালী হওয়ার কারণে আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিসের উপর অগ্রাহ্য পায়।
কেননা, ইবন আকবাস (রাঃ)-এর হাদিসটি কারারী ও মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ
আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিসটি তাতে উল্লেখ নেই।
৬. কোন বর্ণ্যন্তরীয় যদি বিবাহ করিয়ে রেওয়ায়েয়ের বিপরীত আমল করে, এতে প্রমাণিত
হয় যে, তার রেওয়ায়ের আমল করার আর যোগ্যতা রাখে না, বরং তা রহিত
হওয়ার দলীল। সুতরাং ঈসায় আয়িশা (রাঃ) যেহেতু আপন ভাইতে অভিভাবকের
অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়েছেন, তাহলে উক্ত হাদিসটি ধরা কেন দলীল
গ্রহণযোগ্য হয় পায় না।
জ. সর্বোপরি, আয়িশা (রাঃ)-এর হাদিসটি সনদের দিক থেকে মতানৈক্য রয়েছে। যা
তিরিক্ষি এবং তাহরীতে বিশ্বাস উল্লেখ রয়েছে। (নুরিদি ১ খৃস্তাব্দ ৩০, তথায় খৃস্তাব্দ ২ খৃস্তাব্দ)
(৪) আরু মুসা (রাঃ)-এর হাদিসের জবাবঃ
ক. উক্ত হাদিসটি মুতাবিল এবং মূরসাল হওয়ার ব্যাপারে বেশ মতানৈক্য রয়েছে।
সুতরাং এ হাদিসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (নুরিদি ১ খৃস্তাব্দ ৩০)
অর্থাৎ, বিয়ে তো হয়ে যাবে, তবে অভিভাবকের অনুপস্থিতির কারণে তা অপূর্বৈক রয়ে গেল। যেমন বলা হয় না, টায় নামান্তরায়ে মনে লিখতে হলে, এখানে মূলত পরিপূর্ণ ইমান বুঝানো উদ্দেশ্য।

গুরু, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী- উক্ত হারাসে বোলেন (যেহেতু অভিভাবক) শব্দটি মুক্ত (অনিদি বিশেষ), যা তাকায় না-সূচক (লি) শব্দের অধীনে পরিষ্কার হয় ব্যাকরণ-এর ফায়েদাটা দিবে। সুতরাং এর অর্থ হবে, বিয়েতে যদি কোন প্রকার অভিভাবক না থাকে, তাহলে বিয়ে সহীহ হবে না। অর্থ ব্যাখ্যা করা হলো, বয়স্ক ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা নিজেই নিজ সত্ত্বার অভিভাবক। অতএব, বিয়েতে মহিলা স্বয়ং রাজি না থাকলে বিয়ে শুরু হবে না।

(নীল শৈলী)

২৮৭ স্বর্ণ পরিমাণ মহর

বাবু প্লেলির মহর- চল বিয়ে তো হয়ে যাবে, তবে অভিভাবকের অনুপস্থিতির কারণে তা অপূর্বৈক রয়ে গেল। যেমন বলা হয় না, টায় নামান্তরায়ে মনে লিখতে হলে, এখানে মূলত পরিপূর্ণ ইমান বুঝানো উদ্দেশ্য।

বাবু প্লেলির মহর- চল বিয়ে তো হয়ে যাবে, তবে অভিভাবকের অনুপস্থিতির কারণে তা অপূর্বৈক রয়ে গেল। যেমন বলা হয় না, টায় নামান্তরায়ে মনে লিখতে হলে, এখানে মূলত পরিপূর্ণ ইমান বুঝানো উদ্দেশ্য।

মহরের আভিধানিক অর্থঃ "মোহর" শব্দটি বাবু বাবুর বিয়ের মাধার।

ইহো মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর

রধো মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর বা মোহর

মোহরের আভিধানিক অর্থঃ তাছাতে আধুনিক বাবু বিয়ের মাধার।
মহরের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

১। হো উচ্চারণে উচ্চারণে স্বাভাবিক রূপে, যেমন, ইরশাদ হচ্ছে, ব্যাখ্যা দিতে হলে এটি আরো অর্থময় হয়।

২। আরো একটি কিছু বলা হয়, যেমন, ইরশাদ হচ্ছে, এটি সম্ভবত একটি সমান্তরাল চিহ্ন।

৩। কিছু বলা হয়, যেমন, ইরশাদ হচ্ছে, এটি সম্ভবত একটি সমান্তরাল চিহ্ন।

৪। কিছু বলা হয়, যেমন, ইরশাদ হচ্ছে, এটি সম্ভবত একটি সমান্তরাল চিহ্ন।

৫। কিছু বলা হয়, যেমন, ইরশাদ হচ্ছে, এটি সম্ভবত একটি সমান্তরাল চিহ্ন।
অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনের সময় স্বামী কর্তৃক কীর্তি বা প্রদান করা হয় তাই মহর।
মোটরূপে হল, বৈবাহিক সম্পর্কের সময় স্বামী কীর্তির বিশেষ অঙ্ক থেকে স্নাত উপভোগ
করার বিনিময়ে কীর্তি যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকেই মহর বলে।

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ: মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে উলামাদের মাঝে কোন
মতবিরোধ নেই। তার স্বামী-কীর্তির পারস্পরিক সম্মতির উপর নির্ভরশীল। তবে
অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে, সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে অথবা
মানুষকে দেখানোর নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক, অহংকারশীত অথবা প্রতারণার
লক্ষে এতে বেশি মহর ধারা করা ঠিক হবে না, যা আদায় করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক।
কিন্তু মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবদন রয়েছে।

* ইমাম শাফেকে, আহমদ, সুফিয়ান সাওরি, ইসহাক (রহ.) প্রমথের মতে, মহরের
সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নেই। তাঁদের নিকট বিবাহ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়।
তাই স্বামী-কীর্তি একাধারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবে। উভয়ের সন্তুষ্টির
দ্বারা এর পরিমাণ কম হোক অথবা বেশি হোক এটা তাঁদের ব্যাপার। এমনকি
তাঁদের নিকট প্রত্যেক ঐ সকল মাল ও সম্পদ মহর নির্ধারণ করা যাবে, যা ক্রয়-
বিক্রয়ের মূল্য হওয়ার যোগাযোগ রাখে।

(শর মুহম্মদ ৫২ সং ৬৮৫-৬, মাগি ৬২ সং ২৮৫)
উলুলকে যে, আলামা ইবন হুম (রহ.)-এর মতে, প্রায় প্রত্যেক জিনিসই মহর হতে
পারে। এমনকি পানি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। এখানে বিক্রি জায়ে হোক অথবা না
হোক।

(المحلى ৯৬ সং ৪৯৪)

ইমাম শাফেকে (রহ.)-এর দলীল:
দলীল (১): অনুজ্ঞদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসে দেখা যায় যে, নবী করীম (সা) আবু রহমান ইবন আওফকে মহরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি
(রাখ) উত্তর দেন, এক নাওয়া পরিমাণ স্পর্শ এতে বুঝা যায় যে, মহরের নিদিষ্ট
কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই।

(রাখ) 

... এই জাবির ব্ন উবাই; আল্লাহ আমায় তাঁর সেবক হেন যে তাঁর মুভ কাল মনে
অগ্রী হয় এই সুখের মাঝে কাবীয়ে সুনরিয়া বা তুম আমায় হেন করা হয় এবং
কাল কোন তাঁর আত্মীয় সেবক হেন যে তাঁর মুভ কাল মনে

(২):

হাদিসের অর্থ হল, জাবির ইবন আবু উল্লাহ (রাখ) নবী করীম (সা) হতে বর্ণন করেন।
তিনি ইরশাদ করেছেন যে যদিও তাঁর কীর্তি মহর হিসেবে দুই অংশ আটা বা
খেজুর প্রদান করে, তবে তাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। জাবির (রাখ) অর্থ একটি হাদিসের
দলীল (৩): হযরত আমার ইবন রবীআ (রা) এর হাদিস—

"ইন আমারা মনে নির্দেশি ফসারাত তুরাজ হয়েছিল ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা রহমান ওস্লাম রি" — (রহমান ৭: ৩)


cf. ২১১ পাব মা জায় মহোন নাচা, আবু মাজাই সুন ১৫৭ পাব চটাফ নাচা।

অর্থাৎ, "বনু ফাযারার এক মহিলা এক জোড়া স্যাডেলের বিনিময়ে বিয়ে করেছেন। তখন রাসূল রহমান (সাঈ) ইরশা করেন, এক জোড়া স্যাডেলের বিনিময়ে তোমার বন্ধু ও মালের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। তখন নবী করিম (সাঈ) এর অনুমতি দিলেন।"

দলীল (৪):

... উন সুলত বন সুলত সাদ্যী আন রশূন্না ইলা রহমান ওস্লাম রি।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা ওস্লাম রি। তার রূপে নির্দেশার নির্দেশিত ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা। তার ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা। তার ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা। তার ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।

চারালা এমারা ফাতুল্লাহ রশূন্না ইলা।
বলেন, তোমার নিকট এমন কিছু আছে কি, যার দ্বারা তুমি তার মহর আদায় করতে পার? সাহাবী (রা) বলেন, আমার কাছে এই ইজার (পায়জামা) ব্যতীত দেওয়ার মত কিছুই নেই। রাসূল সাহয় (সাহ) বলেন, যখন তোমার নিকট ইজার ব্যতীত দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তখন অন্য কিছু দেওয়ার জন্য অনুমতি কর। সাহাবী (রা) বলেন, আমি দেওয়ার মত কিছুই পাছি না। তিনি বলেন, যদি একটি লোহার আঁটিও হয়, তবুও তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা কর। এরপর এর অনুমতি করে বার্ষিক হয়, কিছুই পাননি। তখন রাসূল সাহয় (সাহ) বলেন, তোমার নিকট কুরআনের কোন অংশ আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ, কুরআনের অমুক সূরায়। রাসূল সাহয় (সাহ) তাকে বলেন, আমি কুরআনের ঐ অংশের বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

উক্ত হাদিসের প্রমাণ তথায় উল্লেখ করেন, নবী করিম (সাহ) মহর হিসেবে লোহার আঁটি এবং কুরআনের আয়াত নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং মহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

* ইমাম মালিক (রহ.-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, তিনি দিরহাম বা এক দিনারের চারভাগের এক ভাগ। (بداية المجهد: 2 ج ١٤) (1)

(1) 

الدليل

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجن نعمه ؛

(2) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(3) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(4) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠٢ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ١٧٧.

(5) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(6) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(7) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠٢ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ١٧٧.

(8) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(9) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(10) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠٢ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ١٧٧.

(11) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(12) 

الدليল

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(13) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠٢ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ١٧٧.

(14) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(15) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(16) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠٢ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ١٧٧.

(17) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(18) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠٢ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ١٧٧.

(19) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(20) 

الدليل

عن أبي داود ج ٢٠২ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، ترمذي ج ১৭৭.

(21) 

الدليل

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطيع يد السارق في ربع.

(22) 

الدليل

عن أبي داود ج ২০২ কাব্য কর্ম বয়ে ধরের জন্য দিয়ে সার্জন করেছেন। করণ সেখানেও তার মত এক চতুর্থাংশ দিনারের পরিবর্তে একটি অঙ্ক কর্তন করা হয়। আর এখানে এর বিনিময়ে একটি অঙ্কের মালিকানা অর্জিত হয়। যা স্বামী ব্যবহার ব্যবহার করে অনেক ব্যবহারের অযোগ্য (নষ্ট) করে দেয়। তাই এই গুপ্তাঙ্গের মূল্যও তিনি দিরহাম হওয়া উচিত।

(المجمع ج ١٥٢ ص ٤٨٢)
* ইব্রাহীম নাখির মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৪০ দিরহাম।
* আল্লামা ইবন শুবারাম মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৫ দিরহাম।
* সাইদ ইবন যুবারীয়ের মতে, ৫০ দিরহাম।
* করিপায় আলিমের মতে, ২০ দিরহাম।
* কেউ কেউ বলেন, ১ দিনার।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.-এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ১০ দিরহাম।

দলীল (১): অটিত কুরআনের আযাত-“قرد علیمًا ما فرضًا علیهم في أزواجهم” অর্থাৎ, তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পুরুষদের উপর আমি (আল্লাহ) যা নির্ধারণ করেছি আমার জানা আছে। (আহ্মাবং ৫০)

উক্ত আযাত দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মহর নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আযাতটি মুখ্য তথা সর্বক্ষণ তাই নবী করীম (সা.) এর তাফসীরে বলেন-

... عن علي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه من عشرة داراهيم (دار قطني ج ৩ স. ২২৫, بی.و.ج ৭ স. ২২৬)

অর্থাৎ, ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেন, দশ দিরহামের কম কোন মহর নেই।

দলীল (২): বিষ্ণুপ্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বলা যায় যে, কুরআনে যেহেতু বলা হয়েছে মহর নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সমস্ত কুরআন ও হাদিস তালাশ করলে নিরন্তর হযরত জাবির (রা)-এর হাদিস ব্যতীত আর কোথাও এর নির্ধারিত অংশ খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদিসটি হল-

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم لا تفمح النساء إلا كفوا أو ينظرهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة داراهيم (لا تفمح النساء إلا كفوا أو ينظرهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة داراهيم) (بی.و.ج ৭ স. ২২৬, دار قطني ج ৩ স. ২২৫, فتح القدیر ج ৩ স. ১৭৮)

অর্থাৎ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (س.) ইরশাদ করেছেনঃ কুফু ছাড়া মহিলাদের বিয়ে দেয়া যাবে না এবং তাদেরকে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দেবে না। আর দশ দিরহামের কম কোন মহর নেই।

যদিও দক্ষ মূহুদ্দিস উপরোক্ত হাদিসটিকে যেহেতু বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাদিসটি যেহেতু নয়। যেমন, হাফিজ ইবন হাজার (ر.ح.) বলেন-

الله بهذا الاستمر حسن و أغلب منه (شرح النقلية ج ১ স. ৫৭৯, إعلام السنن ج ১১ স. ৫৮-৫৯)

فتح العلم ج ৩ (৪৭০)
অর্থাৎ, এটি এই সমদ্বম হাসানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়।

তাছাড়া যুক্তির নিরীক্ষে বলা যায় যে, বিয়েতে মহরকে মূলত এই ভিত্তিতেই (আইনসম্মত) করা হয়েছে, যাতে মহরবাদ মহিলার নিকট একটিী মাল হস্তগত
হয়, যা নূনতমও গুরুত্ব রাখে। আর ইহা হয়ত জাবির (রাঘি)-এর হাদিসের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, যা দশ দিভাগম। কেননা, শাফিকির (রহ.) নিকট তো বলতে
গেল এর কোন অক্ষুফো নেই। (যেমন, এক জোড়া জুতা, কারিকটা খেজুর, এক
দন্ড লোহা, কুরাম শিকাদান ইত্যাদি)। আর মালিকীদের মতে, তিন দিভাগম।

ইহাও তো একটা মেয়ের জীবনে একাকীরেই নগ্ন পরিমাণ সম্পদ (درس ترمدي ج 36)
(392)

জবাবঃ হয়ত শাফিকির (রহ.)-এর প্রথম দলীলের জবাবে আইনাফুগণ বলেন যে,
হয়ত আনুষ্ঠানিক মহর ইবন আওফ (রাঘি) মহরের পরিমাণ নোীতে এর কথা
উল্লেখ করেছেন। অভিধানিক অর্থে নোীতে বলা হয় খেজুরের বীচ বা আঁটি। হতে
পারে ঐ পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য দশ দিভাগমের সমান ছিল। (درس ترمدي ج 36)
(392)

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ফাতহুল্লা কাদিনের গ্রহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত হাদিসের
বাওয়ায়েত ইসহাক ইবন জিবারাঙ্গল এবং মুসলিম ইবন রামান সুফ। সুতরাং এর
দ্বারা প্রদত্ত দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। (فتح الغدير ج 307)

তৃতীয় দলীলের জবাবঃ উক্ত হাদিসে আসিম ইবন উবায়দুল্লাহ নামক একজন রাবি
রয়েছে। ফলে হাদিসটি যুক্তি। কেননা, ইমাম আহমদ, ইবন উয়াইনা, আবু যুবারা,
ইয়াহইয়া, আবু হাতেম, ইবন খুরাইমা, ইমাম দারা কুমলী ও ইমাম নাসাই রহ.
প্রমূখের মতে, তিনি যুক্তি রাবি। তাই ঐতর হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

(ميزان الاعتلاء ج 2 ص 254)

চতুর্থ দলীলের জবাবঃ তথা যদি একটি লোহার আঁটিও হয়,
(তবু এর দ্বারা মহর আদায় কর) এ জাতীয় হাদিসগুলো ঐ সময়ের, যখন শরীয়তে
মহরের বিধান প্রবর্তিত হয়।

অথবা, বলা যায় যে, এ হাদিসগুলো হাদিস দ্বারা রহিত
হয়ে গেছে।

অথবা, কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় খবরে ওয়াহেদ দলীলযোগ্য নয়।
অথবা, হাস্যগুলো মেহর মেহর বা নগদ মহরের উপর প্রযোজ্য। পূর্ণ মহরের ব্যাপারে বলা হয়নি।

(দৃষ্ট মোহ জ ৩৬ স প)

কেননা, বিভিন্ন হাসিদের আলোকে দেখা যায় যে, আরবরা দ্রুত সাথে সহাবাসের পূর্বে হিসেবে কিছু প্রদান করা তাদের কাছে একটা মায়ুলি ব্যাপার ছিল।

ছোটা হাসিদের সাথে সহাবাসকারীকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখত। যেমন হাসিদের এসেছে-

حمدন্তি قَائِمَ بِنْ عَبِيدِ الْحَلِّيْسِ ... عَنِ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ الْقَبِيئةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ قَاطِمًا أَيْنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرَادَ أَن يَدْخُلَ بِهَا فَقَطْنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَعْتِبِبَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ لَيْسَ لِيَ شَيْئُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَبِيئةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَكَ فَأَعْطَاهُهَا دِرْعَهُ مَثِلَ دَخَلَ بِهَا - (ابو داود ج ১ ৩৮৯-১৩৮১) পাপ বাঁধ বলার মত ফাইলঃ

অর্থাৎ, কাশীর ইবন উবায়েদ আল-হিলিসী ... রাসূল বাহাদুর সাই (সাই)-এর জন্যে সাহাবী হতে বর্তিত। তিনি বলেন, যখন ইবাদ বাহাদুর ফাইল (সাই), ফাইল বিন ইবাদ বাহাদুর সাই (সাই)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি নগদ কিছু দেওয়ার আগে তাঁর (ফাইলিসা) সাথে সহাবাস করতে ইচ্ছা করেন। রাসূল বাহাদুর (সাই) এতে বাধা দান করেন এবং ইবাদ (সাই)-কে কিছু নগদ মহর আদায় করতে বলেন। তিনি বলেন, ইবাদ রাসূল বাহাদুর! আমার দেওয়ার মত কিছুই নেই। নবী কবিম (সাই) তাঁকে বলেন, তুমি তাঁকে তোমার লৌহ বর্ণ প্রদান কর। তখন তিনি তাঁকে তা প্রদানের পর তাঁর (ফাইলিসা) সাথে সহাবাস করেন।

উত্তর হাসিদের দেখা যাচ্ছে যে, ফাইল (সাই)-কে যে লৌহ বর্ণ দেয়া হয়েছে, তা মেহর হিসেবে। কেন্দ্র সবই জানে যে, তাঁর মহর ধার্য করা হয়েছিল এর চেয়ে অনেক বেশি।

(فَقْحَ الْغَدِيرِ ج ৩০৬) ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবে চোর হাত কাটার ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ নিয়ে হাসিদের বিভিন্নতা আছে। কেন্দ্র বিভিন্ন হাসিদের প্রমাণিত হয় যে, এর পরিমাণ হল দশ দিন হোক। যেমন-
যেন ইয়া’বু’ল কোরাইনের জেলায় রহমাতুল্লা আল্লাহ আজাদ নাক্সাবাদ আন্ডার কমিশন এর প্রধান আওতায় রাখতে পারেন।

(বিবাহ অধ্যায়)

কুরআনের শিক্ষকদেরকে মহর হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানীক্ষা রয়েছে। যখন- ইমাম শাফেইঈ ও আহমদ (র.হ.)-এর মতে, "তালিম তালিম" বা কুরআন শিক্ষা মহর হতে পারে। কেননা, তাদের নিকট মহরের জন্য মাল হওয়া শর্ত নয়। (শরহ মেহেদ, ১৫ সন ১২৫৬)

দলীল

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, লাইস, মাকহুল এবং ইসহাক (র.হ.)-এর মতে, "তালিম তালিম" বা কুরআন শিক্ষা মহর হতে পারে না। কেননা তাদের নিকট মহরের জন্য সম্পদ হওয়া শর্ত। (আলুমে, ৬-১৪১৬, চার) পবিত্র কুরআনের আয়াত- ১ (১৪)

অর্থং, এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে। শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে সম্পদের বিনিয়োগ তবে করবে। (নিসা: ২৪)

উক্ত আয়াতে সম্পদ তলবের হুকুম দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, যা মাল নয় তা মহর হতে পারে না। আর কুরআন শিক্ষা যেহেতু মাল নয়, তাই তা মহর হতে পারে না।

জনবং ১। তালীমে কুরআনকে মহর বানানো ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের হুকুম। তখন ছিল মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতা। যখন মুসলমানগণ আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করলেন, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

২। অথচা, খাবরে ওয়াহেদ আয়াতের মোকাবেলায় দলীল হতে পারে না।
৩। অথবা, বলা যায় যে, হাদিসে বর্ণিত বাক্যে বলা হয়, ‘কুরআনের নিয়ে অমন কথা বলবো না।’ কিন্তু ভাষায় বা কারণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, বা বিনিময় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে না। অতএব এর অর্থ হবে - কুরআনের নিয়ে অমন কথা বলবো না।

অর্থাৎ, তোমাদের যে কৃত্রিম ও সংক্ষিপ্ত শিক্ষা থাকায় তাকে বিবাহ দিলাম।

৪। অথবা, বলা যায় যে, এটি ছিল নবী করিম (সা‌)র পক্ষ থেকে ঐ সাহাবীর জন্য খাস। তাই এই আনুষ্ঠানিক জন্য দলিল হতে পারে না। এ (মুaltet জ ২৮৪, চ ৬৫)।

যেমন, হাদিসে উল্লেখ আছে -

হাদিসা হারুন বন জেবে ... ও কান মোহয়ল যুক্তো লেখ এবৎ রোকা লেখ লেখ লেখ

صلحم। (এবং উল্লেখ বাবতন হয় ২৮৭, বাবতন নিষেধ সুযোগ হয়ে যাবে।) এর তালিকা প্রত্যক্ষ বিবাহ (মহর ব্যতীত) আর বৈধ নয়।

প্রান্তিক আলোচনাঃ মহর উল্লেখ ব্যতীত বিবাহের হুকুমঃ

বিবাহের সময় মহর উল্লেখ না করলে অথবা মহর না দেয়ার শর্ত বিবাহ করলে, তাহলেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মহর মিসাল ওয়াজিব হবে। কেননা, বিবাহ সম্পাদনের জন্য ইজাব (প্রকাশ) ও কিবর শর্ত। মহর উল্লেখ করা শর্ত নয়। যদি শর্ত হত, তাহলে মহর উল্লেখ করা ছাড়া বিবাহই সহীহ হত না। যদি বিবাহের সময় মহরের পরিমাণ উল্লেখ করে, তাহলে সেই উল্লিখিত পরিমাণ মহর দেয়া ওয়াজিব। আর উল্লেখ না করলে মহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। মহর উল্লেখ করা ব্যতীত বিবাহ সহীহ হওয়ার দলিল হচ্ছে এই-

লা جَنَاهُ عَلَيْكَ إِن طَلَقْتَ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَعْمَسْهُنَّ أَوْ تَفْرَضَوْا لَهُنَّ فَرَيْضَةً

অর্থাৎ, তোমরা তীর্থেরকে স্পষ্ট করার আগে অথবা কোন মহর সাপ্তাহ করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। (বাকরার ২৩৬)

উল্লেখ শর্ত হতে করা বুঝা যায় যে, মহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ শর্ত হয়ে যাবে।

কেননা মহর উল্লেখ ছাড়া যদি বিবাহই শর্ত না হয়, তাহলে তালাক হয় কিভাবে?

ওয়ালিমার হুকুম ৪ নবী করিম (সা‌) বলেন - "ওমর, তুমি ওয়ালিমা কর যদি একটি বক্তৃতা দ্বারা শর্ত হয়। পূর্ণ হাদিসটি অনুচ্ছেদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।)

অভিধানবদ্ধ এবং ফকীহগণ বলেন, ওয়ালিমা ঐ ভোজসাতে বলা হয়, তার বাসর রাত্রের পর খাওয়ানো হয়। আর (ওয়ালিমা) শব্দটি নির্দেশ হয়েছে।

"ওমর, তুমি ওয়ালিমা কর যদি একটি বক্তৃতা দ্বারা শর্ত হয়। পূর্ণ হাদিসটি অনুচ্ছেদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।)
বিবাহ অধ্যায়

থেকে যার অর্থ হচ্ছে মিলন বা একত্র হওয়া। যেহেতু এই রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে, তাই একে ওয়ালিমা বলা হয়।

আবার অনেকেই বলেন, এমন শব্দের অর্থ জমা করা। অতঃপর এর প্রয়োগে সেসব খানার উপর হতে লাগল, যার জন্য লোকজনকে জমা করা হয়। পরবর্তীতে ওলিমা বলতে বুঝানো হয়।

(দ্রুত তর্ক বুঝা 37 সুন্দর)

* ওয়ালিমা করা সম্পত্তি না ওয়াজিব, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
আহলে বাহিনের মতে, ওয়ালিমা করা ওয়াজিব এবং আলামা ইবন হারাম (রহ.)
লিখেন, যে বিয়ে করবে, কম হোক বেশি হোক, তার উপর ওয়ালিমা করা ফরয়।

(المحلي ج9 ص400)

তবে ইমাম মালিক, খাফেই ও আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর মতাবলম্বীর কেউ কেউ বলেন ওয়ালিমা ওয়াজিব, আবার কারো কারো মতে ইহা সুরক্ষিত বা মুতাহাব।
তবে এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে।

(شرح المنهج ج15 ص508-600)

দলীল (১): হাদিসে বর্ণিত নবী করীম (সানগ)-এর বংশী (নিদরেশ)-এর সীগা আনা হয়েছে, যা দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়।

দলীল (২): আলামা তিবরানী (রহ.) বর্ণনা করেন- যা ওয়ালিমা একটি হক। উক্ত হাদিসে হক শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যার দ্বারা ওয়াজিব বুঝায়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ অধিকাংশ আলিমের মত হল, ওয়ালিমা করা 
সুরক্ষিত, ওয়াজিব নয়।

(ировка المسالك ج9 ص435)

দলীলঃ নবী করীম (সানগ) আবুর রহমান ইবন আওফ (রাছ) ব্যতীত আর কাউকের 
ওয়ালিমার আদেশ করেননি। যদি তা ওয়াজিবই হত, তাহলে তিনি অন্যান্য 
সাহাবীদেরকেও ওয়ালিমা করার কুকুম দিতেন। এতে বুঝা যায় যে, তা ওয়াজিব 
নয়, বরং সুরক্ষিত।

জবাবঃ (১) আহানাফরান বলেন, প্রথমক্ষেত্র হাদিসে অর্থ-এর যে সীগা ব্যবহার করা 
হয়েছে তা আমর সুরক্ষিত ও মুতাহাবের উপর প্রযোজ্য হব, ইহা 
ওয়াজিবের জন্য নয়।

(২) দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ ইবন বাতাল (রহ.) বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত হক (হক) 
শব্দটি দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি বাতলের মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে।
অর্থাৎ ওয়ালিমা করা নাজারেয় বা বাতিল নয়; বরং জায়েদ ও সুন্নত। সেদিকেই ইসলাম করা হয়েছে।

(فتح الباري ج 9 ص 430، إعلاء السنن ج 11 ص 10)

ওয়ালিমার সময়সীমাঃ ইমাম মালিক (ر.ف.)-এর মতে, ওয়ালিমা সাত দিন পর্যন্ত করা জায়েদ তথা মুনতাহাব।

(مراقه ج 6 ص 206)

দলীলঃ

... তাকে ঝাড়তে তাকে তাকে ঝাড়তে দাঁড়াইয়ে। রোগো রোগো কানো বাছাই দেখাইয়ে মুনতাহাব।

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ يَمِينَ فَلَمّا كَانَ يَوُمُّ الْأَنْزَلِ دَعَاهُمُ وَدَعَاهُ أَبِيَّ بن كَعْبِ

وزيد بن قايت بن (مصانف ابن أبي شيبة ج 2 ص 312، سنن كنبه بن عامر ج 7 ص 26)

অর্থাৎ, ... হাফসা (ر.) হতে বর্তমান। তিনি বলেন, যখন আমার পিতা সীরীন (দ্বিতীয়) বিয়ে করেছেন, তখন রাসূল সাহাবীগণকে সাত দিন পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন। যখন আমার দিবস এল, তখন তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং দাওয়াত দিলেন উবাই ইবন কবাও ও যায়েদ ইবন সাবিত (ر.)-কে।

ইমাম আরু হানিফা, শাকেই ও আহমদ ইবন হামল (ر.ف.)-এর মতে, প্রথম দিন ওয়ালিমা করা দুষ্ম। দ্বিতীয় দিন করা জায়েদ এবং এর পরেও করা জায়েদ, তবে অপছন্দনীয়।

এবং এর উপকরিতা আশা করা যায় না।

(المغني ج 7 ص 3، إعلاء السنن ج 11 ص 12)

দলীলঃ

... আগ্নেয় স্বরূপ অবরোধ ও কাফের সাতের সুক্ষ্ম যাত্রা তেমন পাই নাই।

مَعْرُوفَ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سَمْعَةً وَزَيَاءً- (ابو داود ج 2 ص 365، كتاب الأطمأنة باب في كم تستحب

الوليمة، ترمذي ج 1 ص 380، باب ما جاء في الوليمة، ابن ماجة ص 139)

অর্থাৎ, ... নবী করিম (ص) ইরাশাদ করেছেন, প্রথম দিনে ওয়ালিমা যথাযথ।

দ্বিতীয় দিন ভাল। আর তৃতীয় দিন লোক দেখানো, খ্যাতি র ও রিয়া।

জবাবঃ এসব ঘটনা তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন দাওয়াতে মেহমান বেশি

হওয়ার কারণে প্রতিদিন আলাদা দলকে দাওয়াত দেয়া হয়।

(فتح الباري ج 9 ص 442)

অথবা, এও হতে পারে যে, ইহা ছিল কতক সাহাবীর ইজতিহাদ, যা রেওয়াযেরেতের

মোকাবিলায় দলীলযোগ্য নয়।

উল্লেখ যে, ওয়ালিমা বেকরী দ্বারাই হতে হবে, তা জরুরী নয়; বরং ব্যক্তি তার

সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবহার করবে। তবে অতিরিক্ত যাতে না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য

রাখতে হবে। কেননা, নবী করিম (ص) ইরাশাদ করেছেন।

خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهُ- (ابو داود ج 288، باب فين تزوج الفتية)

অর্থাৎ, উত্তম বিবাহ তাই, যা সহজে সম্পন্ন হয়।
বিবাহ অধ্যায়

492

বাৰ্তা উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠ সূৰ্য একটি মহিলার বিবাহ করার সময় অনুষ্ঠানকল্প

কুমারী স্ত্রীর সাথে অবস্থানকল্প

... অনন্ত বন্ধুকে কার বাহ না জ্ঞাত করিয়া স্ত্রী একাধিক সমর্থন করিয়া আরোপ করিয়া হইলে অনুহার বিবাহ করা যায়। (বাচ্চা বই ১০১ পৃষ্ঠা)

চূড়ান্ত স্ত্রী একাধিক সমর্থন করিয়া হইলে মানুষ একাধিক সমর্থন করে। (বাচ্চা বই ১০১ পৃষ্ঠা)

অনুবাদঃ ... আনাস ইবন মালিক রায় হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, যদি কোন বক্তি কোন কুমারী কৌশলকে সাহায্য করে। (অকুমারী) মহিলার বিরুদ্ধে বিবাহ করে, তখন তার সাথে সাত রজনী যাপন করবে। আর যখন কুমারীর বিরুদ্ধে সাহায্যকে বিবাহ করে, তখন তার সাথে তিনিয়াত যাপন করবে।

বিশেষভাবে যদি কারো একাধিক স্ত্রী হয়, তাহলে তাদের সাথে রাত্রিযাপন করা, পানাহার এবং কাপড়-চোপড় ইত্যাদি প্রাধান্যর ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা শুক্য।

তবে সুবস্তা ও মহর্ভের ক্ষেত্রে সমতা হওয়া ওয়াজিব যায়। কেননা ইহা মানুষের ইচ্ছাবীন যায়। যেমন হাদিসে বর্ধিত হইয়াছে -

... ভূতের বিশেষ কারণ কান রসো রুহ সুলাইল হয় বিশ্বাস করো তার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক রচনা করো না।

লেখার এই ক্ষেত্রে যেমন ঐতিহাসিক বক্তা, তার ঐতিহাসিক বক্তা তার ঐতিহাসিক বক্তা। (আবু ডাউদ)

জ ১০ প্রথম ২২১ পাব সময় করিয়া সের, তৃতীয় ১১ পাব সময় করিয়া সে পাব সময় করিয়া সে পাব সময় করিয়া ১২৬ পাব সময় করিয়া (১৩১ পাব সময় করিয়া)

অর্থাৎ ... আয়ােস (রায়) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, রাসূল সাহেব তাছের সময় ইসলাম জীবন বলতে এবং বলতেন, ইছা আলাহ আমার পক্ষে যা সস্তব, আমি তা করি। আর যার মালিক আপনি, আমি নই, অর্থাৎ অন্য সে সময় আমার করার দোষারোপ করবেন না।

* একথার উপর সবাই একথার, যে মহিলাকে বিবাহ করবে সে হয়তো কুমারী বাৰ্তা। (পাকৃতি) হবে অথবা অকুমারী বোল হবে। যদি সে নববিবাহিতা মহিলা কুমারী হয়, তাহলে তার সাথে সাত রজনী অবস্থান করবে। আর যদি অকুমারী হয়, তাহলে তার সাথে তিন রজনী অবস্থান করবে। যা অনুচ্ছেদের শুরুতে হাদিসের বর্ধিত হয়েছে। এবং এতে কারো কোন দ্বিতীয় নেই।
দলিল
আমাদের বাইরের অনেকের সহিত সন্নিহিত হাফিজ। উক্ত হাফিজে নবী করীম (সাহ) এ ব্যাপারে এক বিধান বর্ণনা করেছেন যে, নবাগত কুমারী ক্রীর জন্য সাথ এবং নবপরিণীত অকুমারী ক্রীর জন্য তিনি রাত। সুতরাং বুঝা যায় যে, ইহা তাদের জন্য অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র অধিকার। অন্যরা তাতে শরীক নয়।

* ইমাম আবু হানিফা, হাম্মাদ (রহ.) প্রমুখের মতে, এ দিনগুলো ভাগের দিন থেকে বাদ পড়বে না, বরং এগুলোও পালার ভিতরে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যদি নববিবাহিতা কুমারী ক্রীর সাথে সাথ রাত যাপন করে, তাহলে পূর্বে ক্রীর সাথে সাথ রাত যাপন করতে হবে। আর অকুমারী নববধূর সাথে যদি তিনি রাত যাপন করে, তাহলে পূর্বে ক্রীর সাথে তিনি রাত অতিবাহিত করতে হবে।

(ফতেহ আবুদরাজ ৩:৩০)

দলিল
(১) আল্লাহ তাআলার বাগী- فَقَانَ خَيْنُكُمَا أَنْ تَغْلُبُوا فَوَاحِدَةً
অর্থাৎ, আর যদি এরপাশা আশ্চর্য কর যে, তাদের মধ্যে নায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (নিসান ৩)

অপর এক আযাতে বলা হয়েছে: তাদের মধ্যে নায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখ। (নিসান ১২৯)

উপরের বিবেচিত আযাতের অধীনে ইনসাফভিত্তিক বন্দনকে ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা আযাতের শরীর (মুল্লানা) উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাতন বা নবাগত এমন কোন বিশেষে নেই।

দলিল
(২) ... عَنْ أَمْ سَلَّمَهُ اَللهُ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمَّا تَزَوَّجَ أَمَّ (...)

সলমে আল্লাহ তাআলা সাধ্য আপনার কর্মকর্ম অস্ত্র পালন করুক।

(ইবন দাওদ ১:২৭৮) বাবের ফক্রাতে বলা হয়, মস্লে চাই চাই একটি সময় সেই সময়ে নয়।

(১৩)

(১৫) বাবের ফক্রাতে বলা হয়, মস্লে চাই চাই।

অর্থাৎ, ... উম্মে সালামা (রাই) হতে বর্ধিত। রাবী বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাই) যখন উম্মে সালামকে বিবাহ করেন, তখন তিনি তার নিকট তিনি রাত অবস্থান করেন।
এরপর তিনি (সাঁ) বলেন, এটা তোমার জন্য আমার পক্ষ হতে কম নয়, অবশ্য যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করব। আর আমি যদি তোমার সাথে সাত রাত যাপন করি, তখন আমার অন্যান্য কীদের সাথেও আমাকে (সমতা রক্ষার্থে) সাত রাত অতিবাহিত করতে হবে।

লালিল

(৩) অন্য আন্তরিক শপথ নিয়ে তোমার সাথে সাত রাত যাপন করি, যে তোমার সাথে যাপন করতে হবে (আয়াত) এর ফলস্বরূপ তোমার কাৰ্য্য পূর্ণ করিয়ে দিবে।

আবু সুয়ায় বাবায় (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাঁ) বলেছেন, যার দুজন কীর্তন আছে, আর সে তার মধ্যে একজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অধীন অবশ্য অবস্থায় আসবে।

উপরোক্তিত হাদিস সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, রাত যাপনের ক্ষেত্রে কীর্তনের মাঝে সমতা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। নববধূ হোক অথবা পূর্বের কীর্তনের কীর্তন হোক।

জবাবঃ (১) হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদিসে তো কুমারী নববধূর সাথে সাত রাত এবং অকুমারী নববধূর সাথে তিন রাত যাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরে কি করবে, আর্থে পূর্ববর্তী কীর্তন সাথে কয়দিন থাকতে হবে, এ ব্যাপারে উক্ত হাদিসে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং বলা যায়, হাদিসটি সংক্ষিপ্ত (জমাল)। আর উমেদ সালামা (রাঃ)-এর হাদিসে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। (যা হানাফীরা নিজেদের দ্বিতীয় দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।) সুতরাং সংক্ষিপ্ত হাদিসের কথা থেকে বিশিষ্ট হাদিসের দিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(২) অথবা, হযরত আনাস (রাঃ)-এর হাদিসে যে কুমারী নববধূর সাথে সাত রাত এবং অকুমারী নববধূর সাথে তিন রাত যাপনের হুকুম এসেছে, এই আগ্রাহিকার প্রদান মূলত অতিরিক্ত হিসেবে নয়, বরং এই আগ্রাহিকার প্রদান মূলত শুরু করার হিসেবে বর্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন কুমারী বা অকুমারীকে বিবাহ করা হবে, তখন কোনের পদ্ধতি বদলে দিয়ে সাত অথবা তিন রাতের পালা তাদের থেকে শুরু হবে।

(ইনোনা এলাহুল মাজাল ১১৪-১১৫, কুরআন হযরত ইলাহুল মাজাল ৩৭-৩৮ (২০৩-২০৪) সহস্রাব সম্প্রতিক্ষী অন্যান্য হাদিস}

২৯৩: বাবা ফি জামুম নক্কাহ চ ৪২}

... অন্য বিবাহ কালে ইন্ন মুহর্ম উল্লেখ করা হচ্ছো উল্লেখ করা। কৌন যাহাঁ যাহাঁ বিবাহ করেন তাহে অল্লাহ করেন তাহো যাহো বিবাহ করেন তাহো যাহো যাহো বিবাহ করেন তাহো যাহো বিবাহ করেন তাহো যাহো।
ফ্লাড উপর্যুপরি কীভাবে তাদের কিছু ছিল যা তাদের দেরিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল স্পষ্টত: হয় না। তারা কিছু ছিল যাতে তাদের মধ্যে ছিল স্পষ্টত: হয় না।

অনুবাদঃ ... ইবন আব্বস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (আল্লাহ
তাকে বা তাদেরকে মার্জনা করুন) বলেছেন, জাহেদিয়াতের যুগে আনসারগণ দেব-
দেবীর পূজা-অর্চনা করত এবং ইয়াহুদীদের সাথে অবস্থান করত। তারা (ইয়াহুদীদের)
আহলে কিতাব ছিল এবং সেই জন্য তারা (ইয়াহুদীদের) আনসারদের উপর জানের
দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠতা দেখতান। আর তারা (আনসারগণ) অনেক ব্যাপারে তাদের
(ইয়াহুদীদের) অনুসরণ করত। আর আহলে কিতাবদের নিয়ম ছিল যে, তারা
তাদের ক্রীয়ের সাথে চিত হয়ে শায়তিণ্য অবশ্য সহবাস করত। আর এটাই ছিল
ক্রীয়ের সাথে সহবাসের নিয়ম। আর আনসারদের এই গোষ্ঠী তাদের নিকট হতে
এই নিয়মটি গ্রহণ করে। আর কুরআনের এই গোষ্ঠী তাদের ক্রীয়ের সাথে বিভিন্ন
অবশ্য সহবাস করত, এমনকি তারা তাদের ক্রীয়ের সাথে সামান্য সামনি,
পাশাপাশি দিয়ে ও চিত হয়ে শায়িত অবশ্য সহবাস করত। অতঃপর তারা যখন
মুহাজির অবশ্য মদিনাতে আগমন করে, তখন তাদের কোন এক ব্যক্তি
আনসারদের জনৈক মহিলাকে বিবাহ করে। তখন সে তার সাথে ঐ প্রক্রিয়ায়
সহবাস করতে গেলে উক্ত মহিলা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, আমাদের এখনকার
সহবাসের একটিই নিয়ম, কাজেই তুমি সেই নিয়মে আমার সাথে সঙ্গম কর,
অন্যথায় আমার নিকট হতে দূরে থাকে যাও। অতঃপর তাদের এই ব্যাপারটি
জটিলতার হলে এতদসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সার) কে অবহিত করা হয়। তখন আল্লাহ
তাআলা এই আয়াতটি নামিল করেন, “তোমাদের ক্রীয়ণ তোমাদের জন্য
শস্যক্রেতারূপ। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেকোনো ইচ্ছা গমন কর।” তা
সমস্ত দিয়ে হোক, পশ্চাৎ দিক থেকে হোক, কিংবা চিত হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক, অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, সহবাস করবে।

বিশেষণঃ রাফেদীরের মতে, সীরের ওহ্যাজারে (দিনি) সহবাস করা জায়েয় আছে।

দলীল (১) পবিত্র কুরআনের আযাত- (নির্দেশ) হোক তেমনি ফাতো হোক তেমনি শীতন্ত- 
অর্থাৎ, তোমাদের গ্রীষ্মে তোমাদের জন্য ক্ষেত্রবিভাগ। কাজেই, তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে শুরু হয়ে চলাও গমন কর। (বাকারারঃ ২২৩)

রাফেদীরা এই আযাতের বিশেষণ করে বলে যে, উক্ত আযাতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই শব্দটি দুটি অর্থে আসে। যেমন- একই শব্দের অর্থ (১) তথা যেকোন জায়গা থেকে, (দুই অর্থে), যৌনাঙ্গের দ্বারা হোক অথবা ওহ্যাজারে হোক। (২) তথা যেকোন অবস্থায়, সমস্ত দিয়ে, চিত হয়ে শায়িত অবস্থায় হোক কিংবা পশ্চাদিক থেকে হোক। সুতরাং তারা উভয় অর্থ গ্রহণ করে বলে যে, সীরের সামনের রাজ্য (দিনি) এবং পিছনের রাজ্য তথা উভয় রাজ্য দিয়েই সহবাস করা জায়েয়।

(দর্স মশোকে ২৩ সং, তফসিল আশাত ২ সং)

দলীল (২) হয়রাত নাফে (রাঘ) হয়রাত ইবন উমর (রাঘ) হতে একটি সংক্ষিপ্ত (মুক্ত) রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন যে, হয়রাত ইবন উমর (রাঘ) বলেন-

যেমনে এই শব্দ হোক তেমনি শীতন্তে। তথা তোমরা যেরূপে চাও, অর্থাৎ মহিলার ওহ্যাজারে।

* চার ইমামসহ সকল ইমাম ও ইমামের মতে, ওহ্যাজারে সহবাস করা সরাসরি হারাম। ইবনুল মালিক বলেন, ইহা ঘোড়ু মুহাম্মদ (সাৰ) এ উমরের জন্য নয়, বরং পূর্ববৃদ্ধি সম্পদ ধর্মে তা হারাম ছিল।

দলীল (৩) পবিত্র কুরআনের আযাতে- উক্ত আযাতে লক্ষ্য নয়, যে গ্রীষ্মে ক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ক্ষেত্রে যেমন বীজ বন্ধ করা হয় এবং তা থেকে ফসল উৎপত্তি হয়, ঠিক তরুণ একজনের সীর হল ক্ষেত যে এই বীজ হল বীর্য এবং ফসল হল সত্ত্ব। সুতরাং এ থেকে সহজেই অনুমোদন যে, ফসল তথা সত্ত্ব পেতে হলে বীজ তথা বীর্যকে অবশ্যই ক্ষেতে বন্ধ করতে হবে। আর ইহা হল সীরের যৌনাঙ্গ। সুতরাং পশ্চাদিকে (দিনি) বীর্য (বীর্য) দাললে ফসল তথা সত্ত্বের আশা করা যাবে না। সুতরাং আযাতে এটি দ্বারা
দলীল (২)ঃ পবিত্র কুরআনের আযাত-

যেকোন ভয়াবহ কোনো মানুষকে বিষণ্ণ করে, তবে কোন অবস্থায় কোনো তথ্য সংকীর্ণ করে তদায় তার তথ্য সংকীর্ণ হয়।

অর্থতঃ, তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে হামেশ অবস্থায় সহায়তার বিধান সম্পর্কে।

লেখা দিন এটা অতিক্রম (কষ্টকর বিষয়)। কাজেই তা হয়ে অবস্থায় ক্লিষ্মন থেকে বিরত থাক। (বাকরাও ২২২)

উইঠ আযাতে লক্ষ্যীয় যে, হামেশ অবস্থায় সহায়তা করা হামাম হওয়ার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে অতিক্রম বা কষ্টক ই (আও)। সুতরাং এ আযাত হামাম ও হামামের সহায়তা করা হামাম প্রমাণিত হয়। কেননা, অতিক্রম বা কষ্টকের কারণ এতেও পাওয়া যায়।

অর্থতঃ, হামেশ অবস্থায় সহায়তা ক্লিষ্মন কথায় পায়, তদায় হামামের সহায়তা করলেও ক্লিষ্মন কথায়। সুতরাং উভয়টি হামাম।

দলীল (৩)ঃ

... গ্যান গ্যানি আহ্মেরা গাল রোলাল রুলাল সুলাল কলাল বিলাল মুলাল ফুলাল (৩)

মৃত্যুতি তাতি অমরারা দিডিরা (আবু দাউদ ঝুি ২২৪ বা জ্যামিন কা কাতাউ)

অর্থতঃ, ... আবু হুরায়ারা (রাই) হতে বিছিল। তিনি বলেন, রাসুল্লাহ (সান) ইগ্রাস করেছেন, যে ব্যক্তি তার ক্লিষ্মন পশ্চাদ্ধারে সহায়তা করে সে অভিপ্রেত।

সুতরাং উপরের কিছু করা ও কাফিরের আলোকে প্রমাণিত হল যে, ক্লিষ্মন হামামের সহায়তা করা হামাম।

প্রতিপক্ষের দলীলের জুহাম রাসুলের দ্বারা যে ব্যাপক অর্থ নিয়েছে-

"যেকোন জায়গা দিয়ে যায় তা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আযাতের পূর্বপর বিশেষণ করলে বুঝা যায় যে, সহায়তার জায়গা নিদিষ্ট হতে হবে। অতঃপর সহায়তার ধরণ যাই হোক। কেননা আযাতে শয়খকেতে আসার কথা বলা হয়েছে। আর একথা তো স্পষ্ট যে, হামাম করা নিকট মোয়ার জরুরী নয়। শয়খকেতে নয়। সুতরাং ইহা করোনতে জাযায় নয়।

- ৩২
* তাছাড়া আযাতের শানে নুয়লের দ্বায় রুখা যায় যে, ইয়াহুদীদের আকারা ছিল যে, শীর্ষ সাথে পশ্চাদ্ধিক হতে তার যৌনাঙ্গ সহস্রস করার ফলে যে সত্য জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তাদের এ আকারাকে শোধনার জন্য এ আযাত নিয়ন্ত্র হয়। যেমন, হাদিসে এসেছে-

... বুনি মুহাম্মদ বন মুক্তির কাল সূয়েট জায়া য়া যুক্ত হয় যে পিয়ুহুল্ড যুক্ত হয় তা জানু হেন আল্লে কুন সুয়েট রাখুন আল্লে আল্লে আল্লে আল্লে. হর্ন হেন আল্লে আল্লে আল্লে আল্লে আল্লে।

(তাব্দার দাওয়া চ ১ সি ২১৫) পাব জায়া নায়া, মসলমা (স) ১৭-৩০ ১৪-৪)

অর্থাৎ, ... মুহাম্মদ ইব্ন আল-মূনকাদিয় (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবিসিয়ের (রাই-কে) বলতে শুনছি যে, 'ইয়াহুদীরা বলত, যখন কোন ব্যক্তি তার শীর্ষ সাথে পশ্চাদ্ধিক হতে তার যৌনাঙ্গ সহস্রস করে তখন যে সত্য জন্মগ্রহণ করে, সে টেরা হয়। তখন আমরা তার আলা এই আযাত নিয়ন্ত্র করেন, "তোমাদের শীর্ষ তোমাদের জন্য কেত সরুপ। কাজেই তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে যেমন ইহা সাধারণ শণিয়ে ফসল উৎপাদন কর।"

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ

(১) ইমাম তাহবী (রহ.) বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রাইে)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি (রাইে) বলেন - হেল যুগল দুই কার্তার মুসলিমীন হুল বুনা কারা?

অর্থাৎ, এমন কর্ম কি কোন মুসলমান করতে পারে?

সুতরাং হযরত ইব্ন উমর (রাইে) নিজেই যখন ইহাকে অবৈকার করেছেন, অতএব তা দলীল হতে পারে না।

(২) অথবা, ইব্ন উমর (রাইে)-এর দ্বায় উদ্দিশা হলে-"দুই দর দুই দর দুই দর দুই দর দুই দর দর দর।

অর্থাৎ, "শীর্ষ পশ্চাদ্ধিক হতে তার যৌনাঙ্গ সহস্রস করা।" আর এটা তো সবার নিকটই জায়ে।

(৩) অথবা, ময়মন বলেন, নাকে (রাইে) ব্যাপারে তাঁর সুন্দরিকৃত কিছুটা কমে যাওয়ায় পর এই রেণ্যায়ে করেন। তাই ইহা দলীল হিসেবে প্রহরায়োগ্য নয়।

(তন্ত আশ্নাত ২ সি ২১৬, দরস মসকুর জ ২৪-৩২)
আযাল সম্পর্কে

৬ বাব মা গাজা ফি আলি উজ্জ

... আবী সুযরে হাদিসে অনেক জন্য বলা হয়েছে যে র্সুল ইলা হক্ক সালাম তাঁর জন্য আজীবন সত্যিই আর আর।

অনুবাদঃ... আবী সাইদ আল খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সালাম সাইদ আবী সাইদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেন, ইয়ার রাসুল সালাম। আমার একটি দাসী আছে। আর আমি তার সাথে সহায়ত সময় 'আযাল' করি। আর আমি এটা অপচার্ড করি যে সে গর্ভেত্ত হেক এবং আমি তাই চাই যা অন্য লোকেরা চায়। আর ইয়াহুদীরা বলে যে, আযাল হল হাত শিখন তারা। এতদুভাবে তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, বরং আল্লাহ তাকে শৃদ্ধ করতে চান, কেন্দুই তার আগমনে প্রতিব্যাখ্যা শৃদ্ধ করতে পারে না।

আযাল (মস্ল)-এর অভিধানিক অর্থঃ উজ্জ শব্দটি আলি ব-বাব পার্ব পার্ব পার্ব-এর মাসদার।

এর অভিধানিক অর্থ হল- (১) আলাদা করা, (২) অপসরণ করা, (৩) বরখাস্ত করা, (৪) দূর করা, (৫) বের করা, (৬) প্রত্যাহার করা, (৭) বিচ্ছিন্ন করা, (৮) পৃথক করা, (৯) সরিয়ে ফেলা, (১০) বিরত রাখা ইত্যাদি।

উজ্জ (আযাল)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ইমাম নববী (রহ) বলেন-

হুও অহ স্যাত তাবী ইলা হক্ক লালী মোটায় ফরা মুহার মোতায় ফরা মোতায় ফরা

অর্থাং, সহায়তার সময় চরম উত্তেজনার মুহূর্তে স্বীয় মোতায় বীর্যপাত না করে বাইরে বীর্যপাড় করার থেকে আযাল বলে।

(২) গ্রন্থকার বলেন-

العذل هو أن يجتمع فإن الله أقبل الأذلال نزع وانزل خارج الفرنج (عن المعجم ۲/۱۶)

অর্থাং, আযাল হল স্বীয় সহায়তার সময় বীর্যপাতের পূর্বে মুহূর্তে পুরুষাঙ্কে যেন থেকে বের করে এনে বাইরে বীর্যপাড় করা।

(৩) মোহাল্লা আলী কারী (রহ) বলেন

العذل هو اخرج ذكره من الفرنج قبل ان ينزل النبي
অর্থাৎ, সহবাসকেলে বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষের যৌনাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গ হতে বের করে নিয়ে আসা।

- এর হাশিয়ায় বলা হয়েচে-

হো নিদ্রতু বেদ রহেল রাজ্য হাইর বিরাজ তুজ।

মৌটকথা, সহবাসকেলে বীর্যপাতের সময় নারীর যৌনাঙ্গে বীর্যপাত না করে বাইরে নিকেপ করা।

পরিবার পরিকল্পনা এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ নিয়ে বিভক্তের শেষ নেই।

পুরো কুরআন হাদিস চরে কোথাও এর পক্ষে বা বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া মুশকিল। এ বিষয়ে রচিত হয়েছে অনেক বড় বড় বই-পুস্তক এবং আজো লেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক তত্ত্ব, সমীক্ষা ও কন্সেপ্ট। কিন্তু এ বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত উপনীত হতে সক্ষম হয়নি ফকিরহাণ। ফলে মুসলিম উম্মাহ একটি বিভাজনের নিষত্তিত। এবং এ বিষয়টি অনেকের কাছে থেকে একটা স্পষ্টতাও নয়।

কেননা পরিবার পরিকল্পনার কিছু দিক এমন রয়েছে যেগুলো জানেতে জানে। কিন্তু এ ব্যাপারে জান না থাকায় অনেকে গুলাঙ্গি করে হচ্ছে। আবার অনেকে পৃতি হচ্ছে সীমাহীন করে।

তাই এ ব্যাপারে নিম্নে একটি নাতিনীর্থ আলোচনা উপস্থাপন করা হলো- আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ,) ও অন্য কালী আলিমগণ মনে করেন যে, "জম্ম-নিয়ন্ত্রণ" শব্দটাই ব্যবহৃত করা জায়েম নয়। কেননা, জম্ম নিয়ন্ত্রণ তো মানুষের কাজ নয়।

পরিবার কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যোদ্ধিত হয়েছে-

- হুসাইন রবীন্দ্র

অর্থাৎ, আল্লাহই একমাত্র জীবন ও মৃত্যু দান করেন। (ইন্নুসঃ ৫৬)

সুতরাং এ শব্দটি অবশুই বজনিয়। কেননা, এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে,

তথ্যরিদ জম্ম-নিয়ন্ত্রণের সকল পথের গ্রহণ করার পরেও সমীর জম্ম লাভ করেছে।

এমন একটি উদাহরণ হাদিসেও পাওয়া যায়-

... হুন জাবির কালে জাহা রসা-রহজ মন আত্মক সারে রসূল তাঁ হুলি তাঁ সুলতান।

ফলে এই জাহায় আগো বিহীর আগে তাঁ আগে নির্দেশ আগে।

"ফাকের সীতারা" মা ফাকে লা কালে ফাকে ফাকে লাতে অগানে ফাকে অগানে ফাকে লাতে হালফট।

কালে ফাকে আত্মক আগে সীতারা মা ফাকে লা।

(ইবু দাওদ জি ১৬২)

অর্থাৎ, ... জাবির (রা) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে হতে এক

ব্যক্তি রাজুলুলাহ (সা)-এর বিদ্যমানে উপস্থিত হয়ে আরও করে, আমার একটি দাসী

আছে, যার সাথে আমি সহবাসও করি। কিন্তু সে পরিবর্তী হোক আমি তা পছন্দ করি
না। তিনি বলেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আয়ল করতে পার। তবে জেনে রাখ।
তার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে, তা হবেই। রানী বলেন, উক্ত ব্যক্তি কিছুদিন পর
পুনরায় তাঁর নিকট এসে বলে, আমার দাসী গভর্নরী হয়েছে। তখন তিনি বলেন,
আমি তো এ ব্যাপারে তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা যা
নির্ধারিত করেছেন, তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে।
হাঁ, মানুষ যৌনকার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বটে। কিন্তু একে কোন ক্ষেত্রেই সরাসরি
জম্ম-নিয়ন্ত্রণ বলা যায় না। তাই তারা মনে করেন, ইহার নাম সরাসরি জন্ম নিয়ন্ত্রণ
না রেখে “পার্থিব নিরোধ” রাখা যেতে পারে।
আল্লামা তাকে উসমানী বলেন, আমাদের যুগে পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ
নামে যে কর্মকান্ড চলছে, এর অর্থমাত্র ব্যাপারে কোন সদঘ নেই। প্রথমত,
পরিবার পরিকল্পনার অনুমতি তেসব স্থানে প্রমাণিত সেগুলোর সারকথা হল,
বাক্যাখণ্ড পৃথিয়া পরিবার পরিকল্পনা করা। কিন্তু এটিকে একটি সাবজ্বিনী
কর্মসূচীতে পরিণত করা এবং এ কাজের জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও উৎসাহ প্রদান
মোটেই জানেন যা। দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হারাম। কারণ, এর উদ্দেশ্য
হল দরিদ্রতার ভয়। আর এই কারণ, কুরআনের সুপ্রস্তু আয়াত ধারাও ফাসিদ।
মুবাহ (জায়িয়) কাজ ও ধারায় নিয়ন্ত্রের কারণে হারাম হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

বল ওলাদকে খুশী করেন, তুমি তারা তাদের
অর্থাৎ, তোমারা তোমাদের
সভ্যতারকাদে দারিদ্রের ভয়ে হতা করো না। কারণ তাদেরকে এবং তোমাদেরকে
আমিই রিষিকের ব্যবহার করি। (বনী ইসরাইলঃ ৩১)
অতএব, এই কর্মকান্ড সৃষ্টিকর্তার সম্ভায়ত ও রাত্রিকায়ত ব্যবস্থায় নিজের হাতে
তুলে নেয়ার নামাকর। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ওমানাত আর পৃথিবীতে এমন কোন
অর্থাৎ, আর পৃথিবীতে এমন কোন
বিচরণশীল প্রাণী নেই যা,
যার জীবিকার দায়িত্বে আল্লাহ নেননি। (হুদঃ ৬)
আর কুদরতের বিধান হল, সে তুলে উৎপাদনের পরিমাণ সে যুগের চাইবা
অনুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন, অতিশ সমস্ত সফর হত হোড়া ইত্যাদি উপর চড়ে।
সে যুগে এ ধরনের সফরে কাজে আসার মত জন্ম সঞ্চয় ও হত বহুল পরিমাণে।
এখন যেহেতু সফর অন্যান্য পাড়িতেও হয়, ফলে হোড়া ইত্যাদি বংশ কমে
জেনে। পক্ষান্তরে বর্তমানে গোটা জীবনই পেড়ে ও তেলের সাথে যুগায়োগায়।
অতএব, ভূমিতে তার ভাড়ার প্রকৃতিতে অপূর্পনভাবে খুলে দিচ্ছে। এই বাইত্ত সত্যটিকেই
আল্লাহ তাআলা নিয়ন্ত্র আয়াতে স্থাপ করে দিয়েছেন-

ওনেন যেমন হলে আল্লাহর তাহাতাহাতে তার মুক্তি আয়িরে তারে পুনর্গতি
অর্থাৎ, আমার কাছে প্রত্যক
বস্তুর ভাড়ার রয়েছে, আমি নিয়ন্ত্র পরিমাণে তা অবতরণ করিয়াছি। (হিজরঃ ২১)
তৃতীয়ত, তিনি আরো মনে করেন, দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার মনোভাব গড়ে তোলা, এটি ইসলামের চির দৃশ্যমান ইহুদি ও হৃত্তানদের একটি রাজনৈতিক প্রতারণামালা। এর দ্বারা তাদের মূল উদেশ্য হল, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রোধ করা। মুসলমানদের বিচার-বিশ্লেষণ না করেই এর ফাইন্ড পড়া উচিত নয়। কেননা, নবী করিম (সাহ) ইরশাদ করেন-

ত্রুটিগুলো ও দোষগুলো অল্পলে কাঠামো, মুক্তিমানক প্যেম (ইবু দাউদ ১ না ১৮৯ পাবে তুরস্কের বিবাহ, নাসাহী]

অর্থাৎ, তোমরা এমন কীলোকদের বিবাহ কর, যারা সামনের অধিক মহকত করে এবং অধিক স্তৃত প্রসব করে। কেননা, আমি (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিকের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর) গর্ব প্রকাশ করব।

অথবা অন্য অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনার এই কর্মকাণ্ডের নেহাতে ক্ষতিকর। প্রায়োজন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ত্রাস ও ইনসাফভিত্তিক সৃষ্ট ব্যাধি এবং মানব সম্পদকে কাজে লাগানো। অতএব, মাত্রায় টুপি না লাগান মাথা কোনো ছোট করবে নাকি টুপি বড় করতে হবে? এর জবাবে দৃশ্রী বলব টুপি বড় করতে হবে। ঠিক তেমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জনগণকে মারাত্মক ব্যবস্থা না করে বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে জনসর্বদা কাজে লাগানো হবে। আর এটাই হবে বৃদ্ধিমান কাজ। অথচ সে কাজটি আজ ব্যাপ্ত হচ্ছে।

প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) কিছু পছন্দিতমূহ এবং এর হুকুম:

(১) আই.ইউ.সি.ডি.: বীর্য যাতে ভিহানকে নিষিদ্ধ করতে না পারে অথবা পারলেও নিষিদ্ধ ভিহান (জাইগোট) যাতে জরায়ুস মধ্যে প্রতিপাদিত হতে না পারে এজন্য নারীর জরায়ুস মধ্যে প্রতিবিধান সৃষ্টিকরণে একটি প্রাক্তন করেল (করাহি-টি) সর্বজন করে দেয়া হয়।

হুকুমঃ হৃদান্নাথ আলিমদের মতে, পরিবার পরিকল্পনার জন্য জরায়ুহের প্রাক্তন করেল স্ফূর্ত করা ঠিক নয়। কেননা, প্রাক্তন করেল যেহেতু অনেকের সাহায্য ছাড়া সংযোজন করা যায় না। আর কীলোকদের অনেক সম্ভাব্য তত্ত্ব থেকে তাতে গেলে অসুবিধার কারণে হতর থেকে ছাড়া অপরাজেন করাও সম্ভব নয়। (উল্লেখে যে, যদি এমন অবস্থা হয় যে, অপরাজেন ছাড়া রোগীর বা সম্পদের জীবন ভূঁইনোর কোন পথ না থাকে অথবা অঙ্গযোগ্য আশঃকয়া হয়, তাহলে অপরাজেন করা যাবে।)

(২) পুরুষ ব্যক্তিকরণ (ভ্যাসেত্রিমি): পুরুষের বক্তায় করণের জন্য সহজ অর্পণার বিষয়। এতে অন্তর্ভুক্ত থেকে বাবে অস্বচ্ছার দুটি শ্রেষ্ঠ নালিকা অর্থাৎ বা...
বন্ধ্যাকরণের হুকুমঃ শায়খ ড. সাজিদ রামাদান আল বুতী সহ হজানী ফকীহগণ বলেন, ইসলামে বন্ধ্যাকরণ হারাম। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহর প্রদত্ত আমানতের খিয়ানত করা হয় এবং আল্লাহর কুদরতে সরাসরি আঘাত হানা হয়। এটা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের সমতুল্য। কারণ, এতে পুরুষের সত্তার উৎপাদন ক্ষমতা এবং নারীর সত্তার ধারণ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, যা ইসলাম কথনো অনুমোদন করে না। (নার্স কন্ট্রোলঃ প্রিভেটিটিএ এড কিউরেটিভ আসাপেক্ষ- প্রকাশকাল ১৯৭৬ ইং)

নিরাপদ সময়ে শ্রী সত্যোগে গবেষণা করে দেখা গেছে, অতু আরস্থ হওয়ার দিন হতে হিসাব করে পরিত্র হওয়ার প্রথম তিন দিন এবং অতু আরস্থ হতে হিসাব করে বিশেষ দিন পরে আত্ম দিন অর্থাৎ বিষমতা দিবস হতে আঘাত দিবস পর্যন্ত আট দিন। প্রতি মাসে এই এগার দিন শ্রী সহবাসে সাধারণত সত্তার ধারন হয় না। এটাকেই নিরাপদ সময় বলা হয়। (নিরাপদ সময়ের হিসাব যেহেতু মহিলাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় থাকে তাই এর সঠিক হিসাব অভিজ ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে।)

হুকুমঃ পরিবার পরিকল্পনার যত পদ্ধতি রয়েছে এগুলোর মধ্যে উত্তম পদ্ধতি হল "নিরাপদ সময়ে শ্রী সহবাস"। একটি সাধারণ হয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে কৃত্রিম পছন্দ অবলম্বন কেন প্রয়োজন হয় না। ফলে পাপবোধ থেকে পরিব্যাপ্ত লাভ করা যায় এবং আত্মিক প্রশংসিত আর্জিত হয়।

ডায়েনোমা বা পেশরীঁ বীর্য জরায়ুতে না পৌঁছার লক্ষ্যে শ্রীর জননেসিয়ে ব্যবহার করার জন্য এক ধরনের খাপবিশেষ, যা ক্ষেণদ্বীয়।

কনডমঃ এটাও বীর্য জরায়ুতে না পৌঁছার লক্ষ্যে পুঁজনেন্দ্রিয়ে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের খাপ। অভিজ্ঞদের থেকে জানা গেছে, এ পদ্ধতিতে যৌন কার্যে পরিপূর্ণ তৃণত লাভ হতে বর্তমান হতে হয়।

গর্ভনিরোধক ইনজেকশন, বটিকা, নরপ্রস্তু বা পিল সেবনের দ্বারাও সাময়িকভাবে গর্ভনিরোধ করা সম্ভব। তবে অনেক চিকিত্সক মনে করেন যে,
এগুলোর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। অধিক সেবনের ফলে মহিলাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হাত অ্যাটক, উচ্চ রক্চাপ, পিঠথলিতে পাথর এবং শরীরে মারাত্মক জ্বালা-পোড়া গুরুতর হতে পারে।

হুহুমঃ ৫ নং, ৬ নং এবং ৭ নং পদ্ধতি “আয়ল”-এর হ্রুতুকের ন্যায়। অর্থাৎ, এসব পদ্ধতি আয়ল কার্যের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা। যেতে পারে। নিম্নে আয়ল সংক্রান্ত বিতর্কের আলোচনা করা হলো-

(৮) আয়লঃ পরিবার পরিকল্পনা বা গতনিরোধের আরেকটি পদ্ধতি হল। আয়ল।

ইসলামের প্রথম দিকে গতনিরোধের ক্ষেত্রে আয়লই ছিল একমাত্র পদ্ধতি।

tবে, আয়ল জানায় যেন, এ ব্যপারে বিতর্ক রয়েছে। যথা�-

ক। বিরোধীগণের অভিমতঃ ইবনে হাজম, শায়খ মোহাম্মদ আবু জাহরা, আবুল আলা মওদুদী ও শায়খ আহমেদ শাহনূর প্রমুখ আয়ল অথবা গতনিরোধক যে কোন প্রতিকৃতিকে শিফত বলে অভিহিত করেন।

দলীল (১) আলাহ তাআলার বাণীঃ

(২) আলাহ তাআলার বাণীঃ

অর্থাৎ, যখন জীবন সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধ তাকে হত্যা করা হয়েছিল। (তাতক্তিক ৮-৯)

উল্লেখিত আযাত-ব্যবহার সংস্করকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হত্যার প্রতি নিদর্শন জানানো হয়েছে। আর আয়ল অথবা গত নিরোধক যে কোন পদ্ধতিই হল শিরন্ত্যা।

দলীল (৩) আলাহ তাআলার বাণীঃ

(৪) আলাহ তাআলার বাণীঃ

অর্থাৎ, জুনামা বিনত ওহাব আল আসাদিয়া (উক্লাহ-এর ভ্রাতী) বর্ণনা করেন, আমি অন্যদের সহ আলাহর রাসূল (সাহী)-এর সমুদ্রে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেন, “আমি আল ঘায়লা (দুর্গাপোষা বাচ্চার মায়ের সাথে সহায়তা করার) প্রয়োজনীয় করে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমি রোমান ও পারস্যবাসীদের সমন্ধে চিন্তা করলাম এবং জানলাম যে, তাদের পর্যায়ত্তী মায়েরাও সত্বানদের জন্য দান করাতো এবং তাদের ক্ষতি হতো না।” অতঃপর সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (সাহী)-কে আয়ল
সহকাম্য হাদিস

ধীর্মিস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এটা “আল ওয়াদ আল খাফী” অর্থাৎ গুণ শিক্ষাপত্য।

উক্ত হাদিসটি দ্বারা সপষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, আয়ল জায়েয নয়। কেননা, নবী করীম (সাহ) এটাকে “গুণ শিক্ষাপত্য” বলে আখ্যা দিয়েছেন।

খ. সমর্থকদের অভিমতঃ চার ইমামসহ জমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, গর্ব নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া হিসেবে আয়ল বেঞ্চ। তবে ত শৈর সমর্থককে হওয়া চাই।

কেননা, বোধিতে বীর্যপাতের দ্বারা শৈরের আনন্দ লাভ করা, এটা তার ন্যায অধিকার।

অধিকারে ফকিহ মনে করেন, শৈরের অনুমতি ব্যতীত আয়ল করলে তা মারাত্মক তান্ত্রিক হবে। আর এর উপর কিয়সাস করেই পরবর্তী ফকিহগণ বলেন যে, আয়লের ন্যায ডায়েন্ড্রোম, কনফ্যাম, গতনির্দেশ ইনজিওশন, বটিকা বা পিল সেবনও জায়েন আছে। তবে উদেশ্যে যেন খারাপ না হয়।

দলীল (১) : জাহির বন আলামাত বলেন কেনা নুয়ুল্লাহ উলামাত রসূল সন্ন আল্লাহ (২)

অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবন আসুরুল্লাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
(সাহ) এর সময়ে আমরা (সাহবাহগণ) আয়ল করতাম। অর্থাৎ ঐ সময়ে কুরআন
নাখিল হচ্ছিল।

দলীল (২) : হযরত জাবির ইবন আসুরুল্লাহ (রহ) হতে আরো একটি হাদিস বর্ণিত

আছে। তিনি বলেন-

কেনা নুয়ুল্লাহ উলামাত রসূল সন্ন আল্লাহ (২)

অর্থাৎ, ... আমরা রাসূলুল্লাহ (সাহ) এর সময়ে আয়ল করতাম। এ খবর রাসুলুল্লাহ
(সাহ) এর নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান এ হাদিসের সাথে আরো
যোগ করেন, “এটা যদি নিষিদ্ধ হতো, তাহলে কুরআনে তা নিষেধ করা হতো।”

দলীল (৩) : আলী হুসেনের বন উমর বন হাফেজের রাজাব (রহ) হতে হযরত আবু কুরআন বর্ণনা

করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাহ) শারীর অনুমতি ছাড়া আয়ল করতে নিষেধ

করেছেন।
উপরোক্ত হাদিস দ্বারাও বুঝা যায় যে, কৃষির অনুমতি সাপেক্ষে আয়ল বৈধ।

দলীল (৪)ঃ অনুচ্ছেদের গুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসেও নবী করিম (সাঁ) পরোক্ষভাবে আয়লের অনুমতি প্রদান করেছেন।

দলীল (৫)ঃ আয়লকারী বা আয়ল অনুমোদনকারী সাহাবীদের নামঃ
ক. হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা।)
খ. হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াকাছ (রা।)
গ. হযরত আবু আইব আল আনহারী (রা।)
ঘ. হযরত যায়েদ ইবন সাবিত (রা।)
ঙ. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা।)
চ. হযরত আহ্মদ ইবনে আব্বাছ (রা।)
ছ. হযরত আল হাসান ইবনে আলী (রা।)
জ. হযরত খাকাব (রা।)
ঝ. হযরত আবু সাবীদ আল খুদরী (রা।)
ঞ. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ (রা।)

(ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃঃ ১৬১)

জবাবঃ প্রথম দুই আয়াতের জবাবঃ কেন পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে তা ভিন্ন কথা। নতুন, এ দুটি আয়াত দ্বারা আয়ল নাজারে সাব্যস্ত করা কনকর্মেই সঠিক নয়। শায়খ ড। মোহাম্মদ সাল্লাল্হাতুব্বারা মাফকুর-এর মতে, আল-কুরআনের হত্যা সংক্রান্ত দুটি আয়াতের মধ্যে আয়ল ও গর্ভপাতকে অন্তর্ভুক্ত করা ভুল। কেননা, আযাত দুটিতে ‘ওয়াদ’ শব্দ নয়, বরং ‘কাতাল’ (হত্যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর হত্যা তখনি সন্তুত যখন তাতে জীবন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ বিশেষ এমন কোন ডাক্তার বা জানী পাওয়া যাবে না, যিনি বীর্যে রহ আছে বলে মন্থন করবেন।

অতএব রাওীতে অর্থাৎ শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তের ফলাফল বাতিল হবে।

তাহাড়া আযাতনের শানে নুয়ুল পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, জাহিলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং তাদেরকে জীবনের মাত্র প্রোথিত করে দিত। আর এমন জীবন হত্যা তো সবার নিকটই হারাম।

জুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের জবাবঃ (১) কোন কোন আলিম এ হাদিসটিকে যথেষ্ট মনে করেছেন। (২) কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করতে হলে ‘নস’ (কুরআন ও হাদিস)
ধারা বা তার উপর কিয়াস করে নিষিদ্ধ করতে হয়। এছাড়া কোন বিষয়কে নিষিদ্ধ করা যায় না। অথচ আয়ল সম্পর্কে কোন নস বা কিয়াসের কোন বিধান নেই।

(৩) ইমাম তাহবী (রহ.)-এর মতে, সুরা মুমিনুন-এর ১২-১৪ নং আযাত নামিল হওয়ার পূর্বে আযালকে স্পুত শিষ্ট হতা মনে করা হত। কিন্তু উক্ত আযাতসমূহ নামিল হওয়ার পর এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আযাতগুলো হলো-

১. এখন হে মানুষকে বলি— তোমা নিয়ে শিষ্ট হতা মনে করা হত। এই কথা নিয়ে তোমাকে মনে করা হত।

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি উহাকে শোকবিদ্ধরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর শুরু দিয়ে জমাট রক্ত (আলাক) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে (মুদগাহ) পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অহ্ম (ইয়াম) সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অন্ধকারে পড়িয়ে দেই সোশট (লাহস) দ্বারা। অতঃপর উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিতে।

নিপুণতম সৃষ্টিকর্তার আল্লাহ কত কল্যাণময়। (মুমিনুনঃ ১২-১৪)

(৪) হযরত ইবন আকাস ও আলী (রা) আযালকে শিষ্টহতা মনে করেননি। হযরত আলী (রা) বলেন, শিষ্টহতা তখনই হতে পারে, যখন ৭ম খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত হয়। কোন কোন সাহাবায়। কিবর্ম আল্লাহ করতেন। এটা যদি শিষ্টহতা হতো বা কবীরা গ্রহণ করতো, পবিত্র কুরআনে তা নিষিদ্ধ হত অথবা নবী কোম্য (সা) তা সরাসরি নিষেধ করতেন।

(৫) যারা পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে থাকেন তারাও বলে থাকেন যে, বাক্কিগত পর্যায়ে আযাল করা যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় নীতি হিসেবে তা প্রচলন করা যায় না। এতেও বুঝা যায় যে, আযাল বা গর্ভনিরোধ শিষ্টহতা নয়।

(৬) জুদামা বর্তিত হাদিসের ভিত্তিতে আযালকে মাকবুহ তানাবীই বলা যায়। যেমন মনে করেছেন ইমাম নবী ও ইমাম তাহবী।

প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, কোন কোন ফিকহের গ্রহে উল্লেখ আছে যে, নিম্নবর্ণ্য করাগে গর্ভধারণের ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও গর্ভনিরোধ জায়েন।

ক. যদি মহিলা গর্ভধারণের বোঝা বহন করতে অপার হয়।

খ. মহিলা যদি নিজ বাসস্থান থেকে এত দূরে থাকে, যেখানে তার হাতীভবে অবস্থায় যে ইচ্ছা নেই। তার আপনার বাহন সফর করতে হবে যার দ্বারা গর্ভনিরোধ করা যেতে পারে।

গ. বামী-শ্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক না থাকায় সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার সভ্যতানো থাকে।
ঘ. পূর্বের যে সত্তান মায়ের কোলে রয়েছে, তার স্বাদু নষ্ট হওয়ার প্রবল আশ্চর্য থাকলে।

৬. যুগের প্রতিক্ষুল অবস্থার কারণে সত্তান অসচ্ছরিত এবং পিতা-মাতার অপমানের কারণ হওয়ার আশ্চর্য থাকলে।

৭. গর্ভধারণের কারণে মহিলার দুঃখ শুকিয়ে যাওয়া এবং কোলের সত্তানকে লালন-পালন করার মতো অন্য ব্যবস্থা না থাকা বা কঠিন হওয়া।

৮. কোন দীনদার ডাকাত যদি বলে যে, গর্ভধারণ করলে মহিলার প্রাণহানি কিংবা কোন অসহানি হওয়ার প্রবল আশ্চর্য রয়েছে।

৯. মহিলা যদি অসচ্ছরিত হয় এবং স্বামী তার সাথে বিচ্ছেদের ইচ্ছাও রাখে।

(আহসানুল ফাতাহীয়া খন্দ ৮, পৃ. ৩৪৭, ইস্তিমায় সংস্করণ, শামী খন্দ ৩, পৃ. ১৭৬, করাচী সংস্করণ)

উপরোক্তিতে কারণসমূহ ছাড়াও ইমাম গাযালী (রহ.) থেকে আরো দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

(ক) সুখতর দামপত্য জীবন এবং স্বামীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য স্বামীর শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষণের উদ্দেশ্যে।

(খ) বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দৈনন্দিন ক্রিয়া পরিহার করার উদ্দেশ্যে। বহুসংখ্যক সত্তানের কারণে পিতা-মাতা অসৎ জীবন-যাপন বাধা হতে পারে এবং জীবনের স্বাভাবিক অন্তরাল ক্লাপ্ত হয়ে যেতে পারে।

* হামাফী ও হামাশ্লী মায়াহার মতে, শক্তি এলাকায় জন্ম হলে সত্তানের ইসলাম বিচার হতে বাধা হবার সত্যাবনা থাকলে।

৯। গর্ভপাত (এবেরশন): যদি কোন মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় এবং তার কোলের বাচার জন্য তা ক্ষতিকর হয়, যেমন গর্ভবতী হওয়াতে দুঃখ শুকিয়ে যাওয়া, দুঃখ নষ্ট হয়ে যাওয়া, যা কোলের শিশুকে খাওয়ানো যায় না, এমতাবস্থায় গর্ভ চারমাস পূর্ণ হওয়ার আগে ওয়াশ করে বা অন্য পদ্ধতিতে গর্ভপাত করানো যেতে পারে। যদি কোলের শিশুকে বোঝানোর কোন ব্যবস্থা না থাকে।

(ফাতাহীয়া আলমগীরী খন্দ ৫, পৃ. ৩৫৬ পাকিস্তানী সংস্করণ, শামী খন্দ ৩, পৃষ্ঠা ১৭৬ করাচী সংস্করণ)

উল্লেখ্য যে, মালিকী মায়াহারের গর্ভগর্ভ হওয়ার পর গর্ভপাত বা জ্ঞাপন বৈধ নয়।

এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেও নয়।

শাফেই মায়াহারের ফকিরগণ ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত সম্পর্কে স্বাধীনতা।

একদল নিষিদ্ধ মনে করেন। আরেকদল বৈধ মনে করেন।
হাওরী মায়াহারের মতে, ঐতিহ্য বলে যে, পূর্বের গর্ভপাত বৈধ। তবে ৪০ দিনের পরে অবধু।
তবে সকল মায়াহারের সর্বসম্মত অভিমত হলো এই যে, গর্ভসংক্রান্ত ১২০ দিন পর গর্ভপাত হারায়। অবশ্য যদি গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষার কারণে প্রয়োজন হয়, সেটা ভিন্ন কথা। (ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২৬৮-২৬৯)

১৫৪. উমর বিজ্ঞানী বলে যে, 'পিতা এবং দাদার সূত্রে বঞ্চিত। যদি বলেন, রাসূল সাহেব বলেন যে, যখন তোমাদের সন্তানের সাত বছরে উপনিবৃত্ত হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছোলা-মেয়েদের) বিয়না পৃথক কর দাও।
সাম্প্রতিক ফকিহগণ উপরের লিখিত সন্তানের পৃথক শাখা ব্যবহার সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, যে তোমরা পুত্র-কন্যার জন্য পৃথক করে ব্যবহার না করা পর্যন্ত দম্পতি সন্তান জন্মদান সামর্থ্যিকভাবে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। (ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ২৩৭-২৩৮)
এক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে নবী করিম (সাহেব) বলেন, "তোমরা এমন ক্রীতদেশে বিবাহ কর, যার অধিক সন্তান প্রসব করে" উপবন্ধন করলে এর উত্তরে বলেন, পূর্ব হাদিসটি অধিযায় করলে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি নবী করিম (সাহেব)-এর খিদমতে উপনিবৃত্ত হয়ে বলে, আমি এক সুন্দরী ও সংস্মরণী রমণীর সন্তান পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সন্তান প্রসব করে না (বিশ্বাস)। আমি কি তাকে বিবাহ করব? তিনি বলেন, না। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। অতঃপর তৃতীয়বার সে ব্যক্তি কথা বললে, নবী করিম (সাহেব) উত্তর দিয়ে বলেন। (লিয়ালেরের ১৩) এতাবত, এ উক্তিটির সাথে পরিবার পরিকল্পনার কোন বিরোধ নেই। উক্ত হাদিসটির বদার উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি নারীদের বিয়ে না করা; বং প্রজনন সহকর্ম নারীকেই বিয়ে করা। সংস্তান জন্মে যদি নিজ ও জাতির জন্য আপদ না হয় সম্পদে পরিণত হয়, এদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে হারাম ও অবেদ প্রহা অবলম্বন না করে যথাযথ দায়িত্বের সাথে উপযুক্ত শিক্ষা, চরিত গঠন,
আল্লাহ ও রাসূল (সাঁ)-এর আনুগত্য করা তথা প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে তা হবে অবশ্যই প্রশংসনীয়। কেননা, ইসলাম কেবল লোক বৃদ্ধির পক্ষে নয়; বরং প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে। আর তাঁদেরকে নিয়েই নবী করীম (সাঁ) কিয়ামতের দিন গর্ব প্রকাশ করবেন।
কতাব অধ্যায়

তালাক অধ্যায়

সুমাত জরিকায় তালাক

বা ফি তালাক সন্তন ২৯৬

... আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত হন অবস্থাতে তালাক প্রদান করতে। তখন উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ) এ সাহায্য প্রদান করতে। তিনি রাসূল সাহাবািয় এর যুগে তাঁর শ্রীকে হায়ের অবস্থাতে তালাক প্রদান করতে। তখন উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ) এ সাহায্য প্রদান করতে। তিনি বলতেন, তুমি তাকে বল তার শ্রীকে ফিরিয়ে আনতে এবং হায়ের হতে পরিত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখতে বল। এরপর সে (মহিলা) পুনরায় হায়ের হতে পরিত্যাগ হলে সে তাকে চাইলে রাখতে পারে এবং যদি চায় তালাকও দিতে পারে। এই তালাক অবশ্য তার সাথে সহবারের পূর্বে পরিত্যাগ নিজের কাছে হবে। আর এ ইদ্রম সাহাবািয় এ তালাক মহিলাদের তালাক প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

বিশেষণঃ তালাকের আভিধানিক অর্থ

(তালাক) শব্দটি ফার্সি-এর ওয়ানে বাবে তালাক-এর মাসদার, যা তালাক-এর অর্থ ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

1. তালাক মুক্ত করা
2. তালাক হলী করা
3. তালাক বিচ্ছেদ করা
4. তালাক উঠিয়ে ফেলা
5. তালাক বের করা (ফার্সি এর ওয়ান সন্তন ৩২২)
আহকামুল হাদীস

শব্দটির ব্যবহার পরিপ্রেক্ষিত কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়-

الطَلَاقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ يَمَعِزُوفُ أَوْ تَسْرِيحُ بِيِحْسَانٍ

অর্থাৎ, তালাকে ‘রাজ্য’ হল দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় উত্তম পদ্ধতিতে বর্জন করবে। (বাকারাণ ২২৯)

হাদীসে বর্ণিত আছে-.... عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ

(ابو داوود ج ১ পাবে ২৯৬ বাবে করাতিয়াহে তালাকে, এক মাধ্যম ১৪৬)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাজ) নবী করিম (সাহ) হতে বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট নিকৃত্তম হাদাল বন্ধু হল তালাক।

তালাকের পরিভাষিক সংজ্ঞা:

(১) আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন-

هو رفع القدّت الثابت بالتكاح بالالفاظ المخصوصة

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দ দ্বারা বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করার নামই তালাক।

(২) হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়তে রয়েছে-

هو عبارة عن حكيم شرعي يرفع القدّة التكاح باللفاظ المخصوصة

অর্থাৎ, তালাক হচ্ছে এমন একটি শরীর হকুম, যা নির্দিষ্ট শরীরমূহের মাধ্যমে বৈধাবিল বদ্ধনকে উঠিয়ে দেয়।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হوَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الزِّنَةِ والزُّوِّجَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ اسْتِفْتَاع

إلا بالرَّجُعَةَ أو بِتَجْدِيدِ الْتَكَاحَ أو بالحِيْلَةِ

অর্থাৎ, তালাক হল স্বামী-স্বার্থের মধ্যে এমন এক বিচ্ছেদ, যার পর হীলা, নতুন বিবাহ অথবা প্রত্যাবর্তন বাতীত উপভোগের সুযোগ থাকে না।

(৪) বৈধাবিল সমক্ষের বিচ্ছেদকে তালাক বলে। (قواعد الفت ৩৬২)

তালাকের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা:

(গুপগত)-এর দিক দিয়ে তালাক তিন প্রকার। যথা-

(৫) أَحْسَنُ الطَّلَاقِ (উৎকৃষ্টতম তালাক)
হো আপনি তিনি রাজতান্ত্রিক স্তরে তিনি তিনি তিনি তিনি তিনি তিনি তিনি 

(প্রজ্ঞা বিদায় তালাক) ৪ একই সংখ্যার যাত্রা তিনি দুই তিন তালাক প্রদান করা, যার মধ্যে ভিত্তি রয়ে তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়। অথবা তিন তুলে তালাক দেয়, যার মধ্যে সহাবস করা হয়।
হুকুম (হুকুম) হিসেবে তালাক তিন প্রকার। যথা-

(রাজসী তালাক)

হুকুমের দ্বিতীয় রূপের জন্য যে তালাকের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যেমন এক তালাক ও দুই তালাকের পর ফিরিয়ে আনা যায়।

(বায়েন তালাক)

হো মা লা রেজুমেশন ইলে নোহুর টোটাল কৃত্তিকায় মুদ্রিত মূলধন অর্থাৎ, এটা এমন তালাক, যা প্রদান করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রেজুমেশন করার অধিকার থাকে না। তবে উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে নবায়ন করার সুযোগ থাকে। যেমন-(ইজিত-সূচক) শব্দ দ্বারা তালাক দিলে। আর তা এক অথবা দুই তালাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে।

(সুমামলারা তালাক) তালাকে মুগালরা হচ্ছে এমন তালাক, যার পর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার এবং বিয়ে নবায়ন করার কোনো অধিকার ও সুযোগ থাকে না। তবে অন্য স্বামী স্ত্রীতাত্ত্বিকভাবে বিয়ে করে বেচাবার তালাক দিলে ইদিত পালনের পর পূর্বনির্ণয় স্বামীর জন্য বিয়ে করা বৈধ হবে।

যেমন আলীহাত আলালা বলেন-

ফাঁসুন, তালাকের ফলাফল যেন তালাকের ফলাফল নেই।

অর্থাৎ, তারপর যদি সে তৃতীয়বার তালাক দেয়া হয়, তবে সে শুনে যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়।

(বায়েনঃ ২৩০)

* (শহীদ) তালাক দু'প্রকার। যথা-

(সুমামলারা তালাক)

হুকুমের দ্বিতীয় রূপের জন্য যে তালাকের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। ইচ্ছা করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যেমন এক তালাক ও দুই তালাকের পর ফিরিয়ে আনা যায়।

(বায়েন তালাক)

হো মা লা রেজুমেশন ইলে নোহুর টোটাল কৃত্তিকায় মূলধন অর্থাৎ, এটা এমন তালাক, যা প্রদান করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রেজুমেশন করার অধিকার থাকে না। তবে উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে নবায়ন করার সুযোগ থাকে। যেমন-(ইজিত-সূচক) শব্দ দ্বারা তালাক দিলে। আর তা এক অথবা দুই তালাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে।
সরীহ তালাকের শব্দ একটি। তাহলে তালাক, অতঃপৰ এ শব্দ হতে নির্গত সকল শব্দ সরীহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন-

(১) আন্তঃ তালাক (তুমি তালাক প্রাপ্ত)

(২) আন্তঃ মুল্লোতা (তুমি তালাক প্রাপ্ত)

(৩) তোমাকে তালাক দিলাম (তোমাকে তালাক দিলাম)

উল্লেখ যে, শাকেন্দী ও হামলাদের মতে, সরীহ শব্দ দু'টিই। যেমন- সুঝার - ফারাহ - তালাক। কিনায়া তালাকের শৃঙ্খলী দু'প্রকার। যথা-

১. প্রথম প্রকারের শব্দগুলো হচ্ছে-

(ক) ইউনিয়ন (তুমি ইড়ত পালন কর)

(খ) ইস্টার্ন ইউনিয়ন (তোমার জরায়ু পবিত্র কর)

(গ) আন্তঃ পাশলিচ (তুমি নিভসিয়নী)

এগুলোর দ্বারা এক তালাকে রাজহ পরিক হবে, যদিও কিনায়া শব্দ হোক না কেন। কেননা, এগুলির আগে সরীহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। আর সরীহ শব্দ দ্বারা এক তালাক রাজহ পরিক হয়।
যেমন- ে তুমি নিঃমত-এর মূলে হল- তুমি পৃথক
অর্থাৎ, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, তাই তুমি ইহুদত পালন কর।

২। দ্বিতীয় প্রকারের শঙ্কালো হচ্ছে-

(ক) আন্ত বায়ন- তুমি পৃথক
(খ) আন্ত হারাম- তুমি হারাম
(গ) আন্ত ধারাল- তুমি শূন্য
(ঘ) আন্ত আজো- তুমি স্বামী খোজ কর
(ঙ) আন্ত যুত- তুমি দায়মুক
(চ) হিলক ও গার্লেক- তোমার রশি তোমার ঘাড়ে
(ছ) হিলক বায়লেক- তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হও
(জ) সন্ত্ভার- আমি তোমাকে মুক্ত করেছি
(ঝ) আন্ত জোর- তুমি স্বাধীনা
(ঞ) ফার্তকেক- আমি তোমাকে পৃথক করেছি
(ট) আম্বল পিয়দি- তোমার সিদ্ধান্ত তোমার হতে
(ঢ) উম্মুল লাহলেক- তোমার পরিবারের জন্য তোমাকে দান করেছি
(ণ) চায় ধরায় তোমার মাথা ঢাক। এ ধরনের আরো অনেক শঙ্ক রয়েছে।

ঋতুত্বী অবহ্র তালাক প্রদানের মুক্তি:
* আলামা ইবন হযম, ইবন তাইমিয়া এবং হাফেজ ইবন কায়িম (রহ.)-এর মতে, ঋতুত্বী অবহ্র তালাক অনুমোদিত হবে না।

(মহলি জ ১১ ১৯১১, ফিতফি বারিব জ ৪১ ৩০১, রাজা সুলতান জ ৫ ২২১)

দলীলঃ হযরত ইবন উমর (রাঘ) তাঁর ক্রীড়ে ঋতু চলাকালীন অবহ্র তালাক প্রদান বর্ণিত আছে যে-

... কারা করা তুমি বিশ্বাসের তুলনায়? কারা তুমি রােঁ তুমি ইন এর খুঁজ এসে আমাকে বিচার করেন? (খারী)

জ ২ ৭২ বার ইবনে তালত আলহাদে, মসলমান জ ২৭৭, তৌর্জীর জ ১ ২২ বাব তালত সেলে, নিজাম (২ ৪ ৯৯ বাব তালত লেঃ লেঃ লেঃ, বাব মাজাহ ১৪৬)

(চ ২ ৪ ৯৯ বাব তালত লেঃ লেঃ লেঃ, বাব মাজাহ ১৪৬)
অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, আমি বললাম, সে তালাক ধর্তব্য হবে? উত্তরে তিনি বললেন, থাম। তুমি কি মনে কর? যদি সে অক্ষম হয় ও বোকামি করে?

ইবন তাইমিয়া (রহ.)-এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন, তুমি তালাক কার্যকর হওয়ার যে ধারণা পোষণ করছ তা থেকে বিরত হও। আর এর অর্থ বর্ণনা করেন যে, শরীয়ত তার পরিবর্তন সাধনের কারণে পরিবর্তিত হবে না। যেহেতু শরীয়তের হুকুম রয়েছে যে, হায়ে অবস্থায় তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর তা কি পরিবর্তন করা এবং এক তালাক ও তার বোকামি ধর্তব্যে আনা সম্ভব?

(دروس ترمذي ج:369، المجموع شرح المذهب ج:31)

* চার ইমাম সহ জমহুর আলিমগণের মতে, ঝুতুবী অবস্থায় তালাক দিলে তা
  কার্যকর হবে। যদিও তা হাযরাম এবং অপছন্দনীয়।

(بدائع الصنائع ج:396، المجموع شرح المذهب ج:168)

দলীল (১) অনুসারে শুরুতে বর্ণিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম (সা) হযরত উমর (রআ)-কে বললেন- মূলতঃ ফিরিয়ে আনে। "তুমি তাকে বল তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে।"

উক্ত বাক্য স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ( الزوجة) হুকুম দেয়া হয়েছ। আর একথা সুপশ্চ যে, (فِيَرِيَهُمُ الأَنَّا) তখনই সম্ভব, যখন তালাক সংঘটিত হয়। নতুন ফিরিয়ে আনার কোন প্রশ্নই উঠে না।

তাছাড়া তালাক এমন একটা ব্যবহার যা যেকোন অবস্থায়, যেকোন সময়ে বলুক না কেন, তা সংঘটিত হবে।

জবাবঃ ইমাম তাইমিয়া (রহ.)-এর দলীলের জবাবে হযরত আনৌয়ার শাহ কামিয়া (রহ.) বলেন, কোন কোন রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, ইহ তালাক হিসেবে ধরা হয়েছিল। এজন্য হযরত সালিম ইবন আন্দুল্লাহ বলেন, হযরত আন্দুল্লাহ (রআ) তাকে এক তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তার এই তালাক ধর্তব্য হয়েছ। তাছাড়া হযরত ইবন উমর (রআ) বলেন, অতঃপর আমি সেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি এবং আমি তাকে যে তালাক দিয়েছি, সে তালাক ধর্তব্যে এনেছি।

(مسلم ج:31 ص:376، باب تحريم طلاق الحائض، فيض الباري ج:4 ص:310)
বাবেরে পূর্বে তালাক

... ফরের বন শুভে বন বনের জুড়ে তার পিতা হতে এবং পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। পাঠ বলেন, নবি করিম (সাহের) ইরশাদ করেছেন, সুর আর বাতাসী হওয়া ব্যতীত তালাক হয় না। কোন দাস-দাসীর মালিক হওয়া ব্যতীত তাদের আয়াদ করা যায় না। আর কোন জিনিস-পত্রের মালিক হওয়া ছাড়া, উহা বিক্রি করা যায় না। রাবি ইব্রাহীম ইব্রাহীম সাক্সাহ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, কোন মালের মালিক হওয়া ব্যতীত উহার মানত করা যায় না।

বিশেষণে বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে তা কার্যকরী হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতান্তরী রয়েছে।

লা তথা ‘বিবাহের পূর্বে তালাক নেই’, এর দুটি অবহু রয়েছে।

এক, যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের পূর্বে কোন মহিলাকে তাত্ক্ষণিকভাবে বলে যে, ‘না হোক তালাক’ (তুমি তালাক) তাহলে এ কথার উপর সবাই একমত পোষণ করেন যে, তার উপর তালাক প্রয়োজ্য হবে না, ঐ লোক পরে ঐ মহিলাকে বিবাহ করুক বা না করুক। কেননা, যথায় সে তালাক দিয়েছিল, তখন সে তার মালিক ছিল না।

দূই, কিন্তু তালাকের সম্পর্কে যদি বিবাহ বা মালিকানার দিকে করা হয়, (যেমন, কেও বলেল, "না তালাক তুমি তালাক নেই"), অর্থাৎ “আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তুমি তালাক”) তাহলে এ ব্যাপারে ইমামদের মতান্তরী রয়েছে।

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইব্রাহীম হামদল (রহ.)-এর মতে, এমতাবহুলও তালাক হবে না। কেননা, এ ধরনের খুলনা বাক্য মূলধারী ও বাতিল।

দলীলঃ উপরেরলিখিত হাদিস-“লা তথা ‘বিবাহের পূর্বে তালাক নেই’”
উক্ত বাক্যে সাধারণত স্বার্থ মালিক না হওয়া অবস্থায় তালাক না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

* ইমাম মালিক, আওযঝা ও ইবন আবু লায়লা (র.হ.-এর মতে, যদি নিদিষ্ট কোন মহিলা বা কোন নিদিষ্ট এলাকা অথবা কোন নিদিষ্ট গোত্র বা কোন বিশেষ সময়ের উল্লেখ করে, তাহলে ঐ মহিলাকে বিবাহ করলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন- কেউ বললে—

"ইনন তক্ষণত ফাললে তানা যায়। এন নক্ষত্র মনে বিলায়ত কোনো কোনো ফুটিয়ে কোনো, মনে নক্ষত্র ফুটে হয়।"

অর্থাৎ, “আমি যদি অমুককে বিয়ে করি”, অথবা “আমি যদি ঐ শরীফের সাথে বোলা বিয়ে করি” অথবা “আমি যদি ঐ মাসে বিয়ে করি”, তাহলে তালাক- এমনকী তালাক সংখ্যা হবে। যেহেতু সে নিদিষ্ট নেই।

কিন্তু কেউ যদি ব্যাপক আকারে বলে যে, “কল্যান তক্ষণত ওয়ো ফুটো তলাওক”

অর্থাৎ, “যখনই আমি কোন মহিলাকে বিয়ে করব সেই তালাক”।

তাহলে তালাক পালিত হবে না। কেননা এটা বিবাহের দরজাই বন্ধ হয়ে যাব।

এর পরে তো কোন মহিলার সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। তাই তা বাতিলও অগ্রহণযোগ্য। (নব্য অব্যাধিঘোড় 10 সংখ্যা ২৭৩-২৭৪)

দলীল (১): ইমাম মালিক (র.হ.) বলেন, ব্যাপকভাবে এমন উক্তি এই জন্য জায়গায় নয়, কারণ বিবাহ হল একটি হালাল বিষয়। তাই ইহা উক্ত বাক্যের ঘর্ত পরিপূর্ণভাবে হারাম করে দেয়ার সম্ভাবনা। তাই এ অধিকার কোন মানুষের নেই।

তাছাড়া ইবরাহীম নাকিন (র.হ.-এর একটি আহ্বান তাদের প্রমাণ

"ইনন তক্ষণত ফাললে তানা যায়। এন নক্ষত্র মনে বিলায়ত কোনো কোনো ফুটিয়ে কোনো, মনে নক্ষত্র ফুটে হয়।"

(সম্ভাবনা নোং রামজান ২৩১)

অর্থাৎ, যখন কোন মহিলা অথবা কোন গোত্রকে নির্দেশিত করে, তবে এটা জায়গায়।

আর যখন সব মহিলাকে ব্যাপকভাবে বলে, তবে সেটা ধর্তর্থো নয়।

* ইমাম আবু হানিফা (র.হ.-এর মতে, শর্ত ব্যাপক আকারে কর্কু অথবা নিদিষ্ট কোন মহিলাকে কর্কু, সরবরাহ তালাক হয়ে যাবে। (দস্তুনে মাশুক ৩৪ সংখ্যা ৩৩)

দলীল: ইমাম আবু হানিফা (র.হ.) বলেন, কোন উক্তি শর্তের সাথে সম্পর্কিত অবস্থায়, যখন শর্ত বাতাসী পর উক্তি করা হয়েছে। তাই কেউ শর্তের সাথে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। কেননা, ধরে নেয়া হবে ইহ বিয়ের আগে তালাক নয়, যেন বিয়ের পর এইমাত্রে তালাক দেয়া হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে বলেন, যেমন
কেউ বলল - অর্থাৎ “আমি যদি তোমার মালিক হই তবে তুমি আযাদ”। অথবা বলল - অর্থাৎ “আমি যদি তোমাকে ক্রয় করি তবে তুমি আযাদ”। তাহলে এরূপ শর্তায় জায়েষ হবে।

(নুর আলমরা সং ১৯৭) ।

দলীল (২)।

“Қো ғি ғүфіъағиға ғоғиғи ғәляъы ғоғиғи - ғөғағи ғүтерғиғи ғоғиғи - ғөғағи ғүтерғиғи ғоғиғи” (مسف عبّد الرزاق ج ص ২১৪)

ার্থাৎ, আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাতাব (রা.)-এর কাছে এসে বলল; আমি যে কোন মেয়েকে বিয়ে করব, সেই তিনি তালাক। তখন উমর (রা.) তাকে বললেন, এটি তুমি যেমন বলেছ তেমনি।

দলীল (৩)।

“যদি কেউ মৃত্যুর পূর্বে নিজের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসীমত করে তাহলে এর কার্যকারিতা মৃত্যুর পরেই হবে, অসীমতের সময় হবে না।”

(নতুন আলোচনা ২ চৌ ১৯৮)

জবাবঃ হাণাফীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিন ইমামের দলীলের উত্তর হল, মালিকনার দিকে সম্বন্ধীয় তালাককে আমলিকানার তালাক বলা যায় না। কারণ, তালাক পতিত হবে মালিকানা অর্জনের পর। অতএব, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা হাণাফীদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা ঠিক নয়। হাণাফীদের মতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে তাত্ত্বিক তালাক অথবা এরূপ তালাক যা মালিকনার সাথে খুল্য।

(دروس تريتي چ 32 197)

এই ব্যাখ্যার সমর্থন একটি আছে অর্থাৎ হয়ঃ

"عنّ مَعْنَّر عَنّ الزَّهْرِيِّ فيّ رَجُل قَالَ كَلّ إِمَرَأّة أتَوَزَّجَهَا فَيُنَافِقُ وَكَلّ أَمَّةٍ اشْتَرَتْهَا فَيُنَافِقُ قَالَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ مُعَلّم فَقَلّتِهِ أَوْلِيَّ بَيْنِي عَنّ بَعْضِهِمْ فَالَّذِي قَالَ لَا طَلَقٌ فِيّ الْنَّكَاحِ وَلَا عَتَاقَةُ إلَّا بَعْدُ الْمِلْكِ قَالُوُنَّ إِنّي ذَلِكَ أُنْفِق ذَلِكَ أُنْفِقْوُنَّ الرَّجُلٌ إِمَرَأّةُ فَلَان طَلَقٌ وَعَبْدُ فَلَان حُرٌّ” (مسف عبّد الرزاق ج ص 214)

ার্থাৎ, যুবর্জী (রহ.) থেকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে বলেছিল, যে মহিলাকে আমি বিয়ে করব, তারা সবাই তালাক। আর যত বাবু আমি ক্রয় করব সবাই আযাদ। যুবর্জী (রহ.) বললেন, সে যা বলেছে অনুরূপই। মামার বলেন, আমি বললাম, কারো কারো থেকে কি বর্ণিত নেই যে, তিনি (রাসূল সং) বলেছেন, বিয়ের পূর্বে তালাক নেই এবং মালিকনার পূর্বে আযাদ নেই? উত্তরে তিনি বললেন, এটা তো হল তখন, যখন কোন পূর্ণতা বলবে, অমুকের জ্রী তালাক এবং অমুকের গোলাম আযাদ।
গ্রামনিত অবস্থায় তালাক দেয়া

রাবি (সাফিয়া বিনত শায়রা) বলেন, আমি আরিশা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্হু আলাম তালাক হয় না বা দাস মুক্ত করা যায় না। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমার ধারণা ‘গ্রামনিত’ অর্থ হল গ্রামনিত অবস্থায় তালাক প্রদান করা।

বিশেষণে/গ্রামনিত (গ্রামনিত) শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) তথা বাধ্যকরণ, বলপ্রচার, বাধ্যবাধকতা, জবরদস্তি, বন্দল্করণ, তালাবদ্ধকরণ ইত্যাদি।

(২) তথা গ্রামনিত, ক্রোধান্তিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তিকে বলপ্রচারের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক কার্যকর হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানীক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হামল, হাসান বসরী, আতা ও মুজাহিদ (রহ)-এর মতে, জবরদস্তির মাধ্যমে যে তালাক দেয়া হয়, তা সংখ্যিত হবে না।

দলীল (১) উপরোক্তিত হাদিস।

দলীল (২) নবী করিম (সাহ) বলেন-

"যখন তিনি তার গ্রামনিত করেন বলেন যে তিনি রাসূল সাল্লাল্হু আলাম তালাক দিয়েছেন।"

অর্থাৎ, আবু যত গিয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্হু আলাম বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-বিস্ফৃতি ও জেরপূর্বক কোন কাজ বাধ্য করা হলে তা কঙ্কা করে দিয়েছেন।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখাই (রহ)-এর মতে, জবরদস্তির মাধ্যমে প্রদত্ত তালাক সংখ্যিত হবে।
দলীল (১)ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী
ফটাফাহন্ন ২৭ হে, জীবন ঠাকুর
অর্থাৎ, তোমরা ভ্রমের মধ্যে তালাক দাও। (তালাকঃ ১)
উক্ত আয়াতে তালাকের ক্ষেত্রে যে হৃদরুদ্ধ প্রদান করা হয়েছে তা ব্যাপক ও শতিহনি।
জবরদস্তিতি অবস্থায় হোক বা না হোক। এমন কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

দলীল (২)ঃ
عنِ أَبِي هُذِيرَة قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم كُلُّ طَلَاقٍ جَازِئٌ إلَّا طَلَاقُ الْمَطْعُوْبِ عَلَى عَقِلِهِ (بখারী পৃষ্ঠা ৭৯৪ বাবু তালাকের সংক্ষেপ)
ত্রিয়া জেন্ডি জেন্ডি ২২৫ বাবু তালাকের সংক্ষেপ
অর্থাৎ, আবু হুরায়র রাও থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাগর (সাগর) ইরশাদ
kকরেছেন, সব তালাকই জায়গা (তথ্য সংগঠিত হয়)। শুধুমাত্র মাতৃ তথ্য পাগলের
tালাক ব্যতীত।
আল্লামা ইবন হুমায় বলেন, জবরদস্তিতি অবস্থায় প্রদান তালাক কার্যকর হবে। কেননা,
জবরদস্তি অবস্থায় মুখ থেকে তালাকের যে সকল শব্দ বের হয় তা নিজের ইচ্ছায়ই
(ইক্ষুক) বের হয়। (এমন নয় যে, তার কষ্টনালীতে তলোয়ার বা অন্য কোন জিনিস
rাখতেই তার ইচ্ছা ব্যতীত তালাকের শব্দ বের হয়ে যায়। যেমনটি আমার দেখি
xেলানা জাতীয় জিনিসপত্রে। সেখানে সুইচ বা তার সংযোগ দিলেই যক্তির ইচ্ছা
ব্যতীতই পান রাষ্ট্র থাকে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি নয়।) যদিও সে এতে
রাজি থাকে না। আর তালাকের ক্ষেত্রে (ইচ্ছ) শর্ত, সাহস্য বা সন্ত্র থাকা
শর্ত নয়। কেননা (মুক্ত-বল্প্রয়োগকৃত ব্যক্তি)-এর ইচ্ছা কখনো স্বপ্নী (বিলুপ্ত) হয়
না। কিন্তু স্বপ্নী বা যুক্তর ব্যক্তি, পাগল ও ছোট শিতোষ কথা ভিন্ন।
কেননা তাদের ইচ্ছাই নেই। (টেলিফন ও লেখার ও এর তুলনা)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ १। উল্লিখিত তিন ইমাম যে হাদিস পেশ করেছেন তা
থেকে আসতে, যে কুরআনের আয়াতের মোকাবিলায় দলীল হিসেবে প্রাপ্ত নয়।
২। অথবা, উক্ত হাদিসে এই কথা বলা হয়েছে যে, তালাক প্রদান ও দাসমুক্তির
ব্যাপারে যেন জবরদস্তি করা না হয়। কিন্তু যদি জবরদস্তি করা হয়, তবে এই বিধান
কি হবে, তা উক্ত হাদিসে বলা হয়নি।
৩। অথবা বা -”লাইকে খুনিতে দফা একটাই হওয়া কিন্তু কিছু খুনির”।

লাইকে খুনিতে দফা একটাই হওয়া কিন্তু কিছু খুনির খুনিতে দফা একটাই হওয়া কিন্তু কিছু খুনির
তালাক অধ্যায়
অর্থাৎ, “তিনি তালাককে একই সাথে বন্ধ করিও না (যৌথ দিয়ে দিও না) যে, কিছুই বাকি থাকল না” বলে সম্প্রতি তরীকায় তালাক প্রদান কর। আর তা হল, তিন তুল্যে সেই তলাক প্রদান করা। (নিদোষ আইটাক ৩২, দূরে মুক্তি ৩৩ সংখ্যা)
* দ্বিতীয় দলিতের উদ্যত থেকে জবরদস্তি উঠিয়ে নেয়ার কথা যে বলা হয়েছে, এতে দ্বারা উদেশ্য হল, এমন কোন যৌথ যদিও জবরদস্তির মাধ্যমে কুফরী বা শিকারী বাক্স উচ্চারণ করানো হয়, কিন্তু তাদের অন্তরে যদি তাওহাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঐ জবরদস্তির মূল্যক কুফরী বাক্স ধর্মের হবে না।

দ্বিতীয় আলোচনায় পাগল, মাতাল, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, যুক্ত ব্যক্তি ও নেশাপুর্ণ বেইশ ব্যক্তির তালাকের জন্যে

* আলোম আইনি (রহ.) বলেন, পাগল এবং অন্যান্য অবস্থান লোকের তালাক না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম রয়েছে। অন্যতম তালাক না হওয়ার ছুকুম যুক্ত ও বেইশ ব্যক্তি ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। (উম্মে আফারী ২, সংহার ২০৩)।

* এখানে একটি ধারণা হবে যে, উপরিভূখন মাজুরুণ ও নেশাপুর্ণ বলেই উহাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, তাদের কাছে মধ্যেই যখন ইমাম ও অনুভব শাহিদ থাকে না। সুতরাং তারের তালাক সংঘটিত হয় না, এরূপভাবে নেশাপুর্ণ বেইশ্রেখরো তালাক সংঘটিত হওয়া উচিত। অতএব ইমাম আবু হানিফা, মালিক, হাসান বসরী, ইবনী ইবনী যাকুব, আওয়াই, সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম শাফেই রহ.)-এ উক্তি অনুযায়ী তার তালাক হয়ে যাবে। কারণ, লোক ও অন্যান্য অবস্থান লোকের জন্য পরামর্শত ও দূর্বল হওয়ার কারণ কুফরী ও অনুলিপ্ত। এরূপভাবে যুক্ত ব্যক্তির গৃহ যদিও বাহর ঐচিক রুক্ষ যাচার, কিন্তু বাহরতা হল এতো অনুচিত। চিত্ত ফিরে করলে বিলোপ ঘটে যায়। (ফজি আফারী ৯, সংহার ৩৩)। একে রয়েছে, নেশাপুর্ণ বেইশ ব্যক্তির বিবেক যদিও পরামর্শ, কিন্তু একে তার বিবেক পরামর্শ হয়েছে নিজের ইচ্ছার ও স্থায়িত্ব অনুসারে, তার তালাক কার্যকর হবে।
বাবু নিজেই তাছাদের মিলিত মুসলমানেরা তাছাদের একই গ্রহণ করলেন।

তিন তালাক প্রদানের পর, পুনঃপ্রবাহ বাতিল হওয়া সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রূখানার পিতা আবদুল ইয়াহিয়া, উম্মে রূখানাকে তালাক প্রদান করেন এবং মুহাম্মদ গোদালের জানা কীুলাককে বিবাহ করেন। সেই মহিলা নবী করিম (সা) এর বিধিমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, সে সহানুভূতিকে অক্ষম, যেমন আমার মাথায় চূল অন্যান্যের কোন উপকারে আসে না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। এতদ্রূপে নবী করিম (সা) রাগানিত হন এবং তিনি রূখানা ও তার ভাইদেরকে আহবান করেন।

এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত তার সাথীদের সম্মানে করেন বলেন, তাদের লক্ষ্য করে দেখে যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের বিশেষ অপত্যপ্রাণ তাদের পিতাগুলো আবদ ইয়াহিয়াদের অপত্যপ্রাণের মুসলমানেরা তাঁদের মধ্যে মিল খাওয়া না? তখন তারা বলেন, হাঁ। নবী করিম (সা) আবদ ইয়াহিয়াকে বলেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি তাকে তালাক দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রূখানাকে পুনরায় গ্রহণ কর। তখন তিনি বলেন, অমি তো তাকে তিনি তালাক প্রদান করেছি, ইয়া রাসূল হাওয়াই, হতে নিতে বলেন, আমি তোমার তালাক প্রদানের কথা অবগত আছি। তুমি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর। এরপর তিনি আবদানের আযাত তিলাওয়াত করেন, “হে নবী! যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক প্রদান করবে, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনের জন্য তালাক দিবো।” আবু দাউদ (রহ) বলেন, ... রূখানা তার স্ত্রীকে ‘আলবাত’ (নিশ্চিত) তালাক দেয় এবং নবী করিম (সা) একে এক তালাক হিসেবে গণ্য করেন।
বিশ্বেষণঃ যদি কোন ব্যক্তি তার গ্র্যাকে একই কথা দ্বারা বা একই মজলিশে তিনি তালাক দেয়, তাহলে এর হুকুম কি হবে- এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।
(১) শিয়ায়ে জাফরিয়াদের মতে, এবারে তালাক দিলে কোন তালাক হবে না।
(শিয়ারে হিজ্বি এ ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন।)

( شرح الإسلام ج 7 ص 275، فتح العلم ج 1 ص 153)

হামজাই ইবন আরাতাত, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ইবন মুকাসিনের দিকেও এই উদাহরণটি সমর্থনযুক্ত।
( شرح مسلم ج 1 ص 478)

(২) কতক আহলে যাহিদ, আল্লামাই ইবন তাহিমীয়া, আল্লামাই ইবনুল কায়িম, ইকরামার (রহ.) প্রমুখের মতে, এবারে তিনি তালাক দিলে কেবল এক তালাক কার্যকর হবে এবং স্বাভাবিক ইচ্ছাকে থাকলে তিনি ফিরিয়ে আনতে পারবে।
অনেকেই বলেন যে, গ্র্যার সাথে যদি সহবাস হয় থাকে, তবে তিন তালাক, আর যদি সহবাস না হয় থাকে, তবে এক তালাক কার্যকর হবে।

( فتح القدير ج 3 ص 329، المغني ج 7 ص 104، شرح مسلم ج 1 ص 478، زاد المعاد ج 5 ص 248)

দলীল (১)ঃ অনুমিত গুরুত্ব উপস্থ রুক্মানার হাদিস বা ঘটনা।
উক্ত হাদিসে লক্ষ্য করলে প্রতীকমান হয় যে, রুক্মানার পিতা রুক্মানার মাতাকে তিনি
তালাক প্রদান করা সত্ত্বেও নবী করিম (س) তাকে ফিরিয়ে নেয়ার হুকুম দেন।
সুতরাং বুঝায় যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজস হয়।
নতুন নবী করিম (س) এর হুকুম দিতেন না।

দলীল (২)ঃ আর এটাই সত্যতা সত্যতা কিনা তাহলে ইবনু আব্বাস তাই তাহার প্রতি তার গল্প তুজি হুকুম—

{
| উপাধি | উন্নয়ন | আল্লাহ উনির | স্মরণ বা বুদ্ধি বিক্রি করে তাদের মাঝে ত্রিপদী উপাদানের মাধ্যমে অবশ্যই | আব্বাস হুকুম— (ইবু দাউদ) জ 1 পাবে পাপে নস্তা মন্দবাজার, মস্লেম জ 1 পাবে | চালালাম, ১৪৮ | ২০০ | পাব |}

* ইবন অব্বাস এবং সকল মুজাতাহিদ, মুহাম্মদ ও মুফালসিগণের মতে, কেউ যদি
* তার গ্র্যাকে একই কথায় বা একই মজলিশে তিনি তালাক দেয়, তাহলে তাতি
* তালাক বায়ান মুগাল্মায় হিসেবে গণ্য হবে। যদিও সে স্বেভ গোনাহগার হবে,
* তবুও সে উক্ত গ্র্যাকে ছিল (হিজীল) ব্যতীত গ্রহণ করতে পারবে না।
দলীল (১৪) হযরত সাহল ইবন সাদ আস-সাদী (রা) হতে এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, উমাইমর নবী করিম (সা৷)-কে বলেন -

كدبت عليهُ يا رسول الله إن أمسكتها فطلقتها ثلثا قبلاً أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - (بخاري ج ২৪ ص ৭৭১ -ببـ.م.ـ ٤٠٧)

অর্থাৎ, “.... ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি তাকে রেখে দেই, তাহলে তার প্রতি আমি মিথ্যা আরোপ করতে অত তাকে নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই।”

উত্তর হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, যদি এক শব্দ ঘাড়া তিন তালাক দেয়া হয়, তাহলে তাকে কার্যকর হবে।

উল্লেখ যে, হাদিস শাখার ইমাম, হযরত বুখারী (রহ.) সরাসরি জমাদুরের মায়হাব অনুযায়ী এ ব্যাপারে বাবে মীস ভাবে তাদের নামে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে লিখেছেন।

দলীল (২৪) حديثنا قاتلة أنيت الله صلى الله عليه وسلم أن يأتم إنسنا أن نزحجب فلا أعليمها إنسنا أرسل إلي بطلاق، وإن يأتى أهله، الفقه والسكته فإن بها على، فإن حاول يرسل الله إنسنا إني أرسل إنها بثلاث تطقيات، فقالت حالا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الفقه والسكته لمرأة إذا كان لزوجها الرجعية- (لايم ج ২০০ باب الرخصة في ذلك)

অর্থাৎ, “ফাতিমা বিনত কায়তে আমাকে (শাপ্তী) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী করিম (সা৷)-এর কাছে এসে বললাম, আমি খালিদ পরিবারের
মেয়ে। আমার স্বামী আমার নিকট আমার তালাকের সংবাদ প্রেরণ করেছেন। আমি তার পরিবারের নিকট খোঁজাপেশের আবেদন করেছি। তারা আমাকে তা দিতে অস্বীকার করেছে। সাহাবাকে কিরাম বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! তার স্বামী তার কাছে তিন তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছেন। তখন ফাতিমা (রা) বললেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, খোঁজাপেশ ও বাস্তব মহিলার জন্য হবে কেবল তখন, যখন তার স্বামীর জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকে।”
এতে সপ্ত হয়ে গেল যে, নবী করিম (সা) তিন তালাকের অবস্থায় স্বামীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার দেননি।

দলীল (৩): তাবরানী হযরত ইবন ওমর (রা) কর্তৃক হায়েখ অবস্থায় তালাকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার শেষাংশটিকে হল-

... ফেলে থা রসূল লা লো তেফে না লা ছাতা লা লো এ লা বান লা মুল

কোনো মুল্লা (مجمع الزواج ج ৩২৬ পাব তালা তালা কীফ তালা)

অর্থাৎ, ... অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি যদি তাকে তিন তালাক

দিতাম, তবে কি আমি তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখতাম? তিনি বললেন, তখন সে তোমার থেকে বিচিত্র হয়ে যেত এবং এটা তোমার জন্য হত ওনার কাজ।

দলীল (৪): আল্লাহ তাআলার বাগী-

فِن طلَّقَهَا فَلَأ يَنْحَلْ لَهُ مِنْ بَعْدِ احْتَيْنَى تَنْكَحْ زُوجًا غَيْرَهُ

অর্থাৎ, তারপর যদি সে ক্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে ক্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়।

(বাকরাং ২৩০)
তাফসীরে ইবন কাসিরসহ অন্যান্য তাফসীরে এই আয়াতের তাফসীরে এভাবে করা হয়েছে যে, দুই তালাকের পর ক্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর রয়েছে। এই দুই তালাক একসাথে প্রদান করাকে অথবা সূর্য পৃথক পৃথক ভাবে। পক্ষান্তরে তিন তালাকের পর (এই তিন তালাক একসাথে দিক অথবা সূর্য পৃথক পৃথক ভাবে) ক্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর নেই। ইসলামের উয়লগে মানুষের এ অবস্থা ছিল যে, ক্রীকে অসংখ্য তালাক প্রদান করত, এমনকি শত শত হাজার হাজার তালাক দিত এবং ইসং অতিবাহিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে তাকে ফিরিয়ে আনত।
এমতাবস্থায় উল্লিখিত আয়াতটি নোবিল হয় যে, তিন তালাকের পর ফিরিয়ে আনার আর অধিকার নেই।

(ইবন কন্দর ১/২৭১)
উল্লেখ যে, উক্ত আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, তিন তালাকের পর আরেকটি বিবাহ বাতিত্ত স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম। একসাথে তিন তালাক দেয়া হোক অথবা পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়া হোক এমন কোন শর্ত বা বিশেষণ করা হয়নি।

যেমন, যায়েদ ইবন হোসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) এর খেদমতে এরূপ এক ব্যক্তিকে পেশ করা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করলে লোকটি ওয়ার পেশ করে বলল, 

"ইলে কেলে, আমি কেবল ক্রীড়া-কৌতুক করেছিলাম। এরপর হযরত উমর (রা) তাকে বেঁধাগাছ করেছিলেন এবং বলেছিলেন-

"ইলে কেলে, তোমার জন্য তো তিন তালাকই যথেষ্ট ছিল।

সুতরাং, একসাথে তিন তালাক দিলে তা অবশেষই পালিত হবে। যদিও এমনটি করা তীব্রতা ও মানের কাজ।"

(منصف عبد الرزاق ج ۶ ص۶۳۲)

দলিল (۵) সাহবাজে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তিন তালাক প্রদানের দ্বারা তিন তালাকই পালিত হবে। (এ ব্যাপারে বিস্মৃত জানার জন্য দেখুন: شرح معيمنة الآثار ۲ ص۲۳۰، فتح الباري ج ۶ ص۲۳۰)

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব হযরত রকানা (রা) এর তালাকের ঘটনার ব্যাপারে বিপরীতমূখী (مختلف) রেওয়ায়েত রয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে তিন তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন -

"قال إني طلعتها ثلاثاً يا رسول الله..."

(انواعهمিররادু পূর্ব হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে.)

আবার, অনুপ্রেরণের গুরুত্বে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশ সহ কতক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে-

"أن ركبتا إنما طلقت اسماء الحائدة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحيدةي".

সুতরাং রেওয়ায়েত জিন্দ হওয়ার কারণে হাদীসটি দলিলযোগ্য নয়।

এতোতো হাদীসে উল্লেখ আছে যে-

"عنしてきた ابن جبير بن عبد عبد بن ركبتا أن ركبتا بن عبد عبد بن طلقت اسماء السهيمة البنت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما أردت إلا واحدة فقال ركبتا والله ما أردت إلا واحدة فردت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم"
পৃথিবীর আগেই রোমান উমরের লাতিন ভাষায় যুদ্ধের প্রথম সূত্র নিয়ে আলাদাভাবে আলবার্তাতা শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করে। তখন এড়ামন্থর রাসোলাল্লাহ (সা‌)কে অবহিত করা হয়।

তখন তিনি বলেন, আলালাহর শপথ। আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। তখন রাসোলাল্লাহ (সা‌) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আলালাহর শপথ, তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? তখন জবাবে রুকানা (রা‌) বলেন, আলালাহর শপথ। আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করি। এতদৃশ বিষয়ে রাসোলাল্লাহ (সা‌) তাকে বীর দীঘি পুনরায় প্রশ্নের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উমর (রা‌)-এর খিলাফতকালে তাকে দ্বিতীয় তালাক দেন এবং তৃতীয় তালাক প্রদান করেন উসমান (রা‌)-এর খিলাফতকালে।

আবু দাউদ (রহ‌.) উক্ত হাদিসটিকে দুটি কারণে অগ্রাধিকার (নজির) দিয়েছেন—

(১) এই রেওয়ায়েতটি রুকানা (রা‌)-এর বংশের লোক থেকে বর্ণিত। যাঁরা এ ব্যাপারে অনেকের তুলনায় অধিক জান।

(২) তিন তালাক বিশিষ্ট হাদিসের রেওয়ায়েতটি (বিচিত্র অসংগতি)। কেননা কতক রেওয়ায়েতে তালাক প্রদানকারীর নাম রুকানা উল্লেখ করা হয়েছে। (মসনদ হামদ জ ১ স৫৫) কতক রেওয়ায়েতে আবু রুকানা উল্লেখ করা হয়েছে। (আবু দাউদ জ ১ স৫৮)

অথচ উক্ত (বিশিষ্ট) হাদিসটি এমন অসংগতি হতে মুক্ত। বরং এখানে ঘটনার নাত্য সুনির্দিষ্ট। আর তিনি হলেন হযরত রুকানা (রা‌)।

মূল কথা হল, রুকানা বীর দীঘি কে তিন তালাক দেননি, বরং বলেছিলেন—

অন্দর তালাক (রাজা) তালাক।

কিন্তু কতক বর্ণনাকারী এর শাস্কিক অর্থ করতে গিয়ে আলবার্তা তালাককে তিন তালাক দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তারা এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেননি যে, আলবার্তা শব্দ দ্বারা রুকানা (রা‌) এক তালাকের নিয়ত করেছেন। কেননা, এর দ্বারা যদি তিনি তিন তালাকের উদ্দেশ্য নিতেন, তাহলে নবী করিম (সা‌)-এর বারবার এক তালাকের উপর কসম নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। (দারুল কামান ৩ স৯৬)

দ্বিতীয় দীঘির জবাবঃ (১) ইবন আব্বাস (রা‌)-এর হাদিসটি মানসূখ হয়ে গেছে। আর এর বহিতকারী হল সাহাবাদের ইজমা। হযরত উমর (রা‌)-এর যুগে তিনি যখন দেখলেন যে, নবী করিম (সা‌) ও আবু বকর (রা‌)-এর সময়ে মানুষের মাঝে
আহকামুল হাদিস

স্বীয় স্বর্ধের চেয়ে ধারিকতা ছিল অধিক প্রাধান্য বিদ্রোহকারী এবং সাধারণভাবে তখন এক তালাকেরই রেওয়াজ ছিল। তাই কোন লোক যদি তিন তালাকের শর্দ ব্যবস্থার করত, তাহলে তা মূলতঃ এক তালাকের তাকে রুখানোর জন্য বলত এবং পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্য সত্য বলে দিত যে, সে মূলত এক তালাকেরই নিয়ত করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত উমর (রা) দক্ষ করলেন যে, মানুষ মিথ্যা বলে হারামের লিপ্ত হচ্ছে এবং তিন তালাক দিয়ে বলত যে, সে এক তালাক দিয়েছে। তাই উমর (রা) মানুষকে হারাম থেকে বাঁচানোর জন্য যোগ্য করলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার তালাকের শর্দ ব্যবস্থা করে, তাহলে তাকের ওয়ায় প্রথম যোগ্য হবে না এবং যাত্রিক শর্দসমূহের উপরই ফায়সালা হবে এবং তা তিন তালাকে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে সাহাবাদের থেকে প্রথম দিয়েছেন এবং কেউ এতে কোন প্রক্রিয়া ইতিহাস করেননি। সুতরাং এতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাইহো ইবন আব্বাস (রা) বলেন—

বলি কান তাজ জিহল ঈমরান নাশা আন যদি খাল ొ জেলে একটি পাি আইন উপেক্ষ করে তাহলে তিন তালাক দান করত, তাহলে এক কর্মকার সাহাবাদের পূর্বে তাকে তিন তালাক দান করত, তাই একে রাসূল সা (سي) আবুবকর (রা ও উমর (রা) এর বিখ্যাত প্রথম দিকে এক তালাক গণ্য করত। অতঃপর তিনি (উমর) যখন দেখেন যে, মানুষ অধিক হারে তিন তালাক দিলে তখন তিনি বললেন, এতে তাদের উপর তিন তালাক বর্তমান হবে।

ইবন আব্বাস (রা) এর হাদিস সরাসরি জমদুরদের অনুরূপ। সুতরাং বার্ণনাকারীর মূল্য রেওয়ায়তের বিপরীত হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, এই হাদিসটি রহিত হয়ে গেছে।

(২) অথবা, তারা দলীল হিসেবে ইবন আব্বাস (রা)-এর যে রেওয়ায়তটি উপস্থাপন করেছেন তা বিরল (شافع) যা কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদিসসমূহ এবং সাহাবাদের ইজমার বিপরীত। সুতরাং ইহা দলীলযোগ্য নয়।

(৩) অথবা, রেওয়ায়তে উল্লিখিত সকল বিশেষণ অসঞ্চীত তাদের প্রকাশ বলতে (অসঞ্চীত তাদের) এর ব্যাপারে। মূলতঃ নদী করিম (سالم)-এর যুগে লোকেরা অসঞ্চীত তাদের প্রথম তালাকের ক্ষেত্রে বলত- তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক; আর এমতাবস্থায় যেহেতু প্রথম তালাক বলতেই
বিহার

ব্যাপ্তি উদীয়মণ্ডিতে প্রথম অল্প মেশালাদিনী কাল হয়ে গেছে, তাই বক্ত তালাকের সুখ্যাতি ছিল না। তাই তা এক তালাকে বায়েন হিসেবে গণ্য হত।

পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা) -এর যুগে লোকেরা অসন্তুষ্ট বীর তালাকের ক্ষেত্রে বলত - (তুমি তিন তালাক)। ফলে হযরত উমর (রা) তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার হুকূম দেন এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(নসাইদ জি: ২০০ পাপ তালাকের তিন তালাকের মতে আল্লাহ)
অনুবাদঃ ... সালামা ইবন সাকার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনুল আলা আল-বায়াদী বলেছেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাসে আমি খুবই সফল ছিলাম। আর আমার মত সহবাসে সামর্থ্যে ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। এরপর মাত্র রময়ান সমাগত হওয়াতে আমার আংশিকা হয় যে, হয়ত আমি সকাল বেলাতেও আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিগু হতে পারি। তখন আমি তার সাথে বিহার করি এবং এমতাবস্থায় মাত্র রময়ান প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু একদা রাতে সে আমার যিদমতের সময়, তার সৌন্দর্য আমার সময়ের উম্মোচিত হওয়ায়, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হই এবং তার সাথে সহবাস করি। এরপর সকাল বেলা আমি আমার গোত্রের লোকদের নিকট গমন করি এবং তাদের নিকট এ ঘটনা ব্যক্তি করি এবং তাদেরকে বলি, তোমরা আমার সাথে রাসুললালা (সাই)-এর নিকট চল। তারা বলে, আল্লাহর শপথ। আমরা তোমার সাথে গমন করব না। তখন আমি একই নবী করীম (সাই)-এর নিকট গমন করি এবং তাকে সব খুলে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে সালামা! তুমি কি এরূপ কাটে কেন? আমি বলি, ইয়া রাসুললালা! আমি এরপাই করেছি এবং তা দুবার বলি। আর এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশের প্রতি দৈর্ঘ্যাধরণকারী। এখন আল্লাহ যা বলেছেন, সে হিসেবে আমার উপর হুকুম জারি করেন। তিনি বলেন, তুমি একজন দাসী মুক্ত কর। আমি বলি, ঐ আল্লাহর শপথ। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এ ব্যতীত আমার আর কোন দাসী নেই এবং এই বলে আমি তার শরীর স্পর্শ করি। তিনি বলেন, তবে তুমি দুমাস রোয়ার রাখ। তিনি (সালামা) বলেন, রোয়ার মধ্যে আমি যে মুসীবতে পড়েছি, হয়ত সেমুত মুসীবতে আমার পড়তে পারি। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় তুমি সাতজন মিসরিনাকে বৃত্তি সহকারে এক ওয়াসাক খুরমা খাওয়া। তিনি বলেন, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমরা (স্ত্রী, পরিবার) তো রাতে অনাহারে থাকি, আর আমাদের কোন খাবারই নেই। তিনি বলেন, তুমি বিদী যোগী গোত্রের সদকা আদায়কারী ব্যক্তির নিকট গমন কর, সে তোমাকে খুরমা প্রদান করবে। আর তদদিন তুমি সাতজন মিসরিনাকে বৃত্তি সহকারে এক ওয়াসাক খুরমা খাওয়াবে এবং তুমি ও তোমার পরিজনবর্গও বাকী অংশ খাবে। তখন আমি আমার কোমরের নিকট ফিরে এসে বলি, আমি তোমাদের নিকট সংক্রিয় ও দূর্বলভাবে পেয়েছি এবং আমি নবী করীম (সাই)-এর নিকট উদারতা ও উদ্দেশ্য পরামর্শ পেয়েছি। তিনি আমাকে তোমাদের সদকার মাল গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

(বিহার)-এর আধিকারিক অর্থ:

শূন্য-এর ওয়েব ব্যবহারকারীর মুক্তিতে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

(বিহার)-এর আধিকারিক অর্থ হল:-
(১) পিছের সাথে তুলনা দেয়া, (২) প্রকাশ করা, (৩) পৃষ্ঠ, (৪) পিছনের দিক, পশ্চাদগাম, (৫) এক কাপড়ের উপর অন্য কাপড় পরা ইত্যাদি।

বিহারের পরিভাষিক সংজ্ঞা:
(১) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, বিহার হল মায়ের সাথে অামার উপরাংশ।

(২) ড. আ.ফ.ম. আবুবকর সিদ্দীক বলেন, বিহার হল, যদি কোন ব্যক্তি তার অামার বলে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের (পিছের) মত অামারের সাথে তুলনা করকে বিহার বল।

(৩) হোতোতোতো রোধিতে আমার বিদ্যমান পৃষ্ঠায়।

(৪) মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, অামারের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে বিহার বলা হয়। পদ্ধতিটি এইঃ সামাজিক অামারের বলে- আত্তে উল্লিখিত কোন অর্থে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিছের নয়।

(মূলবিষয় লিখন) বলেছেন যে, বিহার ইসলামের লই অর্থে বিহার একটি পদ্ধতির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেনম-

(৫) উল্লেখযোগ্য হোতোতোতো মন্ত্রে বিদ্যুতিতে স্বাভাবিক অর্থে, তোমাদের মধ্যে যারা তাদের কৃপণকে মায়া বলে ফেলে, ... (মুজাদরাং ২)

উল্লেখ যে, যে সকল শব্দ দ্বারা বিহার হয়, তা দু’ প্রকার। যথা-

(১) তথা স্পষ্ট শব্দে বিহার। যেমন কেউ বলল- আত্তে উল্লিখিত কোন অর্থে, তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিছের মত। এতে বিহার হয় যায়।

(২) তথা ইঙ্গিতসূচক বিহার। যেমন কেউ বলল-
অর্থাৎ, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মত। এমতাবস্থায় নিয়ত ধর্মব্য হবে। যদি মিহারের নিয়ত করে, তাহলে মিহার হবে। আর যদি বলে এর দ্বারা রীতে আমার মায়ের মত সম্মানিত বুঝানো উদ্দেশ্য, তাহলে তার কথাই ধর্মব্য হবে। অর্থাৎ, মিহার হবে না। (২০৫)

মিহারের কাফফারাঁ যদি কোন মূর্ধ অবচৈতন্য ব্যক্তি এর সাথে বসে, তবে সেই ব্যক্তির কারণ ইসলামী ধর্মীয়ত রীতে চিত্তব্য হবে না। কিন্তু এই ব্যক্তি বলার পর রীতে পূর্ববৎ ভোগ করার অবহিঠারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জীবনাবস্থা কাফফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রাপ্ত হবে, তবে কাফফারা আদায় করে পালের প্রাপ্তিতত করবে। কাফফারা আদায় না করে রীতে নিকট গমন করা যাবে না। (المعارف القرآن سورة المجادلة)

মিহারের কাফফারার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন-

... রীতে যোগুন মন নসানী তম যোসূন লমা কালোত ফতুরির রশিয়া মন কবল আন যদ্যমান tasun... যৎমন লম বৃন্দ মৃস্থর মনমান মন কবল আন যদ্যমান- যৎমন লম যস্তুতে।

ফাতেমা সিরিয় মস্কিনা।

অর্থাৎ, যারা তাদের রীতিকে মিহার করে ফেলে, অর্থাৎ রীতি উক্তি প্রাপ্তার করে নেয়, তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরের স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। ... যার এ সামর্থ নেই, সে একে অপরের স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুমাস রোপ রাখবে। যে এতেু (রোপ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতত্তলো রোপ রাখতে) অক্ষর হুলে সে যেতজ মিসকিনকে আহার করবে। (মুজাদ্দালাঁ ৩-৪)

হাদীসে বর্ণিত আছে-

... অন পুরচার আন রজলা আহর মন করার তম নাযের মন বেঁচা কবল আন যদ্যমান ফাতেমা তম সুলে করিয়ে টাকামান মান খন মালাক মন য়াল বাবাত ব্যাপার। ... সাবিয়া হুল কফর কফর ফাতেমা হুল তম নক্ষত্র আন। (আবু দাওদ জোর স ৩২০ বাব নুহার, নসাই জোর ২১৭ বাব নুহার পামা মাহ স১৫০)

অর্থাৎ, ... ইকরামা হতে বর্ণিত। জনেজ ব্যক্তি তার ক্রীতে সাথে মিহার করার পর, কাফফারা দেওয়ার পূর্বে তার ক্রীতে সাথে সহাস করে। সে ব্যক্তি নবী করীম (সাু)-
এর ধীরে হাতির হয়ে তাকে এতদসম্পর্কে অবহিত করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাকে এরূপ করতে কিসে উদ্দেশ্য করে? সে বন্ধি বলে, চন্দ্রলোক তার ক্রীর উজ্জ্বল পায়ের গোছায়। তিনি বলেন, তুমি (মহল্লারের) কাফেরারা না দেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে দূরে অবস্থান কর।

এখন প্রশ্ন হল, কেন যদি আহার করানোর পরিবর্তে যাত্রজ মিসকীনকে সদ্ব্য দিয়ে দেয়, তাহলে জনপ্রিয় কতটুকু পরিমাণ দিয়ে হবে? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* ইমাম শাফেকী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে, জনপ্রিয় এক মুদ* গম দিয়ে হবে।

দলীলঃ

* "কোন স্মৃতি বেঁচে থাকে না নিজের রহস্যে, ইসলামের ছায়া রাখে।... ফাতেহের এছাড়া আর কে কেউ কেউ সমুদ্রের তলায়, কোন মাছ আর কে কেউ কেউ হাঁটু করলে আর কেউ কেউ ফিরলে এই চর্চা সমুদ্রের তলায়।... তোমাদের দিকে আর কে কেউ তার নিজের সমুদ্রের তলায়।... অন্য দিকের চর্চা বেতে কে ভ্রমণ করতে পারে।" (মাধ্যম আর আর আর আর)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জনপ্রিয় এক মুদ ঘটে হবে।

রাশুলীন ইবন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাশুলীন ইবন ইয়াসার (রাঃ)-এর ধীরতায় বিছু খেজুর এলে তিনি তা তাকে দান করেন, যার পরিমাণ ছিল পরের সাঁঘাতিক পার্সাগে এর মত। তিনি বলেন, তুমি এটা দিয়ে দেও। ... [তিরিমিলের রেওয়ায়েতে... ঐ খোলাটি তাকে দিয়ে দাও। আরাক (عرق) হল এমন যে তাতে পনের অর্থবা থাকে সা’ জিনিস হরে।]

উক্ত সন্দেশে ১৫ সা’-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এক সা’= ৪ মুদ। সুতরাং ১৫ সা’= ১৫ x ৪ = ৬০ মুদ। অতএব, প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে এক মুদ হয়।

আল-মুগ্নীনি কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাঝারি নিয়মাবলিতিভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

লক্ষ্মীনারায়ণ বা জৈম্বিকানুর ভাগে তাকে দূরে রাখা হবে। খেজুর হোক বা গম হোক।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা’ খেজুর বা যব অথবা অর্থ সা গম দিয়ে হবে, যেমনটি সদ্ব্য ফিটের দেয়া হয়।

* মুদ- এটি ইমাম শাফেকী ও হিজায়াবাদীর মতে, ইরাকী এক রতল ও এক তৃতীয়াঞ্চ। আর ইমাম আবু হানিফা ও ইরাকীর মতে, দুই রতল। (লেখা হয়েছে ৫৭৬)
দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস—

... কালে লক্ষ্মী সলম ছাতির তানো তো তীন সুইনি মৃকিতাঃ ...
আর এক ওয়াসাক হয় ৬০ সা’তে। এ হিসেবে প্রত্যেক মিসনকে ভাগে আসে এক সা’।
(দৃষ্টিপটের ১৮৫ সংখ্যাও (১৮৫ সংখ্যাও)

জন্যঃ (১) হামাকিরো বলেন যে, আবু দাউলের হাদিসের বিবরণ অন্যায়ী আসল হকুম তো এক ওয়াসাকই ছিল। অতঃপর লোকটি যখন ইহা প্রদানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন প্রিয় নবী (সাহ) যা কিছু মওজুদ ছিল তাকে তা দিয়ে দেন। এতে বুঝা যায় যে, পানের সা যথেষ্ট হয়ে যায়া, ইহা ছিল তার জন্য খাস।

(২) এটাও সত্য যে, নবী করীম (সাহ) তাকে একের পর এক চারবার থেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। আর এভাবে ১৫ X ৪ = ৬০ সা’ পূর্ণ হয়ে যায়। আর বর্ণাকারীর তা না জানার কারণে ইহা উল্লেখ করেননি।

(৩) ইমাম শাফেখিও ও হামলিও (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলে উর্চ্চ শত্রু ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটি থেকে অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কি পরিমাণ ধরে সে সম্পর্কে রাবিদের মতবিবর্ধ রয়েছে। যদিও রাবী এখানে উর্চ্চ উর্চ্চ-এর বিশেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—

"ইহো মাত্র যাকে হাঙ্গুস হাঙ্গুস সাহ এ সাহ সাহ সাহ"

কিন্তু আবু দাউলের এক বিশেষণে বলা হয়েছে—

... উর্চ্চ ব্যবহৃত হয়... উর্চ্চ মাত্র হাঙ্গুস সাহ—(আবু দাউল জরাইন দাউল জরাইন দাউল জরাইন)

(প্রাক্তন ১২ সূত্রের ১২ সূত্রের ১২ সূত্রের ১২)

অর্থত্ব, ... ইবন ইসহাক (রহ.), হতে বর্ণিত। ... আরাক হল ত্রিশ সা’—এর সমান।

... আর ত্রিশ মাত্র লিচকে লিচ সাহ ... কালে আর সা’ উর্চ্চ মাত্র হাঙ্গুস সাহ—(আবু দাউল জরাইন দাউল জরাইন দাউল জরাইন)

(প্রাক্তন ১২ সূত্রের ১২ সূত্রের ১২ সূত্রের ১২)

অর্থত্ব, ... খুওলাইলা বিন সাহ মালিক ইবন সালাবা (রহঃ) হতে বর্ণিত। .. রাবী বলেন, এক আরাক হল ছাত্রের সা’—এর সমান।
পক্ষান্তরে, এ ব্যাপারে হানাফীগণ যে দলীল পেশ করেছেন, তাতে ওয়াসাক (যেমন) শাস্ত ব্যবহৃত হয়েছে। আর ওয়াসাকের পরিমাণ হল ৬০ সা’। সুতরাং এতে কোন এক্তেলাফ না থাকার কারণে উক্ত রেওয়ায়েত দলীল হিসেবে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) আল্লামা খাজাবী (রহ.) বলেন, শস্যের যে পরিমাণ তখন প্রস্তুত ছিল, সেটা সামরিকভাবে সদা করার জন্য দিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট পরিমাণ খাওয়া হিসেবে দায়িত্ব ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে। পরে অবকাশ হলে তা দিয়ে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় স্পষ্ট বিষয় হল যে, পনের সা-এর উপর সীমাবদ্ধ করা হয়নি।

(দ্রষ্টি-রূপে পালন করা হয়নি)

খুলাসা তালাক

প্রথম পরিবর্তনের পর বিধানে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনুমান অফিসের কারণে বিচার নির্দেশিত হয়েছে। তিনি বলেন, হাজিবি বিনত সাহল (রাঘ) সাবিত ইবন কায়েস ইবন শামাসের স্ত্রী ছিল। সে তাকে মারধর করলে, তার শরীরের কোন একটা অঙ্গ ভেঙে যায়, সে (হাজিবি) ফজরের নামায়ের পর নবী করিম (সাভ) এর নিকট আসে এবং সাবিতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করে। নবী করিম (সাভ) সাবিতকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি তোমার প্রদত্ত মহরের মাল গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলদাতাও! তা কি উত্তম হবে? তিনি বলেন, হা। তখন সে বলে, আমি তাকে তার মহর স্বরূপ দুটি বাগান প্রদান করেছিলাম এবং সে এখন এগুলোর মালিক। অতঃপর নবী করিম (সাভ) বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর এবং তাকে ত্যাগ কর। সে (সাবিত) এরপরই করে।

খুলাসা - এর আত্মদানক অর্থ হল- খুলে ফেলা, বিচ্ছিন্ন করা, বিচ্ছিন্ন করা, তুলে ফেলা ইত্যাদি।
সুনাম-এর সাথে এ সকল আর্থগুলোর সঙ্গে খুঁজে নেল দেখা যায়- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্বামী-শ্রীকে একজন অপর জনের পোশাক (লেসস) বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- "হেন লেসস কর ও, এনে লেসস লেহন।"

অর্থাৎ, তারা (মহিলা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষ) তাদের পরিচ্ছদ। (বাকারা। ১৮৭)

সুনাম ‘খুলা’-এর দ্বারা একজন অপরজন থেকে যেন তাদের পরিচ্ছদ খুলে ফেলার অনুরূপ।

ফ্রাঙ্ক নোর্জের ইরিওথে, প্রায় বিপদবহুল উপর নির্ভরশীল। যেমন, মুহাম্মদ (পারস্পরিক সম্পর্কে তালাক) শহদ।

节水 (পু.২৮২)

অর্থাৎ, খুলা অথবা এর সমার্থক কোন শহদ দ্বারা বিয়ের মালিকানা দূরীভূত করা, যা মহিলা কর্তৃক প্রহরণের উপর নির্ভরশীল। যেমন, মুহাম্মদ (পারস্পরিক সম্পর্কে তালাক) শহদ।

(২) ন অ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্ধাক বলেন, স্বামী বীর শ্রী থেকে নিদিষ্ট মালের বিনিময়ে বি঵াহ বিচ্ছিন্ন করাকে খুলা বলে।

(৩) ন মুহাম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, শ্রীর আগ্রহে ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রদত্ত তালাকই হল খুলা তালাক।

(৪) আবু দাউদ-এর পাষ্টিকায় খুলার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

(৫) আবু দাউদ-এর পাষ্টিকায় খুলার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

ফ্রাঙ্ক নোর্জের ইরিওথে, প্রায় বিপদবহুল উপর নির্ভরশীল।

* খুলা শরীয়তের ফ্রাঙ্ক নোর্জের বিবাহ (বিবাহ বিচ্ছেদ), নাকি তালাক বলে।

* আবু দাউদ-এর পাষ্টিকায় খুলার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ফ্রাঙ্ক নোর্জের বিবাহ (বিবাহ বিচ্ছেদ)।

(২৩১ পৃষ্ঠার প্রদত্ত সূত্র করে)
দলীল (১)। আল্লাহ তাআলার বাণী—

লোকেরা মরতেন... ক্রমে অন্তর্নিহিতের সৃষ্টি হয়। সুতরাং তারা বিভ্রম হতে পারে কারণ তারা এই বিশ্বাস না করে। তারা তাদের ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থাৎ, তালাক হল দু’বার... অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নিদর্শন পাওয়া না পাবে, তাহলে সেখানে তোমরা লোক নিয়ে দিয়ে অব্যাহতি দেবে। তবে উভয়ের মধ্যে কারও কোন পাপ নেই।... তাঁরের যদি দেখে তোমার কে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে দেখুন যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীকে ভিজে না করবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঞ্জি ২২৯-২৩০)

উক্ত আয়াতের লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা খুলনা ব্যাপারটির আলোচনা দু’তালাকের পরে বর্ণিত করেছেন। অতঃপর তিন তালাক দিলে এর বিধান কিছু হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং খুলনা যদি তালাকই হয়, তাহলে তালাকের সংখ্যা হয়ে যায় চারটি, যার প্রত্যক্ষ কোন নয়। কেননা, তালাকের সীমা হচ্ছে তিনটি। অতএব খুলনা তালাক নয়, বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

দলীল (২)। আপনি আল্লাহ তাআলা হামিদের বাণী হয়—

তুমি স্মরণ করে যে, তুমি আমাকে স্মরণ কর যে, আমি তোমাকে আমার দেহ দিয়ে তোমাকে প্রোত্সাহিত করেছিলাম। (হোমোদ ২: ২৫)

অর্থাৎ,... ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবন কায়েদের ক্ষীর তার নিকট হতে খুলনা তালাক গ্রহণ করে। নবী কর্মী (সঁা) তার ইসলামের সময় একটি হায়রে নির্ধারণ করেন।

একথা সীক্ষণ যে, তালাকের ইস্তে হচ্ছে তিন হায়েয়। অথচ উক্ত হামিদে নবী কর্মী (সঁা) খুলনার ইস্তে এক হায়েয় সাব্যস্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, খুলনা আসলে তালাক নয়; বরং বিবাহ বিচ্ছেদ।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) সহ জমহুরের অভিভাষিত হল, খুলনা ও তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ নয়। হযরত উসমান, আলী এবং ইবন মাসুদ (রহ.-এর অভিভাষিত হল, তাই। (المختصر ১০: ৭৬, তন্মুখি ইরান, ২: ২৩)

দলীল (১)। হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হামিদ—

কিন্তু আমার তোমাকে এর ছাড়া উপস্থাপন করেছিলাম যে, তুমি নিজের ক্ষীর দিয়ে স্মরণ কর। (খুলে ২: ৭৪)

বিবাহ হক এবং মাত্র যে খুলনা তালাকের পর আল্লাহ তাআলা প্রার্থনা করেছেন। (খাদিয়া ২: ১০০, অল্প মাজাহ ১৪৬)

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.) সহ জমহুরের অভিভাষিত হল, খুলনা ও তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ নয়। হযরত উসমান, আলী এবং ইবন মাসুদ (রহ.)-এর অভিভাষিত হল, তাই। (المختصر ১০: ৭৬, তন্মুখি ইরান, ২: ২৩)
অর্থাৎ, সাবিত ইবন কায়েস (রাহ)-এর তার স্বামীর নিকট কুলাহা দায়ি কর্মন এবং স্বামীকে একটি বাগান প্রদান করলেন। নবী করিম (সং) সাবিত ইবন কায়েস (রাহ)-কে বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ কর, আর তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

দলীল (২): সাইদ ইবনুল মুসায়িব (রাহ)-এর মুরসাল হাদিস-

إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي بِهِ وَلَمْ يَجْعَلَ الدَّخَلَ تَطْهِيرٌ بَائِئَةً

�র্থাৎ, নবী করিম (সং) খুলাহকে বায়েন তালাক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) কুরআনের আযাত দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, খুলাহা প্রথম দু'তালাকের একটি অন্তর্ভুক্ত এবং উদ্দেশ্য হল, দু' তালাক পর্যন্ত প্রতারণার সূচাগৃহীত বিষয়ে সুরাগু শেষ হয়ে যায়, যখন তালাক মুগালায়া বা তিন তালাক দেয়া হয়। আর প্রথম দু' তালাক দু'ভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যথা-

(১) সম্পদের বিনিময়ে তালাক, (২) সম্পদ ছাড়া তালাক। তুর্তারা অল্প মর্যাদাময় তালাক (তালাক দু'প্রকার)-এর ক্ষেত্রে সম্পদ ছাড়া তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর খুলাহা ক্ষেত্রে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব খুলাহা তালাক বা দু'প্রকারের তালাকের বহিবৃত্ত নয়। আর ফাইনের আযাত দ্বারা তৃতীয় তালাকের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং তালাকের সংখ্যা চারটি হয়ে যায়, এমনটি বলা ঠিক নয়। (নৌর ইলানব চ১২-২২, মুতাফ আলফারান জ ১৬৬১ চ১ ৫২৬১)

হাদিস দ্বারা যে তারা দলীল পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন- (ক) হাদিসে যে হীরষ্টা (হায়েষ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা মূলতঃ উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে ইদট হিসেবে তাকে হায়েষ জাতীয় হীরষ্টা (ংল হীরষ্টা) সময় অতিবাহিত করতে হবে। এতে এক হায়েষ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা হীরষ্টা শব্দটি কম অথবা বেশি উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। তাহাড়া এর দ্বারা তিন হায়েয়েকে নিষেধ (নগী) (করা হয়নি)

তবে কেউ বলতে পারেন যে, নাসায়ি শরীফের ২২ খন্দ ১১২ পৃষ্ঠায় হীরষ্টা একটি হায়েয়েকে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে। এর জবাব হল- এখানে মূলতঃ বর্ণনাকারীর হীরক্ষেপ হয়েছে। কেননা বর্ণনাকারী-হীরষ্টা-এর মধ্যে যে “৫” রয়েছে,
তিনি উক্ত “ছত” কে এককের (وحدة) জন্য মনে করেছেন। তাই তিনি বীর্য ধারণা অনুযায়ী “হায়া”-এর মধ্যে যে “ছত” রয়েছে তা এককের নয়, বরং (শ্রেণী বা প্রকারের বর্ণনা)-
এর জন্য নেওয়া হয়েছে। (বল্ল মহোদ ১০১ স, ৩৫ স, কবুল্লে জ ২) (খ) তাছাড়া আরো বলা যায় যে, রেওয়ায়েটটি খবরে ওয়াহেদ, যা কুরআনের মোকাবিলায় দলীল হিসেবে প্রহরণযোগ্য নয়। কুরআনে বর্ধিত আয়াতটি হল
“মূল্যত্তে বিরোধিতা নিপ্পিংস নিলাশ কীর্তি” অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্ত নারী নিজেকে
অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়ের পর্যন্ত। (বাকারাঁ ২২৮)

খুলআর সক্ষম সম্পদের পরিমাণে কতক্ষণ পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে খুলআ করা জায়ের, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতান্তর আছে।
* ইমাম মালিক, শাফেকি, লাইফ, নাখিল, মুজাহিদ, ইকরামা (রহ.), ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমথকর মত, মহর পরিমাণ অথবা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ সম্পদ নিয়েও খুলআ করা জায়ের।

দলীলঃ আলাহ তাআলার বাণী-

“ফান হিজম না বৈমান হাজুড আল্লাহ ফলা জানাহ আনুইহুমা ফিনিা হাত্তত পী”

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়ই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না তাহলে সেক্ষেত্রে মীর যদি বিনিময় দিয়ে অবয়বী নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারা কোন পাপ হবে না। (বাকারাঁ ২২৯)

� হরফটি ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; মহর পরিমাণ হোক অথবা
এর থেকে বেশি হোক সবই এতে অন্তঃপুক্ত।
এতে বুঝা যায় যে, মহরের অতিরিক্ত পরিমাণ নেয়া জায়ের আছে।

* ইমাম আহমদ, ইসহাক, সাইদ ইবনুল মুসাইবির ও আতা (রহ.)-এর মত, মহর
পরিমাণ সম্পদ নেয়া জায়ের, কিন্তু এর চেয়ে বেশি নেয়া জায়ের নয়।

দলীলঃ হোরত ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস-

“আন জিহিলা ত্ত নুহি সি ল্লাই প্লু ওরুল ফেকাল ফলু অগ্নিব ফুলি নায়িক ফি হিজক
ও লী নুক্কি আকেক ফির ইসলাম ফাল নুম সি ল্লাই ফেল ও লী হন হিজিক লী নায়িক
নুম ও কী ফাল নুম সি ল্লাই ওরু অরু নুম ও কী জায়ের” (দারুফিনি)
অর্থাৎ, জামিলা (রাঃ) নবী করিম (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (আমার স্নায়) সাবিত্রের ধারিকতা ও চারিটকি দিক থেকে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি ইসলামে কুফরীকে অপছন্দ করি। নবী করিম (সাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তাকে বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে চাও? আমি বললাম, হা, এবং আরো অতিরিক্ত। নবী করিম (সাঃ) বললেন, অতিরিক্ত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বাগানটি যা মহর ছিল, এর থেকে বেশি প্রদানকে নবী করিম (সাঃ) নিষেধ করেছেন। সুতরাং খুলমার ক্ষেত্রে মহরের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া জায়েহ নয়।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, অপরাধ এবং দোষ যদি পুরুষের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে খুলমার জন্য মহিলার নিকট হতে কোন কিছু নেয়া জায়েহ হবে না। কিন্তু অপরাধ এবং দোষ যদি মহিলার পক্ষ থেকে হয়, তাহলে মহরের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া জায়েহ নয়।

দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

وَأَرْسَّلْنَاهُ إِلَىٰ نُوحٍ زَوْجَهُ مَكَانَ ۖ زَوْجٍ وَأَثْمِنَّ ۖ إِحْدَهُنَّ قَنْطُرًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِّهِ ۗ شِيْءًا أَنْتُمَا مُتَّيَّذُونَ

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি এক গুরুত্ব হোক অন্য গুরুত্ব করা ছিল কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই কেবল গ্রহণ করা না। তোমরা কি তা অন্যায়টাকে ও প্রকাশ্য পাপাচার করে গ্রহণ করবে?(নিসাঃ ২০)

উক্ত আয়াতে পুরুষের দোষের ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে কোন কিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

দলীলঃ মহরের অতিরিক্ত সম্পদ নেয়া যে নাজায়েহ, এর দলীল জামিলার (ঘটনার) হাদিস, যা ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীসটি পাঠাতে বুঝা যায় যে, অপরাধ মহিলার পক্ষ থেকে হয়েছিল।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম মালিক ও শাফেক (রহ.)-এর দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াতের জবাব হল- উক্ত আয়াতে মহরের পরিমাণই বুধানো উদেশ্য। কেননা আয়াতে ইতিপূর্বে মহরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

* ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর প্রদত্ত দলীলের জবাব হল, উক্ত হাদীসটি বিবেচিত হবে গুরুত্ববহুলের ক্ষেত্রে। যা আমরা (হাদীসিগণ)ও বলে থাকি।

(নীলম আসেন্তাত ২৫ স. ২০০ দরে মস্কো জ. ৩৭ স.)
স্বাগতম হাদিস ৫৪৩

খাত পীরে অস্ল পরাগায় নাসে আরু ও নাসে আরু স০১৪

ইসলাম গ্রহণের পর যদি কারো নিকট চারের অধিক শ্রী থাকে

... উপর কাদর স্বামী দাতাস্নায়ক নিয়ন্ত্রণে নমুনা সামুদ্রিক বান্ধব বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 

(তথ্য দেখুন - ১২৭ শ্রী এ রুমিজ) তত্ত্বপূর্ণ মহিলা বলে বলে তাহলে স্বামী বিষয়ে এরু এরু এরু।

অনুবাদঃ ... হে আল-আসাদী (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম করাল করি, তখন আমার আটজন শ্রী ছিল। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে নবী করিম (সাও)-কে বহিত করলে তিনি বলেন, তুমি এদের মধ্যে চারজনকে রেখে নাও।

বিশ্লেষণঃ শ্রীরামের সাথে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ কায়েম করতে পারলে, এমন শতে 
ইসলাম শ্রীমানের একাধিক বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে। তবে একই সময়ে চারের 
অধিক শ্রী রাখতে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

فانِحْوَانُ ما طُبّبَ لِكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْلَٰٰ ذَلِكَ وَزَوْيَعُ - فَإِنَّ خَيْفَ أَلَّا تَعَذَّلُوا فَوَاحِدَةً

অর্থাং, তবে সেসব (হালাল) মোক্কাদের মধ্য থেকে যাদের ডান লাগে তাদের বিয়ে 
করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরু আশংকা কর যে, তাদের 
মধ্যে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। (নিসাণ ৩)

ধারণ হলো, যে লোকের নিকট কুফীল অবস্থায় চারের অধিক শ্রী ছিল, ঐ লোক 
যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কোন চারজনকে তার শ্রী এখনো গ্রহণ করবে? এ 
নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেইই ও আহমেদ ইবন হামাদ (রহ.)-এর মতে, অনেক শ্রীর 
অধিকারী কাফের যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে স্বামী তাদের মধ্য থেকে 
যে কোন চারজনকে গ্রহণ করে অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দেবে। [এই হুকুমটি তখন 
প্রয়োজন হবে যখন এসব শ্রী শ্রী ইনহত্তকলে ইসলাম গ্রহণ করে। অথবা এসব শ্রী 
আহলে কিতাব হয়, অন্যায়ায় দীন আলাদা হওয়ার কারণে বিয়ে নিজে নিজেই 
বাতিল হয়ে যাবে। (পিসুণ ৬. ১২০)

দলীল (১৪) অনুসরণ শুরুতে বর্ণিত হাদিস। ইমাম হাদিসে মূল্য (নিঃশ্রেফ্যাবে) 
চারজনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং স্বামী যেকোন চারজনকে ইচ্ছা প্রণয় করবে 
এবং অবশিষ্টদেরকে পৃথক করে দিবে।
দলীলের দিনের (২) অন্বেষণ দ্বারা তারা মনে করেন নি, যে তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে তারা তাদের কাজের জন্য অনেক 

বিবাহসমূহের ব্যাপারে, যখন চারজনের অতিরিক্ত এবং আপন দু’বোনকে একের বিবাহ করা জায়ের ছিল। (তখানি ২০ স। ১২১)

আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে বিবাহ শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও অবশিষ্ট থাকবে।

তাই নবী করিম (সা) সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন-

طلَّق آينهمَا يُستَثْنِئ

অর্থ তুলু বোনের মধ্যে যাকে খুশী তুমি তালাক প্রদান কর।

উল্লেখ্য যে, তালাক তো পতিত হয় ঐ বিবাহে, যে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, দু’বোনের একের বিবাহ শরীয়ত অবতীর্ণের পূর্বে সহীহ ছিল এবং পরেও সহীহ রয়েছে, আর তাই নবী করিম (সা) তালাক দিতে বললেন। নতুন বিয়ে যদি সহীহই না হত, তাহলে তালাকের প্রশ্ন ওঠে না।

সুতরাং বুঝায় যে, যেসব বিবাহ নিষেধ আসার পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব বিবাহের ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু যেসব বিবাহ শরীয়ত আসার পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তিন ইমাম যে সকল সাহাবী দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, সে সকল সাহাবী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

লিওন

… عَنْ أَبِي يُحَرْمُ أَنْ رَجَلًا لَا عَنْهُ امْرَاتُهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنتُنَا مِنْ وَلِدَهَا فَقَرَطُ رَسُولِ اللَّهِ بِيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْمَوْرَأَةَ (ابو داود ج 38, বখারি ج 3:131:২০০০ পাব লইল খোলায়তনৈক্য, মসলমান ই 9:৪৯ কন্যাদি খোলায়তনৈক্য, উল্লেখ্য জ 10:২২৯ পাব লইল খোলায়তনৈক্য, কস্মীরী জ ১০৯:২০০০ পাব লইল খোলায়তনৈক্য, কবর্মী খোলায়তনৈক্য ১৫১)।

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) এর মুগে জনকতা ব্যক্তি তার শ্রীর সম্পর্কে লিওন করে এবং শ্রীর গভীরতা সত্যকে তার গোসরজাত নয় বলে, তখন রাসুলুল্লাহ (সা) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সত্যকের সম্পর্ক মায়ের সাথে ঘিরে করেন।

লিওন (লুমান)-এর আল্লামানোক অর্থ:

বা বা শিক্ষা দুটি (বাবো বা জ্ঞান)-এর মাস্তার। এর কিয়াসূল হচ্ছে ল-ন-ল-ন-ন। এই শব্দটি মূলত লানত হতে উত্তোল উদ্ধোলন এর শাব্দিক অর্থ

- ৩৫
হঠচ্ছে- পরস্পর অভিসম্পাদ দেয়া, বদলায়া করা, অসম্ভব প্রকাশ করা, প্রতিশোধ নেয়া, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। (গ্লামসুল কোয়িম উফির চূনকুল ইমাম মা)(২، ৪০)

পরিবর্ত কুরআনে শপথটির ব্যবহার পাওয়া যায়- ওরাহ এবং লেটিন লিখিত শপ্তাহের উপর আরাম অভিসম্পাদ।

লিখিতের পরিভাষিক সংজ্ঞাঃ

১। মুহাম্মদ শাফী (রহ.) বলেন, শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদন্তে করেকটি শপথ দেয়াকে লিখিত বলা হয়। (মারফত তুর্কে সুরা টার নূর)

২। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সীদাকি বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে শিয়ার অভিযোগ আনে এবং এর অনুকূলে কোন সাধ্য-প্রমাণ না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতের সামনে সূরা নূর-এ বর্ণিত বিশেষ পদ্ধতি পাঁচবার হলফ করতে হয়। আইনের পরিভাষায় একে লিখিত বলা।

৩। শরীহ বেকায়রার ভাষার বলেঃ

ছো হো বৈলাকে তা স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনার শাস্তি এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে অপবাদের শাস্তি ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে যদি পাঁচবার হলফ করে তবে এই বাক্যের অর্থ নিজের সত্যি প্রমাণ হবে না।

অর্থাং, লিখিত হচ্ছে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় এমন বিপদ সাধ্য যেখানে অভিসম্পাদ যুক্ত এবং স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের শাস্তি ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে যদি পাঁচবার হলফ করতে হয় তখন স্বামী হতে অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রী হতে যদি পাঁচবার হলফ করে তবে এই বাক্যের অর্থ নিজের সত্যি প্রমাণ হবে না।

৪। কতিপয় আলেম বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যাধিভারীর অপবাদ দেয় অথবা স্ত্রী যদি স্বামীকে ব্যাধিভারীর অপবাদ দেয় অথবা তা প্রমাণ করার জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাহলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী চারজন সাক্ষীর খুলে চারবার আলাহর নামে শপথ করে বলবে যে, নিজে সত্যবাদী এবং প্রমাণবাদী হয়ে প্রথমবার বলবে যে, আমি যদি মিথ্যা বাদী হই, তবে যেন আমার উপর আলাহর লানত (অভিসম্পাদ) নামানুসারে অপরনোবাদে পাঁচবার শপথ করবে। এরপরে কারীর মাধ্যমে উভয়দের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর নামেই হল লিখিত।

৫। ড. মুহাম্মদ ফজলুর তোহমাহ অর্থ সংক্ষেপে এর পরিচয় দানে বলেন, শপথ সহকারে ব্যাধিভারীর অপবাদই হল লিখিত। (গ্লামসুল কোয়িম উফির চূনকুল ইমাম মা) (২৭৯)
বিশ্লেষণঃ লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শামসের আহমদ (র.হ.)-এর মতে, লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা।

বরং লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা অতি শক্তিশালী করা যেতে পারে, যেহেতু তার সাবিক প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা।

কেননা, তাদের নিকট লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা।

বা শপথসমূহের নাম। তাঁরা বলেন, লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা।

এজন্য মুসলিম স্বামী ও তার কাফের স্বর্ণ মধ্যে এবং গোলাম ও তার স্বর্ণ মধ্যে লিখিতে পারে। (হেদায়াত মুহাম্মদ ২:১৫৫-১৫৬, দ্বার মশকত ৩:৪০)

* ইমাম আবু হানিফা (র.হ.)-এর মতে, লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা।

কেননা তাঁর নিকট লিখিতে প্রত্যেক শ্রদ্ধা করা (সাক্ষাৎ দানে যোগ্যতা) ঐক্য কিনা।

তাই স্বামী-স্বর্ণ উভয়ের জন্য ঐক্য কিনা হওয়া জরুরী। সুতরাং মুসলিম স্বামী ও তার কাফের স্বর্ণ মধ্যে এবং গোলামও তার স্বর্ণ মধ্যে লিখিতে পারেন।
কেননা, তিনি বলেন, লিনান হলে তাদের মোকাদ্দমা প্রায় আরো এগুনও কমবলো সাক্ষীর নাম যেমন কথার দ্বারা তাকীদপুর হা কৃতি।

পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট আয়াতটিতে হানাফী মতের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়:-


du'a
du'a

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা লিনানকে সাক্ষা (সাক্ষাত) বলেছেন। সত্তরাং লিনানের জন্য হওয়া শর্ত।

লিনান সম্পর্কে দ্বিতীয় আলোচনার কেবল লিনানের দ্বারা স্বামী-গীত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিচিত্র (তফরিয়ে) হয়ে যাবে, নাকি বিচারকের বিচিত্র করার প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে প্রতীক্ষা রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেকী, আহমদ ইবন হাশর্ন ও যুফার (রহ.)-এর মতে, লিনানের পর স্বামী-গীত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, বিচারকের বিচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নেই।

(দ্রোশ মিকোয়া জো ফোন ৪২৩)

দলীলঃ হয়ত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত হাদিস -

* ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাতরী (রহ.)-এর মতে, স্বামী লিনানকারী যদি মহিলাকে তালাক দেয়, তাহলে এটাই উদ্দেশ্য, আর যদি তালাক না দেয়, তবে স্ত্রী লিনানের দ্বারা উভয়র মাঝে বিচ্ছেদ হবে না; বরং এক্ষেত্রে বিচারকের মধ্যে

বিচ্ছেদ ঘটিতে হবে।

(দ্রোশ মিকোয়া জো ফোন ৪২৩)

دلالش

... عَنْ أَبِيّْ شَهَابَ أَنَّهُ سَمَّيْنَ بِنْ سَعْدِ السَّعْدِيْ أَخْبَرَهُ أَنَّ غُوَيْرَمَ بُنِّ يُوْمِ الدِّيْنِ وَجَدَ مَعَ

َإِشْرَفَ العِجَالَاتِيْ جَعَلَهُ عَامِمِ بِنْ عَبْدِهِ فَقَالَ لَهُ بِنْ عَامِمُ أَرَأَيْتَ رَجَلًا وَجَدَ مَعَ
মানুষ কিছুতে টেনে আছেন এমন কিছু যা গ্রহণ করে নি। সেই কথাটি মনে রাখুন, এই কথাটিই আল্লাহ সেই কথাটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি।

মানবদের বোধ থেকে গান বলা হয় না। আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি। এটি আল্লাহ সেই কথাটি।

আর্থিক ইবনে শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে সাদ আল-সাইদী তাকে বলে দিয়েছেন যে, উওয়াইমের ইবনে আশকার আল আজলানী আসিম ইবনে আদীর নিকটে আগমন করেন এবং বলেন, হে আসিম! আমাকে বলুন, যদি তার স্বীর সাথে কোন অপরিচিত লোককে এক বিছানায় দেখে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর কিসাস (বদলী) হিসাবে কি তোমরা তাকে হত্যা করবে, নাকি করবে না? তুমি এ সম্পর্কে আমার জন্য হে আসিম! রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি জিজ্ঞাসা কর। আসিম এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি জিজ্ঞাসা করলে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তা শুনে অসম্ভব প্রকাশ করলে এবং তাকে দোষারোপ করেন। এরফতার আসিম রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে যা শ্রবণ করেন তা তার জন্য খুবই ভয়াবহ মনে হয়। এরফতার আসিম তার পরবর্তী পরিচয়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে উওয়াইমের তাঁর নিকট গমন করে বলেন, হে আসিম! রাসুলুল্লাহ (সা.) তোমাকে কি বলেছেন? আসিম বলেন, তুমি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়ে আগমন করলি। আমি এটি...
মহিলা সম্পর্কে রাসূলুলাহ (সাৰ্ক)কে যে প্রশ্ন করেছিলাম তাতে তিনি অসম্ভব প্রকাশ করেন। এতদশ্রেণীতে উওয়াইমের বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার (মহিলার) সম্পর্কে এ প্রশ্নটি রাসূলুলাহ (সাৰ্ক)কে নিজে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত কান হব না।

উওয়াইমের এমন সময় রাসূলুলাহ (সাৰ্ক)-এর নিকট গমন করেন, যখন তিনি মানুষের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুলাহ! যদি কেউ তার শ্রীর সাথে অপরিচিত কোন মানুষ পায়, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এজন্য আপনারা কি তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করবেন?

রাসূলুলাহ (সাৰ্ক) বলেন, আল্লাহ তাজালা তোমার ও তোমার শ্রীর ব্যাপারে কুরআন (আয়াত) নামিল করেছেন। তুমি যাও এবং তাকে (শ্রী) নিয়ে এস। রাবী সাহল বলেন, তারা আগে একে অপরের প্রতি শপথ করে ব্যবস্থা বিচারের দোষারোপ করতে থাকে এবং আমিও তখন অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুলাহ (সাৰ্ক)-এর নিকট ছিলাম। তাপনর তারা যখন অভিসম্পাত ও দোষারোপ করা হতে বিশ্বাস করেন, তখন উওয়াইমের বলে, যদি এখন আমি তাকে আমার নিকট রাখি, তবে ইয়া রাসূলুলাহ! তার ব্যাপারে আমি লোকদের নিকট মিথ্য্যক প্রতিপন্ন হব। উওয়াইমের নবী করিম (সাৰ্ক)-এর অনুমতি প্রদানের পূর্বে তাকে (শ্রীকে) তিন তালক প্রদান করেন।

হাদিসটির শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যদি কেবল লিখিতের দ্বারা বিচিত্র হয়ে যেত, তাহলে নবী করিম (সাৰ্ক) তার তালকের উপর অর্তীকৃতি প্রদান করতেন অথচ বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা বাতিষ্ঠায় করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, শুধু লিখিতের দ্বারা বিচিত্র হবে না; বরং কাহী বিচিত্র করবে, নতুনা শাহী তাকে তালক দিয়ে দিবে।

দলিল

২) আঃ রজ্জলা লাগুন আমার আমারে ইলাম বুলুল বুলুল বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল এ বুলুল 

দলিল

৩) উন্ন তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল তুলুল 

আর্থাৎ, নবী করিম (সাৰ্ক)-এর যুগে এক ব্যক্তি শ্রীর সম্পর্কে লিখিতে লিখিত করলে নবী করিম (সাৰ্ক) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।
হিলাম এবং এ সময় আমার বয়স ছিল পনের বছর। এরপর তারা শপথ করে পরস্পর অভিসম্পাত ও মিনার দোষারোপ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

উক্ত হাদীদস্বর্যে প্রতীয়মান হয় যে, লিঙার পরেও নবী করিম (সাঃ) কাশি হিসেবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছেন। পুরু লিঙার ঘাতায় যদি বিচ্ছেদ হয়ে যেত, তাহলে নবী করিম (সাঃ)-এর বিচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

১। উল্লিখিত তিন ইমাম দলীল হিসেবে যে হাদীদস পেশ করেছেন তা মাওকফ হাদীদস। সুতরাং মাওকফ হাদীদস মারফু হাদীদসের মোকাবেলায় দলীলযোগ্য নয়।

২। অথবা, হাদীদসের ঘাতা উদ্দেশ্য হল- তুফীক বা বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর একজিত হতে পারবে না। যাতে মারফু হাদীদসের সাথে অসামঞ্জস্য না হয়।

লিঙাম সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনাঃ

লিঙারের মাধ্যমে হামী-কৃত্ত মধ্যে যে বিচ্ছেদ হয়, তা কি চিকিৎসালের জন্য, নাকি কোন শর্তসাপক্ষে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈকা রয়েছে।

* ইমাম আবু ইউসুফ, যুফার ও হাসান ইবন মিয়াদ (রহ.)-এর মত- লিঙারের ঘাতা যে তুফীক (বিচ্ছেদ) হয়, এতে তালাক হয় না এবং এর ঘাতা [দুর্বন্দ্বেষ্ট্য ও বৈবাহিক সূত্রে আজ্ঞায়ীতা] (হুমায়ত মুসাহফ)-এর হায়ামের ন্যায়। আজ্ঞায়েনের জন্য কৃত্ত হারাম হয়ে যাবে। কখনো তার জন্য বৈধ হবে না।

(টিলিয়ম আল-আশাত জ চ ২০)।

* ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত, লিঙারের ঘাতা যে বিচ্ছেদ হয়, তা তালাকে বায়েন-এর পর্যায়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ই নিজেদের লিঙারের অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিয়ে সহীহ হবে না। কিন্তু হামী যদি কৃত্ত কৃত্ত উপর ব্যাধিকারের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তা কৃত্ত করে নেয় এবং তার উপর মিথ্যা অপবাদের যে শাপ শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে (৮০টি বোঝাত) তা কার্যকর করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে পুনরায় বিবাহ জায়গে হবে।

সুতরাং একথা বলা যাবে না যে, লিঙারের ঘাতা যে বিচ্ছেদ হয়, তা আজ্ঞায়েনের জন্য।

(ফতহ হিরার জ চ ১২)।
দলীলঃ পতিত কুরআনে যে সকল নারীকে বিয়ে করা চিরদিনের জন্য হারাম (মুহাম্মদ)-এর তালিকা রয়েছে, তাতে লিআনকারীদের উল্লেখ নেই। অতএব তা কিভাবে চিরদিনের জন্য হারাম হবে? 
তাছাড়া, বিচারক যখন স্বামীর সম্বন্ধে বিচিত্র হয়ে উঠার মধ্যে বিচিত্র করে দিবে, 
তখন তা তালাকের মূখ্য গণ্য হবে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে যে বিচিত্র হয়, তখন তাতো তালাক হবে। অতএব, তালাকের দ্বারা যে বিচিত্রতা ঘটে, এর দ্বারা চিরদিনের 
জন্য বিয়ে হারাম হতে পারে না।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ
দলীল হিসেবে তাঁদের প্রদত্ত হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত 
উভয়েই লিআন অবশ্যই থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কখনও একত্র হতে পারবে 
না। আর একথা তো সবাই বলে থাকেন। সুতরাং যানাফিরাও উক্ত হাদিসের বিরোধী 
নন। অতএব, যখন মিথ্যা অপবাদের দরুন স্বামীকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন আর 
লিআন থাকবে না। কেননা তখন লিআনের মূল কারণই থাকে না। আর যখন 
লিআনই থাকল না, তখন তো একত্র হওয়ার অবিধাতাও অবশ্য ভাল না। কারণ 
এটা তো দুই লিআনকারীর সাথে সংঘটিত ছিল। (দালানের মন্ত্রণ ৩-৪৪৬-৪৪৬)
কেননা মতামত প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীকে ঐ সময় পর্যন্ত বলা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 
লিআনের কার্যক্রম চলতে থাকে। যখনই উভয়ে লিআন থেকে ফারেগ হবে যাবে, 
প্রকৃত অর্থে তখন আর মতামত থাকে না, বরং তালাক পরিণত হয়ে যায়।

নিম্নে লিআনের কতিপয় বিধি-বিধান বর্ণিত হলঃ (হানাফী মাইহাব অনুসারে)
(১) লিআন গৃহে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং লিআনের জন্য আদালত জরুরী।
(২) লিআনের অধিকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের রয়েছে।
(৩) পূর্ব যোগসূত্র ও সুচু জান-বুদ্ধি সম্প্রতি ব্যক্তিই লিআন করতে পারে, অন্যান্য নয়।
(৪) লিআন খুলোস্ত স্বাধীন মুসলমান স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কাফের, 
গোলাম ও কাফেরের অপরাধে শাস্ত্রগুলোর জন্য কার্যকর হবে না।
(৫) নিষ্কর্ষের প্রক্রিয়া-বিধিনির্দেশ একটি রূপক উপমা বা সংশয়-সন্দেহই লিআন 
কার্যকর হবে না, বরং স্পষ্ট ভাষায় নিদর্শন অপবাদ দিতে হবে।
(৬) লিআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সত্তার জম্মুর করবে সে স্বামীর সাথে 
সম্বন্ধযুক্ত হবে না, বরং তাতো তার মায়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। তবে সত্তানোল 
জারজ বলা যাবে না।
(৭) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর বিদ্রুপে অপবাদ দিলে লিআন কার্যকর হবে না। কেননা 
নারীটি এখন তার স্ত্রী নয়। অবশ্য যদি রাজদ্ধ তালাক হয়, তবে ভিন্ন কথা।
(৮) স্বামী তার মহরের অর্থ স্ত্রীর কাছে ফেরত চাইতে পারবে না।
(৯) স্বামী যদি ফিনার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কাযাফ-এর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।
(১০) স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক আরোপিত অভিযোগ সত্য বলে কীনার করে অর্থাৎ লিখার অপরীণ হতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ প্রতিশোধ হতে হবে করতে হবে।
(১১) স্বামী যদি কসম খেতে ইতস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয়, তবে তাকে বদন করতে হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করতে বা অভিযোগটি যে মিথ্যা একথা বীর করতে এ বিধান স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য হবে।
(১২) ইদ্দাতের সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে খরচ ও বাস্তবান পাবে না। কেননা সে তালাক কিংবা মুঘ্তু ছাড়াই স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
(১৩) লিখার সংঘটিত হওয়ার পর আদালত স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, যাতে কেউ কারো উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা প্রাপ্ত করতে না পারে।

৩১ বাবর ফিরোলায়া মনিদোরক অনুসরণবিদ্যা

... অন্য উপায়া কাল্ত নিষিদ্ধ করা করার জন্য সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর মূল্য টিকাট বেঁধে দিয়ে সুন্দর 

মাজা (১৭১)

অনুবাদঃ ... আয়াশা (রাখ) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) আমার নিকট প্রবেশ করেন, রাবী মুসাদাদ ও ইবন সারাহ বলেন, সম্প্রতিক্রিয়া। রাবী উসমান বলেন, তার চেহারায় সম্প্রতিক্রিয়া আত্মা প্রকাশের পেছন ছিল। এরপর তিনি বলে: হে আয়াশা! তুমি কি দেখি, মুজরায় মুলাজাএ দেখতে পেল যে, যায়িদ ও উসমান (রাখ) তাদের মন্তক চাইতে আবৃত করে রেখেছে; আর তাদের উভয়ের পা ছিল খোলা। তখন সে বলে, নিষিদ্ধ এ পাগলি একে অপরের থেকে। (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।) ইমাম আবু দাউদ (রহ, বলেন, উসমান (রাখ) ছিল কাল আর যায়ীদ (রাখ) ছিলেন ফস্তা।
বিশেষণগুলি শব্দের অভিধানিক অর্থ হল- চিহ্ন ধরে অনুসরণ, হাবভাব, চিহ্ন দেখে মূল বস্তু নির্ধারণ করার জন্য ইত্যাদি। এর মাধ্যম হল অর্থ-عُقْف
আর পরিভাষিক অর্থে- قَفَّ أَكْفَفَ
(الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود- (المجيد الابجدي ص 777
অর্থাৎ, বীর দূরন্তিতার সাহায্যে এবং শিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে যে বংশ চিনতে পারে।
* দরসে মিশকাত গ্রহের প্রণেতা বলেন, عُقْفُ الْقِبَّة
* আর এ দ্বারা প্রশাখা সম্ভব (قَرْعَة) - মূল- (网点)- এর সাথে সম্পূর্ণ করানো হয়।
* অতএব, বংশ প্রতিষ্ঠায় অনুমানকারীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।
(تنظيم الاشتقات ج 2 ص 609، درس مشكاة ج 3 ص 41)
(أبو داود حا شيبة ج 3 ص 309 باب في الفقة)

هرم من الله معرفة بالآثار ومعرفة شبيهة الرجل بالحني باب

* ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবন হামল, আওয়াঈ এবং আতা (রহ.-এর
* মতে শরীয়তে قَبْقَة-এর প্রখ্যাততা রয়েছে। অতএব, বংশ প্রতিষ্ঠায়
অনুমানকারীর উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।
(تنظيم الاشتقات ج 2 ص 609)

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাউরী এবং ইসহাক (রহ.-এর মতে- شرِّيْهُ ثُقَال
* এর কোন মূল্যায়ন বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। অতএব বংশ প্রতিষ্ঠায় অনুমানকারী
* কোন উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
(تنظيم الاشتقات ج 2 ص 609)

* ইলমুল কিয়ারাফাহ” একটি ধারণা ও আন্দাজমূলক বিষয়। এর দ্বারা একীনী
* ইলম ও প্রকৃত বিষয় অর্জন হয় না। আর শরীয়তের কোন হুকুম আদাজের উপর
* প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন-
যাইহে তাঁদের আমারা আত্মা কর্তার মধ্যে আসে আত্মা ইমানের আল্লাহ
অর্থাৎ হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা
গোনাহ। (হুজুরাতঃ ১২)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে দলীল হিসেবে তাঁরা যে হাদিসটি পেশ করেছেন, এর
জবাব হল এই যে, হযরত উসামা (রা)-এর বংশ তো শরীয়তের হুকুম দ্বারা
প্রথমেই প্রমাণিত ছিল। কেবল মুনাফিকরাই সদ্যেহ পোষণ করত। অতঃপর তাদের
নিকট বেহেতু “ইলমুল কিয়াফাত”-এর প্রথায়কৃত ছিল, এবং মুজাহিদ মুলাজারের
উক্তি দ্বারা তাদের মুখ বক্স হয়ে গেল, এতে হযরত উসামা (রা)-এর প্রমাণিত
বংশের আরো বেশি দুর্বল প্রকাশ পেল। আর এর ভিত্তিতেই নবী করিম (সা) খুশি
হয়েছিলেন। নবী করিম (সা) খুশি

কেননা, আন্দাজের দৃষ্টান্ত দলীল প্রমাণিত হতে পারে না; তবে বংশ তো প্রমাণিত হবে
শরীয়তের হুকুম দ্বারা। (আর তাহল-

... অন্ত হৈলে ফেল্তানাৰা প্রতি এই ক্ষেত্রে আল্লাহ উপনীয় ও প্রতি ভূমির নিয়মে

الحجر- (আবু দাবুদ জ-৩০০ পাব ঠিকাদার, মস্লেম জ-১ পাব ঠিকাদার ও তৃতীয় জ-১
চ-১২৯ পাব ঠিকাদার, নসাই জ-২ পাব ঠিকাদার ও ১১১ পাব ঠিকাদার ও নামাজ চ-১৪)
অর্থাৎ, ... আরিশ্ন (রা) হতে বর্ণিত। ... নবী করিম (সা) বলেন, সত্য হল যার
বিচারের জন্য প্রথম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ উক্ত অনুচ্ছেদে একটি হাদিস বর্ণিত হচ্ছে যে-

... অন্তর দিয়ে বলল কাল কেন্দ্র তাঁদের তোমাদের কান্না তোমাদের কান্না
রঞ্জ থাকে, তাঁদের কান্না তোমাদের কান্না তোমাদের কান্না তোমাদের কান্না
ও কদাচিৎ তাঁদের কান্নায় তোমাদের কান্নায় তোমাদের কান্নায় তোমাদের কান্নায়

(আবু দাবুদ জ-১
চ-৩০০ পাব ঠিকাদার ও ১১১ পাব ঠিকাদার ও নামাজ চ-১৪)
অনুবাদঃ ... যাইহে ইবন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি
নবী করিম (সা)-এর বিবরণে উপরিষ্ট ছিলেম। তখন ইয়ামান হতে জনৈক ব্যক্তি
আগমন করে বলেন, ইয়ামনের তিন ব্যক্তি আলি (রাও)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি সম্মানের (মালিকানা) সম্পর্কে ঝগড়ায় লগ্ন হয়, যারা একটি স্ত্রীলোকের সাথে একই তুলনে উপগত হয়। তিনি (আলি রাও) তাদের মধ্যে দুর্জনকে বলেন, এ সম্মানটি এ (ত্রীর্থ) ব্যক্তির। তারা উভয়ে চীৎকার করে উঠে। এরপর তিনি বলেন, বেশ তারা হলে সম্মানটি তোমাদের দুর্জনের। এ সিদ্ধান্ত প্রদেশে তারা অস্বীকৃতি জানায়। আলি (রাও) বলেন, তোমরা পরস্পর ঝগড়াকারী, কাজেই আমি তোমাদের মধ্যে লাটারীর ব্যবস্থা করব। আর লাটারীতে যার নাম উঠেবে, সে সম্মানের পিতা হবে। আর সে ব্যক্তিকে অপর দ্বারকের জন্য দুঃখীয়তার্থ ক্ষতিপূর্ণ হিসাবে প্রদান করতে হবে। এর উপর তিনি তাদের মধ্যে লাটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লাটারীতে যার নাম আসে, তাকে তিনি সম্মান প্রদান করেন। এতদশব্দে রাসুলুল্লাহ (সাহ) এত জোরে হেসে উঠেন যে, তার সম্মানের ও এর পার্শ্ববর্তী দম মারাত্মক প্রকাশিত হয়।

হাদিসটি পাঠাতে কেউ হয়তো একথা মনে করতে পারেন যে, শরীয়তে লাটারী জায়ের। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। এর ব্যাখ্যায় আহিম্মক্রা বলেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে লাটারীর হুকুম জায়ের ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে শরাব পান জায়ের ছিল। তারা আরো বলেন যে, এই লাটারী মিয়া তথা কোন হককে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নয়, বরং হজ সিদ্ধতে যা কোন হককে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নয়, বরং জীবন মরণ বা প্রতিষ্ঠা হককে প্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে। আর এই বৈধতা এখানে জায়ের রয়েছে। যেমন, কোন পিতা যদি দুটি ছেলে রেখে মারা যায় তবে মৃত পিতার জমি উভয়ের প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কে কোন অংশ নেবে, দক্ষিণ অংশ কে নেবে এবং উত্তর অংশ কে নেবে এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠা হককে প্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে লাটারীর মাধ্যমে তা নির্দেশ করা জায়ের আছে। মোটকথা হল- লাটারীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ হক-এ অধিকারক কার্যের করা জায়ের আছে। কিন্তু লাটারীর মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠা করা জায়ের নয়।

জবাবঃ উল্লিখিত হাদিসে দেখা যাচ্ছে যে, লাটারীর মাধ্যমে হককে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল এই, ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাম্মদের ছিল। কিন্তু পরে তা নিম্ন বর্তী হাদিসের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে- পেশায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাম্মদের ছিল।

... বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো 

... পেশায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাম্মদের ছিল। কিন্তু পরে তা নিম্ন বর্তী হাদিসের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে- 

... বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো 

... বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান 

... বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে 

... বনো মাহিরে সুলতান বনো মাহিরে সুলতান বনো 

... বনো মাহিরে সুলতান 

... বনো মাহিরে 

... বনো 

...
باب من أجل ولد

اسلاما ان ابا میں سلیم مولی من اهل المدینة راجل صدق قل بیانہ انہا جمکرم ابی هریگہ جنہا امرہ فارسیہ معہ انہا لئے فدا حصیہ قد طلقها زوجہا فقائلت يا ابا هریگہ رتنہ پالفارسیہ زوجہی یہرہ ان يذهب ابانیی قائل ابوعریہ استھما علیہ ورتن لها یہا اما فذاء زوجہا فقائل من یہااقئی فی ونی قائل ابوعریہ اللہم این لا اقوال هذا انہا این سیمحت امرہ جاءت الى رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم ونا قاعد علمہ فقائلت يا رسول اللہ ان زوجی یہرہ ان يذهب ابانیی وقد سقانی من یہر ابی عقبہ وقذ نفعی قائل رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم استُمہا علیہ فقائل زوجہا من یہااقئی فی ونی قائل اللہمی صلى اللہ علیہ وسلم هذا انہا اگوک وھی امک فخذ بیہ ایہمی شنت فاخذ بید امہ فانفقیہت پہ - (نسائے ج 2 ص 110.)

انوباد... حیل الین عسااما (را) حتی بنریتی۔ ِتینی بنن، اربع میامیوحا سلمانی ِمینی منہی ونین کسک اکہ بانی إکی امرادکر حیلیا ہیلن۔ تینی بنن، اکدنا ِامی ِیکن اربع ہوریّرا (را) ایک ِنیکٹ عشیخی حیلیا، ِتینین سےنیا پرنسی دہیی ِجینک سکلیاکک، کسک اسکی اکہ پیش نی ِیکنیا امریک کر بیک، ِسک بنن ِسکنک (پیش امرینک) سک اکہ بانی، ِسکتاک قدنیی نیسک ِسکن حیلیا ِدابی کر بیک نیکر ِسکتاک بنن، ِتین کی امریک ِسکنک (مکین) فاکیا ٌبریا ِبانا ِحیل، ِسک اربع ہوریّرا! ِامار بانی ِامار پیش کسک نیا یکنیا ِصیاک۔ اربع ہوریّرا (را) بنن، ِسکمکا ِرول (سکنک) ِبیاکر نیتی کر۔ اکر حیلیا (اربع ہوریّرا) یکنیا ِتینک ِزبیک ِبیکار ِکسک، ِسکتاک بانیکسک ِسکنک، ِتینک ِبیکار کسک ِبیکار ِسکنک، ِسکتاک حیلیا ِسکنک ِسکنک ِسکنک ِبیدنیا یکنیا ِنیسک یکنیا ِصیاک۔ ِبیکار ِسکنک ِبیکار ِسکنک، ِشیمک حیلیا ِسکنک، ِسکتاک ویکر ِبیکار نیا ِبیکار ِکسک ِسکنک کر۔ ِسکتاک بانی، ِسکتاک ِسکنک،
আমার থেকে আমার সন্তানকে কে ছিনিয়ে নিতে চায়? নবী করিম (সাঃ) সে সন্তানকে সম্ভব করে বলেন, এ তোমার পিতা এবং এ তোমার মাতা। তুমি এদের মধ্যে যার খুশী হয় ধারণ কর। তখন সে (সন্তান) তার মাতার হয় ধারণ করলে তাকে নিয়ে সে (মাতা) চলে যায়।

বিশেষণঃ স্বামী-শ্রীর মাঝে যদি কোন কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তাহলে সন্তানের হকদার কে হবে- এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানীক্ষণ রয়েছে।

* ইমাম শাফেক (রহ.)-এর মতে, একের মতে সন্তানকে ইচ্ছা বাধিতা দেয়া হবে। ঐ সন্তান যাকে নির্দেশ করলে, সে তার কাছেই থাকবে।

দলীল (১)ঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে-

... ফুজাদ বীতে আন্দুর নিয়ে একাদশ বীতে আন্দুর নিয়ে ফাওলতে বীতে

দলীল (২)ঃ উচ্ছেদের একাজাত লাভে পাওয়া হয়, আন্দুর বীতে আন্দুর নিয়ে ফাওলতে বীতে

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যখন একটি সন্তান সন্তান কে উপলব্ধির বয়স পর্যন্ত ছুটে, যেমন নিজে নিজেই পানাহার, প্রায়ন-পায়নান, কাপড় পরিধান ও অর্থ করতে পারে, তাহলে এতে বড় বড় বিধাতা পিতা বেশি হকদার হবে।

* ইমাম খাসাসাফ (রহ.) বলেন, উপলব্ধির বয়স হল সাত বছর। এবং এর উপরই ফাটতায়। কোনেম, এ সময় শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং এ কাজ পিতার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এর পূর্বে ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে নয় বছর পর্যন্ত মায়ের ভাবে থাকবে।

দলীল (১)ঃ মালিক এবং বায়হাকি (রহ.) হতে বর্ণিত।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যখন একটি সন্তান সন্তান কে উপলব্ধির বয়স পর্যন্ত ছুটে, যেমন নিজে নিজেই পানাহার, প্রায়ন-পায়নান, কাপড় পরিধান ও অর্থ করতে পারে, তাহলে এতে বড় বড় বিধাতা পিতা বেশি হকদার হবে।

* ইমাম খাসাসাফ (রহ.) বলেন, উপলব্ধির বয়স হল সাত বছর। এবং এর উপরই ফাটতায়। কোনেম, এ সময় শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং এ কাজ পিতার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এর পূর্বে ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে সাত বছর পর্যন্ত এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে নয় বছর পর্যন্ত মায়ের ভাবে থাকবে।
অর্থাৎ, হয়ত আরু বকর (রাঙ্গ) আসেন্দ ইবন উমর ইবন খাতাব (রাঙ্গ)-কে তার মায়ের অধিনে দিয়ে দেন এবং তাকে কোন ইচ্ছা স্বাধীনতা দেয়া হয়নি, আর এ ঘটনাটি সাহাবগণের সামনেই ঘটেছিলো। কিন্তু কেউ অপছন্দ করেননি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ছোট সন্তানকে ইচ্ছা স্বাধীনতা না দেয়ার ব্যাপারে
সাহাবগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলীল (২৪) ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের ইচ্ছা স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া আদৌ
ঠিক নয়। কেননা, বলুক বুদ্ধির কারণে সে সঠিক নির্বাচন করতে পারবে না। দেখা
যাবে সে এমন কোন অনুপযোগীকে নির্বাচন করে বসে আছে যার নিকট গেলে সে
খেলাধুলার অধিক সুযোগ পাবে, যা ইসলামের দৃঢ়কোণ থেকে আদৌ কাম্য নয়।

(ননম আশাত ২৩ সং ১৫৭)

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবে ইমাম শাফেই (রহ.) আবু হুরাইয়ার (রাঙ্গ) থেকে যে
হাদীসের উদ্ধের করেছেন, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, এটি ছিল নবী করীম
(সাঙ্গ)-এর একটি খাস ঘটনা। সুতরাং এর দ্বারা প্রদত্ত দলীল গুরুত্বপূর্ণ নয়। যার
বিশ্বাসিত ভর্তৃ নিয়ে হাদীসের পাওয়া যায়—

"ননম আশাত ২৩ সং ১৫৭"

(এবং)...

অর্থাৎ, ... আবুজুল হামিদ ইবন জাফর (রাঙ্গ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা
আমার দাদা রাফি ইবন সিনান (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ
করলেও তাঁর শৈলী ইসলাম বুঝতে অর্থিক করে। তখন সে (তাঁর শৈলী) নবী
করীম (সাঙ্গ)-এর যুদ্ধেতে হাজির হয়ে বলে, এ আমার কন্যা স্বতান্ত। আর সে
আমারই মত। অপরপক্ষে রাফি নারী করেন, এ আমার কন্যা। নবী করীম (সাঙ্গ)
তাকে এক পার্শ্বে এবং তাঁর শৈলীকে অপর পার্শ্বে বসতি বলেন এবং কন্যা স্বতান্তটিকে
তাদের মাঝখানে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, এখন ভোমারা উভয়ে তাকে
আহবান কর। কন্যাটি তার মাতার দিকে আকৃষ্ট হলে, নবী করীম (সাঙ্গ) বলেন, ইয়া
আল্লাহ। তুমি একে (কন্যাকে) হেদায়ত দান কর। তখন সে তার পিতার প্রতি
আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে (রাফি) তাকে গ্রহণ করেন।
অহকামুল হাদিস

৫৬০

তালাক অধ্যায়

মূলতঃ এটা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য একটি বিশেষ ঘটনা। কেননা, নবী করীম (সাঃ) তার জন্য অতি মঙ্গলের (হেদায়েত) দোয়া করেছিলেন। যা কব্রিত্ব হয়েছিল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ব্যতীত অন্যদের দোয়া কব্রিত্ব হওয়ার কোন গ্যারাংটি নেই। তাই হতে পারে ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রাপ্ত সত্তার অক্লান্ত দিকে কুক পড়তে পারে। যা আদৌ কাম্য নয়।

দ্বিতীয় জবাবঃ অথবা, নবী করীম (সাঃ) ইচ্ছার স্বাধীনতা এজন্য দিয়েছিলেন যে, নবী করীম (সাঃ) যদি স্বাধীনতা প্রদান ব্যতীত সত্তারকে পিতার নিকট হস্তান্তর করতেন, তাহলে তাকেই এই বলে দেখা রোপ করা হত যে, নবীজি মুহাম্মদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষপাতিত করেছেন।

(তিনি আল্লাহর প্রতি স্বাভাবিক ইতিকাফের কারণ ছিল।)

তালাকপ্রাপ্ত রমণীর ইন্দুত

তালাকপ্রাপ্ত রমণীর ইন্দুত হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল(সাঃ)-এর যুগে তালাকপ্রাপ্ত হন। আর সে সময় তালাকপ্রাপ্ত রমণীর জন্য ইন্দুত পালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরপর আল্লাহ তাআলা আসমার তালাকপ্রাপ্তির পর ইন্দুত সম্পর্কে আযাত নামিল করেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা, যার সম্পর্কে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ইন্দুত পালনের বিধান দিয়ে আযাত নামিল হয়।

বিশেষণঃ ইন্দুত (ইদ্দত ইদ্দত)-এর আধিকারিক অর্থ।

ন্যায়ভাষাতে এখানে বাবে তালাক এবং ইন্দুত-এর মাসদার। এর শাস্ত্রীয় অর্থ হলো-

১. গণনা করা

২. হিসাব করা

৩. সংখ্যা, কৌণিক ও কতক ইত্যাদি।

ইন্দুত-এর পরিভাষাতে সংজ্ঞা-

হলে তার প্রতি সংজ্ঞা তার স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক ইতিকাফের কারণ।
অর্থাৎ, বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবার পর মহিলার যে সময়টুকু নিজেদেরকে বিবাহ হতে বিতর রাখে তাকে ইন্দ্র বলা হয়।

* তানরীমূল আশ্রতার প্রণেতা বলেন, ইন্দ্র বলা হয় ঐ সময়কালকে, যা ছীলোক স্বয়ং স্বামীর মৃত্যুর অথচ তালাক প্রদানের পর সমাজ প্রশাসনের মাধ্যমে অথচ হাজার কিংবা মাসমাসুহার মাধ্যমে গণনা করে থাকে। (টনিমুর আলুম জ ২১ স ২০)

সংক্ষেপে বলা যায়- তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের শরীর নির্ধারিত অতিবাহিত সময়কালকে ইন্দ্র বলা হয়।

ইন্দ্রের প্রকারভেদ- ইন্দ্র দু’ভাগে বিভক্ত-

১। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ইন্দ্রঃ তালাক বা খুলাসার কারণে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইন্দ্র পালন করা।

২। স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইন্দ্রঃ স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রীর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইন্দ্র পালন করা।

তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা মহিলার ইন্দ্রের পার্থক্যঃ

১। তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইন্দ্রঃ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বৃদ্ধ (যার হায়ের বক্ত হয়ে গেছে এমন মহিলা) হয়, তবে তালাকের অবস্থায় তিনি মাস ইন্দ্র পালন করতে হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالَّذِي يَبَسَّنَ مِنَ السَّمَّيِّضِ ... فَقِدْ تَهُنُّ ثَلَاثَةٌ آشَهْرُ وَالَّذِي لمْ يَحْيَضَ

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের মৃত্যুর অথাতুর্বী হওয়ার আশা নেই, ..., তাদের ইন্দ্র হবে তিনি মাস। আর যারা এখনও মৃত্যুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইন্দ্রকাল হবে। (তালাক: ৪)

আর যে নারীর হায়ের আসে এমন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী তালাকপ্রাপ্ত হলে, সে ইন্দ্র হিসেবে তিনি হায়ের পালন করবে, নাকি তিনি তুলন পালন করবে, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَّ بَيْنَ فَسَحِهِنَّ ثَلَاثَة نُولَوْءٍ

অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্ত নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিনি কুকুর (হায়ের) পর্যন্ত। (বাকারাং ২২৮)

উক্ত আয়াতে তিনি কুকুর পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। আর অভিধানে 

قاتِنَةٍ فَوَوَعَهُ... শব্দটি হায়ের এবং তুলন (পাখিতা) উভয় অথবাই ব্যবহৃত হয়।
* ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.), আযিশা ও যাযিদ ইবন সাবেত (রাঃ) করা এর অর্থ তুর্ক (পবিত্রতাকে) প্রস্তুত করে বলেন, এমন মহিলাকে ইসলাম হিসেবে তিনি তুর্কের সময় অতিবাহিত করতে হবে। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর একটি মতও তাই।

* ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঈ, নাকশি, মুজাহিদ, আতা (রহ. চার খলিফা (রাঃ) এবং আহমদ ইবন হামল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে ইসলাম হিসেবে তিনি হায়ের সময় অতিবাহিত করতে হবে। কেননা, তারা বলেন, পবিত্র করুন তার তিনি কুরআনে উল্লিখিত তিন করুন দ্বারা তিন পবিত্রকে উদ্ধৃত্ত করে (নিসাহ ৪৩)

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-

* ওল্লিন ব্যুঝার মতো হঠাৎ কাঁচ মাইনেন্ড মিন তাসাইকা এন এরাকাম্ফ ফেকটোছে নান্দাহর- অর্থাৎ তোমাদের কীদের মধ্যে যাদের ঝুঁকি হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইসলাম হবে তিনি মাস। (তালাকঃ ৪) উক্ত আয়াতে লক্ষ্যীয় বিষয় হল- যদি কোন মহিলার হায়ের না আসে, এমতাই তার জন্য তিন মাসেও ইসলাম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর ইহাই হায়েরের স্কুলাহিদিক।

* ফেকাম তুর্কাম মাফ ফেকাম সুচিবাদা গিৎ- অর্থাৎ যদি তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (নিসাহ ৪৩) উক্ত আয়াতে মাটিকে পানির স্কুলাভিদিক করা হয়েছে। মূল হল পানি। পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম জাত্য রয়ে নয়। (নিসাহ ৪৩)

দলীল (২) আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস-

(নিসাহ ৪৩)
আহকামুল হাদীস

তালাক অধ্যায়

آن اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال فِي سَبَأَيْ أَوْطَاسِ لا تُؤَاوِنَا حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِضٌ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ يَحْيَا تَحْتَهَا—(سند)

অর্থাৎ, আওতাসের বন্ধীদের সম্পর্কে নবী করিম (সাহ) বলেছেন, সত্তান ভূষিত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নরের সাথে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কুতুভীর সাথে সহবাস করবে না।

উত্তর হাদীসে ইস্তিন্দার (রাহুল পবিত্রতা)-কে হায়েরের মাধ্যমে নিদিষ্ট করা হয়েছে। আর ইদতের উদেশ্যই হল জরায়ু পবিত্রতা। সুতরাং বুখা গেল যে, ইদত হায়েরের দ্বারা হবে, তুহুর দ্বারা নয়।

দলীল

... عن عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال فِي طَالِقَةٍ الأَمَةِ(۳)
	تَطْلِيقُتَانِ وَقُرُوءٌ حَيْضِتَانِ-(إِبَوِ دَاوُدُ جُرَابِ)

ص ۲۴۵ د. خ. ۱۰۸ ب. خ. ۱۰۸ ب. خ.

অর্থাৎ, ... আয়াহ (রাহুল) নবী করিম (সাহ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, দাসীর জন্য তালাক হল দু’টি এবং তার ইদতের সময় হল দু’হায়ের পর্যন্ত।

উত্তর হাদীসে দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, ইদত হায়ের দ্বারাই পালন করতে হবে।

তাহাড়া আয়াতে কারীমায় ছোরে শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। যদিও ছোরে শব্দটি হায়ের ও তুহুর উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এককের হায়েরের অর্থটি গ্রহণ করাই উচিত।

হেদায়া গ্রাহকার তাই বলেন। কেননা, ছোরে শব্দটি-এর বহুবচন। যা কমপক্ষে তিনির উপর প্রয়োগ হয়। ঠিক তেমনিভাবে আয়াতে বর্ণিত (তিন) শব্দটিও নির্দিষ্ট।

সুতরাং তিনির চেয়ে কম অথবা বেশি আমল করা ঠিক হবে না। অতএব, যে তুহুরে তালাক প্রদান করা হয়েছে, ইহাকে যদি ইদতের মধ্যে গণ্য না করে ইহা ব্যতিত পরবর্তী তিন তুহুর আদায় করা হয়, তাহলে ফল দোড়ায় এই যে, তিন তুহুর এবং যে তুহুরে তালাক দিয়েছে এর কিছু অংশ তুহুর আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে, যে তুহুরে তালাক প্রদান করা হয়েছে, তা যদি ইদতের মধ্যে গণ্য করে আরো দু’তুহুর ইদত পালন করা হয়, তাহলেও তা পুরোপুরি তিন তুহুর আদায় হচ্ছে না। তবে তিনির থেকে কিছু না কিছু কম হবেই। অর্থাৎ, ছোরে দ্বারা তুহুর উদেশ্য হলে কোনক্রমেই পুরোপুরি তিন তুহুর আদায় করা সম্ভব নয়। অল্পক্ষণের জন্য হলেও কম-বেশি হবেই।

তাতে ছোরে দ্বারা হায়ের অর্থ নিলে তিন সংখ্যাটির উপর পুরোপুরি আমল করা সম্ভব। আর ইহাই যুক্তিসঙ্গত। ( تنظيم الاشتنات ج2 ص۱۹۷، التوضيح ص90)
জবাবঃ হাদিসে উল্লিখিত ইদ্দত দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত রুখানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এতে তালাকের সময় রুখানো উদ্দেশ্য।

আর একথার ইঙ্গিত (قرینة) হল এই যে, এই কথার সময় মাতির ব্যক্তি হলেন হযরত উমর (রাঃ)। আর তাঁর নিকট ইদ্দত হায়ে দ্বারা পালন করতে হবে, তাহক দ্বারা নয়। সুতরাং এর অর্থ তুঃসুর নয় বরং হায়ে। অতএব, উক্ত হাদিস দ্বারা এক্ষেত্রে দলীল উপস্থাপন করা সহীহ নয়। (تنظيم الأشتات ج: 197، درس مشروحة ج: 3 ص: 30)

বিধবা মহিলার ইদ্দতঃ
ক. গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হলো চার মাস দশ দিন।

দলীল (١) আলাহ তাআলার বাণী-

وَلَذَٰلِكَ يَتَوَفَّوْنَ بَيْنَكُمْ وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَابِضُونَ فَيَنْفِسُهُمْ أَرْبَعَةٌ آَشِهِرٌ وَعَشْرَةٌ

অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং নিজেদের স্বামীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্বামীর কর্তব্য হলো নিজেদের চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

(বাকারাঃ ২৩৪)

দলীল (٢) আলমার সালামা (رَاهِن) হতে বর্ণিত। যায়ন বলেন, একদা আমি উন্মে হাদীসের নিকট গমন করি। আর এই সময় তার পিতা আবু সুফিয়ান (رَاهِن) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ সময় তিনি হলুদ রংবিশিষ্ট সুগন্ধি তৈল অথবা অন্য কিছুর জন্য আহবান করেন। তাহারা একজন দাসী তার কেশের তৈল
মেঝে দেয়। এরপর তিনি চেহারায় তৈল মর্দন করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ। সুগতি দ্বয় ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন নেই; তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে ইরাশাদ করতে জোরিয়া যে সমস্ত মিলা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈসামা রাখে, তাদের জন্য কোন মৃত্যু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিনিরাতের অধিক শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। তবে স্বামীদের জন্য চারমাস দশদিন শোক প্রকাশ করবে।

খ. গভর্তিত মহিলার তালাকের ইন্দ্র হল সম্মান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, যতদিনই লাগুক না কেন।

দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বাগী- 

* ওয়ালাত আলামাখাতু আন ইলাহু আল্লাহু * 

অর্থাৎ, আর গভর্তিত নারীদের ইন্দ্রকাল সম্মান প্রসব পর্যন্ত। (সূরা তালাকঃ ৪)

গ. গভর্তিত মহিলার স্বামী মারাত গেলে তার ইন্দ্র করা হবে, এ নিয়ে মতানৈক রয়েছে। কেননা, প্রথম আযাতের চাহিদা অনুমানী তার ইন্দ্র চারমাস দশদিন হওয়া উচিত, পক্ষপাতে দ্বিতীয় আযাতের মার্মর্যাদায় বুঝা যায়, তার ইন্দ্র সম্মান প্রসবকাল পর্যন্ত হেক।

* হযরত আলী (রা)-এর মতে, এমন মহিলার জন্য সম্মান প্রসব এবং চারমাস দশদিন উভয় ইন্দ্রই পূর্ণ করা জরুরী। তাঁর অভিমতকে বিশেষ করতে গিয়ে বলা হয়ে যে, এমন মহিলার ইন্দ্র হল দুটি সময়ের মধ্য থেকে অধিক তূর্গবর্তী সময় (৪১ অব্দুল্লাহ)। যেমন কারো সম্মান প্রসব স্বামীর মৃত্যুর হয়মাস পরে হবে, এমতাবশ্যক চারমাস দশদিনকে ইন্দ্র না ধরে সম্মান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ধরতে হবে। আবার কারো সম্মান প্রসব স্বামীর মৃত্যুর এক দুমাস পরে হয়, এমতাবশ্যক সম্মান প্রসবকে ইন্দ্র না ধরে চারমাস দশদিন ধরতে হবে। কেননা এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রথমদিকে হযরত ইবন আব্দ ব্রা (রা)-এর অভিমতও এটাই ছিল।

* অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ও চার ইমামের মতে, এমন মহিলার নিধরিত ইন্দ্র হল, সম্মান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, তা যত কম বা বেশি সময়ই হেক না কেন।

(দৃষ্ট তাইফি জ০ ১ স, ৫২)

দলীলঃ সুবাইয়াহ (রা) যখন সম্মান প্রসবের পর বিবাহদের পরগাম প্রেরণের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন আরু সানারিও ইবন বাকা এসে তাকে লক্ষ্য করে বললেন-

* মা লি আরাক মুজাম্মেলা আল্লাহ আমাকে তারতিখে লক্ষাহ আল্লাহ আমাকে তারতিখে লক্ষাহ আল্লাহ আমাকে তারতিখে লক্ষাহ * 

* মা লি আরাক মুজাম্মেলা আল্লাহ আমাকে তারতিখে লক্ষাহ *
অসীমত অাদে স্বৰূপ আল্লাহ তালাহ তালাহ তালাহ ১০২ তালাহ অধ্যায়

অসীমত কাজিত স্বৰূপ আল্লাহ তালাহ তালাহ তালাহ ১০২ তালাহ অধ্যায়

০৬ অথবা, ... আসি তামাকে সাজ গোপ করতে দেখি, মনে হয তুমি পুনঃবিবাহ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর শপথ তুমি ততক্ষণ পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার মৃত্যু (মৃত্যু ত্বাবধি) ইন্দ্রভক্ত চারমা দশম পূর্ণ না কর। সুবাইয়ার বলেন, তার এরূপ উত্তর শ্রবণের পর, আসি রাতে কাপড়-চোপড় পরিধান করে রাসুল সাহেব (সাহেব) এর নিকট গমন করি এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি এরূপ ফাতো দেন যে, আসি তখনই হাসাল হয়েছি, যখন আসি সত্ত্ব প্রসব করেছি। এরপর তিনি আসি প্রয়োজন বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ) বলেন, যদি সে এখন বিবাহ করে, তবে আসি এতে দোষের কিছু দেখছি না; যখন সে তার সত্ত্ব প্রসব করেছে। আসি এখনও যদি তার নিফাসের রক্ত থাকে, এতেও বিবাহ বন্ধে কোন আপত্তি নেই। অবশ্য সে তা হতে পারিত হাসিলের পর তার মধ্যে সাহাস করতে পারবে।

উক্ত হাসিলের দ্বারা জমিহারের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আমুদ্রা ইবন আব্দুল্লাহ (রা) উক্ত রেওয়ায়েত শোনার পর জমিহারের মায়ারের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

প্রতিপক্ষের দলীলের জওয়ার মূল ব্যাপার হল এই যে, দ্বিতীয় আযাত (১০২) এর জন্য পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রে নাস্থক। আর যে সকল ফুকাহা আল্লাহর নিকট গমন করেছেন, এর একটি কারণ ছিল এই যে, তাদের সর্বাধিক পুরো আল্লাহ আসলামের (রা) এর রেওয়ায়েত বোঝা নেই, ফলে তা প্রাপ্ত করা ছিল অধিক সত্যকার মূল।

দ্বিতীয় কারণ ছিল যে, কোন আযাতটি প্রথমে নামিল হয়ে মানসূক হয়েছে এবং কোন আযাতটি পরে নামিল হয়ে নাস্থক হয়েছে, তা তাদের জানা ছিল না।

এ ব্যাপারে আমুদ্রা ইবন মাসউদ (রা) বলেন-
बाब ५: नफ़ाफ़ियतुल मबुतीतुइन स ३१
तालाका बायेनप्रांग़ा महिलार खोरपोश

अनुवाददं: फातिमा बिनत कायौस (रां) हत्ते बर्थित। तिनी बलन, निश्चयই आबु आमर इबन हाफ़स ताके तिन तालाका बायेन प्रदान करेन, एमदतबस्थय ये तिनी अनुपस्थित ছিলেন। এরপর তার উকিল মারফত তার (ফাতিমার) নিকট কিছু আটা গ্রহণ করেন, যার ফলে তিনি অনন্তর প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তার অর্থ কিছুই আমার নিকট সত্তার পাওনা নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাং)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ তার নিকট
তোমার খোরপোষ পাওনা নেই। এরপর তিনি তাকে উঁচ্চে ঘুরায়কের ঘরে অবস্থানপূর্বক তার ইন্দ্র পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বলেন, এ স্ত্রীলোককে তার অধিক খরচের দ্বারা আমার সাহায্যে কেঁকে ফেলেছে। তুমি উষ্মে মাকতুমের ঘরে অবস্থান কর, আর সে হল একজন অন্য লোক, কাজেই (তুমি তোমার কাপড় খুলে রাখলেও) সে তোমাকে দেখেন না। এরপর তুমি যখন তোমার ইন্দ্র পূর্ণ করবে, তখন আমাকে এ সম্পর্কে খবর দেবে। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার ইন্দ্র পূর্ণ করে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং বলি যে, মুক্তি ইন্দ্র আরু সুফিয়ান ও আরু জাহাম উভয়ে আমার নিকট আমাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সার) বলেন, আরু জাহাম তা তার কাছ হতে তার লাঠি সরায় না, (অর্থাৎ অধিক মারাধরকারী)। আরু মুক্তি যে তার ফক্তর এবং তার কোন মাল নেই। তুমি বরন উসামা ইবন যারিদকে বিবাহ কর। তিনি বলেন, তা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয়। তিনি পুনরায় বলেন, তুমি উসামা ইবন যারিদকে বিবাহ কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করি। অতঃপর আল্লাহ তাদুল্লাহ এতে এত মঙ্গল প্রদান করেন, যার ফলে আমি অন্যের জন্য ঈশ্বর কল্যাণে পরিণত হই।

বিশেষেঃ ফুকাহারে কিরমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, রাজসী তালাকপ্রাপ্ত এবং নিচিত তালাকপ্রাপ্ত অন্ধসত্তা মহিলা ইন্দ্র পালনকালে স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। এতে কোন মতানৈক্য নেই।

(দ্রু তুর্থ চ ৩:৪৪, দ্রু মশুমে চ ৩:৬৪)

যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَإِنَّ كُنِّي أُولَاتٍ حَمَلَ فَأَتْلَتْ عَليهِنَّ حَتَّى يَضْعَفَ حَمْلُهُنَّ – (سورة الطلاق آية ৬)

অর্থাৎ, যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সত্যাঃ প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যায়ার বহন করবে।

(তালাকঃ ৬)

প্রশ্ন হল, গর্ভবতী নয়, এমন মহিলাকে যদি নিচিত তালাক প্রদান করা হয়, তাহলে ইন্দ্র পালনের দিনগুলোতে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে কিনা- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মলিক ও শাফেঈ (রহ).-এর মতে, এমন মহিলাকে বাসস্থান দেয়া ওয়াজিব, খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব নয়।

(ইহুমাত আল জাহামাত ২:২৫৯, ইমাম আবদুর রেহমান, দ্রুহর ইমাম চ ৩:৬৪)

দলীল (১): আল্লাহ তাআলা বলেন - আস্কালুহুন্ন মুন হেন্না সেখেন মুন বেজাকেম -
অর্থাৎ, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। (তালাকঃ ৬)

উক্ত আযায়ে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে বাসস্থান দেয়ার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। তাই তাকে বাসস্থান দিতে হবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তারালার বার্তায়—

ওয়ান কিন আওলাট হামলাট ফ্যান্টাসে যোগ্য প্রাপ্ত হতে পর্যন্ত হ্যামলাট

উক্ত আযায়ে দ্বারা রুখা যায় যে, খোরোপোষ প্রদান করা ওয়াজিব। তবে খোরোপোষের ওয়াজিব হওয়াটা গর্ভবতী মহিলার সাথে শর্তারোপ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হল যে, গর্ভবতী নয় এমন মহিলাকে ক্ষেত্রে খোরোপোষ প্রদান করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় তাদের প্রমাণ হবে, তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা। নতুন আযায়ে গর্ভবতী মহিলাকে নির্দিষ্ট করার কোন সার্থকতা থাকে না।

(ছাত্র বাকরি জ সো টি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা)

দলীল (২): অনুছেদের ওপরে বর্ণিত হাদিস। নবী করিম (সা.) বলেন—

নিস্তান লেয় আল্লাহ নিস্তান আল্লাহ

উক্ত হাদিসে দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্টঃসত্তা নয় এমন নিশ্চিত তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইত্যাদি পালনকালে খোরোপোষ পাবে না।

* ইমাম আহমদ ইবন হামল, ইসহাক, আহলে যাহের, শাবি, হাসান বসরি, তাউস ও আতা (রহ.)-এর মতে, এমন মহিলাকে খোরোপোষ এবং বাসস্থান কোনটিই নেই।

(এবো দাউদ হাশিমা জ সো ১২১, তনমী আইেতা জ সো ২১৫)

দলীল(১): উন ফাতেমা মিন মওসে তে ফাতেমা মিন মওসে

সাল্লাল হামল উল্লাম নাকফো ওলাস স্কেন্ডিন

(এবো দাউদ জ সো ১৩১ বাবা মুহক্কম, স্লাম জ সো ১৪৮)

অর্থাৎ, ... ফাতিমা বিনত কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার স্বামী তাকে তিন তালাক প্রদান করে। তখন নবী করিম (সা.) তার থাকার ও খোরোপোষের জন্য কিছুই নির্দিষ্ট করেননি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, অন্টঃসত্তাহীন বায়েন তালাক অথবা তিন তালাকপ্রাপ্ত খোরোপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

* ইমাম আবু হানিকা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, উল্লিখিত মহিলা ইদ্দীতের সময় খোরোপোষ ও বাসস্থান উভয়টিই পাবে। সুফিয়ান সাওরি, ইবরাহীম নাখী, ইবন উদুরামা, ইবন আবী লায়লা (রহ.) এবং হফ্ত উমর ইবনুল খাতাব ও আদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখের মায়াবাদ এটাই।

(ঢুমাকি ওরাজি জ সো ১২০, ৩১৭-৩২৮, ভক্তির ফরায় লাক্সোহান জ সো ৩১৫)
দলীল (১): পবিত্র কুরআনের আযাত - উল্লেখিত পাশের ফেরোয়া তালিকাভুক্ত স্কিন হয়ে উঠেন। অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরে যেহেতুদের উপর কর্তব্য। (বাকারা: ২৪১)

উক্ত আযাতে মঞ্চ দ্বারা সরবসমতিক্রমে হোরগোষ্ঠই এবং বাসন্ধান উভয়টি উদ্দেশ্য। আযাতের যোগসূত্র পর্যালোচনা করলে তাই বুঝা যায়। কেননা, আযাতে মূলত শব্দটি ব্যাপক, যা রাজী তালাক ও তিন তালাক বা বায়েন তালাক উভয়টিকেই শামিল করে।

দলীল (২): আল্লাহ তাআলার বাণী - আকস্মিক মিষ্টি সেক্টর্মণ এবং ইবন মাসউদ (রাছ)-এর এক কিরিয়াতে উল্লেখ আছে-

১০৩ স (রহ. সামীরা জ) অর্থাৎ, এবং তোমাদের সাধারণ অনুযায়ী তাদের জন্য ব্যয় কর।

উক্ত কিরিয়াতটি দ্বারা হোরগোষ্ঠীর কথা প্রমাণিত হয়। আর বিরল (৫১৫) কিরিয়াত খবরে ওয়াহীদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের নয়। (ফতুহ মলুক জ ১ স (২০৪)

দলীল (৩): তাহবিয়েত হযরত ফাতিমা বিনত কায়েস (রাছ)-এর ঘটনা উল্লেখ আছে যে, হযরত উমর (রাছ) এ ব্যাপারে বলেন-

১০৪ স (রহ. চৈল্য ইয়ামীর আরাক জ ২ স (২৫)

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাছ)-কে আমি বলতে শুনেছি, এ মহিলার জন্য বাসন্ধান ও হোরগোষ্ঠীয় রয়েছে।

দলীল (৪): উন্ন জাহাজের তালিকা ইলে স্কিনের ফেরোয়া উল্লেখ করা স্থলে মুলত তালিকা ও লেখা।

অর্থাৎ, ... জাহাজের (রাছ) সূত্রে নবী করিম (সাছ) থেকে বর্ণিত আছে, তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য হোরগোষ্ঠী এবং বাসন্ধান রয়েছে।

দলীল (৫): ইজমা দ্বারাও হানাফীদের অভিমত প্রমাণিত হয়। নির্মোক্ত হাদিসটিই এর প্রমাণ-
আহকামুল হাদিস

571
তালাক অধ্যায়

... অল্প ইসহাক হতে বর্ণিত। তাঁর বলেন, আমি একদা (কুফায়) জামে
মসজিদে আসাগারের সাথে (উপরিভ) ছিলাম। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কাইয়েস
উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি
বলেন, আমা আমাদের দেব কিতাব (কুফায়) ও আমাদের সুলতানকে
একজন মহিলার বন্ধুর অনুসারে পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সম্পর্কে আমি জান
নিয়ে যে, সে সঠিকভাবে উহা (হাদিস) হিসাবে করেছে কিনা।
হযরত উমর (রাঃ)-এর উক্ত বাণীকে কোন সাহাবী প্রত্যাখ্যান করেননি। এতে
প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজ্মা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলিল (৬): কিয়াসের দারাও হানাফীদের অভিভাবক প্রমাণিত হয়। কেননা, ইদরে
পালনকারী নারী ইদরের সময়ে (সমাত্ত্বর অধীনে) উপার্জনের দিক থেকে বদ্ধ। আর
যার অধীনে বদ্ধী, খোরপোষ তার উপরই বর্তী সুতরাং খোরপোষ ও বাসস্থান
সমুর্জ উপরই বর্তী হবে।
তাহাতু ইমাম জাসাস (রহ.) নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্বারা তিনভাবে হানাফীদের
অভিভাবক প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আস্কানৌহেন মু হীরা সুস্তিন মু সুজিক মৃ তালাসোহেন এটিভোসো এনিভেন-
অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুষ্ঠানে যোগপ্রাপ্ত হব, তাদেরকেও
বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটপ্রাপ্ত করো না।
(তালাকঃ ৬)

(ক) যোগপ্রাপ্তে বাসস্থান একটি আর্থিক অধিকার তেমনিভাবে খোরপোষও
অর্থনৈতিক অধিকার হওয়া কারণে তা ওয়াজিব।

(খ) দ্বারা তালাককারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর
ক্ষতি দেওয়া বাসস্থান না দিলে হয়, অনুরাগ্নে খোরপোষ না দিলেও হয়ে থাকে।
(গ) আয়াতে উল্লেখ আছে এনিভোসো এনিভোসো অবচ্ছেদন এবং সংক্ষেপতা যোগপ্রাপ্তে
বাসস্থান না দেয়ার কারণে হয়ে থাকে, তবে খোরপোষ না দিলেও হয়।
সুতরাং তালাকপ্রাপ্ত নারী খোরপোষ ও বাসস্থান ভবিষ্যতেই পারে।

জবাবে ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রহ.) দলীল হিসেবে যে আযাত পেশ করেছেন, এর জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, উল্লিখিত প্রথম আযাত দ্বারা তা তাদের কথামতই বাসস্থানের প্রমাণ মিলে। আর দ্বিতীয় আযাতের ক্ষেত্রে তাঁরা যে মেহরেম মুভাল্ফ না বিপরীত অর্থ নিয়েছেন, আহনাফীগণ তা গ্রহণ করেন না। কেননা, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আযাতসমূহ দ্বারা যেখানে খোরপোষ ও বাসস্থান ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে বিপরীত অর্থ নয়। কোনও কোনও গ্রহণযোগ্য ও দলীলযোগ্য হতে পারে না।

তবে, আযাতে বসত্রাজারে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্ত মহিলার কথা উল্লিখে করার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হল এই যে, গর্ভবতী মহিলার ইহুদী অধিকাংশ সময় দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এমতবস্তুত ব্যাপারের ক্ষেত্রে খোরপোষের ভার বহনে অনিহার চলে আসার সুবাদান না আছে বিধায় তাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, খোরপোষ সত্ত্বেও জন্মের পূর্বের পর্যন্ত দোয়া ওয়াজিব, চাই যত সময়ই অতিবাহিত হোক না কেন।

(ইকাম ইলাহী ফিনতল্লী ২:২-২৬, ফিনত আল-ফিলুম ১:৩২-২০৩)

* ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর প্রদত্ত হাদিসের মাধ্যমে (এককত্র) জন্য হলঃ

(১) হযরত ফতীমা বিনত কায়েস (রাবি)-এর হাদিসটিকে হযরত উমর (রাবি) সাহাবায়ে কিরামের সামনে খুন করে দিয়েছেন, সুতরাং তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) ফতীমা বিনত কায়েস বীর্য স্বামী ও ঘরওয়ালীদের সাথে ঝাড়া করতো। এজন্য নবী করিম (সাত) তাকে ঘর হতে বহিষ্কার করেছেন। সুতরাং এ হকুম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

... হযরত ফতীমা বিনত কায়েস (রাবি) তাকে খোরপোষ করতে বলেন। তিনি বলেন যে, আমি (জমিদার) হতে বর্ধিত তিনি বলেন, আমি (রিকর্কা হতে) মদ্রাসী আলাক করি। এবং সাহেব ইবনুল মুসারিয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে বলিলে, ফতীমা বিনত কায়েসকে তালাক দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তার ঘর হতে বহিষ্কার
করা হয়েছে। সাইদ বলেন, সে মহিলা তো মানুষকে বিপদে ফেলেছে, আর সে তাঁকে মুখোরা রামণী। এরপর তাকে অদৃশ্য মার্কুতুমের হত্যা সোপর্দ করা হয়েছে।

(৩) হযরত আরিশা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা বিনত কায়েস বীর্য স্বামীর ঘরে এককীরণের কারণে নিঃসংঘাত অনুভব করত। তাই নবী করিম (সাঃ) তাঁকে অদৃশ্য আস্তুরাহ ইবনে উমেদ মার্কুতুম (রাঃ)-এর ঘরে ইদ্দিত পালন করার অনুমতি দেন। তাই এটা ছিল তাঁর জন্য খাস।

قالَتْ عَائِشَةُ بُنَيَّةً إِنَّ قَاتِلَةَ كَانَتْ فِي مَكَّةَ وَحَشَرَةُ فَخَيْفَةَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلَذَاكَ أَرْحَصَ لَهَا الْلَّبَثُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِخَارِي ج ٢٩: ১৬) বাবার মাজাত চ১৪৭

অর্থাৎ, হযরত আরিশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বীর্য স্বামীর ঘরে এককীরিং হওয়ার কারণে ভয় অনুভব করতেন। এজন্য প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে আস্তুরাহ ইবনে উমেদ মার্কুতুম (রাঃ)-এর ঘরে ইদ্দিত পালনের অনুমতি দিয়েছেন।

(৪) কতক আহানাম জবাব দিয়ে গিয়ে বলেন, তাঁর স্বামী উকিল মার্কুতুম তাঁর জন্য খোরোপাষ বাবদ কিছু আটা (তিরমিমির রেওয়ায়েত অনুযায়ী দশ সা’) প্রেরণ করলে তিনি তা কম মনে করে অস্ত্রশিক্ষা প্রকাশ করেন। এবং এর চেয়ে অতিরিক্ত পাওয়ার নিমিত্তে নবী করিম (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে, তিনি (সাঃ) বলেন -

ليسَ لِكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (অর্থাৎ, এর অতিরিক্ত) তোমাকে খোরোপাষ দেয়া হবে না।

সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা নবী করিম (সাঃ) সাধারণ খোরোপাষ প্রদানকে নিষেধ করেননি; বরং এর দ্বারা তাঁর কাংক্ষিত অতিরিক্ত খোরোপাষকে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে নিজের কিভাবসমূহের হাদিস লিখেছে।

(এবং দাইয়ার জ ৩২৩ হাদিস নৈফতে মিতনা, মসলমান জ ৪৮৩ বাবার মাজাত হাদিস)

(৫) ইমাম তাহিবী (রহ,) বলেন, হাদিসের কিভাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, ফাতিমা বিনত কায়েস ছিলেন একজন অবাধ্য ও কলহপ্রিয় ক্রীলোক। আর এ ব্যাপারে পরিত্বর করা হয় নাহি -

لا تُحْزَجِحْهُمْ مِنْ بَيْوُتِهِمْ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنَّ يَأْتِيَنَّ مِفْهَةً مُبِينَةً

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ কাজে লিপ্ত হয়।

উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হল, (সুস্পষ্ট নির্দেশ) শব্দটিকে হক্ক হতে ব্যাবক্রম (ইস্তিফা) হিসেবে আনা হয়েছে। আর কটুভাষা ও কলহপ্রিয়ভাবেও ফাহেরা হিসেবে আনা হয়েছে।
হাদিসে বর্ণিত আছে—

... عَنْ سِلَيْمَةَ بْنِ يَسَارٍ فِي حُرُوجٍ قَافِثَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنْ سُوءِ الْحَلِّقِ

(ابو داود ج 313 باب من انكر ذلك على فاطمة)

অর্থাৎ, ... সুলায়মান ইবন ইয়াসার হতে ফাতিমা বহিষ্কৃত হওয়ার হাদিস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। রাশি বলেন, তার এ বহিষ্কার ছিল তার বদ অভ্যাসের পরিণতি হ্রদপ। আলোচনার শেষ প্রাতে বলা যায় যে, সর্বপ্রথম তালাকপ্রাপ্ত মহিলাই নারীর পক্ষ থেকে ইসলামের সময় বাস্তবায় ও থেকে নেওয়া পাবে। এর এ ব্যাপারে হয়ত ফাতিমা বিনত কায়েমের হাদিস দ্বারা দলীল প্রদান করা সহীহ নয় এবং প্রহেলিয়াগুও নয়।

باب في المبتوطة تخرج باللهار ص 313

বারো তালাকপ্রাপ্ত রমণীর ইহেদতকানীন সময়ে দিনের বেলায় বাইরে যাওয়া

... عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَقَتْ حَالَاتِي ذَاكِ فَخُرْجَتْ تَجْدِيدًا نَخَلَتْ لَهَا فَلَفَّيْهَا رَجَلُ

فَنِهِيَهَا فَأَتَتَ الْلَّهُ مَثْلَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِّرَتْ ذُلِّكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا أَخْرُجْيُ

فَجَذَّرَ يَنْحَلِكَ لَمَّا لَمْ تُقْدِرِيِّ بِنَجْعُودٍ أَوْ تُقْدِيِّ خُبْرَاءٍ (سُلَمَى ج 1486) باب جواز خروج

المتعددة البائناء الخ: نسائي ج 119 باب خروج المذكور عنها باللهار

অনুবাদঃ ... জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক (বারো) প্রদান করা হয়। এরপর তিনি খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাকে (ইহেদতকানীন সময়ে) ঘর হতে বের হতে নিষেধ করেন। তিনি নবী করিম (س) এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর। যেন তুমি তা হতে কিছু সদকা কর অথবা ভাল কাজ কর।

বিশেষণঃ তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইহেদের সময় যে ঘরের মধ্যে থাকে, সে ঘর থেকে যদি বের হতে বাধ্য হয়, যেমন ঘর ভেঙে যায় অথবা নিজ সত্ত্বা ও সম্পদ বিনিঃ হওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা গৃহকর্তা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, এমতাবধিয়ে উক্ত তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ঘর থেকে বের হতে পারবে। এতে কোন মতানৈক্যা নেই।

(تنظيم الاشقات ج 211)
প্রশ্ন হল, উপরের লিখিত কারণ ছাড়া তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ইত্যাদি চলাকালীন সময়ে ঘর হতে বের হতে পারবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেই, আহমদ ইবন হায়াল ও হাইস (রহ.)-এর মতে, দিনের বেলায় নিঃশর্তে বের হতে পারবে, কোন প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক এবং রাতের বেলায় খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত বের হওয়ার অনুমতি নেই। (درس مشروط ج 31 ص)

দলীল: অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস।

فَقَالَ نِسَاءٌ أُخْرَجْنَاكُنَّ فَخَذُواْ نَخْلَكَ

অর্থাৎ, তিনি (সাও ) তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন কর।

উত্তর হাদিসে খুব বেশি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ নেই। বরং খুব খেজুর কর্তনের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই সাধারণ কাজেও দিনে বের হতে পারবে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, দিনে ও রাতে কোন সময়ই খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

দলীল (۱) আল্লাহ তাআলার বাণী-

ولَا تَحْرِجُواْ نِسَاءٍ مِّنْ يُبْرِغُونَ وَلَا يُخْرِجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْلَيْنَ يَفَاحِشُونَ وَيُغْيِثُونَ

অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। (تالক: ۱)

آذِرَّلَما نَاكَحِي (রহ.) আদুরে বর্ণিত (نيرিজ) শর্তের অর্থ করেছেন নিজ

الخروج

তথা প্রয়োজন ব্যতীত নিজ থেকেই বের হয়ে আসা। (نظم الأسئلة ج ۲۱ ص)

দলীল (۲) আর প্রয়োজনে যে বাইরে বের হতে পারবে, এর দলীল অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

لَعْلِكَ أَنْ تُصَدَّقِي مِّنْهُ أَوْ تَفْعَلْيَ خَيْرًا

�র্থাৎ, ... যেন তুমি তা হতে কিছু সদকা কর অথবা ভাল কাজ কর।

উত্তর বাক্যাংশে সদকা ও ভাল কাজকে বের হওয়ার কর্ণ সাব্যস্ত করায় একথা বুঝা যায় যে, কেন দীনি ও দুনিয়াভী প্রয়োজনের জন্য বের হওয়া জায়ে। নতুন জায়ে নয়।

জবাবঃ হানাফীগণ বলেন, উপরের লিখিত দলীলের মাধ্যমে জবাবও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যেখানে কুরআন-হাদিসে এ ব্যাপারে বাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাধাহীনভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। (نظم الأسئلة ج ۲۱ ص)
باب في المتوفرة عندها تنقُل ص 314

الباجي

الصورية

فما للمورثة على باب

... عن سعد بن اسحاق بن كبير بن عجارة عن عقته زينب بن نت كعب بن...

عجارة بن القرية بن لام بن سمان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها
أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمالك أن ترجل إلى أهلها في
بلي خديفة فنان وضعها خرج في طلب أعبده إياها حتى إذا كان يطرف القدوم
لحقه ثم قتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجل إلى أهلها فأتي
لم يتركلها في مسكن يملكها ورتفع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعلم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجيرة أو في المسجد دعاك أو أمرني
فدعنت له فقال كيف قلت فرذدت عليه القصة التي ذكرت من شان ورجع
قالت فقال امكلي في بنيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتذرت في أربعة
أشهر وعشرًا قالت فلمًا كان عنمان بن عفان أرسل إلى فسالمي عن ذلك
فأخبرته فأبلغه فقضى به - (تمددي ج 1 ص 229 باب عبد المنتفي الخ، نسائي ج 2 ص 116)

(عدة المتوفر عليها الغ)
হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (নামাকার) ঘরে অবস্থান করবে। রামা বলেন, এরপর আমি সেখানে চার মাস দেখিন অতিবাহিত করি। রামা বলেন, উসমান (রা।)-এর খিলাফতকালে, তিনি এ হাদিসটি আমার নিকট হতে ভ্রান্তের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে পাঠান। সে আমার নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করি। আর তিনি (উসমান রা।) এর অনুসরণ করেন এবং ঐ অনুসারে স্বসালাও দিতেন।

বিশ্লেষণঃ নামাকার মৃত্যুর পর কোথায় ইন্দ্রিয় পালন করবে- এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছেঃ

* হযরত আলী, ইবন আব্দুল-মলিক এবং আব্বু নাসির (রা।)-এর মতে, নামাকার মৃত্যুর পর নামাকার গৃহে ইন্দ্রিয় পালন করা কোথায় জরুরী নয়; বরং সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ইন্দ্রিয় পালন করতে পারবে এবং নামাকার বাড়ি থেকেও স্বাভাবিক হতে পারবে।

এই মতের স্পর্শে ইমাম শাফেক (রহ।)-এর একটি উক্তি রয়েছে-(নতুন আমদানি, ২০১২, ডুই মস্কোর জ়েমেল, ২৩ সংখ্যা, ৪৩ পাতা)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসেঃ

FAQSALAT RASOUL ALLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM AN ORJUAH ILAI AHLEF FANAI LAM YATARKUFI FEE

মসকি যাতস্থায় না নির্ভর করাত ফকা রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আলাইহী ঵া সাল্লাল্লাহু আলাইহী

এতে বুঝা যায় যে, নামাকার জন্মে ইন্দ্রিয় পালন করা জরুরী নয়। কেননা, বর্ণিত হাদিসের প্রথমাংশে কৃষ্ণে পরিবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

যদিও হাদিসের শেষাংশে ইরান হচ্ছে- “তুমি তোমার (নামাকার) ঘরে অবস্থান করবে” আর এটি হচ্ছে একটি মৃত্যুহাব হুকুম।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমদ ইবন হামদল ও আইয়াদু (রহ।) সহ জমহর সাহবীবি ও তাদের সাধারণের মতে, নামাকার মৃত্যুর ঘর থেকে বের হওয়া জায়গা নয়; বরং তাতেই ইন্দ্রিয় পালন করা জরুরী। হুমাই, ঘর যদি aYং বা ভেঙে যায় অথবা উত্তরসূরীর নিকট ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে স্বাভাবিক হতে পারবে। ইমাম শাফেক (রহ।)-এর প্রসিদ্ধ মতও তাই।

(নতুন আমদানি, ২০১২, ডুই মস্কোর জ়েমেল, ২৩ সংখ্যা, ৪৩ পাতা)

দলীলঃ অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসেঃ

FAQSALAT RASOUL ALLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM AN ORJUAH ILAI AHLEF FANAI LAM YATARKUFI FEE

অর্থাৎ, ... নবী কৃষ্ণে (সাঙ্গ) বলেন, তুমি তোমার (নামাকার) ঘরে অবস্থান করবে।

উত্তর বাক্যাঙ্কে নির্দেশের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। যা ওয়াজিব। বর্ণিত হাদিসে নবী

কৃষ্ণে (সাঙ্গ) ফারিয়াকে প্রথমে তার পরিবারে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

- ৩৭
অতঃপর তৎক্ষণাৎ স্বামীর গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেন। সুতরাং স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও ইহত পালন করা জায়েদ নয়।

জবাবঃ তাঁরা নবী করিম (সঃ)-এর হাঁ সূচক (দিয়েছিলেন পত্র দিয়ে দলীল পেশ করেন, এর জবাবে চার ইমাম বলে যে, তিনি (সঃ) প্রথমে তো হাঁ বলে অনুমতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরকারেই আম্কি নির্দেশ দিতে অংশ নেই, বরং প্রথমে হাঁ বলে অনুমতি দিয়ে পরবর্তীতে আম্কি নির্দেশ হলার দায়ের একাধারে প্রমাণ করে যে, পূর্বের হাঁ-সূচক উক্তি রহিত হয়ে গেছে।

* উল্লেখ যে, বিধবা মহিলার যেহেতু ইহত পালনকালীন অবস্থায় খোরাপ পাবে না, তাই জীবিকা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন দিনে এবং রাতের কিছু অংশ বাইরে বের হওয়া জায়েদ আছে। তবে অনর্থক যোগাযোগ ও নিষ্ঠা আনন্দের জন্য বের হওয়া জায়েদ নয়।

(নেম) ২১৩

বাবু মেনোয়াতে নাই রেজিআল ইলেই রোজেজা হাঁই তিন্নং কর্তৃক রোজেজা গুরুর সি২১৬

তালাকে বায়েন (তিন তালাক) প্রাপ্ত রমণী তত্ত্বক তার স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না; যতক্ষণ না দে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।

... নির্দেশ বলে যে, সেই গুরুর সুলতানের উলামার সমালোচনা করে নিজের স্বীকার করছেন।

ক্ষুদ্র তাত্ত্বিক ফলাফল যে দিন একে হাঁ বলে অনুমতি দিয়েছিলেন, যে তার প্রথমে তালাক প্রদান

অনুবাদঃ ... আওয়াখ (রাখ) হতে বর্তিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সঃ-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান

এরপর সে (মহিলা) অপর একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং

তার সাথে নির্জন বাসও করে। এরপর তার সাথে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক
প্রদান করে। এ মহিলা কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি (আয়িশা) বলেন, নবী করীম (সাহ) ইরশাদ করেন, ঐ মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য (পুনর্বার প্রহর করা) হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস সুখভোগ করে এবং সে ব্যক্তিও (দ্বিতীয় স্বামী) তার সাথে দৈহিক মিলনের সুখানুভব করে।

বিশ্লেষণঃ (1) প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস শর্ত কিনা- এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।
* হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়েব (রা)-এর মতে, তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ বা হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শর্ত, সহবাস শর্ত নয়।

দলীলঃ পরিশোধ কুরআনের আয়াতঃ

فِيَانَا طَلَقْنَاهَا فَلا تَحْجِلْنَاهَا مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكُحْ زَوَّاجًا غَيْرَهَا

অর্থাৎ, তারপর যদি সে ক্রীয়ে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে ক্রীয়ে যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে, তার জন্য হালাল নয়। (বাকারাঃ ২৩০)
উক্ত আয়াতে সহবাস (ওত্তম)-এর কোন উল্লেখ নেই। যদি সহবাসের শর্ত হত, তাহলে আয়াতে তা উল্লেখ থাকত।

* চার ইমামসহ জমহুর উমমেতের মতে, তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করা শর্ত। শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়।

দলীলঃ অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস।
উক্ত হাদিসে পুনর্বার হালাল হওয়ার জন্য তোভোন উদ্দেশ্য-কে শর্ত করা হয়েছে। আর তোভোন বলা হয় সমস্ত সুখ ভোগ করাকে। সুতরাং শুধু আকাদ যথেষ্ট নয়; বরং সহবাস করা শর্ত।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ

(1) আয়াতে যদিও সহবাসের কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু খবরিয়ে উদ্দেশ্য (সমস্ত সুখ হাদিসটি) মশহুর, সুতরাং এর দ্বারা শর্তহীন করা জানেন।
(2) অন্যদিকে, আয়াতে উল্লিখিত (বিবাহ করা) শব্দটি আসলে তোভোন (সহবাস করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সহবাসের শর্ত খোদ কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। কেননা, আয়াতের দ্বারা যদি শুধু দ্বিতীয় বিবাহই উদ্দেশ্য হত, তাহলে তো
(২) অথবা, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়িব (রাঃ) এর নিকট হযরত হসেন পোহেনি। এবং আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, পরবর্তীতে হযরত সাঈদ (রাঃ) জমহুরের অভিযোগের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অতএব, বিষয়টি নিয়ে কোন মতানৈক্যই নেই। (দৃষ্টির মাধ্যমে লেখা কাগজ ৩৩ সেপ্টেম্বর ২০১২)
রোয়া অধ্যায়

বাবু নস্ত কোলে তুলাই এরে লীলিয় যুটিয়োন দি নিউ দেই সুচীত চা ৩১৭

"যারা রোয়ার সামর্থ রাখে অথচ রোয়ার রাখে না তারা ফিদয়া দিবে" আলাহ তাআলার এ বাণী মানসূখ রহিত হওয়া

... মনে করে না যে যারা যুটিয়োন নিউ দি নিউ দিন বিপুল নিয়ম ও সূচন দি নিউ দিন বিপুল নিয়ম ও সূচন

তুলাই চারোন্তে, কান মন আর মন যে যুটীর বিপুল নিয়ম ও সূচন দি নিউ দিন বিপুল নিয়ম ও সূচন

বুদ্ধিমান ফুলসহন করা— (ধর্মিক ধর্মিক) ৩২১ বাবু শেখ দিন বিপুল নিয়ম ও সূচন দি নিউ বাবু নক

কোথা এ মানসূখ এ মানসূখ হওয়া পূর্বতন আযাতের হুকুম মানসূখ রহিত হয় যায়

চৌম বা রোয়ার অভিধানিক অর্থ শাল্কত দিক থেকে চৌম এবং চৌম উভয়টি বাবে প্রাথমিক মুক্তক তৃমাস হচ্ছে— এক মাস দার। এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে— এর মাস দার। এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে— (আলী মুজাহিদ) ৩২১ বাবু বাবু নক বাবু নক বাবু নক বাবু নক

আলী মুজাহিদ তৃমাস আলী মুজাহিদ তৃমাস আলী মুজাহিদ তৃমাস আলী মুজাহিদ

অর্থ বা কোন কাজ থেকে বিজ্ঞ থাকার নাম চৌম বা রোয়া। এজন্য সফর থেকে বিষ গোড়া আর বিজ্ঞ বলে থাকে এবং যে কথা বলা থেকে বিজ্ঞ

তাকে ও বিজ বলা হয়। (আলী মুজাহিদ) (নৈমাতা এর অর্থ হচ্ছে ২৫ পাওয়া যায়)।

পরিবর্ত, কুরআনে এ শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়—

তাকে বিজ বলা হয় এবং কোন মানসূখের সাথে কথা বলব না। (মারিয়াম ২৬)

আলী মুজাহিদ তৃমাস আলী মুজাহিদ তৃমাস আলী মুজাহিদ

অর্থ বা কোন কাজ থেকে বিজ্ঞ থাকার নাম চৌম বা রোয়া। এজন্য সফর 

* কেউ কেউ বলেন— শব্দটি সম্ময় স্বীকৃতি চাওয়া হয় এবং মানুষকে ত্রুটি করার জন্য একটি মাসকাহিনী। এর আবিষ্কারকে আরও হবে— কিন্তু কেউ বলে থাকে, নির্দিষ্ট থাকা, রোহা রাখা, উপবাস থাকা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, তথা রোহাকে রম্যান (রামায়ান) বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, মন্ত্রা যেমন রম্যান রম্যান তা হয়ে থাকে শব্দটি চাওয়া হতে নিঃসরণ করে।

আর বছর এই মাসের নামকরণ করা হয়, এই মাস অর্থ গরম হয়, ঐ বছর এই মাসটি অর্থ উল্লেখ হয় বিধায় এর নাম রম্যান (রামায়ান) রাখা হয়।

* আবার একমেয়েই বলেন, রম্যান এই মাসের অর্থ দশ হওয়া, পুড়ে যাওয়া, উত্তপ্ত হওয়া, জলে যাওয়া। সুতরাং রোহা রাখার কারণে সমাহার মানুষ যেহেতু জলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এজন্য একে রম্যান বলে।

* আবার কেউ কেউ বলেন, রম্যান আলাহ তাআলার সুমহান নামসমূহের একটি।

সুতরাং রোহা হল "শের রম্যান" অর্থাৎ আলাহর মাস।

(ফতেহ পারিব, ৪৬, উমা তাত জো থাত ২৬৫)

কিন্তু আল্লামায় শাকরীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল।

শের রম্যান যিনি আল্লাহর নামকরণ করেছেন (ফতেহ মেহম, ছ। ২৬২)

কিন্তু আল্লামায় মাসের অর্থ রম্যান হল সে মাস, যায় নামীল করা হয়, আল কুরআন।

(বাকারু) ১৮৫)

* কাশফাফ্যুকার লেখেন, রম্যানের অর্থ হল, প্রচণ্ড গরমে জ্বলা করা এবং কষ্ট বর্দাশ্ত করা। এই নামকরণের কারণ হল, এই মাসে রোহা রাখতে হয় এবং কষ্ট গরম বরদাশ্ত করতে হয়। যা ছিল একটি পুরানো ইবাদত।

(ফতেহ মেহম, ছ। ২৫৫)

সাহীমের পারিভাষিক সংজ্ঞাই

১. আল্লামায় জুরাহানী (রহ.) সাহীমের সংজ্ঞায় বলেন—

গ্রহের অস্বাভাবিক উল্লেখ অ্যাল এবং জুরাহানীর মাধ্যমে স্বাভাবিক উল্লেখ করেন।
অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে সূরহে সাদিক হতে মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও কী সহরাস থেকে দূরে থাকাকে সাওম বলা হয়।

২. আল্লামা আবুল হাসান সহ জমেহর উলামায়ে করাম বলেন-

الصّوْمُ إِمَّاسَكْ مَحْصُوتٌ فِي زَمَانٍ مَحْصُوتٍ عَنْ شَيْيٍ مَحْصُوتٍ بِشَرَائِطٍ مَحْصُوتَةٍ

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট স্থানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্য থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৩. অধিধানে বলা হয়েছে,-

هُوَ إِمَّاسَكُ عَنِ المُفْتَرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ

إِلَى غُرُوبِ السَّمَّسِ مَعَ اللَّيْلِ (الْمُعْجِمُ الوَسَّيِّمُ ص ٢٤٩)

অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে ফজর উদয় থেকে নিয়ে সূরীয় পর্যন্ত রোয়া ভজ্জকারী জিনিস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

৪. হিদায়া গ্রহকার বলেন-

الصّوْمُ إِمَّاسَكْ عَنِ الجِمْعٍ وَعَنِ إِذْخَالِ شَيْيٍ بَنِيَّةً لِهِ من الفَجْرِ إِلَى الغِرْوَبِ عَنِ النَّيْةٍ

অর্থাৎ, ফজর থেকে নিয়ে সূরীয় পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সহরাস ও উদয়ে কোন বস্তু প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকার নাম হল সাওম।

৫. অম্মাস্ক উন মফ্তরতাতি ধািমিন ও হিজ্জায় খুফি হীরাতি মাখোস্থি বারি মন আলাহ্মা

(اللباب ج ١ ال‌جوهرة رج ١٢٨)(ال‌ج ١٢٢)

অর্থাৎ, নিয়তের যোগা ব্যক্তির নিয়ত সহকারে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকৃত অথবা হুকুমী রোয়া ভজ্জকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা।

৬. অম্মাস্ক উন মফ্তরতা বিলামাকালে সে মাখোস্থি বারি খুফি ফজর স্তোত্রে বারি বিন উরব

(اللية على ماذاة ال‌اربعه ج ٥٤١)

রোয়া ফরয হওয়ার সময়কালং রমযানের রোয়া ফরয হয়েছিল হিজরতের দেড় বছর পর শাবান মাসের দশ তারিখে।

(البداية وال‌نهية ج ٢٤٩-٢٤٧) যোমন আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন-

فُرِضَ الصّوْمُ فِي السَّنَةِ الْثَّانِيَةِ قَضَامُ اللَّهِ تَسْعَ رَمَضَانَاتٍ (فَتْحُ البَاري ج ٨٧)

অর্থাৎ, রোয়া দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। রাসূল (ص) মোট নয়টি রমযানে রোয়া রেখেছেন।
* আল্লাহ্মা ইবন কাসীর প্রমুখ বলেন, দ্বিতীয় বছরে রোহার পূর্বে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। এই বছরেই সাদকারে ফিতর ও সদকার (যাকাতের) পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। (মুদাবির সোন জ ২১ স৪)

এখানে উল্লেখ যে, রময়ানের রোহা ফরম হওয়ার পূর্বে নবী করিম (সা)` ও সাহাবায়ে কিরাম আশরা (দশই মহররম) ও আযামের পীর (চাজমালের ১৩, ১৪ ও ১৫)-এর রোহা রাখতেন।

অতঃপর এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এই রোহা তখন ফরম ছিল কিনা।
* শাফেঈদের অভিমত হল, রময়ানের রোহার পূর্বে কোন রোহা ফরম ছিল না। বরং আশরা ইত্যাদির রোহা প্রথমেও সুন্নত ছিল এখনও সুন্নত।
* হানাফীরা বলেন যে, রময়ানের রোহার পূর্বে আশরা ইত্যাদির রোহা ফরম ছিল।

অতঃপর যখন নিম্নলিখিত আযাতটি অবিশুল্ক তথ্য তখন তা মানসূচ হয়ে যায়। আযাতটির উপর রোহা ফরম করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেয়ারী অর্জন করতে পার। (বাকারাঁ ১৮৩)

দলীল (২)ঃ আহ্মদ বেন মসলামান ব্যাপারে তাঁর চাহা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা (১৪) মুহাররম তারিখে) আসলাম গোরের লোকেরা নবী করিম (সা)`-এর বিদমভ উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এদিন (আশরার) রোহা রেখেছ? তারা বললেন, না। এতদশোল নবী করিম (সা)` বললেন, নবীরা অবশিষ্ট দিন আর কিছু না থেকে পূর্ণ কর। আর এটা কাবা করে নাও।

নবী দাউদ (রহ.) বলছেন, অর্থাৎ আশরার দিন।

উক্ত হাদিসে নবী করিম (সা)` আশরার রোহা কাবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বক্তুতঃ কাবা হয় ফরম অথবা ওয়াজেরের ক্ষেত্রে।

দলীল (২)ঃ তা�াদা মুহাম্মদ ইবন জাবাল (রা)` থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত আছে-
আহকামুল হাদীস

রোয়া অধ্যায়

... বলেন যে রসূল বলেন ল্যাইয়া চলার উপর তারা আর্যরোয়ার রোয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করেছে, তাই রোয়া হওয়ার পর আর্যরোয়ার ফরয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করেছে, তাই রোয়া হওয়ার পর আর্যরোয়ার ফরয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করেছে এবং আর্যরোয়ার রোয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করেছে।

রোয়া প্রকারভেদে ও স্বীকার ও ভুক্তমূলক রোয়া প্রাপ্তত ৬ প্রকারে।

(১) - ফরয়া রোয়া। রোয়া যার এক মাস রোয়া রোয়া ফরয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করে। এ রোয়া চলার উপর রোয়া ফরয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করে। আর্যরোয়া তামালা বলেন।

(২) - ওয়াজিব রোয়া। রোয়া যার মাস রোয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করে।

(৩) - সুসম সোনে। ফরয়া কিংবা ওয়াজিব রোয়া না, কিন্তু যে রোয়া নবি করীম (সাহ) হয়ে রোয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করে তার সমস্ত এ বিষয়কে রাখে। তবে না রোয়া না হওয়ার এ বিষয়কে রাখে। তবে না রোয়া না হওয়ার এ বিষয়কে রাখে। তবে না রোয়া না হওয়ার এ বিষয়কে রাখে।
আহকামুল হাদিস

রোয়া অধ্যায়

(4) স্তুনে নফল - নফল বা মুস্তাহাব রোয়া। ফরম, ওয়াজিব, সূমত বাদ সব রোয়া সম্পূর্ণ বা মুস্তাহাব। যেমন- নিষিদ্ধ ৫ দিন (দুইদের দিন এবং কুরবানী ঈদের পর আরো তিন দিন) ব্যতীত যে কোন দিন ঈদার নেকট লাভের উদ্দেশ্যে রোয়া রাখা।

(5) স্তুনে মকরোহ - মকরোহ রোয়া। যেমন- বা সন্দেহের দিনে রোয়া রাখা।

(6) স্তুনে হরাম - বা হারাম রোয়া। বছরে পাঁচ দিন রোয়া রাখা সম্পূর্নরূপে হারাম।

যেমন দুইদের দিন ও ঈদের মধ্যে তাশরিকের তিন দিন (কুরবানীর ঈদের পরের তিন দিন) রোয়া রাখা। যেমন হাদিসের বর্ণিত আছে:-

(7) যখন ঈদের বুধবার বা চতুর্থ তারিখ থেকে ঈদের পর পঞ্চম তারিখের মধ্যে ঈদ নিয়ে আন্দোলন হয়ে থাকে তাহলে ঈদের মধ্যে ঈদ নিয়ে আন্দোলন হয়ে থাকে তাহলে ঈদের মধ্যে ঈদ নিয়ে আন্দোলন হয়ে থাকে তাহলে ঈদের মধ্যে ঈদ নিয়ে আন্দোলন হয়ে থাকে।
বর্তমানেও কি সক্ষম ব্যক্তি রোয়া না রেখে ফিদয়া দিতে পারবে?

পরিব্রহ্মাকারের আয়াত-  

"যেন তোমরা বিশ্বাসী হওয়ার জন্য অতিরিক্ত দান করা হয় না, সে যে কৃত্রিম ফিদয়া নোহতে হয় না।"

বর্তমানে কি সক্ষম ব্যক্তি রোয়া না রেখে ফিদয়া দিতে পারবে?

পরিব্রহ্মাকারের আয়াত-  

"যেন তোমরা বিশ্বাসী হওয়ার জন্য অতিরিক্ত দান করা হয় না, সে যে কৃত্রিম ফিদয়া নোহতে হয় না।"
অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুর্রোগের রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক পরিপক্কারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের ক্ষেত্রে উপসংহার নির্দেশটি এখনো প্রয়োজা রয়েছে। সাহাবী ও তাবেঈগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই।

(মাদরফ তত্ত্বাবধান জ ১ সংখ্যা ৪৪)

* এ ব্যাপারে সুমাত্রা আন্বেষণ শাহ কাশ্মিরী (রহ) প্রথমে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ”রোগার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করা প্রকৃতপক্ষে ইহা রমণার রোয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়নি। বরং প্রাথমিক অবস্থায় যখন কৃত্যে ফিদয়ার উপর রোয়া ফরম করা হয়েছে) আযারত নামিল হয়, তখন উক্ত আযারত দ্বারা আওয়ার এবং তথা প্রতি দিক মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোয়ার রোয়া ফরম করা হয়েছিল। আর এ সকল রোয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ না করা না করা বলা হয়েছিল। সমষ্টি আযারতের দ্বারা ফিদয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন মুসল্মানের রোয়ার ফরম করে দেয়া হয়।”

(মাদরফ সত্ত্বা জ ৬ সংখ্যা ২০৬-২০৭)

* আর একদল উলামা বলেন, সুমাত্রা হাফসা (রাশি)-এর কিরামতে উল্লেখ রয়েছে, যদি উক্ত আযারত প্রাগৃহ করা হয়, তাহলে রহিতেরও প্রয়োজন হয় না, বরং আযারত মুমিন মানতে হবে। তখন উক্ত আযারতে যারা রোয়ার রাখতে একেবারেই অক্ষম কেবল তাদেরকেই ফিদয়া দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(রহব্ব মুমিনা জ ৫ সংখ্যা ১৯)

যেমন হাদিসে এসেছে-

"নবন ইবনে ইবন ইবনে ইবনে ইবনে নবন ইবনে ইবনে ইবনে ইবনে ইবনে মুসলিম কাফিন কাফিন মুসলিম ব্যাপার" এই বাক্যটি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলাহার বারিয়া (অর্থ) যারা সামর্থ্যবান তারা মিসকিনদের ফিদয়া প্রদান করবে। তিনি বলেন, এ আযারতী অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ লোকের জন্য ঐচিক ব্যবহ্যা স্বরূপ।

ফিদয়ার পরিমাণ ও অনুষ্ঠানের মাসআলাম একটি রোয়ার ফিদয়া অর্থ সাধ।

গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্থ সাধ।

(চাই)
সমান এক সেরা সাড়ে বার ছটাক। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান কর দিলেই একটি রোহার ফিদয়া আদায় হয়ে যাবে। ফিদয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কর্যরত কোন লোকের খিদমতের পরিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়ের নয়। (মুরাফ আল ফ্রান ৬:৪৪)

উল্লেখ্য যে, এক রোহার ফিদয়া দুই ব্যক্তিকে বন্ধ করে দেয়া অথবা কয়েক রোহার ফিদয়া একই ব্যক্তিকে একই তারিখে প্রদান করা জায়ের নয়। এবং যদি কোন ব্যক্তি ফিদয়া প্রদানের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে সে কেবল একেকার পড়বে এবং মনে মনে এ নিয়ত করবে যে, যখন সন্ত্ব হবে আদায় করে দিব।

(মুরাফ আল ফ্রান ৬:৪৫)

প্রাচীন আলোচনায় গর্ভবতী এবং দুঃখদায়িত্বার্থী সম্পর্কে সবাই একমত যে, তাদের জীবনের ব্যাপারে কোন প্রকার আশ্রয় হলে তাদের জন্য রোহা না রাখা জায়ের আছে। এমতাতর্কায় তারা পরবর্তীতে রোহার কায়া হিসেবে আদায় করে নেবে। নিজের জীবনের উপর আশ্রয়কারী রোহার ন্যায় তাদেরকে ফিদয়া দিতে হবে না। এটিকু পর্যন্ত একমত রয়েছে। যদি রোহা রাখার ফলে অন্যে মহিলা পেটের বাচ্চাকে প্রদান করায় এমতাতর্কায় তাদের জন্য রোহা না রাখা সর্বসম্মতিক্রমে জায়ের।

তবে তাদের মধ্যে মতানুক্রম হল-

* ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.-)এর মতে, এমতাতর্কায় তারা উভয়ে কায়া করবে এবং ফিদয়া দিবে। হযরত ইবন উমর (রা।) ও মুজাহিদ (রহ-) থেকে ইহাই বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (রহ.-)এরও এক রেওয়ায়ের তাই।

তবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়ের ও লাইছ (রহ.-)এর মায়াহব হল, অন্যতম মহিলা কায়া করবে, কিন্তু তার দায়িত্বে ফিদয়া নেই। তবে দুঃখদায়িত্বার্থীর দায়িত্বে কায়া এবং ফিদয়া উভয়ই আছে।

* ইমাম ইসহাক (রহ.-)এর মতে, তাদের দায়িত্বে ফিদয়া আছে কিন্তু কায়া নেই। হযরত ইবন উমর ও ইবন আক্বাস (রা।) এবং ইবন যুবাইর (রা।) থেকেও এটিই বর্ণিত আছে।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তার সার্থিদের মতে, এমতাতর্কায় তাদের দায়িত্বে শৃঙ্খলা আবশ্যক হবে। ইমাম আওয়াঈ, সুফিয়ান, আবু উবায়দা, আবু সাওর, নাকথা, যাহপাহ এবং সাহিদ ইবন যুবাইর (রহ.-)এর মায়াহব তাই।

(মুরাফ আল ফ্রান ৬:১০)
বাবু মন কালে ফান গম অতি কৃষ্ণ চ্যোত্তুর ত্রীত্র স্বরূপ স্বরূপ

যদি রমযাচের উনলুরবির তাছিয়া আকাশ মেষাত থাকে তবে তোমরা ব্রিশ রোথা পূর্ব করবে

... যুক্তি যোথ একুথ জান রসূল লোকে ইজ্জ ধানে ইসলাম লা তুমদ্দুয়া শের
বিত্তে যোথ উলায়েন একে জান যেন কৃষ্ণ চ্যোত্তুর হান্দক তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে 

(খারিজ জ ১ শত ২১ বাবু যুক্তি গলাতে আলিম চলাতে উলাম প্রধান লোক, মসলম ১ 

c-৩৪৭ বাবু বাবু চলাতে রসূল লোক, মসলম ১ 

চ ১ শত ৩০ বাবু যুক্তি গলাতে আলিম চলাতে উলাম প্রধান লোক, মসলম ১ 

বাবু কালে ফান গম অতি কৃষ্ণ চ্যোত্তুর ত্রীত্র স্বরূপ স্বরূপ

যদি রমযাচের উনলুরবির তাছিয়া আকাশ মেষাত থাকে তবে তোমরা ব্রিশ রোথা পূর্ব করবে

... যুক্তি যোথ একুথ জান রসূল লোকে ইজ্জ ধানে ইসলাম লা তুমদ্দুয়া শের
বিত্তে যোথ উলায়েন একে জান যেন কৃষ্ণ চ্যোত্তুর হান্দক তুম চ্যোত্তুর হতে তুম চ্যোত্তুর হতে 

c-৩৪৭ বাবু বাবু চলাতে রসূল লোক, মসলম ১ 

চ ১ শত ৩০ বাবু যুক্তি গলাতে আলিম চলাতে উলাম প্রধান লোক, মসলম ১ 

বাবু মন কালে ফান গম অতি কৃষ্ণ চ্যোত্তুর ত্রীত্র স্বরূপ স্বরূপ
অনুবাদঃ ইবন আকাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমযানের মাস আগমনের এক বা দু’দিন পূর্বে রোয়া রাখবে না, অবশ্য যদি কেউ এরপর রোয়া রাখায় অভাব থাকে, তবে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর রমযানের চাঁদ দেখার পূর্বে তোমরা রোয়া রাখবে না এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোয়া রাখবে। আর যদি এর মধ্যে মেয়াচ্ছেন তা থাকে, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে এবং পরে ইফতার করবে। আর চন্দ্রমাস উন্নিত্রিক দিনেও হয়।

চাঁদ দেখার হুকুম নতুন চাঁদ দেখা মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। কারণ চাঁদ দেখার উপর ইসলামের অনেক আহকাম নির্ধারিত। অনেকের মতে, চাঁদ দেখা ‘ওয়াজিবে কিফায়া’। অর্থাৎ সমাজের সবাই উপরই চাঁদ দেখার দায়িত্ব। যদি একজনও এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সবাই গোপালীগুলোর হবে।

চাঁদের অফিজ গণ্য হবে, নাকি দর্শন?

সকল উলামা ও ফুকাহা এ মাসআলায় একমত পোষণ করেন যে, চাঁদের দর্শন গণ্য হবে, এর অফিজ গণ্য হবে না। কেননা চাঁদের দর্শন অনুযায়ী রোয়া রাখার জন্য কুরআন ও হাদিসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আলাহ তাআলা বলেন—

فَنَّبِيُّ ٱنۡطَهَّ ٰٓ ٱلۡشَّهۡرُ ۖ ۛأَنَّهُ ۚ مُصِّصُصُ ۛأَنَّهُ

ওর্থাৎ, অতএব তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে রোয়া রাখবে। (বাকারাঃ ১৮৫)

এবং হাদিসে এসেছে,

(পূর্ব হাদিসটি অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে)

আপনি এক হাদিসে এসেছে,

ۡعَنِ ۡعَبَّدٌ ٱلۡلَّهِ ۖ يَنَعُّ ۡعُمَّرُ ۨۖاَنَّ ۚ رَسُوۡلَ ٱلۡلَّهِ ۖ صَلِٓى ٱلۡلَّهُ ۗ عَلَيۡهِ ۚ وَسۡلَمَ ۡذَکَرَ رَضۡمَانَ ۖ فَقَالَ لاً

(যখন আবু আস্যাজ ব্যাখ্যা করেন)

তোমরা নিয়মিত তোমরা বা চলাচল কর না, তোমারা পূর্বে রোয়া রাখবে না। আর চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ঈদের জন্য রোয়া ভেঙ্গে না এবং যদি তোমাদের নিকট চাঁদ গোপন থাকে তাহলে হিসাব করে নাও।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.):-এই হাদিসের ব্যাখ্যা বলেন, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে হাদিসে রূপিত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রসিদ্ধ। যার অর্থ হল, কোন জিনিসকে চোখে দেখা। এছাড়া অন্য কোন অর্থে যদি ব্যবহার করা হয়, তবে তা প্রকৃত অর্থ নয়, বরং রূপক অর্থ হবে। অতএব, ইরশাদে নববীর সারারিয়াস
হল এই যে, সমস্ত শরীর বিধি বিধান যেগুলো চাঁদ উঠা না উঠার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলোতে চাঁদ উঠার অর্থ হল, সাধারণ চোখে পরিদৃষ্টি হওয়া। এতে বুঝা গেল আহকামের নির্দেশগুলো দিগের চাঁদের অস্তিত্তের উপর নয়, বরং দেখার উপর। যদি দিগের চাঁদ বিদায় থাকে কিছু কোন কারণে দর্শন্যোগ্য না হয়, তাহলে শরীর আহকামে এই অস্তিত্ব ধর্মব্য হবে না।

হাদীসের এই অংশটিতে এই হাদীসের শেষ বাক্যটি আরো বেশি প্রচুর করে তুলেছে। যাতে ইরশাদ হয়েছে, যদি চাঁদ তোমাদের থেকে সপনা থাকে অর্থাৎ, তোমাদের চোখগুলো তা দেখতে না পায় তাহলে তোমাদের উপর এই দায়িত্ব চাপানো হয়নি যে, অর্কের হিসাবে লাগিয়ে চাঁদের অস্তিত্ব ও জন্ম জেনে নাও এবং এর উপর আমল কর। অথবা দূর্বীনের মাধ্যমে সূর্য রশ্মি থেকে অথবা উড়োটিরাজে উড়িয়ে যেতে মেঝের উপর যেতে চাঁদের অস্তিত্ব প্রতিক্ষা কর। বরং তিনি বলেছেন, “যদি তোমাদের কাছে চাঁদ সলন থাকে তবে ৩০ দিন পূর্ণ করে মাস শেষ মনে কর।”

এখানে শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যীয়। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ আরবী বাগ্ধারায় ক্রামুস ও শরহে ক্রামুস সূত্রে এই- 

গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; 

চাঁদ সূত্রে এই- 

গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; 

গম্ভীর উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে।

অর্থাৎ, গম্ভীর সত্ত্বে তখন বলা হয়, যখন নতুন চাঁদের উপর মেঝের অথবা অন্য কোন বন্ধ প্রতিবন্ধক হয়, আর চাঁদ দেখানো না যায়। তখন একে বলা হয় যে, তুমি বেল্লা না হয় তবে চাঁদ সূত্রে এই হকুম দিয়েছেন। কারণ, সলন হওয়ার জন্য মজুম থাকা আবশ্যক। যে জিনিস অস্তিত্ব নয়, সেটাকে বলা হয় অস্তিত্বীয়।

(রোহিত হাসার সং ১০/৩)

তিরমিশ্রতে বর্ণিত আছে- 

"... উন্ম আবারো আবারো আবারো আবারো আবারো আবারো আবারো আবারো আবারো আবারো... কারণ সময় অতিক্রম হয়েছে, এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; এখানে দুর্বীন উদ্দীপনায় তালাক প্রত্যাহার করে; 

অর্থাৎ, ... ইরব সূত্রে এই হতো বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করহাম (সাধনামাত্র) বলেন, ... যদি চাঁদের সামনে মেঝের অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হয় তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ কর।

যারা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া হয়, আর এটা তখনকার বিবরণ যখন চাঁদ দিয়েছে মজুম থাকে, কিন্তু কোন কারণে যদি দৃষ্টগোচর না হয়- এমন সময়ও বিশেষ দিন পূর্ণ করার হকুম দেয়া হয়েছে।

(দরস তমিদী জ। সং ১২)
অঙ্কের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু রায়হান আল-বেরুলী মীর গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, প্রথম তারিখের চাঁদ সম্পর্কে অকাট্য হিসাব করা সত্ত্বা নয়। কারণ হিসাবের পদ্ধতি যতই উন্নত হোক তা সত্তেও এগুলোতে ভূল-ভাঁজির সমস্যা সর্বাধিক বিদ্যমান।

(ইস্তান্বুল সংস্থা চুনী) 198

সুতরাং কোন অঞ্চলের আয়ত্ত ও হাসিদসমূহ দ্বারা একাধিক প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র দিন পত্রকা বা ক্যালেন্ডার হিসাব করে চাঁদ আকাশে হওয়া বা না হওয়ার ফয়সালা করে মাস প্রমাণিত হতে পারে না।

তবে অন্য অঞ্চলের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়।

... উন্নত প্রতিকৃত পাঁচ মাসের সেরা মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব।

... অন্য অঞ্চলের এক রাত পূর্বে চাঁদ দেখা যায়।

(মসাদে) 48 বা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব এলাকা পাঁচ মাসের উপরে কর্তৃত্ব।

... কুরআনের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমরের ফায়ার বিশ্ব আল-হারিস তাকে মুহাম্মদ বিন রাসুল শায় (সিরিয়া) দেশে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে তার প্রচুর পূর্ব করি। আমি সিরিয়া থাকাবহায় রামজানের চাঁদ উঠে এবং আমরা চাঁদের জন্য রাত্রিতে অবলম্বন করি। এরপর আমি রামজানের শেষের দিকে মদীনায় প্রবাহিত করি। ইন্ত আলাম (রাজ) আমাকে সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বিশেষ করে চাঁদ দেখা সম্পর্কে বলেন, তোমরা চাঁদের চাঁদ এবং পূর্ব করিন দেখেছিলেন? আমি বলি, আমি তা জুমুআর রাতে দেখেছি। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি নিজেও কি তা দেখেছিলে? আমি বলি, হু এবং লোকেরা দেখে এবং তারা রোখা রাখে, এমনকি মুহাম্মদ রাজিয়া রোখা রাখেন। তিনি বলেন, আমরা তা তা শুনিয়ে দেখেছি। কাজেই আমরা ত্রিশ দিন পূর্ব না হওয়া পর্যন্ত
রোযায় রাখব অথবা শাওয়ালের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযায় রেখে যাব। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুমিবিয়ার দর্শন ও রোযায় রাখা কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়? তুমি বললেন, না। আমাদেরকে রাস্তালুলাহ (সাহ) এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণঃ এই ইহুদির তথা চদরের উদয়সূচির যে ভিন্নতা রয়েছে এ ব্যাপারে কারণ কোন দ্বিতীয় নয়। দেশসমূহের দূরত্বের পার্থক্যের কারণেই এ ভিন্নতা ঘটে থাকে। যেমন কোন দেশে দেখা যায়, যে চাঁদ এক রাত উদয় হয়েছে অন্য দেশে পরের রাতে উদয় হয়েছে, এমনিভাবে একই চাঁদ এক জায়গায় উদয় হচ্ছে, অন্য দেশে অতুল্য যাচ্ছে। কোথাও রাত হচ্ছে, আবার কোথাও দিন হচ্ছে। অতএব, চদরের উদয়সূচির ভিন্নতার কারণে এক দেশের অধিবাসীর চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীর জন্য এটি ধর্ম হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতোন্নয় রয়েছে।

* ইমাম মালিক, শাফেকী ও আহমদ ইবন হাসান (রহ)-এর মতে, উদয়সূচির বিভিন্নতার কারণে এক দেশে চাঁদ দেখা অন্য দেশের অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক অঞ্চলের লোক নিজস্ব চাঁদ দেখার আলাদা হিসাব করবে।

দলীল (১) অনুমোদনের শুরুতে বর্ণিত হাদীস।

উক্ত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত আব্বাস (রাহ) কুরআনের থেকে বর্ণিত শাম্বাসীদের চাঁদ দেখা এবং মুমিবিয়া (রাহ)-এর রোযায় রাখার কথাটিকে গ্রহণ করেননি।

দলীল

(২) অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাহ) সূত্রে নবী করিম (সাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি রামজান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা চাঁদ না দেখে সাও পালন করো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতার করো না।

দলীল

(৩) অর্থাৎ, ... আবু হুরায়ার (রাহ) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সাহ) বললেন, তোমরা চাঁদ দেখে সাও পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার করবে।

উক্ত হাদীসের শুরু প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ দেখেই যেহেতু রোযায় রাখা বা ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলবাসীকেই পৃথকভাবে চাঁদ দেখতে হবে।
* ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, উদয়স্বল্পের বিভিন্নতা ধর্মত্ব

নয়। অতএব যদি কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা

নাও যায়, তাহলে অন্য অঞ্চলের লোক তদন্তয়ার্থ রময়া অথবা ঈদ পালন করতে

পারবে। তবে শর্ত হল, ঐ অঞ্চলে নতুন চাঁদ দেখার প্রমাণ শর্তী পদ্ধতিতে হতে

হবে। অর্থাৎ, দ্বারকারী যে কোন প্রাপ্ত চাঁদ দেখা গেলেই যথেষ্ট। এই ভিত্তিতে,

যদি পাপচাপোর লোকেরা চাঁদ দেখে তবে প্রাচ্যবাসীর উপর তা আবশ্যক হবে।

(ফাতুল মল্লুম ১৩ সং)

দলীল

... উন্ন আবু হানীফা করে রসোনা কর লেগে লেগে খোপ তাত্ত্বিক এসে লেগে নক্ষত্র নক্ষত্র দিন দিনে... (তারকী শাহ ১, সং ৩৫)

ফাতুল মল্লুম ১, ৩৫৭ সং, নসাই শাহ ১, সং ১)

(ইতিপূর্বে হাদিসটি উক্ত অনুসারে ইমামরা দ্বিতীয় দলীল হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।)

দলীল

... উন্ন আবু হানীফা করে রসোনা কর লেগে লেগে খোপ তাত্ত্বিক এসে লেগে নক্ষত্র নক্ষত্র দিন দিনে... (তারকী শাহ ১, সং ৫৫, মসলমান শাহ ১, সং ২৪৮, নসাই শাহ ১, সং ২০০)

(ইতিপূর্বে হাদিসটি উক্ত অনুসারে ইমামরা দ্বিতীয় দলীল হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে।)

দলীল

... উন্ন আবু হানীফা করে রসোনা কর লেগে লেগে খোপ তাত্ত্বিক এসে লেগে নক্ষত্র নক্ষত্র দিন দিনে... (তারকী শাহ ১, সং ৩৫, মসলমান শাহ ১, সং ২৪৮, নসাই শাহ ১, সং ২০০)

গুগুঁ- (আবদ ইয়াহাবী ১, সং ৩২, বাবে সুকিয়া এক দিন বিশাখায় রোগ্য হলে রময়া, নসাই শাহ ১, সং ২০০)

(কেভ শহীদ এলগেলে এক দিন দিনে স্বর্ণ মুরয়া, বিষয় মুরয়া, বিষয় মুরয়া সাহ মুরয়া ১২৪, নসাই শাহ ১, সং ২০০)

অর্থাৎ, ... ইবন আকাবা (রাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনের মোদুনাম

নবী করিম (সাহ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, আমি চাঁদ দেখেছি! ... নবী করিম

(সাহ) বিলালকে বলেন, তুই বিলাল! তুমি লোকেদের জানিয়ে দাও, যেন তারা

আগামী দিন রোগা রাখে।

অতএব, উপরের বিলালকে হাদিসমূহের সামান্য বা চাঁদ দেখা বিষয়টি শর্তহীনভাবে

(মুরয়া) বলা হয়েছে। অর্থাৎ হাদিসগুলো কেহ জানাহা থেকে চাঁদ দেখতে হবে

কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে লোকেদেরকে পৃথক পৃথকভাবে চাঁদ দেখতে হবে কিনা, এমন কোন শর্তেরূপ করা হয়নি। সুতরাং যে কোন জানাহা থেকে চাঁদ দেখা গেলেই

এর উপর আমল করতে হবে।
অবশ্য পরবর্তী আহনাফদের মধ্য থেকে হাফিজ যায়লাই (রহ.) [মৃত্যুঃ ৭৪৩ হিজরী]-এর ব্যাখ্যামূলক কিতাব “সোল্টিবুন হানাফাইক” গ্রহণের ১ম খুন ৩২১ পৃষ্ঠা লিখেন যে, দুরবর্তী দেশগুলোতে উদয়স্থলের পার্থক্য আমাদের (আহনাফদের) নিকটও গ্রহণোয়াগু। সুতরাং দুরবর্তী অঞ্চলগুলোর চাদ দেখা যেতে নয়। পরবর্তী আহনাফগণ ইহার উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। (বদলে মফালেল ২ সং ৪৭; রচিতে মন্ত ৮৬)

কিন্তু দুরবর্তী দেশ ও নিকটবর্তী দেশের পার্থক্য বুঝানোর মাপকাঠি কি? এ ব্যাপারে আল্লামা শিকর্ত আহমদ উসমানী (রহ.) লিখেন- যেসব অঞ্চল এতটুকু দূরবর্তী হয় যে, এর উদয়স্থলের পার্থক্য গণ্য না করলে দু’দিনের ব্যবধান হয়ে যাবে, সেসব উদয়স্থলের ব্যবধান গ্রহণোয়াগু হবে। অর্থাৎ তখন এক জায়গার চাদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা যদি এমন দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য গণ্য করা না হয়, তাহলে মস ২৮ অধ্যা ৩১ দিনে হয় যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা শরীয়তে অনুমোদিত নয়। (ফতুল্লাহ ৩ সং ১২)

যেমন, হরমত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসঃ-

آن رَسُولُ اللّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وسلم قالَ الشَّهْرُ تَسْعَ وَعَشَرُونَ فَلا تَصُومُوا

حتى تُخْرُوُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرْوَهُ (ابو داوয ১ সং ৩১ বাব শের বুক তসুয়া উসরন, مسلم ১ সং ৩৪৮)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; রোয়ার মস উনত্রিশ দিনেও হয়। কাজেই তোমরা চাদ না দেখে রোয়া রাখবে না এবং চাদ না দেখে রোয়া ভঙ্গ দেব।

وَلَا نَحْصِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَحَنَّسَ سِلَّمَانُ إِسْبَعَةً فِي الْثَّلَاثِ يَعْلَى

্যেসা করি উয়শ্যিয়ন নেশিয়ন- (ابো দাওয ১ সং ৩১ বাব শের বুক তসুয়া উসরন, ৬৫৪ পয) চু ২৫৬ বাব উলিম বুক লের হতে নক্সু ও নাসু মসলম ১ সং ৩৪৭)

অর্থাৎ, ... ইবন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; আমরা উচ্চ জাতির অন্তর্নিহিত। আমরা লিখেছে যায় না এবং মাসের হিসাব করতে পারি না। এরপর তিনি এরূপ, এরূপ ও এরূপ বলে (তিনবার) নিজের (দশ) অন্য প্রসারিত করেন। রাবী সুলায়মান তৃতীয়বারে তাঁর একটি আনুষ্ঠানিক করেন, অর্থাৎ রোয়ার মস উনত্রিশ ও ক্রিষ দিনে হয়(এর প্রতি ইশারা করেন)
সূত্রাং উপরোক্তিহিত হাদিসন্দর্ভে দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মাস ২৮ বা ৩১ দিনে হয় না।
* কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর ব্যবধানের মানদণ্ড কি হবে এর বিশদ বিবরণ ইসলামী আইনের প্রহরালীতে উল্লেখ নেই। তবে-
* কেউ কেউ বলেন, কোন অঞ্চলকে দূরবর্তী এবং কোনটিকে নিকটবর্তী বলা হবে,
** তা যা বা ঐ সময়ের প্রচলনের উপর নির্ভর করবে।
* কারো মতে, একজন শাসকের শাসনাধীন একটি দেশের যেকোন অঞ্চলে চাঁদ
  দেখা গেলে ঐ দেশের অধিবাসীদের সকলের উপর রোয়া ফরয় হবে।
* কেউ কেউ বলেন, এক মাসের দূরবর্তী অঞ্চল এবং এর চেয়ে কম
  দূরত্বকে নিকটবর্তী অঞ্চল বলা হবে। ইহা ঐ সময়ের হিসাব, যখন যাতায়াতের
  যানবাহন ছিল উট এবং যোড়া।
* বিশেষচর্চা কথা হল এই যে, চাঁদের মূল্য যদি এমন দূরত্ব হয় যে একই দিনে
  চাঁদ দেখা সত্ত্ব নয় অর্থাৎ তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা দূরবর্তী অঞ্চল,
  আর যদি তারিখ পরিবর্তন না হয়, তাহলে তা নিকটবর্তী অঞ্চল।
(দ্রুত মক্তাব ২ সং ১২৮) যেমন- সৌদী আরবে যে দিন চাঁদ দেখা যায়- বাংলাদেশে
  সেদিন চাঁদ দেখা আদৌ সত্ত্ব নয়; চাঁদের মূল্য তথা উদযাচলের দূরত্ব বেশি
  হওয়াতে বাংলাদেশে সেই চাঁদ এক দিন পরে দেখা যাবে। কাজেই সৌদী আরবের
  চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অধিবাসীদের রোয়া রাখা বা ভঙ্গ করা
  যাবে না।
* কতিপয় আলিম বলেন- আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে চাঁদের উদযাচল নির্ণীত হওয়ায়
  এ দূরত্ব নির্ভর করা সহজ হয়ে গেছে। ফলে পৃথিবীর যতটুকু অংশ জুড়ে একই
  সময়ে চাঁদ দেখা সত্ত্ব, এমন অংশের কোন স্থানে চাঁদ দেখা গেলে ঐ অংশের
  সকলের উপর রোয়া রাখা বা ভঙ্গ করা আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে দূরত্বের পরিমাণ
  যাই হোক।
* আল্লামা উসমানী (রহ.) দূরত্বের মাপকাঠি নির্ভর করতে গিয়ে বলেন, যেসব শহর
  এতটুকু দূরবর্তী যে, এগুলোর উদযাচলের বিভিন্নতা ধর্তর না আবলে দুঃখির
  পার্থক্য হয়ে যায় সেখানে উদযাচলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হয়ে। (ফটুল মক্তাব ৩ সং ১২৪)
  জবাবে উল্লিখিত তিন ইমাম কুরায়েব-এর বর্ণিত হাদিসে হযরত ইবন আব্বাস
  (রাঃ)-এর ফায়সালার উপর ভিত্তি করে বলেন- প্রত্যেক অঞ্চল ও দেশবাসীকেই
  চাঁদ দেখতে হবে, এর জবাবে আহমাফরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বলেন যে-
(১) হযরত ইবন আকবাস (রাঃ) শাম এবং মদিনাকে প্রায় দূর দূর দেশের মধ্যে গণ্য করেছেন। এজন্যই তার (কুরায়েব) কথাটিকে গ্রহণ করেছিলেন। আর অঞ্চল নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়া একটি ইতিহাসবাদী বিষয়। আহমদাবাদ একথা বলেন যে, দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক চাঁদ দেখতে হবে। সুতরাং কোন মতান্তর নেই।

(فتح اللهم ج ۳ ص ۱۳۱)

(২) অথবা, খবরদাতা শুধু একা কুরায়েব ছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সাক্ষীর সংখ্যা (তথা কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী হওয়া) পূরা হচ্ছে না। আর এ কারণেই ইবন আকবাস (রাঃ) তাঁর একথা গ্রহণ করেছিলেন।

المعارج البلدي ج ۳ ص ۲۱)

বিশিষ্ট ও উচ্চতান্ত্রী দলীলের জবাবে: যদিও হাদিসের বলা হয়েছে যে, চাঁদ দেখে রোয়া রাখ এবং ভঙ্গ কর; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশবাসীকে চাঁদ দেখতে হবে। যদি একথানা মনে নেয়া হয়, তাহলে তো একথার মানতে হবে যে, কেবল এই ব্যক্তিই রোয়া রাখতে বা ভাঙতে পারবে, যে কেবল নিজ চোখেই চাঁদ দেখবে। অন্যার চাঁদ দেখা তার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এমনটি কথনো সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, রোয়া রাখা বা ঈদ পালনার্থের রোয়া ভাঙ্গার জন্য প্রত্যেক অঞ্চল বা দেশবাসীকে চাঁদ দেখা জরুরী নয়; বরং যে অঞ্চল বা দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান একেকেরই নগণ্য রয়েছে (যেমন, এক দুই ঘণ্টা) এক্ষেত্রে একে দূর অঞ্চল একে অপরের চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে রোয়া রাখতে বা ভাঙতে পারবে। আর যদি ব্যবধান বেশি হয়, তাহলে পারবে না। মোট কথা, দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক হানাফীদের অভিমত হল, এমতাবস্থায় উদয়নকের বিভিন্নতা ধর্তব্য।

উল্লেখ যে, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, আমার ধারণা ইমাম আবু হানাফা এবং অন্যান্য ইমাম যাঁরা উদয়নকের বিভিন্নতা ধর্তব্য সাবান্ত করেন না, তার আরেকটি কারণ এটিও ছিল যে, যেসব অঞ্চলে মামলি-মামলিতের (পূর্ব-পশ্চিমের) ব্যবধান আছে, সেখানে এক জায়গার সাক্ষাৎ অপর জায়গায় পৌঁছা তাদের জন্য শুধু একটি কাল্পনিক ও মনে নেয়ার বিষয় ছিল। শুধু কল্পনা ছাড়া এর অতিরিক্ত কোন মর্যাদা ছিল না। এরপর মনে নেয়া কাল্পনিক বিষয় দ্বারা বিভিন্নতার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। আর নগণ্যকে অনিহিতের পর্যায়ভুক্ত সাবান্ত করা ফুকাহায়ে ফিরানের মাঝে প্রসিদ্ধ। এজন্য উদয়নকের বিভিন্নতা ব্যাপক আকারে ধর্তব্য নয় বলেছেন।

কিন্তু বর্তমানে উডোজাহাজ, টেলিফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রত্যুষ্টি যোগাযোগ মাধ্যম গোটা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমকে এক করে ফেলেছে। এক জায়গার সাক্ষাৎ অপর
বাব করাহিয়া সুম যোম আল শ্রুক ৪১৯
সন্দেহজনক দিবসে রোয়া রাখা মাকরহ

... উন সিলেট কাদা এক্ট উমার ফি তৈমুর যিনি মুহান ফি তাতী প্রতি প্রতি নতুন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন তখন 

২৫১ বাবু করাহিয়া সুম যোম আল শ্রুক নাম এক নাম সন্দেহজনক দিবসে আবার (রা)-এর নিকট ছিল। এখন একটি ভুতা বক্তৃতা পেশ করা হল এখানকার কিছু লোক (রোয়া খারাক কারণ) তা খাওয়া হতে বিরত থাকে। আবার (রা)- জিজ্ঞাসা করেন, আজ (এ সন্দেহজনক দিবস) যে রোয়া রেখেছে, সে তো আবুল কাসিম নবী করীম (সা)-এর নাকফরমানি করেছে।

বিশেষণ - 'যোম আল শ্রুক'-এর পরিচয় এবং এ দিনে রোয়া রাখার বিধান

অভিধানিক অর্থঃ 'যোম আল শ্রুক' শব্দের অর্থ দিন এবং 'রোয়া' শব্দের অর্থ সন্দেহ-সংশয়।

অতএব, 'যোম আল শ্রুক'-এর অর্থ হল “সন্দেহ দিন”

পারিভাষিক অর্থঃ ফিকহ শাক্তের পরিভাষায়-

যোম আল শ্রুক হো আর হো মুহান আহ্মেল হো কোন আহ মুহান হো কোন আহ মুহান হো কোন আহ মুহান হো কোন আহ মুহান হো কোন আহ মুহান হো কোন আহ মুহান হো কোন 

লুলাল হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো 

যোম আল শ্রুক হো হো হো হো হো হো হো হো হো হো 

(পাতাতে উল্লেখ, প্রদত্ত করেন আল লালামের এবং রবীন্দ্রনাথ টেঙ্গের সহায়তা)
অর্থাৎ, আকাশ মেঘাঙ্গন থাকার কারণে শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত রাস্তাগুলি দেখানা গেলে পরের দিনকে যোদ্ধা না থাকে অথবা সন্ধির দিন বলা হয়। কেননা, আরো অপর মধ্যে এ সংযোগ রয়েছে যে, ইহা কি শাবানের শেষ তারিখ, নাকি রমজানের প্রথম তারিখ?

যোদ্ধা না থাকে অথবা যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে 

* যোদ্ধা না থাকে অথবা যোদ্ধার শেষ তারিখের মধ্যে আরো অপর মধ্যে 

* কেউ কেউ বলেন, সন্ধির দিনে রোযা বারো ইমাম তথা রক্তশ্রমের রাখার উপর নির্ভর করবে।

* কেউ কেউ বলেন, রমজানের নিয়ে এ দিন রোযা রাখা যাবে।

* ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, রমজানের নিয়ে রোযা রাখার জায়গায় নয়। ইহা ব্যতীত সবই জায়গায় আছে।

* ইমাম শাফেঈ (রহ) বলেন, এ দিনে ফরম কিংবা নফল কোন রোযাই জায়গায় নয়।

(দৃশ্য মিশ্রণী ২৫)

দুইঃ অনুচ্ছেদের সম্পর্কে বর্ণিত হয় তারা আমার ইবন ইয়াসারের (রা) হাদিস।

উত্তর হাদিসের মালক মালক (মালকা) তারা রোযা রাখার নির্দেশ করে না এর নাম অনাত রাখায় বলা হয়েছে।

* এইদিনে কেউ যদি এই মনে করে রোযা রাখে যে, হতে পারে এটা রমজানের দিন, আমরা হতে চাও দেখি। তবে এই নিয়ে রোযা রাখা সমস্ত ইমামগণের অনুরূপ বহু তাহীরীম।

(দৃশ্য মিশ্রণী ২৫)

* ইমাম আবু হানিফা (রহ) এ দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১) এ দিনে রমজানের রোযার নিয়ে রোযা রাখা মাকরুহ।

(২) রমজানের বাতীত অনু কোন ফরম বা ওয়াজিবের নিয়ে রোযা রাখা (যেমন রমজানের কায়া, মালক অথবা কাফারার রোযা) এটাও মাকরুহ। তবে এটা মাকরুহ তান্বিহী।
(৩) কেউ একুট নিয়ত করলে যে, যদি আগামীকাল রম্যান হয় তবে তা রম্যানের রোয়া, আর যদি রম্যান না হয় তাহলে রোয়া রাখবে না। এমতভাবে তার রোয়া হবে না। কেননা, কে বিনা দোদুল্যমান অবস্থায় তার প্রহরোপাগণ নয়।

(উমীরা গায়ত্রী ঘোষ ২০০২ সংখ্যা ১৮)

* আর একটি অভিযুক্ত হল- যদি কেউ কোন বিশেষ দিনে নফল রোয়া রাখায় অভ্যস্ত হয় আর সে দিনটি ঘটনাচক্রে সংশয়ের দিন হয় তবে তার জন্য নফলের নিয়তে রোয়া রাখা সর্বসম্মতক্রমে জারেখ।

দলীলঃ

... হঠাৎ আবু হুরায়ার (রাশ) হতে বর্ষণ। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) ইবনাদ করেছেন, তোমরা রম্যান আগমনের পূর্বে তার রোয়াকে একদিন বা দু’দিন এগিয়ে নিও না। অবশ্য যদি কেউ ঐ দিন (শাবানের শেষ তারিখে) রোয়া রাখতে অভ্যস্ত থাকে তবে সে যেন ঐ রোয়া রাখে।

আর যদি অভ্যাস ছাড়া কোন ব্যক্তি এই সদেহের দিনে নফলের নিয়তে রোয়া রাখতে চায় তবে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে এটি সাধারণতঃ নাজায়ে।

হানাফীদের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য নাজায়ে, কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য জায়িয়।

তিন ইমামের দলীলঃ উপরালীখিত হাদিসে অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া নিঃশর্ত তারে নিষেধ করা হয়েছে।

হানাফীদের দলীলঃ এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, রম্যানের সদেহ। এ কারণেই যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই কোন বিশেষ দিনে রোয়া রাখায় অভ্যস্ত আর সে দিনটি সদেহের দিনে এসে যায়, তার জন্য আলোচা অনুন্নত হাদিসে রোয়া রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ, সেখানে রম্যানের সদেহের কোন সম্ভাবনা নেই। এর উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও কিয়াস করা হবে। যারা স্বীয় ইসলাম ও ফিকহের ভিত্তিতে সদেহ সংশয় ও ওয়াসওয়াসায় পড়বেন না। বরং খালেদ নিয়তে রোয়া রাখবেন। অবশ্য সাধারণ
বাবি শীতা রাজীন উপর রূপী হলাল শোলাল চাঁদ দর্শনে দুঃখিত সাক্ষ্যদান

... অ্যান হুসেইন বন হারামের জীবনে জীবনে ফিলিস আসাম মকুত হখেই থেকে মুহারিম মহান পুলী যেখানে ফাতাহ একদিন রসূল সুলতান আলী তার কাছে আলাদা মহান কার্যকর হতে বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমারা যেন শাওয়ালের চাঁদ দেখাকে ইবাদত হিসেবে শুরু দেই। আর আমরা সৌন্দর্য যদি তা না দেখি তবে দুর্জন নয়াপরায়ণ লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রদান করলে তখন আমরা যেন তাদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করি।

বিশ্লেষণঃ একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য রোয়া রাখা বা রোয়া ভাঙ্গা যাবে কিনা, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে:

* ইমাম মালিক ও ইসহাক (রহ)-এর মতে, একজন নয়াপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রোয়া রাখা এবং ভঙ্গ করা যাবে না। বরং দুর্জন বিশ্বসী পুরুষের চাঁদ দেখা শর্ত।

কেননা, নবী করিম (সা) ইরশাদ ফরমান—

* মোহাজ শাফেকী, আহমদ ইবন হামল ও ইবন মুবারক (রহ) প্রমুখ আলীসির মতে, চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন নয়াপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। রমজানের চাঁদ হোক অথবা শাওয়ালের চাঁদ হোক। সমস্ত মেঘাছায়া থাকুক কিংবা পরিকাল থাকুক।
দলীলঃ ... উনি বোধ করেন যে বুদ্ধি হলতে রাস্তা নাটকে ফাঁদা দিয়ে দেখাতে কান লাগাও না ও তা দেখাতে না লাগাও। 

স্বাদু ফাঁদা গলের মত ফাঁদা এমন করে আনুষ্ঠানিক রেখাও নাটকে ফাঁদা দিয়ে দেখাতে কান লাগাও না ও তাকে দেখাতে না লাগাও। তাকে আল্লাহ নিজের কার্যকারী হিসেবে দেখাতে না লাগাও।

তারা তারাবীর নামার আদায় না করার এবং পরদিনের ডানার না রাখার ইচ্ছা করেন। একটি ভাব করেন যে, তাকে একটি চাই করেন না ও তাকে দেখাতে না লাগাও।

* ইমাম আবু হানিফা (র.হ.)-এর মতে, দিদি আকাশ পরিক্রমার না হয় অর্থাৎ কোন মেয়ে ধূলোবালি অথবা ধূম ধূম থাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁদ দেখা যেখানে হবে।

কিন্তু আকাশ যদি পরিক্রমা হয়, তাহলে একটি বড় দলের সাক্ষাৎ আবশ্যক হবে।

কষ্টের, শাওয়াল বা ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আকাশ যদি মেয়াদান্ত্র হয়, তাহলে দুইজন বিশ্বস্ত পুরুষ কিংবা একজন বিশ্বস্ত পুরুষ ও দুইজন বিশ্বস্ত মহিলা সাক্ষাৎ প্রদান জরুরী। তবে শরীর হল সাক্ষীর শুলালীর তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে।

আর আকাশ যদি পরিক্রমা থাকে তাহলে এমন একটি বড় দলের সাক্ষাৎ আবশ্যক, যা অধিকের কারণে এটা যুক্তি প্রতিবেদন বিষয়ে বিষয়ক করা যায় না যে, এই বিষয়ে দলটি মিথ্যা বলতে পারে।

(দৃশ সময় ১৯৫ সং)

উল্লেখ যে, এই দলের সংখ্যা সম্পর্কে ফুকাহারে করিমের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ ৫০ জনের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হল, কোন নিদিঘ সংখ্যা শরীরভাবে নির্ধারিত নয়। যতভাবে সংখ্যা দ্বারা ইয়াকীন হয়ে যাবে যে সংসার মিলে মিথ্যা বলতে পারে না সে সংখ্যাই যথেষ্ট ৫০ জন হোক বা এর চেয়ে কম হোক।

(দৃশ সময় ১২৬ সং)
ইমাম আবু হাফিজ দলীলেঃ

দলীল

... উন্নত বা বিশেষ নয় রজুবে বা প্রয়োজন থাকে, তবে যদি একটি শাস্ত্রীয় উল্লেখ আছে তাহলে দরকার।

(1) উল্লেখ করা গাথা নির্দেশ করে যে, বায়ুক্তিক রূপে মসন্দ হলেন আল্লাহ।

(2) উল্লেখ করা গাথা নির্দেশ করে যে, মানুষের স্বভাব করা সক্ষম এবং তার সাধারণ দৃষ্টিকোণে বায়ুক্তিক রূপে মসন্দ হলেন আল্লাহ।

(3) উল্লেখ করা গাথা নির্দেশ করে যে, মানুষের স্বভাব করা সক্ষম এবং তার সাধারণ দৃষ্টিকোণে বায়ুক্তিক রূপে মসন্দ হলেন আল্লাহ।

(4) উল্লেখ করা গাথা নির্দেশ করে যে, মানুষের স্বভাব করা সক্ষম এবং তার সাধারণ দৃষ্টিকোণে বায়ুক্তিক রূপে মসন্দ হলেন আল্লাহ।

(5) উল্লেখ করা গাথা নির্দেশ করে যে, মানুষের স্বভাব করা সক্ষম এবং তার সাধারণ দৃষ্টিকোণে বায়ুক্তিক রূপে মসন্দ হলেন আল্লাহ।
বাবুর রঞ্জল সেমন্ত লোকালোক, এলানে উল্লাসে যেদিন চল
(সাহরীর) খাবার গ্রহণ অবস্থায় আযান শুনতে পেলে

... উন্ন ভীম হোরিং কাল কাল মসুর ঈশ্বর উইলাই হল্লু চলি যেলা অর ভুম এই সেমন্ত অন্ধকার
লোকালোক এলানে উল্লাসে যেদিন চলি ফাল প্যাক হাতে হাতে প্যাক হাতে হাতে প্যাক
দলীল (১): আল্লাহ তাআলার বাণী—

ক্লো ও আশ্রয় হতে যতেক তোমরা আল্লাহ নিয়ন্ত্রকের অধীনে তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শীত রেখা পরিক্রমার দেখা যায়। (বাকারাণ ১৮৭)

উপরোক্ত আয়াতে আহার ও পান করার শেষ সীমা (ফজর উদয়) পর্যন্ত সাবান করা হয়েছে।

তাছাড়া উপরোক্ত হাদিসের দ্বারা উদেশ্য এই যে, ফজর উদয় হওয়া মূলতঃ ইয়াকীনের উপর নির্ভর করে। মুআয়িনের আযানের উপর নির্ভর করে না। কেননা তার ভাষ্ট্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং মুআয়িন যদি আযান দিয়ে দেয়, কিন্তু নিজের কাছে যদি ফজর উদয় হয়নি বলে দৃঢ়ভাবে মনে হয়, তাহলে পানাহার বন্ধ করে না।

ইবনুল মালিক এবং আল্লামা খাতাবী বলেন, উক্ত আযানের দ্বারা ফজরের আযান উদেশ্য নয়, বরং তাহাজুদের আযান উদেশ্য। যেমন অন্য হাদিসে এসেছে—

* বিশেষঃ উপরোক্ত হাদিসের বাহিক অধীনের উপর ভিত্তি করে আবুল আলাম মোদুদীসহ কেউ কেউ বলেন যে, ফজর আবির্ভাবের (ট্যাব ফজর) পরে তথা সুবে সাদিকের পর্যন্ত খাওয়া-পান করা জায়েদ আছে।

* চার ইমামসহ জমকের উদ্দেশ্যের মতে, ট্যাব ফজর বা ফজর আবির্ভাবের পরে পানাহার করা জায়েদ। ইচ্ছাযুক্ত খাওয়ার দ্বারা কায়া এবং কাফফরা উভয়টিই অত্যাবশ্যক হবে।

মুসলিম বৈজ্ঞানিক বিভাগের অধীনে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে দুর্ধর্ম্মার পর পানাহার করা আইনে স্বাভাবিক নয়।
 waivers RV 75

 waivers RV 75

 waivers RV 75

 waivers RV 75
আহকামুল হাদিস  ৬০৮
রোয়া অধ্যায়
আপনি তো ক্রমাগত রোয়া রেখে থাকেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের মত নয়। তোমাদের মত নই, আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে।
সাওমে বিসাল এর পরিচয়ঃ কেশর শত্রুর অর্থ রোয়া, আর সুচনা শব্দটি ফেল-এর ওয়ানে বাবে মাফুল-এর মাসমার। এর অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ তথা মিলিত হওয়া ও একাধারে কোন কাজ করা, তথাঃ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে দুটি বস্তু পারস্পরিক ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা, মিলন, মেলামেশা, সংসর্গ, সংযোগ, যোগাযোগ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সাওমে বিসালের শাস্তি অর্থ হল- নিরবচ্ছিন্নভাবে রোয়া রাখা।
পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ
১। এ গ্রাহে বলা হয়েছে-

হু তনাইন চিত্বার ফিত যোমানি ও অক্টর মন ভুত এফুটা পালিলে- (বাল্য মুহম্মদ জ ১২ স. ১১)
অর্থাৎ, দুই বা তত্ত্বাধিক দিন মাঝখানে রাতে পানাহার না করে একাধারে রোয়া রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

২। মীরকাত গ্রহেকার বলেন-

হু তনাইন চিত্বার মন ভুত এফুট পালিলে- (বাল্য মুহম্মদ জ ১২ স. ১১)
অর্থাৎ, রাতে পানাহার না করে লাগাতার রোয়া রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।

৩। আল্লামায় আইনী বলেন-

মন চিত্বার যোমানি ও অক্টর মন ভুত এফুট লিলেহাম ফুহু মুওয়াসি (মুহাম্মদ চৈরি জ ২০ স. ১৬)
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুই অথবা তত্ত্বাধিক দিন রোয়া রাখে, রাতে ইফতার করে না, সে সাওমে বিসাল পালনকারী।

৪। এ পাদটীকায় বলা হয়েছে-

ওয়াল চিত্বার মোতাবেক বিধান বা দুঃখ ফেন ফিরত নো সৌহোর- (ফেহে ওয়াহে জ ১০ স. ৩৭৫, মুবারফ)
অর্থাৎ, ইফতার অথবা সহৰী না খেয়ে এক রোয়ার সাথে আরেক রোয়া মিলানোকে সাওমে বিসাল বলে।

৫। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) বলেন-

হু সৌহোর যোমানি না ফেন নো সৌহোর- (ফেহে ওয়াহে জ ১০ স. ৩৭৫, মুবারফ)
অর্থাৎ, মাঝখানে কিছু না খেয়ে লাগাতার দুই দিন রোয়া রাখাকে সাওমে বিসাল বলা হয়।
* রোহা পালনের ক্ষেত্রে (লাগাতার) করা জায়েত কিনা, এ ব্যাপারে উলামারে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, সাওমে বিসাল না রাখাই উত্তম।

তবে কেউ যদি রাখে, তাহলে তা জায়েত। (drs মশকুম ২:১৯৯)

... উন্নাশিত কাল্ত নেহী রসূল ললির সচ্ছি লাহু উল্লাহ উর্লাহ উল্লাহ উল্লাহ রহমা,

লুড়া ভাগ (খাৰিজ ১:২৩৩)

অর্থাৎ, হয়ত আঁশান (রাণ) বলেন, নবি করিম (সাৰ) তাদেরকে করণাশ্রূপ রোহা বিসাল করতে নিষেধ করেছেন।

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই নিষেধ স্বীকার করা হয়েছে, আবশ্যক ছিলেন নয়। সুতরাং রোহা রাখা জায়েত। (drs মশকুম ২:১৯৯)

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দুটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি

মাতৃনায়িক সাওমে বিসাল হারাম। মালিকীদের মধ্যে হতে ইবন আরাবী এবং আহলে

বাহিরও এরই প্রবক্তা। অপর মাতৃনায়িক সাওমে বিসাল মাকরহ। (drs তুরন্দি ২:১৭৭)

দলীল: অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। নবি করিম (সাৰ) উক্ত হাদিসে

নীতাী (নিষেধসূচক) ছিয়াহ (শশ্নক) দ্বারা সাওমে বিসাল নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(তোমরা ক্রমাগত রাখে না রোহা রাখবে না।) আর নাহির (নীহি)

উক্ততম সীমা হচ্ছে হারাম হওয়া এবং নিম্নতম সীমা হচ্ছে মাকরহ হওয়া।

* ইবন খুয়াইমা ও ইবনুল মুনফির (রহ.) শেষ রাখ পর্যন্ত জায়েত বলেছেন।

... উন্বী সুহইদ হজ্জি আহন সুম রসূল ললির সচ্ছি লাহু উল্লাহ উর্লাহ উল্লাহ উল্লাহ রহমা,

রদ্দাীলো ফ্লীকো আর আন পোলান ফ্লীকোলাল হতি হয়ের হচ্ছি (এবো দৌড়ি ২:৩২৬ বাবি),

যেহেতু উক্ততম সীমা হচ্ছে হারাম হওয়া এবং নিম্নতম সীমা হচ্ছে মাকরহ হওয়া।

অর্থাৎ, ... আবু সাইদ আল-খুয়ারি (রাণ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ

(সাৰ)-কে বলতে হয়েছেন, তোমরা ক্রমাগত না থেকে রোহা রাখবে না। অবশ্য

তোমাদের কেউ যদি ক্রমাগত রোহা রাখতে চায়, সে যেন সাহীর পর্যন্ত এরূপ করে।

* কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সাওমে বিসালের ক্ষমতা রাখে তার জন্য এটা জায়েত।

নামুনা হারাম। ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ এবং মালিকীদের মধ্য থেকে ইমাম ওয়াস্তাহ

(রহ.)-এরই প্রবক্তা। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকেও এ মায়হফর্ত বর্ণিত আছে।

(আলুমেদা জ ১১:২১ চ ৩৭-৩২, ফ্লাই এলাহান ৪:১৭৭-১৭৮, আহলে কুরান ৩:১৭১-১৭২)
* ইমাম আবু হানিফা ও জমহুর উলামা বলেন, সাওমে বিসাল জায়েছ নয়, বরং মাকরােহ। কারণ এটা শুধুমাত্র রাসূল (সাহ)-এর জন্য খাস হতে পারে, অন্য কারণ জন্য নয়। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতেও উল্লেখ আছে যে, সাওমে বিসাল মাকরােহ।

(ফতওয়াই উলামকিরি ১ ৫০১, বদাল চট্টনাং জ ২৬ স)

দলীল (১) ইবন উমর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদিস−

آن رَسُولِ اللّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ...  
(পূর্ণ হাদিসটি অনুচ্ছেদের গুরুত্ব বর্তিত হয়েছে।) উক্ত হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় সাওমে বিসাল নিষেধ করা হয়েছে। আর এর নহে নেই দ্বারা মাকরােহ প্রমাণিত হয়। (দ্রস মঠোরা ১ ৫১ স)

দলীল (২) উন্নত বয়সে প্রায় তার গলা চালান নি। ম্যাকেল আল্লাহ তাআলার বান-  
এই জায়গায় যেন হেমা ছড়ান দেহাত তিনি ম্যাকেল ফের সালাম− (এক্স ডাউন জ ১ ৫১ স বাবা ফত আল সালাম)

অর্থাৎ, ... আসিম ইবন উমর (রাঃ) তার যে পিঠ হতে বর্ণিত করেছেন। তিনি বলেন, নবী করিম (সাহ) ইসরাশ করেছেন, যখন পূর্বকালে অলকার ঘনিয়ে আসে এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে অন্ধিত হয়, তখন যে রোয়ারদার ইফতার করে।

উক্ত হাদিসে রোয়ারদারের ইফতারের সময় যিনি স্বাদে রাতে করে সন্ধ্যা (সন্ধ্যা) নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। আর সাওমে বিসালের অবশ্য রাতেও রোয়া রাখতে হবে। যা হাদিসের বিপরীত আমল।

দলীল (৩) আল্লাহ তাআলার বান-  
লার যেন ফের হেমা নিয়ে না বসমুনোর এ常州 মার । (বাকারাঃ ২৮ জ)

জবাব হয়ত ইমাম আহমদ (রহ.) দলীল হিসেবে হযরত আহিশা (রাঃ)-এর যে হাদিস পেশ করেছেন, এর উপরে আহনাফগণ বলেন যে, উক্ত হাদিস আমাদের বিপরীত নয়, বরং আমাদের সমর্থক। কেননা, নবী (সাহ) উম্মতের রহমত ও ক্ষমার জন্য তা নিষেধ করেছেন।

* শাকেদি (রহ.) হাদিস দ্বারা সাওমে বিসালকে যে হারাম সাব্যস্ত করত চাচছেন এর জন্য যে হানাফীগণ বলেন−

“আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাহ) সাওমে বিসাল নিষেধ করেছেন। ... অতঃপর তারা যখন সাওমে বিসাল থেকে ক্ষত হল না, তখন তাদের যা তাদের তিন একদিন সাওমে বিসাল করলেন। পরের দিন আবার বিসাল করলেন। অতঃপর লোকজন (প্রথম তারিখের) চাঁদ দেখল। ফলে নবী করিম (সাহ) বলেছেন, যদি চাঁদ
আহকামুল হাদিস ፲፵፱
রোয়া অধ্যায়
আরো দেরিতে উঠত, তাহলে (তোমাদের সাথে রোযা) আমি আরো বেশি রাখতাম, যেন তারা বিতর হতে না চাওয়ার কারণে তাদের জন্য শান্তি সরুপ হয়।”

(খাই ६३४ ४६४ বাব তলকিল ৫ অক্টোবর)

আল্লামা হাফিজ (রহ.) বলেন, নবি করিম (সাধ) নিষেধাজ্ঞার পরেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে বিসাল করেছেন। অতএব, যদি নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য হতো, তবে তোদেরকে এ কাজের উপর ক্ষি রাখতেন না।

(قصه الباري ४ ३६७)

* নিষ্ঠেই আমাকে পানাহার করানো হয়ে থাকে -এই সর্বাধিক মস্তিষ্কের ব্যাখ্যায় নিয়ে অভিমতগুলো পেশ করেছেন -

(شرح السنة ৫) গ্রহকার বলেন, রাসূল (সাঙ্গ) আল্লাহ তাআলা রাজাকালে অদৃশ্য উপায়ে পানাহার করিয়ে থাকেন যা, কিন্তু এর সরুপ আমাদের অজানা।

(২) আল্লাহ তাআলা তাঁকে শপন্তে পানাহার করাতেন, এতেই তিনি শক্তি পেতেন।

(৩) তাঁর পানাহারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নয়। কারণ, তাঁদের উভয়ের মাঝে যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে নেই। তাই এটা রাসূল (সাঙ্গ) -

(৪) তাঁকে পানাহারের পরিবর্তে এমন অধ্যাত্মিক শক্তি দান করতেন, যাতে তাঁর এ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়ে যেত।

(৫) এর দ্বারা তিনি বুঝতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর মহাত্মা সরুপ তাঁকে পানাহার হতে নির্দৃষ্ট রাখে।

(৬) ব্যাৰাপাটি সম্পূর্ণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এর সরুপ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

(المغلي ৬ ২৬১)

(৭) হাফিজ ইবনুল কায়িম (রহ.) বলেন, নবি করিম (সাঙ্গ) উক্ত উক্তি দ্বারা বোঝাতে চাইছেন যে, আমার এবং আল্লাহ তাআলার ইশক ও মহবুত এমন পর্যায়ের যে, তাঁর মহত্ত্ব ও নুরের দর্শন হাসিল হয়। যার ফলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না।

(৮) যদিও এটা আমার রহস্যী খাবার।

(درس مشكورة ७ १९९)
রোয়াদার ব্যক্তির মিসওয়াক করা

... উন্নয়নের উপর নির্ভর ভিত্তির উপর নির্ভর করা যায়।

(খাযাতি জ ১৫ সংখ্যক ২০ দুর্গত রাসূলের রাত্রের খুব, তর্ম জ ১৫ সংখ্যক ২০, রোয়াদার এর সাহায্য করা যে করা আছে)

অনুবাদঃ ... আবদুল্লাহ ইবন আবু আইয়াম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, আমি রাসূল সাধ্য-কে রোয়াদার রাখা অবশ্য মিসওয়াক করতে দেখেছি।

বিশেষতঃ মিসওয়াক করা সম্ভব। কিন্তু রোয়াদা বহু মিসওয়াক করা জায়ে কিনা,

কিবা কোন সময় মিসওয়াক করা উত্তম- এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানীকা

রয়েছে। এ সম্পর্কে মোট ৭টি মত আছে-

১। ইমাম শাফেই ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, রোয়াদা রেখে দুপুরের আগে

মিসওয়াক করা মুসল্লাহব। কিন্তু দুপুরের পর মিসওয়াক করা মারকরহ। মিসওয়াক

দুনাহা হোক অথবা কাঁচা হোক। (عذبة للعيسى ج ১৬ সংখ্যক ২০)

দলীলঃ হযরত আবু কুরাইশ (রাও) হতে বর্ণিত হাদিস-

... لَحُلُوفُ فَمَ الصِّادم أَطْبِبْ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ المَسْكَةُ - (খাযাতি ج ১৫ সংখ্যক ২০৩ দুর্গত)

الصوم، مسلم ج ১৩ (২৬৬) বাবু ফসল

(২০৯ সংখ্যক ১৫২ বাবু ফসল চামা, তর্ম জ ১৫২ সংখ্যক ২০৩ বাবু ফসল চামা, পাপ সংখ্যক ১৯)

অর্থাৎ, রোয়াদারের মুখের গল্প আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে সুস্থক্ষম।

তাঁরা বলেন যে, রোয়াদারের পেট খালি হবার কারণে মুখে দুর্গত আসে। আর ঐ

গল্প দুপুরের পরে শুরু হয়। মিসওয়াক করলে আল্লাহর প্রিয় ঐ গল্প দূর হয়ে যায়।

তাই দুপুরের পর মিসওয়াক করা মারকরহ।

২। হযরত আবু কুরাইশ (রাও) ও কুতিপ আলিম বলেন- আসরের পর মিসওয়াক

করা মারকরহ।

দলীলঃ “রোয়াদারের মুখের গল্প আল্লাহর নিকট মিশকের চেয়ে বেশি প্রিয়।” এ

হাদিস তাঁদেরও দলীল। তাঁর বলেন মুখের গল্প আসে আসরের পর।

(عذبة للعيسى ج ১৬ সংখ্যক ২৩)

৩। ইমাম মালিক, শাফেন্নি, মিয়াদ ও আবু মায়সাহা (এর মতে, রোয়াদা অবস্থায় কাঁচা

করা দিয়ে মিসওয়াক করা মারকরহ। তবে শুননো কর্ম দ্বারা মিসওয়াক করা যায়ে।

(عذبة للعيسى ج ১৬ সংখ্যক ২৩)
দলীলঃ (k) রোষাদারের মুখের গথ আল্লাহর নিকট প্রিয়। কাঁচা বন্ধু ঐ গথ ঢুক দূর করে দেয়।

(খ) কাঁচা বন্ধুর রস পেটে যেতে পারে, পেটে গেলে রোষা ভেঙে যাবে।

৪। কতিপয় মনীষী বলেন, ফরয় রোয্যার ক্ষেত্রে দুপুরের পর মিসওয়াক করা মারা করা। আর নফলের ক্ষেত্রে মারা করা নয়।

দলীলঃ আবু হুরাইয়ার (রা।)-এর মুখের গথ সংক্রান্ত হাদিস। তারা ঐ হাদিস ফরয় রোযার সাথে সীমাবদ্ধ করেন।

৫। ইসহাক বিন রাহওয়াইহ বলেন, রোযার দিনে কাঁচা বন্ধু দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে না। আর দুপুরের পর শুকনো বন্ধু দিয়েও মিসওয়াক করা যাবে না।

দলীলঃ (ক) কাঁচা বন্ধুর রস পেটে যেতে পারে।

(খ) দুপুরের পর মুখে গথ হয়। তাই দুপুরের পর মিসওয়াকই করা যাবে না।

৬। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.,) বলেন- পানি দ্বারা সিক্ত কোন বন্ধু দিয়ে মিসওয়াক করা যাবে না।

দলীলঃ পানি দ্বারা সিক্ত বন্ধু দিয়ে মিসওয়াক করলে অকারণে মুখে পানি প্রবেশ করানো হয়। আর রোযার সময় বিনা কারণে মুখে পানি প্রবেশ করানো নিষেধ।

৭। আলী (রা।), ইবন উমর (রা।), ইমাম আবু হানিফা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবন সীরীন, সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নার্কী, ইমাম আওয়াঈ (রহ,-) সহ জমকুর উলামাদের মতে, রোযাদারের জন্য মিসওয়াক করা জারী। সকালে, দুপুরে বা বিকেলে হোক, সব সময়ই মিসওয়াক করা জারী। ভেজা অথবা শুকনা মিসওয়াক হোক, কোন ক্ষতি নেই।

(عمراء الفاري ج 11 ص ١٤)

দলীল (١) হযরত আবুদুল্লাহ ইবন আমের (রা।)-এর হাদিস।

রাবীত رَسُولُ اللَّهِ صلِّمّ يَسْتَكُنَّ وُهُوَ صَائِمٌ

দলীল (٢) আযিশা (রা।)-এর হাদিস-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْرُ الخَلَالِ خَلَالِ الصَّامِ بالسُّوْاِكَ

অর্থাৎ, মিসওয়াক করাই রোযাদারের সর্বোত্তম থিলাল।

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা রুখা যায় যে, সতর্কতার সাথে রম্যানের দিন রোযাদারের মিসওয়াক করা কোন দুষ্কীয় কাজ নয়, বরং সুর্মতি ও সর্বাঙ্গের বিষয়।
জীবনের উপরে লিখিত অধিকাংশ মতেই দেখা যায় যে, হয়তো আবু হুরায়রা (রাও) এর মুখের গন্ধ সংক্রান্ত হাদীসকে দলিল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর কারণ হল, মিসরায়ক করলে দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়, যা হাদীসের উদ্দেশ্যের খেলাফ। এর জন্য আহনাফগণ বলেন, বাংলার হল, হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই দুর্গন্ধ বাকি রাখার ও তা স্রোতকের চেষ্টা করতে হবে। এখানে মুখের এই দুর্গন্ধের কথা বলা হয়েছে, যা পানাহার না করার কারণে আঁত থেকে সৃষ্টি হয়। মিসরায়ক করলেও এই দুর্গন্ধ দূর হবে না। আর স্বাভাবিকভাবে মুখে যে গন্ধ হয় তা দূর করার জন্য মিসরায়ক করতে হয়। (ফায়ায়েলে আমল, রোয়া অধ্যায়)

২। অথবা, মিসরায়ক করা স্বতন্ত্রভাবে একটি সুন্দরতা। এখানে খল্যেন লমেন তথ্য মুখের গন্ধের সাথে মিসরায়কের কোন সম্পর্ক নেই। তাই রাসুল (সাহ) রম্য মানে মিসরায়কের অনুমতি দিয়েছেন। আর সূর্য ঢালার পর মিসরায়ক করা মান্য, এ জাতীয় কথা ধূ ব্যক্তিগত অভিমত। সরা হাদীস দ্বারা এর কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আলাম নবী (রহ.) বলেন-

"যদি হেদিদ সহিষ্ণু করা করিয়ে মুক্তি বা ব্যক্তি যাতে মুক্তি পায় তাতে তাতে যাতে বিদ্যমান। যাতে তাতে তাতে বিদ্যমান প্রশ্ন নেই। এ ব্যাপারে আলাম নবী (রহ.) বলেন-

পাপীয় ব্যক্তিগত শিস্তা সাব্যস্ত
রোয়াদার বাংলা শিস্তা জাগানো

... তোতাবাদ তাতে ব্যক্তি যাতে মুক্তি পায় তাতে তাতে যাতে বিদ্যমান।
(তোমায় জোড়া বাংলা শিস্তা জাগানো, অধ্যায়)
অনুবাদঃ ... সাহবান (রাও) নবী করীম (সাহ) হতে মর্না করেছেন। তিনি ঈমান করেছেন। যে ব্যক্তি শিস্তা জাগানো এবং যার উপর শিস্তা জাগানো তাদের উদ্ভাবনের রোয়া ভঙ্গ হয়।

বিশেষণে রোয়াদার শিস্তা জাগানো রোয়া ভঙ্গে যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ঈমামদের মধ্যে মতানুষ্ঠা রয়েছে।
* ঈমাম ঈমামদ এবং ঈসহাক (রহ.)-এর মতে, শিস্তা জাগানো রোয়া ভঙ্গে যাবে।
* তবে এতে কায়াওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
* আতা (রহ.) বলেন, রম্য মানে শিস্তা জাগানো কায়া এবং কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে। (মহফিলের মুন্দিত জোড়া) দলিলে অনুসারে হুমত বর্ণিত হাদিস।
* ইমাম আওয়াইহ, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবন সীরীন এবং মাসরক (রহ.)-এর মতে, সিংগা লাগানো মাকরহ, তবে এতে রোয়া ভঙ্গ হয় না।

(المختصر للمندري ج 3 ص 442, عبدا القاري ج 11 ص 99)

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিকি ও জমকুর আলিমগণ বলেন, রময়ানে সিংগা লাগানো বেইধ। সিংগা লাগালে রোয়া ভঙ্গ হবে না। এ কাজটি মাকরহও নয়।

(عيليه ج 11 ص 99)

[তবে ইমাম মালিক, শাফিকি ও সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে একটি মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোয়া অবস্থায় সিংগা লাগানো মাকরহ।]

(بداية المجتهد ج 1 ص 212, اوجز المسالك ج 3 ص 45)

দলীল

* عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجج و هو ١(١)

صاحب - (ابو داود ج 1 ص 233 باب في الرخصة, البخاري ج 1 ص 230 باب الحجامة), ترمذي ج 1 ص 124 باب الرخصة في ذلك, ابن ماجة ص 272/122)

অর্থাৎ, ... ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হেতু বর্ধিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রোয়া থাকা অবস্থায় (ব্যুর দেহে) সিংগা লাগিয়েছেন।

(سكت: ٣)

দলীল

* عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجج و هو ٢(٢)

صاحب - مخرج -

অর্থাৎ, ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হেতু বর্ধিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (سাঃ) ইহরামের মধ্যে রোয়া থাকায় শিংগা লাগান।

(سكت: ٤)

দলীল

* عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع من قاء ولا من احتلم ولا من احتجج - (ابو داود باب ج 1 ص 233 باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضان)

অর্থাৎ, ... নবী করিম (সাঃ)-এর জনৈক সাহাবী* হেতু বর্ধিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সাঃ) ইহরাম করেছেন যে ব্যক্তি বমি করে (অনিচ্ছাকৃত), যার স্পৃহাদোষ হয় এবং যে শিংগা লাগায়, তার রোয়া ভঙ্গ হয় না।

* বায়হাকি বলেন, জনৈক সাহাবী ঘারা উদ্দেশ্য হল, عبد الرحمن بن زيد ইবন আব্‌ উসম বিবি, যে উদ্দেশ্য সাহাবী (আবু দাউদ, পাদাটিকা)

(عن عطاء عن أبي سعيد الخدري)
উপরের বিবিধ হাদিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোয়া অবস্থায় শিংগা লাগালে রোয়া নষ্ট হবে না।

জবাবঃ—এর জবাব দিতে গিয়ে আহানাফগণ বলেন,

(১) আরো এই আমল রোয়াদারকে রোয়া ভঙ্গের নিকটবর্তী করে দেয়। হাঁকেম (শিংগা লাগানো ব্যক্তি)-কে এজন্য বলা হয়েছে যে, সে রক্ত চুয়ার কারণে তার কষ্টনালীতে রক্ত দুঃখ যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর মাহগুম (যার উপর শিংগা লাগানো হয়)-কে এজন্য বলা হয়েছে যে, সে শিংগা লাগানোর দরুণ খুব বেশি দূর্বল হয়ে পড়বে।

(عمدة الفقاري ج 11 ص 29 معارف السنن ج 6 ص 164)

(২) ইমাম তাহরী (রহ.) বলেন, নবী করিম (س) এর বাণী,

"ফত৷র হাঁকেম, জন্ম তাঁহাদের ব্যক্তিকে দুঃখ দান দেবে না যে, তাঁহাদের শিংগা বন্ধুত্ব দিয়ে হয়ে যাবে। বিচার করে তাঁহাদের দিয়ে হয়ে যাবে। নবী করিম (س) বলেন, তাঁহাদের যে দুঃখ দুঃখকে দূর করে দিয়ে হয়ে যাবে। তাঁহাদের উভয়ের রোয়া ভেঙে গেছে। সুতরাং এখানে ফত৷র রোয়া ভঙ্গ নয়, বরং গীতের কারণে রোয়ার সরবার বিলুপ্তি হুকুম হয়েছে।

(৩) ইমাম শফেকি (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাও)-এর হাদিস দ্বারা সাওবান ও শাদাদের হাদিস মার্কে হয়ে গেছে। কেননা, সাওবান ও শাদাদ ইবন আব্বাস (রাও)-এর হাদিসমূহ মক্তা বিজয়কালীন। আর ইবন আব্বাস (রাও)-এর হাদিস মহানবী (س) এর বিদায় হুজরকালীন।

(৪) মূলতঃ এটি একটি পরামর্শ। যেন রোয়া অবস্থায় শিংগা লাগানো না হয়। কারণ, এর মানে মানুষের মধ্যে নেহায়ত দুর্বলতা এসে যায়,
রোয়াতে সত্ত্বেও ফুর্ততা অবশিষ্ট থাকে না। এটা ঠিক তেমনই, যেমন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে—

... عَنْ أَبِي ذَرَّ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَقْطَعُ الصُّلُوْةَ الْمُرَأةُ؟

وَالحِيَامُ وَالْكَلْبُ—(سَلَّمُ ﷺ ১৬৭ কবাব চলো, বাব সিরাজ চলো)

অর্থাৎ, ... হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। ... নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন, মহিলা, পাখি ও কুকুর নামায ভেঙে দেয়।

অথচ এগুলো নামাযের সামনে দিয়ে গেলে নামায ভাঙে না। তবে এমনটি যেন না হয়, সে পরামর্শ উত্তর হাদিসে দেয়া হয়েছে।

এ বাণ্যের সমর্থন সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতেও পাওয়া যায়।

سُنَّةً آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَكْنِمَ تَكْرُمُونَ الْحِجَامَةَ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ

الضَّعْفُ—(বখারী ১:২২)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা কি রোয়াদারের জন্য পিঙ্গা লাগানো মাকরহ মনে করেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। দুর্বলতার কারণেই আমারা তা মনে করি।

পরিষেবা বলা যায়, রোয়া রেখে পিঙ্গা লাগানো জায়েব। এতে রোয়ার কোন ক্ষতি হয় না এবং সওয়ারের কোন কম্পিতি হবে না। কিন্তু তাকলকাশাতে কেউ যদি পিঙ্গা না লাগায় তাহলে ভিন্ন কথা।

রোয়া অবস্থায় ইনজেকশন রোয়ার মুক্তির ব্যক্তি ইনজেকশন নিতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামদের মধ্যে এক জটিল ও দীর্ঘ একতনাফ রয়েছে।

তবে জমলের উলামায়ে কিরামের সর্বমুখে সিদ্ধান্ত হল।

ফকিরগুণ এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি দেয় যে, রোয়া অবস্থায় পেটে বা মস্তকে স্বাভাবিক রাখা দিয়ে অর্থাৎ কান, নাক, পালা বা পেশার-পায়োখানার রাখা দিয়ে ইছাপূর্বক কোন কিছু প্রবেশ করলে রোয়া ভেঙে যাবে। এটাই শরীয়তের বিধান। ইনজেকশন দ্বারা মেহেরু স্বাভাবিক রাখা দিয়ে পেটে বা মস্তকে কিছু পৌঁছে না। সুতরাং, এর দ্বারা রোয়া ভঙ্গ হবে না। আর পুরু শরীরে কোন কিছু প্রবেশ করলে বা করালেই রোয়া ভঙ্গ হয় না। যেমন, অথু বা গোলাস করলে, শরীরে তৈল মালিশ করলে, অথবা কুলি করলে পানি ও তৈল শরীরের লোমকূপ দিয়ে কিছু কিছু ভিতরে প্রবেশ করে। যার ফলে গর্মের সময় গোলাস করলে শরীর ঠাপ্পা হয় যায়। অনেক সময় ক্ষুধাও নিবারণ হয় যায়। এমনকি নবী করিম (সা) নিজেও অধিক গরমের সময় রোয়া অবস্থায় শরীরের ঠাপ্পা করার জন্য ভিজা কাপড় মাথায় দিয়ে রেখেছেন।
যেহেতু শরীরের সমস্ত শিরার সম্পর্ক রয়েছে, তাই মথা ঠান্ডা হওয়ার কারণে সমস্ত শরীরের ঠান্ডা হয়। কিন্তু এগোলো যেহেতু মুখে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পৌঁছে না, তাই এর দ্বারা রোথা ভঙ্গ হবে না।

(আলাত জেদেয়াল ১৫৩-৩, মানময় ২ স্থ, শায়িত ১০২ স্থ)

২৩৪
রোথাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বয়মিক করলে

... অব্যাহতি রোথা থাকায় সন্তান তাদের স্থিরতা উন্নতি ও তাদের কল্যাণ হয়। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বয়মিক করে তবে সে যেন কায় করে।

বিশেষতঃ চার ইমাম এ ব্যাপারে একত্র যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বয়মিক এলে রোথা ভঙ্গ হয় না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বয়মিক করে তবে রোথা ভঙ্গ হবে।

(মুফতি এলাম ৭ স্থ)

দলীলঃ উপরোক্ষিত হয়ে থাকে।

* তবে হানাফীদের মতে, যেখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। আলামা ইবন নুজাইম (রহ.) বয়মিক বর্তমান অবস্থা প্রকাশ করেছেন। যেমনঃ

বয়মিক হয়ত নিজে নিজে আসবে অথবা ইচ্ছাকৃত বয়মিক করা হবে। উভয় অবস্থায় মুখ ভর্তি বয়মিক হবে বা হবে না। অতঃপর এগোলো থেকে প্রত্যক্ষ অবস্থায় হয়ত বয়মিক হবে বা হবে না, কিংবা নিজে নিজে ভিতরের চলে যাবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে নেয়া হবে। এই মোট বয়মিক অবস্থা হল। এই অবস্থায় রোথা ভঙ্গ হবে।

১. মুখ ভর্তি বয়মিক হলে এবং রোথাদার বয়মিক অংশ ইচ্ছাকৃত পেটে নিলে।

২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভর্তি বয়মিক করলে।

অন্য কোন অবস্থায় রোথা ভঙ্গ নিলে না।

(লোকোলয়াল ৪ স্থ)
রোয়াদার ব্যক্তির চুম্বন করা

৩২৪ | بَابُ الْقِبْلَةِ لِلصَّلَاتِ

... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ يُقبِلُ وَهُوَ صَائمٌ وَأَنَا صَائِمٌ... (بخاري 1 ص ۸۸۸ باب القبلة للصائم، مسلم ۱ ص ۳۵۲ باب بيان ان القبلة في الصوم، ترمذي ۱ ص ۱۵۴ باب القبلة للصائم، ابن ماجة ص ۱۲۲) 

অনুবাদঃ ... আয়াশা (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লা (صًا) রোয়াবহুয় আমাকে চুম্বন করতেন এবং আমিও রোয়াবহুয় থাকতাম।

বিশ্লেষণঃ রোয়াদার ব্যক্তি ক্রীকে চুম্বন করার ক্ষেত্রে ফুকাহাদের পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়ঃ

১। ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, রোয়াদার ব্যক্তি ক্রীকে চুম্বন করা নিঃশর্তে (মুট্টা) মাকরহ।

২। ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং দাউদ যাহেরী (রহ.)-এর মতে নিঃশর্তে জায়েছ।

৩। কেউ কেউ বলেন, নফল রোযায় চুম্বন করা জায়েছ এবং ফরয রোযায় নিষেধ।

৪। কতক তারিখগণের মতে, রোযায় চুম্বন করা নিঃশর্তে নিষেধ।

৫। ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম আওয়াঈ (রহ.)-এর মতে, রোয়াদার ব্যক্তি ক্রীকে চুম্বন করা দৃষ্টিগোচর নয়, জায়েছে। তবে শর্ত হল, রোয়াদার ব্যক্তিকে নিজের নফরের উপর অবশেষ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, চুম্বন যাতে সঙ্কম পর্যায়ে না পৌঁছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইমাম খাতেরী (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত তাই।

(মুঘলের বাদামি বলেন, ২৯০, সুমাকির কিরা, ১১ চ) 

দলীল (১) অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলীল (২) ... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ يُقبِلُ وَهُوَ صَائمٌ وَيِبَاءِشُرُ وَهُوَ صَائمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمُّهُ لَأُرَبِّهِ (ابو دাউদ ۱ ص ۳۲۴, بخاري ۱ ص ۲۴۸, باب مباشرة الصائم, مسلم ۱ ص ۳۵۲, ترمذي ۱ ص ۱۵۴ باب مباشرة الصائم, ابن ماجة ۱۲۲)

অর্থাৎ, ... আয়াশা (রাও) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লা (صًا) রোয়া থাকার যন্ত্রে চুম্বন করতেন এবং তিনি রোযাবহুয় তাঁর সাথে সহাবহু করতেন। তবে তিনি ছিলেন কচ্ছার সময়ী।
দলীল

... আবু হুরায়রা (রাও) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেকোন ব্যক্তি নবী করীম
(সাও)-এর নিকট রোয়া থাকাবাদ্য হায়র সাথে সহাবস্হান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
করলে, তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে
অনুমতি চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। আর ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে
অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।

দলীল

... জাবির ইবনে উমর ইবনে আব্বাস হায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমর ইবনে
খাতার (রাও) বলেন, একদিন রোয়া থাকাবাদ্য আব্বাস ইবনে আমার সাথে আনন্দ-ফুর্তি
করাকলে তাকে চুম্বন করি। এরপর আমি বলি, ইবনে আব্বাস ইবনে আমার সাথে চুম্বন
করে। দলীল নিষেধ করে। তিনি বলেন, তুমি কি রোয়া থাকা অবস্থায় পানি দ্বারা কুলি কর না? ঈসা ইবনে হামিদ
তার হাদিস বলেন, আমি বলি এতে তো কোন দোষ নেই।
সুতরাং উপরোক্ত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুম্বন করলে সহাবস্হা লিপ্ত
হয় না, এমন ব্যক্তির জন্য চুম্বন করা জায়গা। তবে যে রোয়াকে নিরাপদ রাখতে
চায় সে চুম্বন থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

মন্ত আহমেদ আব্বাস ইবনি শের রমাস্তান চুম্বন বলে হলে

রমাস্তান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে

... আবু হুরায়রা (রাও) বলেন। তিনি বলেনঃ ঈসা ইবনে আব্বাস ইবনে আমার
কান নিষেধ করেন। তুমি কি বললে তো জেনি বলে আবু হুরায়রা ইবনে
রমাস্তান মাসে নাপাক অবস্থায় ভোর হলে চুম্বন বলে হলে।
অনুবাদঃ ... নবী করিম (সাঁ) এর স্বী আয়িশা ও উদ্ভ সালামা (রাঙ) হতে বর্ণিত।
তাঁরা বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঁ) এর নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যেত। নবী আবুদুল্লাহ আল-আয়হামি তাঁর বর্ণিত হাদিসে বলেন, রমণাহেন মাসে রাতে স্পুদদেশের কারণে
নয়, বরং স্বী সহবাসের কারণে তিনি সকালে নাপাক অবস্থায় থেকে রোয়া রাখতেন।
বিশ্লেষণঃ রোয়ার দিনে নাপাকী অবস্থায় ভোর হলে রোয়া সহীহ হবে কিনা, এ নিয়ে
ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। আল্লামা আঈনী (রহ.) এ ব্যাপারে সাতটি
অভিমত উল্লেখ করেছেন-
(১) হযরত আবু হুরায়রা, ফয়ল ইবন আলাবাস ও উসামা ইবন যায়েদ (রাঙ)-এর
মতে, “লা یضَحُّ صُومُ مَنْ أصْحَبَ جَنَّةَ” (সম্ভাব্য উত্তর)।
(২) তাউস ও উরওয়াহ (রহ.)-এর মতে, যদি ইচ্ছে করে গোসল করতে দেরি করে
তাহলে রোয়া সহীহ হবে না। আর অত্যতাবশতঃ গোসল করতে বিলম্ব করলে রোয়া
সুদ্ধ হবে।
(৩) ইব্রাহীম নাখিল (রহ.)-এর মতে, এক্ষেত্রে ফরম রোয়া সহীহ হবে না। কিন্তু
নফল রোয়া সহীহ হবে।
(৪) ইবন হায়ম (রহ.) বলেন, নিদ্রা থেকে উঠার পর সূর্যোদয়ের আগে গোসল করে
নামায় পড়তে পারলে রোয়া সহীহ হবে। যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করে নামায
পড়তে না পারে, তবে রোয়া বাতিল হয়ে যাবে।
(৫) হাসান ইবন সালেহ (রহ.)-এর মতে, এমতাবার্তায় ফরম রোয়া কায়া করা
মুক্তাহীব।
(৬) সালিম ইবন আবদুল্লাহ, হাসান বসরী ও আতা ইবন আবী রাবাহ (রহ.)-এর
মতে, "عَلَيْهِ اِنْ يَضْحَوْ مَعْضِلٍ" অর্থাং, রোয়া অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরে এর
কায়া করতে হবে।

delilঃ উপরের বিষয়ের ফকিরগণ দলিল হিসেবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঙ)-এর
উক্তি পেশ করেন।
মনে আছে, যে নাপাক ব্যক্তির উপর ফজরের সময় হয়ে যায় অথচ সে রোয়া রাখতে চায়
সে যেন রোয়া না রেখে ইফতার করে।
(৭) জমহুর সাহাবা (রা.), ফুকহা এবং চার ইমাম-এর মতে, এমন ব্যক্তির রোধা বিনা শর্তে জায়েহ। ফরয রোধা হোক বা নফল রোধা হোক। ফজর আবির্ভাবের পর তাড়াতাড়ি গোসল করক অথবা দেরিতে। দেরই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুক্তকৃমে অথবা ঘুমের কারণে হোক, সর্বাঙ্গহয় তার রোধা সহীহ হবে। (العمرة للعبري ج ١١ ص2)

দলীল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী-
فَأَلَّهُنَّ بِشِرْجُوعٍ وَيَبْتَغُونَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواَ وَاشْرَبُواَ حَتِّى يَتَبَيَّنَّ لَكُمُ الْحَيَّزُ

আর্থাৎ, অতঃপর তোমরা নিজেদের লীলীর সাথে সহবস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের অত্যন্ত রেখা পরিকার দেখা যায়। অতঃপর রোধা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (বাকরাঃ ১৮৭)

উক্ত আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাপাক ব্যক্তি যদি ফজর আবির্ভাবের (طلِّعَ فَجَر) পর গোসল করে তাহলে তার রোধা সহীহ হয়ে যাবে, কেননা উক্ত আয়াতে পানাহার এবং সহবস করার অনুমতি ফজর ফরয পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। সমুদ্র যে ব্যক্তি একেবারে রায়ের শেষভাগে লীলী সহবস করবে, তাকে তা স্বাভাবিকভাবেই সুবেহ সাদিকের কর পর গোসল করতে হবে। অতএব যদি রোধার কোন ক্ষতি হত তাহলে এর পূর্বেই এ সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার কোন দেয়া হবে।

দলীল (২) হযরত আরিয়া ও উম্মে সালামা (রা) এর হাদিস-
(পূর্ণ হাদিসটি অনুসরণের জুড়ে বর্ণিত হয়েছে)

দলীল (৩) ... عَنْ عَائِشَة بُنتِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

اللهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَيْ الْبَابِ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِاللهِ أَصِيبُ جَبِيلَا وَأَنَا أَرْبَدُ الصُّيَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصِيبُ جَبِيلَا وَأَنَا أَرْبَدُ الصُّيَامِ فَأَفَاتِِسَ وَأَصِيبُ فَقَالَ الْرَّجُلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيِّ لَسْتُ مِثْلُكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبيّ وَمَا تَأْهِرُ فَغَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ اللَّهُ ﷺ لَارْجَحُو أنَّ أَكُونَ أَحْشَاكَمُ اللَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ مَا أَتَيْعُ - (ابو داود ج ۲۲۴ ص ۳۲۴)
ক্ষণেকে আল্লাহের প্রতি প্রত্যেক নিজের দেহন রহস্যের অধিকারীকে তার প্রতি অর্পিত করতে হয়।

কফাদরে মন নাচে তাকে আল্লাহের প্রতি প্রত্যেক নিজের দেহন রহস্যের অধিকারীকে তার প্রতি অর্পিত করতে হয়।

কফাদরে মন নাচে তাকে আল্লাহের প্রতি প্রত্যেক নিজের দেহন রহস্যের অধিকারীকে তার প্রতি অর্পিত করতে হয়।

যে ব্যক্তি রমজানের দিনে স্বপ্ন শ্রীমত শ্রীমত সাঙ্গে সহৰসে করে তার কাফকুরা হয়েছে।
অর্থাৎ, ... উদ্দেশ্য হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি (রাব্বী) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে বিজয়ের পর ফাতিমা (রাঃ) আগমন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বামদিকে উপবেশন করেন এবং উদ্দেশ্য হানী (রাঃ) বলেন দান দিয়ে। তিনি (রাব্বী) বলেন, এ সময় জনৈক দাসী একটি পাত্রে কিছু পানীয় দ্রব্য এনে পেলে তিনি তা পান করেন। এরপর তিনি এর অবশিষ্ট অংশ উদ্দেশ্য হানীকে পান করতে দেন। তিনি তা পান করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো ইফতার করলাম, কিন্তু আমি যে রোয়া ছিলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন কায় রোয়া আদায় করছিলে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন, যদি তা নফল রোয়া হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি হবে না।

* ইমাম আহমদ বিন হামদ (রহ.)-এর অভিমতও ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত। তবে তিনি বলেন, নফল রোয়ার নিয়ত দ্বিগ্রহের পূর্বে করতে হবে।

* ইমাম আবু হানিফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবরাহীম নাখসী (রহ.)-এর মত, রমযানের রোয়া নিদিষ্ট মাস্ততের রোয়া এবং নফল রোয়ার নিয়ত দ্বিগ্রহের পূর্বে করলেই চলে। সুবেহ সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা জরুরী নয়। (যদিও রাজিউই নিয়ত করা উত্তম) হাঁ, রমযানের কায় রোয়া, কাফরাও ও সাধারণ মাস্ততের রোয়ার ক্ষেত্রে ফরয়ের পূর্বেই নিয়ত করা ওয়াজিব।

(معارف للبلور ج 82 ص 8-91، المغني ج 3 ص 91)

دلال (2)4 آذلاله تاثاليار باني-
তাঁরা বলেন, পানাহার সহবাসের মত, এমন কিয়াস করা যাবে না। তাই তাঁরা বলেন- 
ফুত্তাহরুর কফারাত ফি নে লা যাহা তাহা তোলা ইন গেলে হবে (البداية ج 1 ص 219)
অর্থাৎ, কাফারার সহবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য দিকে (পানাহার) অতিক্রম করবে না।

দলীল (২): যদি কেউ ইচ্ছা করে পানাহার করে, তাহলে এর জন্য সে তওবা করবে। পানাহারে এসেছে—
الثَّانِبِ مِنَ الدَّنْبِ كَمْ لَا دَنْبُ لَهُ
অর্থাৎ, গোনাহ থেকে তত্তাত্ত্বিক এমন, যেন তার কোন গোনাহই না।

* ইমাম আবু হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক, ইবন মুবারক (রহ.) প্রমুখের মতে, কাফারার কেবল সহবাসের সাথেই নিষিদ্ধ নয়; বরং ইচ্ছাকৃত পানাহারকারীর উপরেও কাফারার ওয়াজিহ হবে।

( Hassa�a tаw̡k̡аbа j 1 сr. 2 0 3, аq̡аrаz j 2 сr. 3 )

দলীল (১): জীলের আল্লাহ সা.ল্লাতের ইসলাম উল্লেখ ও স্মরণ করায় ছাড়া আর কোন পালন বা ব্যবস্থা করা যায় না।

( Dar qatы j 2 сr. 2 0 9 )

অর্থাৎ, ... এক ব্যক্তি নবী কর্মী (সা)) এর নিকট এসে বলল, রমিয়ান মাসের কোন একদিন হিজেরা এই রোহা ভেঙেছি। তা শনে নবী কর্মী (সা) বললেন, তুমি একটি সোলাম আযাদ কর।

দলীল (২): ... অনেক হেরা তিন রাজা তাহলে রাজা এমন মুসলিম বা মুসলিম পালন করো যা উল্লেখ ও স্মরণ করা যায়।

( fаsi)tа fа wаgа j 3 2 0, bаxаrа j 1 сr. 1 0 9, сr. j 1 сr. 3 2 5 )

অর্থাৎ, ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রমিয়ানের মধ্যে রোহা ভঙ্গ করলে রাসূল সাল্লাতে রাজা তাকে দাস-দাসী আযাদ করতে, অথবা ক্রমগত দুইমাসের রোহা রাখতে বা যাত জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে নির্দেশ দেন।

দলীল (৩): ... এই কফার ফি ইথাল ও স্বর্ণ ও জুমাহ—

( tаw̡аbа j 1 сr. 3 2 0, bаxаrа j 1 сr. 1 0 9, сr. j 1 сr. 3 2 5 )

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই কাফারার আদায় করতে হবে, পানাহার এবং সহবাসের কারণে।
সুতরাং উপরোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সহবাসের কারণে যেমন কাফফারা ওয়াজির হয়, তদ্রুপ পানাহারের দ্বারাও তা ওয়াজির হবে।

জবাবঃ ইমাম শাফেঈ ও আহমদের দলীলের জবাবে আহনাফগণ বলেন-
(১) পানাহারের ক্ষেত্রে কাফফারার হুকুম আমরা কিয়াসের দ্বারা প্রমাণ করি না; বরং অনুচ্ছেদের হাদিসের *Darâl-l-نص* দ্বারা প্রমাণ করি। কেননা, অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিসে কাফফারা ওয়াজির হওয়ার মূল কারণ হল রোযা ভঙ্গ করা। পানাহারের দ্বারা হোক অথবা সহবাসের কারণে হোক। সুতরাং ইহা কিয়াস নয়; বরং ফতুহ ত্তেবিরে জুল (১) *Darâl-l-نص*

(২) কাফফারা কিয়াসের পরিপুষ্ট নয় বরং কিয়াসের অনুকূল। কেননা, অন্যায়ের দত্ত বিধান বিবেকসম্মত।

(৩) দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা যায়, কাফফারা এবং শরীফ সাজা তওবা দ্বারা ক্ষমা হয় না।

সাওমের কাফফারার পরিমাণঃ
রোয়ার কাফফারার পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে-
* ইমাম শাফেঈ ও মালিকের মতে, প্রত্যেক মিসকীনকে রিয়াজ চাও তথা এক সা’-
এর চারাগাহের একভাগ দিতে হবে। এ হিসেবে ৬০ জন মিসকীনকে মোট ১৫ সা’
দিতে হবে। যার বর্তমান ওজন এক মণ সাড়ে বার সের গম।

দলীলঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা’)-এর হাদিস-

... فاتي يعرق فيه تعرق خمسة عشر صاعاً ...
(গোলামের দাগিনা ১ সং ২৮১ বাবি কফারা মাত্র)

অর্থাৎ, অতঃপর তাকে এমন একটি খুরমা ভর্তি হলে প্রদান করা হয়, যাতে গনের
সা’ পরিমাণ খেজুর ছিল।

* ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাওমের কাফফারার পরিমাণ হল, ওহার
(মায়ের সাথে কৌমু উপমা)-এর কাফফারার অনুরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক মিসকীনকে অর্থ

* দাসালাতুন নস (লাম) বলা হয়- এরূপ শব্দকে যা একথা প্রমাণ করে যে, আলোচিত
বিষয়ের হুকুম অনালোচিত বিষয়ের জন্য প্রমাণিত। এই হুকুমটির কারণ শুধু অভিধান সম্পর্কে জান
ঝাকার কারণে বোঝা যায়।

(তশেবি তালুকায় ফাল আল ১০২ সং ১০)
সা গম দিতে হবে অথবা এক সা’ খেজুরা। অতএব, এ হিসেবে ৬০ জন মিসকীনকে
৩০ সা’ গম দিতে হবে। যার বর্তমান পরিমাণ ২ মণ ২৫ লের গম। (المعدة ج ১১ ص ৩৭)
(العدد ج ١١ ص ٣٧)

দলীলঃ হযরত আরিশা (রাজ) হতে বর্ণিত হাদিস-

... فَأَمَرَهُمُ الْرَّسُولُ ﷺ ﻟَيْسَ ﻓَجَاءَهُ ﻓَيْهِمَا طَعَامٌ ﻓَأَمَرَهُ ﷺ ﻟَيْسَ ﻓَجَاءَهُ ﻓَيْهِمَا وَسَلَّمَ ﺃَنْ ﻳَتَصَدِّقُ ﻲَهُ- (مسلم ج ১ ص ৩৫)

অর্থাৎ, ... তখন তিনি তাকে বসার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর খাদ্যভুতি দুটি থলে
এল। অতঃপর নবী করিম (সাহ) তাকে তা সদকা করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।
আল্লাহ আল্লাহ (রহ.) বলেন, এক আরাকে* ১৫ সা’ হলে দুই আরাকে ৩০ সা
হবে। আর এগুলো যেহেতু যাটি মিসকীনকে দিবে, তাই প্রত্যেক মিসকীনের ভাগে
পড়বে অর্থ সা’। (عمدة الفقاري ج ١১ ص ٣৭, اوجز المسالك ج ٣ ص ٣৪)

জবাবঃ ইমাম মালিক এবং শাফেঈ (রহ.)-এর দলিলের জবাবে আহমদগণ বলেন যে-

(১) ঐ লোকটি যেহেতু দরিদ্র ছিল, তাই তাকে প্রাথমিকভাবে এক সদকা
করার জন্য বলা হয়েছিল, পরে যখন সামর্থ্যবান হয়, তখন তাকে দ্বিতীয়
সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) ইমাম মুহাম্মদ বলেন, আসলে এই হাদিসটিই উক্ত ব্যক্তির জন্য খাস ছিল। সুতরাং
১৫ সা’-এর হাদিসটি কাফফারা আদায়ের ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার প্রশ্নই
ওঠে না।

(৩) বন্দুক কথা হচ্ছে, ঐ লোকটিকে কাফফারা হিসেবে আদায় করার জন্য তা দেয়া
হয়নি। বরং তার পরিবারের খরচের জন্য দেয়া হয়েছে। যেমন, আবু সুলাইয়ারা থেকে
বর্ণিত হাদিস-

... وَقَالَ ﻓِيْهِ ﻣَعَلَّمَةً إِنَّ وَاهِلَ ﻋَيْنَكَ ﻱَمَّ ﻤُوَاءَ وَعَسْتَغْفِرِ اللَّهِ- (ابو داود ج ১ স৫)

অর্থাৎ, ... রাবী বলেন, এরপর নবী করিম (সাহ) তাকে বলেন, তুমি তা তোমার
পরিবারের লোকদের সাথে ভক্ষণ কর এবং একদিন রোয়া রাখ, আল্লাহর নিকট
গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

* দারা কৃত্তিনীতে বর্ণিত আছে-

* আরাক হল এরূপ খলে অথবা টুকরী যা খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী করা হয়। তাছাড়া বুননকৃত
সাবকিছুকেই আরাক বলে। (مجمع بحار الأنوار ج ۲ ص ۷۶۳)
দলীল (৪): সর্বোপরি বলা যায়, উত্ত ব্যক্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হাদিস থেকে যদি সাওমের কাফফারার পরিমাণ নির্ধারণ করতেই হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আবু হানিফার অভিমতই অগ্রগণ্য। কেননা, হযরত আরিশা (রাঘ) হতে হযরত হাকিমকে বর্ণিত আছে- 

ফালী পুরুষ মনে তুমি পিয়ে উচ্ছরো চাণা (আবু দাউদ, ১৬৬ সংখ্যায়)

(উক্ত অনুচ্ছেদে হাদিসটি অর্থসহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)

এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে- 

মাদিতে হ্মূদু উইরু চাণা এল এই এই ইস্তাফ খুল (السدة ج ১১ সংখ্যায়)

(উক্ত হাদিসটি ইতিপূর্বে অর্থসহ আবু হানিফার দলীল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।)

রোহার কাফফারার আদায়ের সেখানে ধারাবাহিকতাতে রোহার কাফফারার আদায়ের সেখানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈকী রয়েছে।
* ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, রোয়ার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী নয়, যদিও তার ইচ্ছাবিন্ন অর্থাৎ হাদিসে বর্ণিত গোলাম আবাদ করা অথবা ক্রমগত দুই মাস রোয়া রাখা অথবা যাদ জন মিসকিন খাওয়ানো, এর যে কোন একটি আদায় করলেই চলবে। ইবন জুরাইজ, ফুলাইহ ইবন সুলায়মান এবং আমর ইবন উসমান আল মাখুমীরিয়াও ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত পোষণ করেন।

(১) তাঁরা রোয়ার কাফফারাকে শপথের কাফফারার উপর কিয়াস করেন।

(২) তাঁরা রোয়ার কাফফারার ব্যাপারে আলাহ তাআলা বলেন-

লা যোখিদ্ধম লালুথো ফিউ আইমানিক ও লিক যোখিদ্ধম প্যাতুট আইমানিক ফকারানা ইতরুম উসরু মসকিন ম ফোর্পিম মাইলিক ও কথোতম ও তরিও রিপারু ফেন

লম বিচ ফিসুম ফলুক্তি আইম ডাক ফকারান আইমানিক ইফা হলফুম ও হোটুম আইমানিক-

অর্থাৎ, আলাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অন্যক শপথের জন্য; কিন্তু পাকড়াও করবেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা দুঃখভাবে কর। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে বাষ্প প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর বাষ্প যা তোমরা বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বংশ প্রদান করবে, অথবা একজন দুর্লভদাস কিংবা দাসী মূল্যে করে দিবে। যে ব্যক্তি (এসবের) সামর্থ রাখে না, সে তিনিই রোয়া রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন শপথ করবে। তোমারা শপথসমূহ রক্ষা কর। (সূরা মায়েদাত অ) ৫৯

উক্ত আয়াতে মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া অথবা গোলাম আনায় করার ব্যাপারে মাধ্যমতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং রোয়ার কাফফারাকে তিনি কসমের কাফফারার উপরই কিয়াস করেন।

(৩) তাঁরা রোয়ার কাফফারার বিষয়ে বিষয় হল, উক্ত হাদিসে এর (অথবা) শঙ্ক ব্যবহার হয়েছে। এতে মাধ্যমতার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

* ইমাম আবু হাদিফা, শাফেক, আহমদ ইবন হাবল, ইমাম যুহরি (রহ.) ও জমকুর উলামাদের মতে, রোয়ার কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। সুতরাং ক্রমগত দুই মাস রোয়া তখনই
রাখি, যখন গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য না থাকবে এবং একটি মিসমীকর খাওয়ানোর অনুমতি তখনই পাবে, যখন ক্রমাগত দুই মাস রোয়া রাখার সামর্থ্য না রাখতে।

(ফতেহপাতি জ ৪ সং ১৪৫, উমাদা ফরি জ ১১ সং ৩২)

দলীল (১): অনুচ্ছেদের গুরুত্বে বর্ণিত হাদিস, যা নিচে হিসেবে প্রমাণিত।

দলীল (২): তারা রোয়ার কাফফারাকে ফিরাহ (বিহার)-এর কাফফারার উপর কিয়াস করেন।

দলীল (৩): অনুচ্ছেদের গুরুত্বে হাদিসে বর্ণিত আছে:

...ফেল তুমি তুম তুম তুম তুম... তুমি তুম তুম তুম... তুম তুম তুম তুম... তুম তুম তুম তুম... তুম তুম তুম তুম...

দলীল (৪): অলাম আইনী (রহ) বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অন্তর্ধর্থিকারের আরেকটি কারণ হল, এতে অধিক সত্তর্তা অবলম্বন করা হয়।

(উমাদা ফরি জ ১১ সং ৩২)
জবাবঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর দলীলের জবাবে উল্লিখিত তিন ইমাম বলেন, প্রথম দলীলের জবাব-

(১) যেখানে এ ব্যাপারে শরিয়াতের দ্বিতীয় উৎস স্পষ্ট হাদিস (نص) (রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিয়াসের কোন মূল্য নেই। সুতরাং ঐনির্দেশের উপর অগ্রগণ্য লাভ করবে।

(২) তাছাড়া কিয়াস যদি করতেই হয়, তাহলে তোমার কাফাফার উপর কিয়াস করা উচিত। কেননা উভয় কাফাফার মধ্যে রেশ সমঘাত রয়েছে। কিন্তু শপথের কাফাফার সাথে (গোলাম আমাদ ব্যতীত) কোন মিল নেই।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ হাদিসে (অথবা) শব্দ দ্বারা স্বাধীনতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা শেষবিন্যাস (تَلْوْيَت) বুঝানো উদ্দেশ্য (اعلاء السن ج ۱۳۲)।

কাফাফারা দ্বিতীয় পরিবারবর্গে প্রধানের হুকুমঃ সকল উলামা ও ফুকাহা এ মাসআলায় একমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি কাফাফারার সম্পদ অপন পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি কাফাফারার বন্ধু অপন পরিবারকে খাওয়ানো জায়ে না হয়, তাহলে রাসূল (صلى الله عليه وسلم) ঐ লোকটিকে কিভাবে বললেন- "আল্লাহ অর্থাৎ, তোমার পরিবারের লোকদেরকে খেতে দাও। এর জবাবে মুহাম্মদ নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন-

(১) ইমাম শাফেক ও যুহরী (রহ.) বলেন,

"এই হাদিসটি উত্ত ব্যক্তির জন্যই খাস অর্থাৎ এই হাদিসটি উত্ত ব্যক্তির জন্যই খাস।"

(২) কেউ কেউ বলেন, এ হুকুমটি পূর্বে কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে গেছে।

(৩) কেউ কেউ বলেন, হাদিসে আহল (أهل) বলতে নিজের পরিবার পরিজন বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নিজের নিকটতম আত্মীয়-ব্যজন।

(৪) আল্লামা তকী ওসমানী বলেন, ইহা মূলত কাফাফারার জন্য ছিল না, বরং সদয় স্বরূপ ছিল। পরবর্তীতে ক্ষমতা হলে কাফাফারা আদায় করতে হবে।

মোটকথা, অপন পরিবারের লোকদেরকে কাফাফারার বন্ধু খাওয়ানো জায়ে নয়।

* ঐনির্দেশের উপর এরূপ শব্দ যা এরূপ কোন অর্থ বুঝায় যার জন্য শব্দটিকে নেয়া হয়নি। কোন রকম চিন্তা-ফিকির ছাড়া প্রথম প্রবণের সাথেই বাক্য দ্বারা তা বোঝা যায় না। (التقصيف ص ۱۰۵)
রমযানে সহবাসের ক্ষেতে কীর্তির উপর কাফরার ওয়াজিব কিন্তু:
* দাউদ যাহেরির মতে, রোয়া অবস্থায় কীর্তি সহবাস করলে, কীর্তির ইচ্ছা থাকবে বা না থাকবে কোন অবস্থালেই কীর্তির উপর কাফরার ওয়াজিব নয়।
* তবে সকল ফুকাহা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রোয়া অবস্থায় কীর্তি সহবাস করলে যেভাবে যামীর উপর কাফরার আদায় করা আবশ্যক, অনুরূপ কীর্তির উপরও কাফরার আবশ্যক হবে, যদি সহবাসে কীর্তির ইচ্ছা থাকে। হাঁ, কীর্তির যদি সহবাসে বাধ্য করা হয় এবং ইচ্ছা না থাকে, তাহলে তাকে কাফরার দিতে হবে না; বরং কায়া আদায় করলেই চলবে। এদিকে ইসলাম করে আল্লামা খাতাবী বলেছেন:-
"যদ্যপি কোন িদ্ষা করে, তবে তার উপর কায়া ওয়াজিব হবে, কাফরার ওয়াজিব নয়।

بابَ فيَّمْنَ مَاتِ وَعَلَّمَهُ صَيِّيَّمَ صِٰحَةٰ ٣٦٢

যে ব্যক্তি রোয়ার কায়া বাকি থাকবাবহয় মূল্যবান করে

عنَّ قَوْنٍةَ أَنّ اللَّهَ ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن مَاتَ وَعَلَّمَهُ صَيِّيَّمَ صَامًّا عَنَّهُ وَلِيَّةً﴾ (بخاري 1 ص 362 باب من مات وعليه صوم مسلم 1 ص 362 باب قضاء الصوم عن اليمين)

অনুবাদঃ ... আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ধিত। তিনি বলেন, নবী করিম (صagina ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার উপর কায়া রোয়া থাকবাবহয় মারা যায় তার উত্তরাধিকারী তার পক্ষ হতে তা আদায় করবে।

বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি রোয়া অনাদরী রেখে মারা গেলে ওয়ারিশগণ সে রোয়ার
কায়া আদায় করবে, নাকি ফিদায়া প্রদান করবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈকো
রয়েছে।
* ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মতে, উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পক্ষ হতে রোহা রাখা জায়েয়। (সমাপ্তচ ৫ ৫৭২)

দলিল ১ অনুমতার শুরুতে বর্ণিত হাদিস।

দলিল ২ একদা একটি মহিলা নবী করিম (সা.ও.সি.-এর নিকট এসে বললে-

... বা রসূল ল্য়ে কান উল্লেখ রোহার চুন্ন থাকে ও স্বীয় নজর আদায় জাতি তোমাদের নামে। (সংজ্ঞা ১ ৩৬২, তৃতীয় ১ ২৫৬ পাপ নিষেধে প্রথম পণ্ডিত অবাধ, ১১ মাহী, ১৭)

অর্থাৎ, ... হে আল্লাহর রাসূল! আমার (মৃত) মায়ের উপর এক মাসের রোহার দায়ভার ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোহা রাখব? নবী করিম (সা.ও.সি.) বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোহা রাখ।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.) প্রথমে ভিক্ষু পোষণ করলেও পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন।

* আব্ব ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, কোন প্রকার রোহার ক্ষেত্রে হলাভিনিত্ত নিয়ে। অজ্ঞাত, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোহা আদায় করা জায়েন নয়। বরং প্রতিটি রোহা বিনিময়ে একে মিসকীনকে দুই বেলা খাদ্য খাওয়াবে। (শর্ত, সম্পূর্ণ ১ ৩৬২)

দলিল ১ নিন্দিত বলা কিছু যে, এটি রোহার একটি নজর সৃষ্টি হয়।

দলিল ২ বলা যে, অনির্দিষ্ট নজম নিলে কোনো প্রাণীর শোধ করা অতি দুর্ভাগ্য।

* ইমাম আবদুল্লাহ ব্রাহ্ম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রময়ান মায়ের রোগদানের হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুখ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদায়া প্রদান করত) মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কায়া থাকবে না।

দলিল ২ বলা যে, ইমাম আবদুল্লাহ ব্রাহ্ম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রময়ান মায়ের রোগদান হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুখ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদায়া প্রদান করত) মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কায়া থাকবে না।

* ইমাম আবদুল্লাহ ব্রাহ্ম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রময়ান মায়ের রোগদান হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুখ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদায়া প্রদান করত) মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কায়া থাকবে না।

* ইমাম আবদুল্লাহ ব্রাহ্ম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রময়ান মায়ের রোগদান হয় এবং সে ঐ অসুখ হতে সুখ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে তার পক্ষ হতে (ফিদায়া প্রদান করত) মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। এবং তার উপর এর কায়া থাকবে না।
পক্ষ থেকে কায়া করে দিলে তা শুদ্ধ হবে কি? তিনি বললেন, না। তবে তুমি তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের জন্য কোন একজন মিসকিনকে সদকা কর। এটা তোমার রোয়া অপেক্ষা উত্তম।

দলীল (৩) ইবন আকাসাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

লা ّيُ صَلِي عَلَيْهِمْ أَحَدٌ عَنِ أَحَدٍ وَلَا يُصوُّمُ أَحَدٌ عَنِ أَحَدٍ ٍ(بِيِّنَهُ ج ۴، حَمَّادِي ج ۲۵۷)

অর্থাৎ, কোন কারো পক্ষ থেকে নামায় পড়বে না এবং কোন কারো পক্ষ থেকে রোয়া রাখবে না।

দলীল (৪) হযরত ইবন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত:

لَا يُ صَوُّمُ أَحَدٌ عَنِ أَحَدٍ وَلَا يُ صَلِي عَلَيْهِمْ أَحَدٌ عَنِ أَحَدٍ ـ (مَوْطِئَ اَمَامَ مَالِكَ ص ۴۴)

অর্থাৎ, কোন কারো পক্ষ থেকে রোয়া রাখবে না এবং নামায় পড়বে না।

কোন সাহাবী থেকেও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাঁরা একজনের বদলে অন্যজন রোয়া রেখেছেন বা নামায় আদায় করেছেন। বরং তাঁরা এ ধরনের ইবাদত প্রত্যেকেই নিজে নিজে আমল করেছেন।

(নস্ব طبحة ج ۲۳)

তাহাড়া রোয়া হচ্ছে নামায়ের ন্যায় একটি শারীরিক ইবাদত। আর নিঃক শারীরিক ইব্যাদতের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব জারী নয়।

সুতরাং উল্লেখিত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিত হেক অথবা মৃত হেক একজনের রোয়া আরেকজন রাখা জারী নয়।

প্রতিপক্ষের দলীলের জবাবঃ ইমাম আহমদ ও ইসহাকের দলীল দুটোর জবাবে আহনাফগণ বললেন যে-

(১) প্রথম হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আরিশা (রাঃ) নিজেই তার বিপরীত উক্তি করেছেন। (আমরা যেমন এর পূর্বে বর্ণনা করেছি) তাই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথবা তারা হাদিসের যে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা ঠিক নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, অভিভবক তার যিথম্মা থেকে রোয়ার ফিদমারী হতে নিয়ূক্তি পেল। আর তাহল মিসকিনকে খানা খাওয়ানো।

(২) আল্লামা তিব্বি (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলনে—

مَعْنَاهُ يُقُلُّ عَلَيْهِمْ مَا يُقُومُ مَعَّالِمِ الصَّوُّمِ وَهُوَ الْإِطْعَامُ

অর্থাৎ, ওলী এমন কাজ করবে যা রোয়ার বা মিসকিনকে চাই। আর তা হচ্ছে খাদ্য প্রদান। যা অর্থাৎ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।

যেমন, নবী করিম (س) তামিমকে অমূ দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন—

“أَنْ تَرَابِصُ وَضَعُتُ الْمُسْلِمِ” অর্থাৎ, মাটি মুসলমানের ওয়ায়।
মূলত উত্তরাধিকারিগণ মৃত ব্যক্তির বিস্ম্য থেকে রোষার বিস্ম্যাদারী উঠিয়ে নিবে। এ বাখ্যাপনাতে হযরত আয়িশার হাদিসটি আমাদের (আহ্নাফদের) দলীল। আপনাদের দলীল নয়।
(৩) অথবা হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদিসটি রহিত হয়ে গেছে।
(عبدا البلشي ج ١٩٠ ص ٤٧) (৩)

(৪) হযরত আযানার শাহ কাশ্মিরী (রহ,) বলেন, বিভ্যত হাদিসের "صُوُمُيْ عَنْهَا" উক্তিতে আদেশ বাধ্যবাধকতা অর্থে নয়। বরং সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মুজাহাব ও ইহসান হিসেবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং অধিকাংশ সুদূর ( محکمة) রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় সন্দাবা (محكمه) রেওয়ায়েতের দ্বারা দলীল সহিত নয়। মোটকথা, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে ওলী রোয়া না রেখে ফিদিয়া আদায় করবে।
(درج مكبمه ج ٢٠٥ ص ٤٧) (৪)

سُفَرُ ٨: باب الصوْم في السِّفر ٣٩٦

)... عَنْ عَائِشَةٍ بْنَيْنَةِ النَّسَابِيَّةِ سَأَلَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّى أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصُّوْمَ أَفَاصِبُومُ فِي الْسِّفرِ قَالَ صَمٌّ إِنْ شَيْتُ وَافْطَرَ إِنْ شَيَتْ (بع hari ج ١٠١ ص ٣٨٦ باب الصوم في السفر والأفطار، مسلم ج ١٣٧ ص ٣٨٦ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر الغير، ترمذي ج ١٠٤ ص ٣٦٢ باب الرخصة في الصوم في السفر، نسائي ج ١٣٤ ص ٣٨٣ سرد الصيام، ابن ماجة ج ١٣١ ص)

انعابادঃ ... أَيْشَةٍ (رَأِي) হতে বর্তি, তিনি বলেন, হাব্বা আল অসলামী (রা) নবী করীম (سা)-কে জিজ্জাসা করেন, ইয়া রাসূললালাহ! আমি প্রায়ই রোয়া রাখি। কাজেই আমি কি সফরকালে রোয়া (রমায়ানের) রাখব? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে রোয়া রাখতে পার, কিংবা ইফতারও করতে পার।

সফর অবস্থায় রোয়া রাখার হুকুমঃ সফর অবস্থায় রোয়া রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

* কতিপয় আহলে মাহিরের মতে, সফর অবস্থায় রোয়া রাখা জারি নয়। বরং রোয়া রাখলে তা পুনরায় মুক্তিম অবস্থায় কাজ করতে হবে।
(فتح الباري ج ٤٩ ص ٢٠٩)

(৬) আল্লাহর বাগী- (১) ৫ আল্লাহর বাগী-
দলীল

"আহলামা তাবারী (রহ.) বলেন, সফর অবস্থায় রোয়া ভাঙ্গা জায়েহ নয়।

দলীল: আহলাহ তাবারী বাণী- "ফেন শেহ মেনকম শহর চিস্তাহার অর্থাৎ, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোয়া রাখবে।" (বাবারাহ ১৮৫)

* ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আওয়াই (রহ.)-এর মতে, সফর অবস্থায় সাধারণত রোয়া না রাখাই উত্তম। ইমাম শাফেরী (রহ.)-এর একটি রেওয়ায়েত অনুরূপ।

(ফতুহ বায়রি, p. 116)

"আহকামুল হাদিস" ৬৩৬ সূরা অধ্যায়

অর্থাৎ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অনুষ্ঠান থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সেই রোয়া পুরোপুরি করে নিতে হবে। (বাবারাহ ১৮৪)

উক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, সফরের কারণে যেহেতু অন্যদিন রোয়া রাখার সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সুতরাং রমজানে রাখালে তা অসময়ে পালন করা হবে, যা উচিত নয়। অতএব পুনরায় রোয়া রাখতে হবে।

ক্রামিক কোষে মুসলমানের সফরের অর্থাৎ, ... জাবির ইবনে আলাদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রমজান মাসে সাওরত অবস্থায় রাসূল উদেশ্যে বের হলেন। এরপর যখন তিনি ‘কুরাউল গামিয়া’ নামক স্থানে পৌছেছিলেন, তখন লোকেরা সাওরত ছিল। এরপর তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। ফলে লোকেরা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করল। এরপর তিনি পানি পান করলেন। তখন তাঁকে বলা হল, কতিপয় লোক (যেখানো) সাওরত অপেক্ষা রয়েছে। তিনি বললেন, তারা অবাধ্য, তারা অবাধ্য।

সুতরাং উক্ত হাদিসের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, রোয়া রাখার সময়ের পরিবর্তে রোয়ারদেরকে গোনাহার বা অবাধ্য বলা হয়েছে। সুতরাং রোয়া রাখা কিভাবে অদ্যাবধি হবে?

* আলাহামা তাবারী (রহ.) বলেন, সফর অবস্থায় রোয়া ভাঙ্গা জায়েহ নয়।

দলীল: আলাহ তাআলার বাণী- "ফেন শেহ মেনকম শহর চিস্তাহার অর্থাৎ, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোয়া রাখবে।" (বাবারাহ ১৮৫)

* ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আওয়াই (রহ.)-এর মতে, সফর অবস্থায় সাধারণত রোয়া না রাখাই উত্তম। ইমাম শাফেরী (রহ.)-এর একটি রেওয়ায়েত অনুরূপ।

(ফতুহ বায়রি, p. 116)

"আহকামুল হাদিস" ৬৩৬ সূরা অধ্যায়
দলীল (১)। আল্লাহর বাণী -

"যে প্রেরকটি আল্লাহ প্রদান করেন তার লাভ হয়।"

দলীল (২)। অনুমোদনের ঘুরতে বর্তমান হাদিস।

দলীল (৩)।

"সে আল্লাহ বাণী যে প্রেরকটি আল্লাহ প্রদান করেন তার লাভ হয়।"
দলীল

গ্রহণ করিয়া মোহাম্মদ বলেন, যে রসূল নবী বিশ্বাসিত হন আল্লাহ ও রহমত প্রদান করেন।

রোয়াণা (৫) বলেন, একদা আমরা রসূল উপাসনা করলাম।

আরাফত, আবু দারাদ (রাছ) হতে বর্ষণি, একদা আমরা রসূল উপাসনা করলাম।

মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল উপাসনা করেছেন।

জবাবঃ আহলে মাহরর্গের প্রথম দলীলের জবাবঃ (১) তাঁরা আযাতের খণ্ডাণ্ডের ভিত্তিতে রোয়াণা রাখা অবৈধ বলেছেন।

(২) তাছাড়া এই আযাতে রোয়াণা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে কেবল, রোয়াণা রাখতে নিষেধ করা হয়নি।
(৩) আলামা আহীন (রহ.) বলেন, উত্ত আয়াতে একটি শব্দ উহা (মহ্ত্যু) রয়েছে।
যেমন, আয়াতটি হবে-

ফুম কান মল্কার মিহরা অরে সবার (ফাকরেন) ফেরাদে মনি আমাদে।

অর্থাৎ, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুখ আর সফরের থাকা অসম্ভব “রোহা ভঙ্গ করেছে” তার পক্ষে অন্য সময়ে সেই রোহা পুরণ করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবে নবী করিম (সা).-এর (তারা আবাদ্য) বলার কারণ হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্যককে কোন পাধ্য না দিয়েই রোহা রাখা শুরু করে অথবা যে রোহা রাখার দ্বারা তার কর্ম হয়, সেক্ষেত্রে নবী করিম (সা) এই উক্তিটি করেন। নতুন স্বয়ং নবী করিম (সা) রোহা রাখতেন না। নায়ে যারা রোহা রাখতেন তাদেরকেও তিনি কোন দিন তিরস্কার করেননি। যেমন-

... উনিতে সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব (আবু সাবিদ হথর্যার)

খর্গিতাম মুন্তা মুন্তা মুন্তা মুন্তা (আবু যাবদ হথর্যার)

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

সালেন আ সামান রাজিয়া ফি সফার ফালাব

* আলামা তাবারী প্রদত্ত দলীলের জবাবে বলা যায় যে, যেখানে স্বয়ং আল্লা তালালা আর স্পষ্টভাবে অবকাশ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে এমন কথোরতা করা আদৌ ঠিক নয়।

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীলের জবাবে নবী করিম (সা) অর্থাৎ

"সফর রোহা রাখা পূর্ণত্ব কাজ নয়।" অনুসারে এ উক্তিটি নবী করিম (সা) কোন অবশ্য পরিপ্রেক্ষিত বলছিলেন সেদিকে একটি নয় নয় দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট বুঝে আসে। অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমের কারণে সে লোকটি যখন অজ্ঞাত হয়ে মৃত্যুর কাহারা পৌঁছে গিয়েছিল, তখন নবী করিম (সা) বলেন- 

নবী করিম (সা) বলেন যে, সফর অবশ্য অসহায় কর্তা দের সময় উন্নত, সে কথা তো আমরাও বলি। (দ্রুত তরিমী জের. ৫০৩)
ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দ্বিতীয় দলীলের জবাবে যদিও সফর অবস্থায় রোয়া না রাখার অনুমতি প্রদান একটি বিশেষ সুযোগ ও নেয়ামত। কিন্তু লক্ষ্যীয় বিষয় হল-এই সহজ বিষয়টা গ্রহণ করাকে মর্যাদার প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়নি। বরং উত্তম বা মর্যাদার প্রতীক হিসেবে আল্লাহ তাআলা বলনে-"ও আল্লাহর ক্ষেত্রে হে নাম-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাম"

* কতিপয় আলিমের প্রদত্ত অভিমতের জবাবে বলা যায়-

যদিও সফর অবস্থায় রোয়া রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে, তবে এ কথা সত্য যে সফর অবস্থায় রোয়া রাখাই উত্তম এবং যুক্তিযুক্ত। কেননা, সফরে রোয়া রাখা কষ্টকর। আর যে বিষয় কষ্ট করে ইবাদত পালন করে তার সওয়াব বেশি হওয়া বাঙ্গালীয়। তাহাঁড়া রোয়া রাখা যে উত্তম তার স্বপক্ষে কুরআনের নাস (দলীল)

রয়েছে-"ও আল্লাহর ক্ষেত্রে হে নাম-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাম"

রোয়ার নিয়ত

৬৪০ রোয়ার নিয়ত

... উন্হর বিশেষে রণ্জ নূরর সালাল্লাহু আলাম বলে নাম-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাম নাম-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাম।

(সুরা হাফসা: 327)

অনুবাদঃ ..... নবী করিম (সাহ) এর ক্ষেত্রে হে নাম-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল তাঁহার ইমরাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোয়ার নিয়ত করবে না, তার রোয়া হবে না।

বিশেষের নিয়ত বা দৃঢ় সংকল্প করা সকল ফজর কাজের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

রোয়ার জন্য নিয়ত করা ফজর। নিয়ত ব্যতীত রোয়া সহশুন হবে না। (সুরা হাফসা: 31)

(গল্পের জন্য)

যেমন, নামাজের নিয়ত ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হয় না। তবে রোয়ার নিয়তের সময় কখন এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* ইমাম মালিক ও ইবন আবিবিগুলির ব্যবহার (রহ.)-এর মতে, সব ধরনের রোয়ার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করা ফজর। রময়ানের ফজর রোয়া হোক কিংবা কাফফরার রোয়া হোক অথবা মাস্তরের রোয়া বা নফল রোয়া হোক অথবা ওয়াজীর রোয়া হোক। সুবহে সাদিকের পর নিয়ত করলে রোয়া হবে না।

দলীল (১) অনুসারে অনুক্রমের গুরুত্বে অর্থিত হাদিস। উত্তর হাদিসে কোন রোয়াকেই নিদশত করা হয়নি।
কিন্তু দলিলের রূপে রোষ সুবহে সাদিকের পর থেকে শুরু হয়। বেলে নামক কাজের নিয়ত তা শুরু হবার আগেই করতে হয়। যেমনঃ নামায়ের নিয়ত নামায শুরুর পূর্বেই করতে হয়। সুতরাং রোষার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বে হতে হবে। এটাই স্বাভাবিক।

* ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মতে, সুবহে সাদিকের পূর্বের নিয়ত করা ছাড়া ফরয় এবং ওয়াজিব রোষ শুধু হবে না। তবে নফল রোষার ক্ষেত্রে সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে যাওয়ার পরেও নিয়ত করা যাবে।

দলিল (১): অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত হাদিস। উক্ত হাদিসটি ফরয় ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফেঈ ও আহমদ (রহ.) বলেন, যেকোন নফল ইবাদত ভঙ্গ করলে, কায় ওয়াজিব হয় না। রোয়ার করবার একই হক্কুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নফল রোষার ভেঙে ফেললে এর কায় করা ওয়াজিব নয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে রাত্র থেকেই নিয়ত করা আবশ্যক নয়।

(মালীক ৩: ১০২)

... এই রসূলের নিয়ম ঝল্লা উল্লেখ স্থল পাঠ্য নিয়ম তার প্রমাণ এক্ষেত্রে নিয়ম পুনরুদ্ধার করা।

দলিল (২): আমি হাফিজ বলেন যে কাজ যেখানে করা হয় তা করা হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর (উমরেনার) নিকট প্রবেশ করে পানীয় আনালান। অতঃপর তা পান করলেন। তাপর তা তাকে মালার করলেন। ফলে তিনি বললেন, ইয়ারাসুলাহ! আমি তো রোষাদার ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, নফল রোষাদার নিজের নফসকের আমানতদার। সে ইচ্ছে করলে রোষা রাখতে পারে, আর ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারে।

দলিল (৩): আপনি হাফিজ বলেন যে দৃশ্য কোন খিরণ জানা কাজে ফাটায় যাতে।

(সোম চ: ১৫৫)
কানের ফেলে ত্রস্ত হয়ে আনন্দ সৃষ্টি নেওয়া এক সমস্ত দুঃখ মিলিয়ে উঠে হয়ে আর করে, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, রোহা অবশ্য আমি আমার শ্রীর সাথে সহায়তায় পাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের মন্দ কোন দাস দাসী আছে কি? সে বলে, না। তিনি বলেন, তুমি কি কম্পিউটার দুর্গাম রোহা রাখতে সক্ষম? সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কম্পিউটার দুর্গাম রোহা রাখতে সক্ষম থাকবেন? সে বলে, না। তিনি তাকে বলেন, তুমি বস। এ সময়ে নবী করিম (সাহেব)-এর নিকট এক ‘ইরক’ (থালি ভর্তি) খেলুন এল। এরপর নবী করিম (সাহেব) তাকে খুরমা ভর্তি একটি থালি প্রদান করে বলেন, তুমি তা দরার সহকার। সে ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলালাহ! মদ্দিরার উভয় পার্শ্ব আমার চাইতে অভাবতাত্ত আর কোন পরিবার নেই। রাবি বলেন, এতে রাসূলালাহ (সাহেব) এমনভাবে হেসে উঠেন যে, তাঁর সম্মুখের দরগাজি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বলেন, তবে তোমার তা ভক্ষণ কর। রাবি মুসাদ্দা অন্য বর্ণনায় বলেন, তাঁর দরগাজি বের হয়ে পড়ে।

বিশেষতঃ রোহার কাফরারা কেবল সহায়তায় সাথেই নিদর্শি, নাকি সহায়তায় পানাহার সবকিছু করায় কাফরারা দিতে হবে, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতঘোষী রয়েছে- * ইমাম শাফেখ ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, কাফরারা প্রু ঐ ব্যক্তির উপর যস্যিয় হবে, যে সহায়তায় দরকার রোহা ভঙ্গ করে অর্থাৎ কাফরারা সহায়তায় সাথে নিদর্শি। তাই ইচ্ছা করে কেউ পানাহার করলেও তার কাফরারা যস্যিয় হবে না। কেবল কাফরা যস্যিয় হবে।)

দলীল (১) পানাহারের ক্ষেত্রে কাফরারা আরোপ করা কিয়াসের পরিশ্রমী। কেননা পানাহারের দরার কাফরারা যস্যিয় হওয়ার কথা কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নেই।
কল্যাণের উদ্দেশ্যে হৃদয়মলিন করলেন খাদ্যের একাধিক মৌলিক বস্তু যা ভর্তীর মাধ্যমে, চিত্তের লালনপালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ রেখা পরিকার দেখা যায়। অতঃপর রোয়া পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (বাক্যাং ১৮৭)

উক্ত আয়াতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সবচেয়ে সাদিক পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর রোয়ার হুকুম শুরু হবে। সুতরাং একথাতো স্পষ্ট যে, রাত্রে নিয়ত করার কোন সুযোগই থাকল না। অতএব নিঃসনদে দিনে নিয়ত করত হচ্ছে। সুতরাং এতে বুথা যায় যে, নিদিষ্ট ফরহ রোয়ার ক্ষেত্রে রাত্রে নিয়ত করা আবশ্যক নয়।

দলীল (৩): ফরহ রোয়ার ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল-
যে সব ফরহ রোয়া নিদিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, সে রোয়ার সময়ে অন্যা কোন রোয়ার নিয়ত করলেও তা আদায় হবে না। কারণ ঐ সময়টিকে ঐ রোয়ার জন্য নিদিষ্ট। যেমন, রমণান মাস রমণানের ফরহ রোয়ার জন্য নিদিষ্ট। সুতরাং, এ সময় অন্যা কোন রোয়ার রাখা যাবে না। এই বাধ্যবাধকতা অনেকটা নিয়তের কাহাকাছি। তাই এসব ক্ষেত্রে বিপ্লব পর্যন্ত রোয়ার নিয়ত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

দলীল (৪): নফল রোয়ার ক্ষেত্রে আবু হানিফা (রহ.)-এর দলীল-

* আল্লাহ বলেন, নবিবের কারণে (সাহ) আমার নিকট আগমন করলে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের নিকট কি খাবার আছে? আমরা না বললে, তিনি (সাহ) বলতেন, আমি রোয়া রাখলাম। রাবী ওয়াকী অতিরিক্ত বর্ষনায় বললে, এরপর একপর্ব তিনি আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা বলি, ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমাদের জন্য হায়েস (ও আটা মিশ্রিত খেজুরের তৈরী এক প্রকার সুবাদু খাদ্য) হাদিয়া এসেছে। আর আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি (সাহ) বললেন, তা আমার কাছে নিয়ে আস। এরপর তিনি (সাহ) সকাল হতে রাখা রোয়া ভেঙে ইফতার করেন।
উক্ত হাদীসে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবী করিম (সা) নফল রোয়ার নিয়ত ফজরের পরেও করেছেন।

দলীল (৫) রমযানের কায়া, কাফফরা এবং সাধারণ মামলার রোয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু বিশেষ কোন দিন নিদিষ্ট নেই, সেহেতু পুরো দিন ঐ রোয়ার সাথে নিদিষ্ট করার জন্য রাত্র থেকেই নিয়ত করা আবশ্যক। সুতরাং হাফসা (রা)-এর হাদীসটি উল্লিখিত তিন ইমামের দলীল নয়, বরং হানাফীদের দলীল। কেননা হাদীসটি নিদিষ্ট কোন রোয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং ব্যাপক।

তাই আহনাফুগণ বলেন, হাফসা (রা)-এর হাদীসটি মূলতঃ রমযানের কায়া, কাফফরা ও সাধারণ মামলার রোয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। কেননা ফরয়, ওয়ালিবের ক্ষেত্রে ফজরের পরে যে নিয়ত করা যাবে তা ইতিপূর্বে দলীলসহ প্রমাণিত হয়েছে।

জবাবঃ তিন ইমামের প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-  
(১) হাফসা (রা)-এর হাদীসটি মারফু নাকি মাওকুফ, এ নিয়ে এখতিলাফ রয়েছে।
যেমন, হাদীসটির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে-  
{
hoqata, fihi, idarab
}

সুতরাং উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে প্রগণমূল্য নয়।
(২) কেউ কেউ বলেন, হাফসা (রা)-এর হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ যার মোকাবেলায় কুরআনের আযাত কেনে ও দিয়ে তিনি তাদের থেকে নিয়ত করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কুরআনের আযাতই প্রাধান্য পাবে।
(৩) হাফসা (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত মন, তাঁ সম্মানে চূড়ান্ত ফজর দ্বারা সেহেরী খাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সেহেরী খায়নি।
{
qala, samam, nahu
}
(তার রোয়া আদায় হবে না) যদি তথা রোয়া পরিপূর্ণ না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেহেরী গ্রহণ না করলে রোয়ার পরিপূর্ণ সামর্থ্য পাওয়া যাবে না।
(৪) অথবা হাফসা (রা)-এর হাদীস দ্বারা মুসত্তাহব সময়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাতে নিয়ত করা মুসত্তাহব, তবে দিনের নিয়ত করা জায়ের আছে।
(৫) সর্বপরি বলা যায়, হযরত আরিশা (রা)-এর হাদীসের দ্বারা হযরত হাফসা (রা)-এর হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

ইমাম শাফেরী ও আহমদ (রহ.)-এর অভিমত, “নফল রোয়ার (ও নামায়ের) কায়া ওয়াজব নয়”-এর জবাবঃ
দলিল (১) আল্লাহ তাআলার বাণী- যদিও ইমাম শাফিই (রহ.)-এর মতে, নফল রোয়া ভাঙ্গার দরুন কায়া ওয়াজিব নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, নফল রোয়া ভাঙ্গার দরুন কায়া করা ওয়াজিব।

(২) মুহাম্মদ (৩৩) নফল রোয়াও (এবং নফল নামায়) একটি আমাল। সুতরাং তা ভেঙে ফেললে অবশাই কায়া করতে হবে।

দলিল (২) উন্নতীশের দালত আহ্দির লাহোর খুলিত ও অট্টালা চাঁদীগুলো ফাটভুর না... (কিন্তু ডালত রসূল লুলি ধনি কিন্তু লাহোর কর্মস্থানে লাহোর ভাঙ্গার উল্লেখ তা কেছে ফেলে।) এরপর রাসূল সাহাবা (সাহ.) হজরি হলে, আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূল সাহাবা। আমাদের জন্য কিন্তু ডালত হোক এর লাহোর ভাঙ্গার উল্লেখ তা কেছে ফেলে। রাসূল সাহাবা (সাহ.) বলেন, কত্তি নেই। তোমাদের উল্লেখের জন্য অন্য কোনও রোয়া কায়া করতে হবে।

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, এটি ছিল নফল রোয়া। নতুনা ফরম রোয়াতাঁ এবার ভেঙে ফেলতেন না। আর নফল রোয়া ভাঙ্গার দরুন অন্যদিন কায়া করার কথা বলা হয়েছে।

জবাব (১) উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ ওজরের কারণেও নফল রোয়া ভাঙ্গার জায়ে আছে। আর তাই তো বলা হয়েছে- ইন শা মাউন এন শাআ।

কিন্তু অপর হাদিসে কায়া করার মুক্তিও দেয়া হয়েছে।

(২) তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শাফেই (রহ.)-এর বর্ণিত হাদিসে নবী করীম (সাহ.) রোয়ার কায়া হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেননি। আর কোন বিষয় উল্লেখ না করা, তা অবশ্য হওয়াকে নিষেধ করে না।
(৩) অথবা, প্রাথমিক অবস্থায় নফল রোধা রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল।
কেউ রাখতেও পারে, নাও রাখতে পারে। কিন্তু রেখে ভেসে দিলে কায়া করতে হবে।
কিন্তু শাফেঈ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদিস দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, রোধা রাখার পর
ভেসে ফেললে তা কায়া করতে হবে না।

* উম্মে হানিনা (রাও)-এর হাদিসের জবাবে বলা যায়—

(১) উম্মে হানিনা হাদিসটি আল্লামা আইনী ও তিরমিয়ী রহ মতে অসঙ্গত পূর্ণ
আর অসঙ্গত পূর্ণ হাদিস দলিলযোগ্য নয়।

(২) উক্ত হাদিসে লক্ষ্যীয় যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের দিন। আর মক্কা বিজয়
হয়েছিল রম্যান মাসে, আর রম্যান মাসে যে নফল রোধা রাখা জায়গায় নয়,
একথা তো সর্বজনবিদিত। অতঃ হাদিসে নফল রোধার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং
হাদিসটি কোনক্রীত দলিলযোগ্য নয়।

িতিকাফ

৩৩৪/ পাপের আত্মীয় সন্ততির কারণ

... যে আল্লাহ তোমাদের ফরুক্ত দিয়েছে সেইসময় তোমরা তাদের চেয়ে নিচু হওয়ার
রক্ষার জন্য তাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কাছে যে তোমরা সেই ইচ্ছা দেখে তোমাদের
প্রতি বিরূপ করে। তবে যে যে পর্যন্ত তোমরা যত দৃঢ়তায় তা তাই তোমাদের
অনুসারিদের কাছে আমন্ত্রণ করতে পার। এমনি হলের জন্য তোমরা তাদের
কাছে প্রতি করে যে তোমাদের প্রতি যে হাসি তার প্রতি সত্ত্বেও তোমাদের
অনুসারে তোমাদের প্রতি করে যে তোমাদের প্রতি হাসি

ইতিকাফের অভিধানিক অর্থ:

পাপের আত্মীয় সন্ততির কারণ

ইতিকাফের মাসাদার হয়েছে। এর মূল
ধাতু হচ্ছে ইতিকাফ অর্থ হচ্ছে।

* কোন জিনিসের নিকট অবস্থান করা এবং সেটা আঁকড়ে ধরা।

যেমন কুরআনে আছে—

चेम्बर इजराइली बहर फातेमा उन्होंने सालाना पूर्ण १५ वर्षों
अर्थां, बलूं आम राहते पारे करे दिये है। बनी इसराइलीसे। तारा एमन एक
सम्प्रदाय के काहे गिये पूঠালো, यारा तादेर मूर्ति पूजाके আঁকড়ে ধরেছিল।
(আরাফঃ ১৩৮)
মাহে তুমি মুহাদ্সিলের তর্কে আমন্ত্রিত হবে তোমাকে ভেবে নিও।

যেমন কুরআনে এসেছে -

আর্থত, এই মূর্তিগুলো তোমার সাথে তোমার নিজের কাছে আটকিয়ে রেখেছে?

(আমিসহ ৫২)

আর্থত, নিজেকে বদনী করো।

নির্দিষ্ট পরিভাষিত বাস করো।

মসজিদে অবস্থান করো।


dr. সরফরাজ বেগ মোহিনী

ইতিকাফের পরিভাষিত সংজ্ঞা:

হো ইরাকায় মসজিদ অবস্থান করো।

(২) আল্লাহর নামাযত বেগ মোহিনী বলেন হো ইরাকায় মসজিদ অবস্থান করো।

(৩) আল্লাহর নামাযত বেগ মোহিনী বলেন হো ইরাকায় মসজিদ অবস্থান করো।

(৪) কেউ কেউ বলেন হো ইরাকায় মসজিদ অবস্থান করো।

(৫) কেউ কেউ বলেন হো ইরাকায় মসজিদ অবস্থান করো।

ইতিকাফের প্রকারভেদ:

(১) সূর্য ইতিকাফ - সূর্য ইতিকাফ হল যে ইতিকাফ গুলো পবিত্র রমণাঙ্গনের শেষ দেশে অকৃষ্ঠ তারিখের রাত (তথা বিশ্ব তারিখের সূর্যাঙ্গনের পূর্ব) থেকে নিয়ে ঈদের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতিকাফের নিয়ত মসজিদে থাকা হয়।

(মুফতি মুন্তসার আলী ১২৩৫, মুফতি মোহিনী ১২৩৫)
যেহেতু নবী করিম (সা.) প্রত্যেক বছর এই দিনসমূহে ইতিকাফ করতেন, এজন্য একে সুন্দর ইতিকাফ বলা হয়। [যদিও বিশেষ কারণে নবী করিম (সা.) থেকে রমণায়ে দুইবার ইতিকাফ ছুটে গিয়েছিল।]

আল্লামা চল্পী (রহ.) লিখেন- 

লাও ল্যাবি সিলে ল্যাবি আল্লাহ উল্লাহ ও ল্যাবি অল্যাবি ফি- 

العشر الأخیر من رمضان (حاشية جليلي على التنبين ج 1 ص 347).

অর্থাৎ, কারণ নবী করিম (সা.) রমণায়ের শেষ দশকে সবর্দা এই ইতিকাফ করতেন।

ইহা সুন্দরে মুহাম্মদ কিফায়া। অর্থাৎ একটি মহল্লা বা জনপদে কোন একজন যদি ইতিকাফ করে তাহলে পূরা মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে এর সুন্দর আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু পূরা মহল্লা থেকে যদি একজনও ইতিকাফ না করে, তাহলে সমস্ত মহল্লাবাসীর উপর সুন্দর ছাড়ার জন্য হবে। (احكام اعتكاف ص 31)

উল্লেখ যে, রমণায়ে যে ইতিকাফ মাসনূন তা দশদিনের কম হলে সুন্দর আদায় হবে না।

(التبيين الحقائق ج 1 ص 248 معرف السنة ج 2 ص 191-192)

(2) ওয়াজিব ইতিকাফঃ ওয়াজিব ইতিকাফ হল, যা মামতের দ্বারা ওয়াজিব হয়ে থাকে অথবা কোন সুন্দর ইতিকাফ বিষয় করার ফলে এর কায়া ওয়াজিব হয়ে থাকে।

(3) নফল ইতিকাফঃ ইহা হচ্ছে উপরোলিখিত দু’প্রকার ইতিকাফ ছাড়া অন্যান্য ইতিকাফ। আর নফল ইতিকাফ যে কোন সময় আদায় করা যায়।

(التبيين الحقائق ج 1 ص 248 معرف السنة ج 2 ص 191-192)

উল্লেখ যে, মহলারাও বীর গুহে ইবাদতের জন্য নিদিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে তখনই ইতিকাফ করতে পারবে, তবে একেতে স্বামীর অনুমতি নেয়া আবশ্যক। তাছাড়া ইহাও অত্যাবশ্যক যে, তাকে হায়ের ও নেফাস থেকে পবিত্র হতে হবে।

(بدائع الصنائع ج 2 ص 106-107 , إحكام اعتكاف ص 19)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ ওয়াজিব এবং সুন্দর ইতিকাফ সবসম্মতিক্রমে রোয়া রাখা শর্ত। কিন্তু নফল ইতিকাফে রোয়া রাখতে হবে কিনা এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছেः

* ইমাম শাফেঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের মতে, নফল ইতিকাফে রোয়া রাখা আবশ্যক নয়। কেননা, ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মদ ও আহমদ (রহ.)-এর নিকট নফল ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে। এক মুক্তি। তথা নফল ইতিকাফের জন্য সময়ের কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। আর আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট দিনের অধিকাংশ সময়।

(عهد الفارق ج 11 ص 140)
দলীল (২) হয়তহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত- "সোমের মুক্তফ"।

অর্থাৎ, ইতিকাফারীর রোহা প্রয়োজন নেই।

* ইমাম আবু হানিফা ও মালিক (রহ.)-এর মতে, নফল ইতিকাফের জন্য রোহা রাখা আবশ্যক। কেননা, তাঁদের নিকট নফল ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে একদিন। (১৪০ ও তারবার জুলাই ১)

দলীল (১) হয়তহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত- "সোমের মুক্তফ"।

অর্থাৎ, ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) জাহেলিয়াতে একদিন অথবা একরাত মাসজিদুল হারামে ইতিকাফের মানত করেন। তিনি এ সম্পর্কে নবি করিম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি ইতিকাফ কর এবং রোহা রাখ।

দলীল (২) হয়ত আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে- "লাল পুকুর নামুনা ইতিকাফ নেই।"
দলীল (৩)য় ইবনে উমর ও ইবনে আকাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন-
অর্থাৎ, ইতিকাফকারী রোয়া রাখবে।

উপরোক্তিত হাদিসে ইতিকাফকারীকে রোয়া রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর রোয়া একদিনের কম হয় না। আর হাদিসে রোয়াকে সাধারণ (মাল্য) রাখা হয়েছে।

ফরয় কিংবা ওয়াজিদের সাথে শর্তমুক্ত (মুক্ত) করা হয়নি। সুতরাং নফরের ক্ষেত্রেও রোয়া রাখতে হবে।

দলীল (৪)য় আল্লাহ তাআলার বাণী-

নতুন আসমানকে নতুন হওয়া তা নন- তব তাতে আওয়াম এবং আগন্তুক এই মসজিদে অবশাও কর, ততক্ষণ পর্যন্ত জিনদের সাথে মিশা না। (বাকরাণ ১৮৭)

উক্ত আযাত থেকে বুঝা যায় যে, ইতিকাফের জন্য রোয়া জরুরী। কেননা আযাতে রোয়ার সাথে ইতিকাফের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

আহনাফদের পক্ষ থেকে জাবাবুর উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদিসে দ্বারা প্রদত্ত দলীলের জবাব হল এই- সহীহ মসিলিমে উক্ত হাদিস বর্ণিত আছে, তথায় লেলে (রা)-এর জায়গায় যোনা (দিন)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এবং আবু দাউদ ও নাসাবীতে যোনা (দিন এবং রাত) উভয়ই উল্লেখ দেওয়া হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে সকল রোয়াতে শুধু রাতের কথা উল্লেখ রয়েছে, এর দ্বারা লেলে মুহাম্মাদ (সাহেব রা) বুঝাতে উদ্দেশ্য। আর দিন হল রোয়ার আধার।

(দ্বারা- পূর্ব ছ।)

দলীল (২)য় অথবা বলা যায় যে, নবী করিম (সা)-এর এই হুকুম ছিল হযরত উমর (রা)-এর জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতকৃত ইতিকাফ আদায় প্রসঙ্গে। আর এই হুকুম ছিল, হযরত উমর (রা)-কে মানসিক প্রশাস্তি দান প্রসঙ্গে। এটা আদায় করা বা না করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এতে রোয়ারও প্রয়োজন নেই। কেননা, হানাফী মাসাহাবে জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতই সহীহ নয়। আর অন্যদের মতে যেহেতু জাহেলিয়াতের যুগে মান্নতকৃত ইতিকাফ আদায় করা ওয়াজিব, সুতরাং নফরের ক্ষেত্রে উক্ত হাদিস দলীল হিসেবে পেশ করা আদৌ ঠিক নয়। (দ্বারা- পূর্ব ছ।)

দলীল দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা যায় যে, ইবনে আকাস (রা) থেকে ইবনে ইতিকাফকারীর রোয়া রাখতে পাওয়া যায়- অর্থাৎ, ইতিকাফকারী রোয়া রাখবে।
বাবু আব্বান বুঝতে পারেন না।

ইতিকাফ কোথায় করতে হয়?

... গুরুত্ব প্রদর্শন করেন তাঁর শ্রদ্ধা ও নিঃসন্দেহ সাধনা।

অনুবাদঃ ... ইবন উমর (রাঘ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা) রম্যান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফে বলেন, আমাকে আহ্বান ইবন উমর (রাঘ) মসজিদের ঐ হাঁটতি দেখান, যেখানে রাসুলুল্লাহ (সা) ইতিকাফ করতেন।

বিশ্লেষণঃ জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুধু হবে কিনা, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

* হযরত ইবন মাসুদ, আলী (রাঘ), আতা হাসান বসরী, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রেওয়ায়েৎ অনুযায়ী ইতিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য জামে মসজিদ আবশ্যক। সুতরাং জামে মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ শুধু হবে না।

দলীল (১) অয়িশা (রাঘ) হতে বর্ণিত -

... না ইতিকাফ না এ মসজিদ জামে - (আলি দাদ জি) ৩৫ বাবু মন্তক বয়েদ উদর, তরমুজ জি ১।

অর্থাৎ, জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুধু নয়।

দলীল (২) তারা দলীল হিসেবে কিয়াস উপস্থাপন করে বলেন যে, জমুআর নামায আদায় করা ফরম। আর এবং ইতিকাফার কে জমুআর জন্য বের হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যেমন মসজিদে ইতিকাফ করলে মন্তক হওয়া লাগবে না।
দলীলঃ পবিত্র কুরআনের আযাত

* ইমাম আরু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক, শাবি, আরু সালমা, নাকৈ এবং
ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ জমাত উলামার মতে, ইতিকাফ শুরু হওয়ার জন্য জামে
মসজিদ হওয়া আবশ্যক নয়; বরং প্রত্যেক মসজিদেই ইতিকাফ সমীক্ষ হবে, যেখানে
পাঁচ ওয়াকফ নামায জামাইকাতে আদায় করা হয়।

াধ্যায়ঃ 

ওলা’ তাবারুর হেন ওয়ালাম মুকুলুন ফি দুরালি মসজিদ-

অর্থাৎ, আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফের অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত
সৌদীর সাথে মিশে না। (বাকারাঃ ১৮৭)

উত্তর আরামে ইতিকাফের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,
জামে মসজিদকে শর্তযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং যেকোন মসজিদে ইতিকাফ করলে
তা আদায় হয়ে যাবে।

প্রত্যেক ইমাম মালিক (রহ.}-এর প্রথম দলীলের জবাবঃ আরু দাউদ (রহ.)
হাদীসটি বর্ণনা করার পর নিজেই বলেন-

... গুরু তাবুরুর রহমান বন এস়াহদি না তুলো ফি দুরালি সাল ফালাহ দাউদ জালে

রোল উদাহরণ ফি দুরালি

অর্থাৎ, ... আহমদ রহমান ইবন ইসহাক ব্যতীত কেউ বলেন না যে তা সুন্নত। আরু
দাউদ (রহ.) বলেন, এ হলো আয়াশা (রাহান)-এর বক্তব্য।

সুতরাং তা কুরআনের মোকাবেলায় দলীলের ব্যাপার।

দ্বিতীয় দলীলের জবাবঃ কুরআনের আযাতের মোকাবেলায় কিয়াস করে জামে
মসজিদকে শর্তযুক্ত করা কোনক্রমেই বেঞ্চ নয়।

উল্লেখ যে, সর্বক্ষণ ইতিকাফ হল যা মসজিদে হারামে (কাবা শরীফে) আদায় করা
হয়, অতঃপর মসজিদে নান্দী (সাং), অতঃপর বায়তুল মুকামদাস, অতঃপর জামে
মসজিদে, অতঃপর ঐ সব মসজিদে যেখানে মুসল্লী সংখ্যা বেশি হয়।

(নব্বাদা আলিদ্দিন ১১ সং ১৪২–১৪৩)

বাবু আমুলফিক, যিনিই পবিত্র ভূমি লিখিতে সীমান্ত সৃষ্টি করে সোমেন চর করে

প্রযোজন ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হয়ে ঘরে প্রবেশ

... উনি উদাহরণ কোন রাসুল হেন সালী খলু উল্লী ঔয়েল ইয়া আমুলফিক যুক্ত যুক্ত
রাসুলের মাত্র ওকোন যে যিনি পবিত্র ভূমি লিখিতে সীমান্ত নাট লিখিতে সীমান্ত
(খামারি সং ২৭২) বাবু
অহকামুল হাদিস ৬৫৩ রোয়া অধ্যায়

মন্তকের লা ঢিকের আহরণে, তাহলে জ ১৫ বাব মন্তকের হজার লাহের নাম না, অন্য মাজার।

অনুবাদঃ ... আহিশা (রাতি) হতে বিভিন্ন। তিনি বলেন, রাসূল সাইদ (সাইদ) যখন ইতিকাফ করতেন, তখন তিনি মীয় মাথা মুক্ত আমার নিকটবর্তী করতেন, আমি তাদের চিরক্ষে করে দিতাম। আর তিনি মানবিক (প্রত্যাহরণ) প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন থেকে প্রবেশ করতেন না।

বিশেষণঃ ইতিকাফ শুধুর অর্থে হল নিজেকে আটকিয়ে বা বস্তি করে রাখা। কিন্তু একষ্ট প্রয়োজনে ইতিকাফকারী মসজিদ হতে বের হতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে নিজে আলোচনা উপস্থাপন করা হল এ ব্যাপারে আলাদা নবী (রহ.) লিখেন—

লা ইবুল মুন্তকের মন্তকের নাম লাহের লা লাহের শরীর। শরীর না অথবা স্বভাব গোলাম প্রয়োজন শুধু তে বের হতে পারবে না।

লা ইবুল মুন্তকের মন্তকের নাম লাহের লা লাহের শরীর। শরীর না অথবা স্বভাব গোলাম প্রয়োজন শুধু তে বের হতে পারবে না।

হাসাফিরা পদাস বিভিন্ন লা লাহের প্রথম করে বেরে লাহের—

অথর্থরা পাদ্য প্রয়োজন ও পুরুষের কাজগুলো।

অদৃষ্ট বিভিন্ন, অধু ও ফরম গোসলও অক্ষত হয়ে যায়। আর এটাই ব্যাপকতর ব্যাখ্যা।

আর তাই অপরিহার্য প্রয়োজন শুরুতে মসজিদের বাইরে যাওয়া, যেখানে জমামার দিন গোসল করতে বা একষ্ট টাইটার জন্য গোসল করতে অথবা এক অজু থাকা সত্ত্বেও নতুন অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়গা নয়। কেননা, এগুলো হামিল হে প্রয়োজন হয়। (এক্ষেত্রে ভিক্ষ না অপরিহার্য প্রয়োজন নয়।)

হামিল এই যদি হয় যে, গোসল না করার কারণে শরীরে খুব বেশি দুর্গন্ধ এসে যায় বা ইবদেত মন না বসে অথবা তীর্থ অসুখ হওয়ার সমূহ সত্ত্বা থাকে, তাহলে ভিক্ষ কথা।
বাবু মুম্তাজ আফতাবুর রহমান চৌধুরী

প্রথম ভাগ

জে. নুসরাত আহমেদ সাহেবের জীবনী

কিন্তু ফকিহগণ কেবল নাপাকীর কারণে গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকেন, কারণ জুমুআ সহ অন্য কোন গোসলের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেন না। হিসেবে বলেন, নবী করিম (সাহ) প্রায় প্রতি বছরই ইতিকাফ করতেন, এবং প্রত্যেক ইতিকাফে অবশ্যই জুমুআ অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কোথাও একবার বর্তমান যে, নবী করিম (সাহ) জুমুআ গোসলের জন্য বের হতেন। অর্থাৎ স্বয়ং আযিশা (রাখ) বলেছিল যে, “... নবী করিম (সাহ) বীর্য মাথা মোরাবক আনার নিকটবর্তী করতেন, আমি তাতে চিরন্ত করে দিতাম।” কিন্তু জুমুআ গোসলের জন্য বের হয়েছেন এমন কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়নি। যদি তিনি কখনো বের হতেন, তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করা হতো।

প্রথম ভাগ

ইতিকাফকারীর রোগীর সেবা করা

"বাবু সাহেব তোমাকে বলছেন যে,... অনুবাদঃ... আযিশা (রাখ) হতে বর্তিত। রাবী আন-নুফাইলী বলেন, তিনি (যাই হোক) বলেছেন, নবী করিম (সাহ) ইতিকাফে থাকা অবশ্যই রোগীর নিকট গমন করতেন। এরপর তিনি যে অবশ্য থাকতেন, সে অবশ্য গমন করতেন এবং তার (রোগীর) নিকট দুঃখিত না হয়, তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। ইবনে ইসা বলেন, তিনি (যাই হোক) বলেছেন, যদি নবী করিম (সাহ) ইতিকাফে অবশ্যই কোন রোগীর পরিচর্যা করে থাকেন (তবে তিনি প্রফেসর-পায়খানার প্রয়োজনে বের হয়েছিলেন)।

বিশ্লেষণঃ একথার উপর সকলেই একমত যে, রোগীর সেবা করা এবং জানায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ইতিকাফকারীকে মসজিদ থেকে বের হওয়া নাজারেয়।

(ইস্লাম: প্রথম ভাগ প্রতিটি অবস্থান (১-৫) শেষ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়)
কিন্ত মুল্ল আলী কারী বলেন যে-এমতাবস্থায় ইতিকাফকারীকে দেন্তায়মান না তার চলতে চলতে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। (মর্ফাহ ৫৪ চ ৩৩)

দলীল (১) অনুভূতের গুরুত্ব বর্ণিত হাদিস। উল্লেখ যে, জানায়ার নামায় যেহেতু দেন্তায়মান থাকা ছাতার শরীক হওয়াই সত্ত্ব নয়, এজন্য তাতে দেন্তায়মান হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্ত মূল রাস্তা থেকে সত্ত্বে পারবে না এমন সময় হতেই তৎক্ষণ মসজিদে ফিরে আসা ওয়াজিব।

(بدائع الصنائع ج 2 ص114، احكام اعتكاف ص27-45)

যদিও সুফিয়া সাওরী এবং আলুল্লাহ ইবন মুহারক (ر.ث.ة)-এর মত, ইতিকাফে বসার সময় যদি কেউ এ শর্ত করে যে, ইতিকাফ চলাচলিন্য অবস্থায় রোগীর সেবা করব, ইলমের মজলিশে সবে অথবা জানায়ার নামায় চলে যাব, তাহলে তার জন্য বের হওয়া জারী হবে। (الدر المختار مع رد المختار ج 2 ص149، فتاوى الطالكي ج 1 ص11)

কিন্ত বিশুদ্ধ কথা হল এই যে, কেবল মাত্র অথবা নফল ইতিকাফের কেন্দ্রে একক অনুমতি দেয়া যায়। সুন্নত ইতিকাফের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন নয়। সুতরাং সুন্নত ইতিকাফের ক্ষেত্রে যদি কেউ এ ধরনের নিয়ত করে, তাহলে তা সুন্নত ইতিকাফ থাকবে না; বরং তা নফল ইতিকাফ পরিগণিত হবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কায়া ওয়াজিব না হলেও সুন্নত ইতিকাফের ফযিলিত হাসিল হবে না। (احكام اعتكاف ص61-17)

প্রণিধানযোগ্য যে, ইবন মাজায় হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يبيع الجنائز ويروع المريض

(ابن ماجة ص128 باب في المعتكف يعود البيض ويعيد الجنائز، ترجمة ج1 ص166)

অর্থাৎ, ... রাসুলুল্লাহ (ص.غ) ইরাশাদ করেছেন, ইতিকাফকারী জানায়ার পিছনে যাবে এবং রোগীর সেবা করবে।

কিন্ত এ রেওয়ায়েতটি দুর্বল। তাছাড়া ইহা হযরত আযিশা (রা.)-এর সহীহ রেওয়ায়েতের বিরোধী।

عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعدوة مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لدرا منه ولا اعتكاف الأصوص ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع (ابو داود ج1 ص339 باب المعتكف يعود المريض)
অর্থাৎ, ... আরিশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নত এই যে, সে যেন কোন রাগীর পরিচর্যার জন্য গমন না করে, জানায়ার নামায়ে শরীর না হয়, ক্রীকে স্পর্শ না করে এবং তার সাথে সহবাস না করে। আর সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ হতে বের না হয়। রোষা ব্যতীত ইতিকাফ নাই এবং জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুধু নয়।

অতএব, এক্ষেত্রে আরিশার (রাঃ) হাদিসটি প্রমাণযোগ্য। কেননা, অন্যান্য হাদিসের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং আনাস (রাঃ)-এর হাদিসের তুলনায় এটি অধিক বিশ্বাস।